দেবতোষ দাশ



ধর্মসূত্র

https://boierpathshala.blogspot.com

কামসূত্র

দেবতোষ দাশ



কেতাব-e প্রকাশনা

KAMASUTRA
A Novel by Debatosh Das

কামসূত্র

প্রথম কেতাব-e সংস্করণ: অক্টোবর, ২০২১
প্রচ্ছদ: সৌজন্য চক্রবর্তী

গ্রন্থস্বত্ব: দেবতোষ দাশ

প্রকাশক: দিব্যেন্দু ঘোষ, টেকনো ভিশন
৫১ সি/২ডি/৪ অর্ধেন্দু শেখর নস্কর সরণি,
কলকাতা ৭০০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

যোগাযোগ: info@ketab-e.net, +91-9433813450
অনলাইন বিক্রয়স্বত্ব: www.ketab-e.net

দাম: ৩০০ টাকা (ভারত), $8.57 (ভারতের বাইরে)

ই-বুক সংস্করণ - দ্য বুকমেকার্স
www.thebookmakers.in

এই ই-বইয়ের পূর্ণ বা খণ্ডাংশের কোনও রকম নকল, অনুমতি ছাড়া প্রকাশ ও বণ্টন আইনানুগ শাস্তিযোগ্য।

এই গ্রহে নিজভূমে পরবাসী যাঁরা, বা মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত,
তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা-লড়াইয়ের প্রতি নিবেদিত এই উপন্যাস।

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

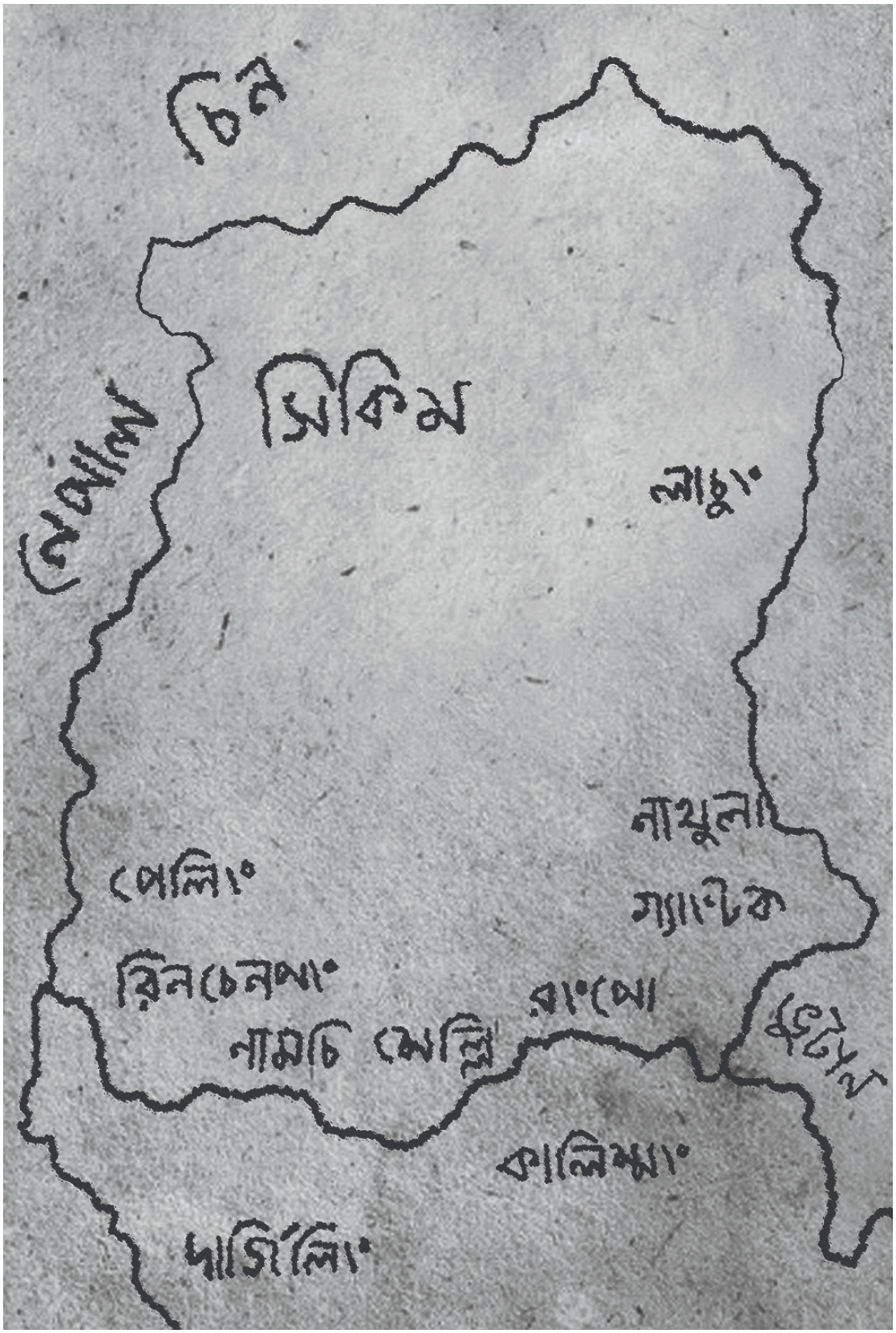
boidownload.com

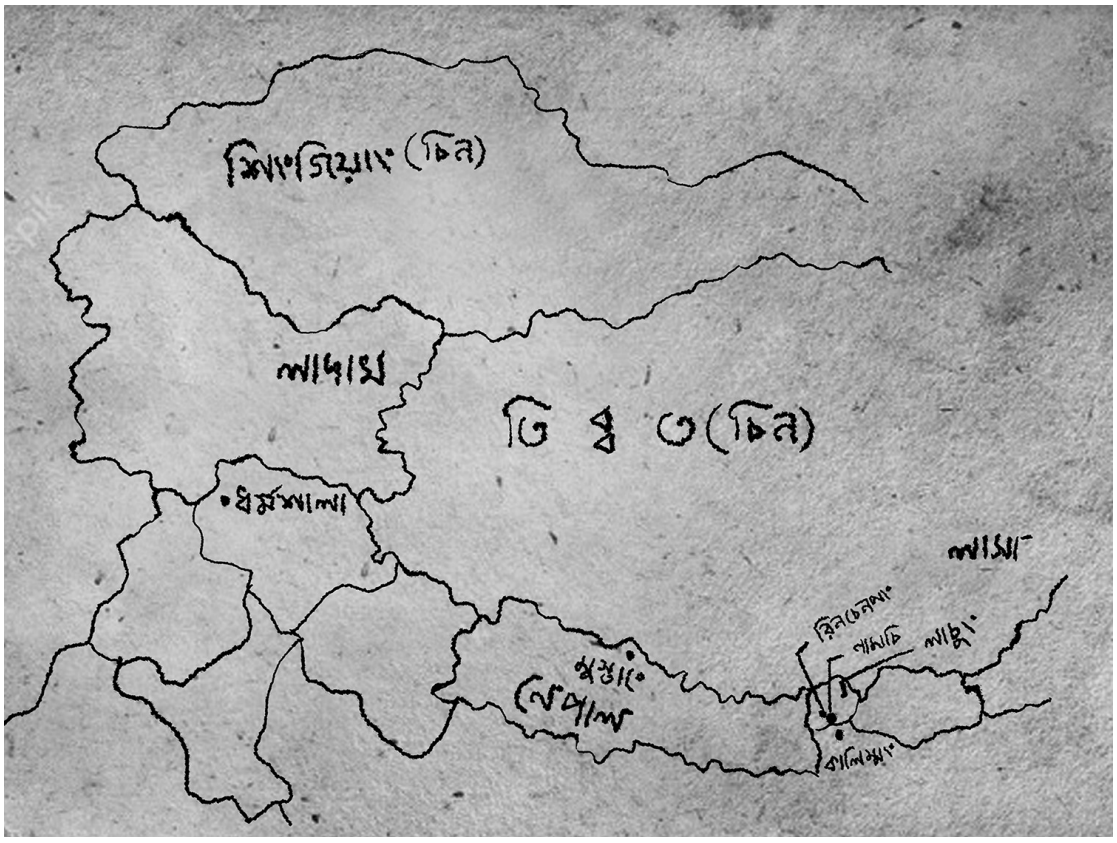
boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥


চিন
সিকিম
নেপাল
লাচুং
নাথুলা
পেলিং
গ্যাংটক
রিনচেনপং
রাংপো
নামচি
মেল্লি
কালিম্পং
দার্জিলিং


সিকিম (ভি)
ভি ব ও (ভি)

ধর্ম

অর্থ

কাম

মোক্ষ

ধর্ম

https://boierpathshala.blogspot.com/

১৩ অক্টোবর। পার্কস্ট্রিট। কলকাতা।

শহরে সদ্য শেষ হয়েছে দুর্গাপুজো। সিঁদুরমথিত বাতাসে এখনও বিচ্ছেদবেদনা স্পষ্ট। হেমন্তের কুয়াশা এসে সেই বেদনা ঢেকে দিতে পারেনি। দিনের আবহাওয়া এখনও শরৎকালীন। এসে গিয়েছে উৎসবের ঋতু। চলবে সেই শীতকাল পর্যন্ত। একের পর এক। কিন্তু পার্কস্ট্রিটে আলাদা কোনও আনন্দের মরশুম নেই, যেন বছরভর উৎসব। শরীরের স্থায়ী ট্যাটুর মতো আদরের চিহ্ন। জন্মদাগ।

দিনান্তের চরাচর ক্রমশ আনন্দব্যাকুল এবং গূঢ়। কাল পূর্ণিমা। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। জ্যোৎস্না জমে জমে চাঁদ ক্রমাগত অখণ্ড। শনিবারের রাত। ঘড়িতে আটটা কুড়ি। ঝলমলে পার্কস্ট্রিট। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয় এই এলাকা। খানাপিনার ঠেকগুলো হয়ে ওঠে সরগরম।

ব্র্যান্ডের নিয়ন আলোয় কাকস্নান করে ফুটপাথে বসে থাকে ঝানু ভিখারি। তার পাশে পুরনো ও পাইরেটেড বই বিক্রি করে যে বিষণ্ণ দোকানি, সে আপাতত বাড়ি ফিরতে চায়। ঘড়ি দেখে। ন'টায় তুলবে দোকান। বাঁহাতে বিড়ি ধরে ডানহাতে ঝাড়ন দিয়ে বইগুলি ঝাড়ে। ভিখারির লোভাতুর চোখ আর দোকানির বিড়ির ধোঁয়া শূন্যে কাটাকুটি খেলে। তাহাদের দুঃখের দিন তথাগত। তাহাদের সুখের দিন ভাসমান। ব্যর্থতার সেইসব অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন টপকে ফুটপাথ ধরে হনহনিয়ে হেঁটে যায় মেলা মানুষ-মানুষী।

রডন স্ট্রিট ও পার্কস্ট্রিট সংযোগের দক্ষিণপূর্বে সাউথ পার্ক গোরস্থান। বিপরীতে আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। সে বিশাল বহুতল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পেল্লাই ফটকের সামনে অষ্টপ্রহর কড়া নিরাপত্তা।

রডন স্ট্রিট অধুনা সরোজিনী নাইডু সরণি ধরে, গোরস্থান ঘেঁষে, ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়াল, একটি পুরনো মারুতি আটশো। গাড়ি থেকে নেমে মসৃণ হেঁটে শহরের ভিড়ে মিশে যায় ড্রাইভার। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গোরস্থান ও জাদুঘরের মাঝে হাইফেন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভিনটেজ গাড়ি।

দর্শনার্থীদের জন্য মিউজিয়াম বন্ধ হয়েছে সাড়ে সাতটায়। আটতলায় গ্যালারি বন্ধ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী দৈনন্দিন নিরীক্ষণে ব্যস্ত। গলায় ঝোলান পরিচয়পত্রে লেখা আছে কর্মীর নাম। মন্টু ভট্টাচার্য। দিনের শেষে তালিকা ধরে সব জিনিস মিলিয়ে নেওয়া তাঁর কাজ। তারপর ছুটি। গ্যালারি ধরে-ধরে প্রদর্শিত মূর্তি, ছবি, মুদ্রা ইত্যাদি মেলানোর পর নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উজ্জ্বল আলোগুলো তিনি একে একে বন্ধ করতে থাকেন।

অষ্টম তলা পুরোটাই বৌদ্ধধর্মের জন্য সংরক্ষিত। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম, হীনযান-মহাযান পেরিয়ে বজ্রযান হয়ে তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গ্যালারির দিকে এগিয়ে যান কর্মী। গ্যালারিতে ঢোকার মুখেই দুটি বিশাল চিত্রকর্ম। নাগ-পো চেং-পো বা মহাকাল, তাঁর পাশে দেবী পেলডেন লেহ্‌মো। অষ্টধর্মপালের অন্যতম দুই মুখ। যথার্থ দ্বারপালের মতো গ্যালারিতে ঢোকার মুখেই তাঁরা দণ্ডায়মান। তাঁদের সাক্ষাৎ ব্যতীত তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের অন্দরে ঢোকা অসম্ভব।

ভয়াল মহাকাল ও দেবী পেলডেন লেহ্‌মোর রূপ দেখে গা কেমন ছমছম করে ওঠে রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীর। রোজই এই কাজ করেন তিনি, কিন্তু আজ যেন অন্য অনুভূতি। এদিক-ওদিক দেখেন। নাকে মাঝে মাঝে আসছে একটা বোটকা গন্ধ, কিন্তু গন্ধের উৎস অজানা। পেছন ফিরেও তাকান দু'বার। কয়েকটি আলো নেভানোর ফলে আলোর সঙ্গে কিছু আঁধারও মিশে গেছে বিশাল হল ঘরে। ওয়াকিটকিতে অন্য সহকর্মী কারোকে ডাকবেন কিনা ভাবেন।

এই থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন। দেশ-বিদেশের বহু গবেষক আসেন এখানে বছরভর। এখনও পাঁচ বছর বয়স হয়নি, বিভিন্ন ধর্ম-সংক্রান্ত তথ্য,

ইতিহাস, সংকেত-চিহ্ন, প্রাচীন পুঁথি, মূর্তি ইত্যাদির সমারোহে ইতোমধ্যেই গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে এই দশতলা জাদুঘর। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ক গ্যালারিও অসাধারণভাবে সাজানো। বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলো ও ধ্বনি সহযোগে শো হয় নিয়মিত। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি, জাতকের কথা, ওল্ড টেস্টামেন্টের গল্প, আরব্য রজনীর গল্প ইত্যাদি কাহিনি পুতুলের মাধ্যমে বর্ণিত। হিন্দু পুরাণ, খ্রিস্টান ও ইসলামিক মাইথোলজির গ্যালারিও কম আকর্ষণীয় নয়। ফলত প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ দর্শনার্থীর সমাগমও প্রচুর। বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় সাপ্তাহিক সেমিনার, গবেষক ও আগ্রহীজনের আকর্ষণের বিষয়। ইদানিং অনলাইনে ওয়েবিনারও বিশ্বব্যাপী যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি করতে পেরেছে।

মন্টুর চোখ আবার যায় চিত্রে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মহাকালের তিন মুখ, ছয় বাহু। বিস্ফারিত দুই চোখের ওপরে জ্বলন্ত তৃতীয় চক্ষুও দৃশ্যমান। আটটি নরমুণ্ড মালা হয়ে ঝুলছে তাঁর গলায়। মাথায় পাঁচ-খুলি শোভিত উষ্ণীষ। মহাকালের পাশে তাঁর সঙ্গিনী দেবী পেলদেন লেহ্‌মো। দেবীও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ছবিতে তিনি একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়ে পেরোচ্ছেন রক্তের সমুদ্র। খচ্চরের পশ্চাতে একটি চক্ষু ও তার লাগামটি সাপের। বিজন হল ঘরে ভয়ানক দুই চিত্র রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী মন্টু ভট্টাচার্যের মনোযোগ টেনে নেয়।

ভয় একবার মাথায় ঢুকে গেলে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করা শক্ত। তবে ভয় পেলে ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত সজাগ হয়ে ওঠে। মন্টুরও সম্ভবত তাই হয়। এই হল-ঘরে অতিরিক্ত কারও উপস্থিতি তিনি টের পাচ্ছেন। তিনি ছাড়াও এই বিশাল ঘরে আরও কেউ আছে। চকিতে পেছন ফেরেন। না, কেউ নেই। মনের ভুল। চোখ বুলিয়ে নেন সিসি টিভি ও পিআইআর যন্ত্রগুলোর ওপর। মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণের কর্মী সহজে হওয়া যায় না। নির্দিষ্ট ট্রেনিং ও শিক্ষণ-প্রণালীর মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। মন্টু ভট্টাচার্য দক্ষ কর্মী হিসেবেই মিউজিয়ামে পরিচিত। এতদিন কাজ করছেন এখানে, এই অভিজ্ঞতা প্রথম। ভয় বা আতঙ্ক তো দূরের কথা, কখনও কোনও অস্বস্তিতেই পড়তে হয়নি।

নিজেই নিজেকে সাহস জুগিয়ে দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হন মন্টু। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হতেই আবার চমকে যান তিনি। ওয়াকিটকিটা বন্ধ হয়ে গেছে। অনর্গল সিগনাল আসে যে যন্ত্র থেকে সে সম্পূর্ণ নীরব। পকেট থেকে দ্রুত বার করেন স্মার্ট ফোন। ফোন চালু কিন্তু কোনও কল করা যাচ্ছে না। কেবল ওয়াকি নয়, বিকল হয়েছে ফোনও। সে হোক, মন্টু এগিয়ে যান মূল গ্যালারির দিকে।

মহাকাল ও দেবী পেলদেন লেহ্‌মোকে অতিক্রম করে তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের মূল গ্যালারিতে তিনি ঢুকে যেতেই পারতেন, কিন্তু পারলেন না। পা-দুটো যেন মেঝেয় গেঁথে দিয়েছে কেউ। স্থবির। নাকে একটা গন্ধ পেয়েছেন, এবার কানের পালা। অদ্ভুত একটা গরর্ আওয়াজ। মৃদু গর্জন। শিরদণ্ড বেয়ে ভয়ের একটা শীতলধারা বয়ে যায় মন্টুর। বুকে একটা প্রবল চাপ। ঢোক গিলতেও বিস্মৃত হন তিনি।

গর্জনটা থেমে যায়। মন্টু স্থির। চিৎকার করতে চান। পারেন না। যেন বোবায় ধরেছে। হঠাৎ আবার একটা শব্দ পেছনে। এবার কোনও জন্তুর গর্জন নয়। খসখসে আওয়াজ। সর্বশক্তি একত্র করে মন্টু ঘুরে দাঁড়ান। তাঁর থেকে দু-পা দূরে পড়ে আছে একটি কালো রঙের বস্তু। মুখোশ। কিন্তু এই মুখোশ কোথা থেকে এল? এমন মুখোশ তো জাদুঘরে নেই! মুখটা মহাকালের। মন্টুকে আবার গ্রাস করে দিগ্বিদিক আতঙ্ক। সে কেবল বীভৎস সেই মুখমণ্ডল দেখে নয়, এই ভেবে যে ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছে কেউ!

একজন, না কি একাধিক?

অকস্মাৎ, তুমুল অপ্রত্যাশিত কাণ্ড, মন্টুকে বিস্মিত করে মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে যায় গোটা হলঘর।

রডন স্ট্রিট আর পার্ক স্ট্রিটের মোহানার কাছে, গোরস্থান ও জাদুঘরের মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার নিপুণ মিশে গিয়েছেন জনজঙ্গলে। মিনিট পনের অতিক্রান্ত। কাছে পার্কোম্যাট থাকলেও কারও নজরেই পড়ে না গাড়িটি। পড়লেও আলাদা কোনও মনোযোগ তৈরি করে না। কিন্তু গাড়িটি যে ভেতরে-ভেতরে নিজেকে প্রস্তুত করছিল, বোঝা গেল আটটা বেজে পঁয়ত্রিশে। গাড়ির ভেতর একটা বিস্ফোরণ ও আগুনে সচকিত হয় এলাকা এবং ক্রমে শহর।

নিরাপদ দূরত্ব রেখে মুহূর্তে ট্রাফিক পুলিশ ঘিরে ফেলে গাড়িটি। স্তব্ধ যান চলাচল। ভিড় ক্রমবর্ধমান। মুহূর্তে ভিডিও মোডে চলে যায় উপস্থিত জনতার ফোন-ক্যামেরা। নিকটবর্তী পার্কস্ট্রিট থানা থেকে দল নিয়ে চলে আসেন অফিসার-ইন-চার্জ। খবর যায় লালবাজারে। গাড়িটা জ্বলছে। আরও বড় কোনও বিস্ফোরণ হবে কিনা বোঝা যায় না। দড়ি দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে ফেলেছে পুলিশবাহিনী। অপেক্ষা বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের। শহরে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ, হতাহতের খবর এখনো জানা যায়নি। মূলধারার মিডিয়া আসার আগেই স্মার্টফোন বাহিত হয়ে খবর ও ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। হুটার বাজিয়ে ঢোকে একের পর এক পুলিশ বাহিনী ও দমকল। উত্তেজনা ঊর্ধ্বমুখী।

গাড়ির ভেতরে আবার মৃদু একটি বিস্ফোরণ। চোখের সামনে ফিল্মি বাস্তবতা চাক্ষুষ করে চিৎকার করে ওঠে সমবেত জনতা। সজাগ হয়ে ওঠেন পার্শ্ববর্তী মিউজিয়ামের নিরাপত্তা রক্ষীরাও। প্রধান ফটক বন্ধই ছিল, প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিক নিজেই চলে আসেন ফটকের তদারকিতে। ফটকের দায়িত্বে পাঁচজন রক্ষী। মূল মিউজিয়াম বাড়িটির নিরাপত্তা দেখেন আরও তিরিশজন। ডিরেক্টর ঘটনার গতিপ্রকৃতি রক্ষীদের মুখ থেকে শুনে আন্দাজ করার চেষ্টা করেন। ঠিক সেই সময় বেজে ওঠে তাঁর সেল ফোন।

ফোনটি ধরতেই উত্তেজিত গলায় একজন বলেন,

‘স্যার, ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস থেকে বলছি, আপনার অফিসের ঠিক পাশেই কারবম্ব ব্লাস্ট হয়েছে। ওখানেই আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড হাই-ভোল্টেজ সাবস্টেশন, পুরোটাই গ্যাস

ইনসুলেটেড পাওয়ার ট্রান্সফরমার! ওখানে আগুন লাগলে সর্বনাশ! আপনি ইমিডিয়েটলি আপনাদের মেইন স্যুইচ অফ করুন। শর্ট সার্কিট হয়ে গেলে মুশকিল। অত বড় বাড়ি, আগুন লাগলে বিরাট বিপদ! আমরা এক্ষুণি এলাকায় পাওয়ার কাট করব! প্লিজ স্যার ইমিডিয়েটলি স্যুইচ অফ দ্য মেইন বাটন টু অ্যাভয়েড ফার্দার ডেঞ্জার!'

উত্তেজিত সতর্কবার্তা শোনানোর পরই ফোনটা কেটে গেল। মুহূর্তে প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিকের খোঁজে প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন ডিরেক্টর। খবর পেয়ে প্রধান ফটক থেকে দৌড়ে ভেতরে আসেন চিফ সিকিউরিটি অফিসার। দৌড়ে আসেন প্রধান কিউরেটর। একে একে বাকি অফিসাররাও। পিআরও। কেমিস্ট। ফিনান্স অফিসার। গ্যালারি গাইড বা ডোসেন্ট। স্টোর কিপার। এছাড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, একজিবিশন সেল, কনজারভেশন ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টররাও এসে পড়েন তাঁদের চেম্বার ছেড়ে। মিউজিয়ামে কর্মীদের ছুটি হয় ন'টায়। খেলা ভাঙার মুখেই শুরু হয় টেনশন-জনিত বিশৃঙ্খলা।

ডিরেক্টর চিৎকার করে বিদ্যুৎ কোম্পানির সাবধানবার্তা শোনান কিন্তু সব শুনে ইতস্তত করেন নিরাপত্তা আধিকারিক। ঠিক সেই সময়, বাইরে জ্বলন্ত গাড়িতে আবার একটি বিস্ফোরণ এবং তৎসহ জনগর্জন কানে আসতেই ডিরেক্টর আরও হতচকিত হয়ে যান। চিৎকার করে নির্দেশ দেন নিরাপত্তা আধিকারিককে।

আগুনের গ্রাসে এই বহুতল, মানসচোখে এই দৃশ্য দেখে ডিরেক্টর আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। নিজেই দৌড়ে যান সেন্ট্রাল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট যেখানে আছে সেই ঘরের দিকে। তাঁর পিছু নেন নিরাপত্তা আধিকারিকসহ অন্যান্য অফিসাররা। ডিরেক্টরকে টপকে ঘরে ঢুকে সিকিউরিটি অফিসার বন্ধ করে দেন সেন্ট্রাল সার্ভিস ব্রেকারের স্যুইচ। অন্ধকার এসে মুহূর্তে ঢেকে দেয় মিউজিয়ামের অন্দরমহল।

হঠাৎ আলো চলে যাওয়ায় বিভিন্ন তলে কর্মরত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা কর্মীরা সাবধান হন। মোবাইল ফোনে আদানপ্রদান হয় জরুরি বার্তা। মোবাইলের আলো জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে

নেমে আসেন অনেকে। নিরাপত্তা কর্মীরা অতিরিক্ত সতর্ক। অকস্মাৎ অন্ধকার নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতে পারে। চিফ সিকিউরিটি অফিসারের নির্দেশে, ভবনে ঢোকার কাচের গেটসহ শাটার বন্ধ করা হল।

সব মিলিয়ে প্রায় সত্তরজন কর্মী-অফিসার এই মুহূর্তে মিউজিয়ামে উপস্থিত। সকলেই অন্ধকারের মধ্যে একে একে এসে জড়ো হন একতলার প্রশস্ত পরিসরে।

নিরাপত্তা রক্ষীরা ভিড় ঠেলে ভবনের শাটার বন্ধ করতে উদ্যোগী, ফটক বন্ধ করার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন কর্মী সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা দরজা পেরিয়ে ভবন থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। মূল ফটক এড়িয়ে তিনি চলে গেলেন ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। তারপর নিখুঁত দক্ষতায় উঁচু পাঁচিল টপকে নেমে গেলেন ফুটপাথে।

অদূরে জনারণ্য। জ্বলন্ত গাড়িটির ওপর দূর থেকে তীব্র বেগে জল ঢালছে দমকল। মানুষটি মিশে গেলেন ভিড়ে।

অপেক্ষায় ছিল একটি গাড়ি। লোকটিকে নিয়ে গাড়িটি পার্কস্ট্রিট অঞ্চলেই একই রাস্তায় কয়েক পাক মেরে এগিয়ে যায় চৌরঙ্গী রোডের দিকে। গন্তব্য মধ্য কলকাতার একটি মাঝারি হোটেল। জানালা দিয়ে দীপ্তিমান শহরের দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটি। আলোর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে মহানগর। শহরের কোনায় কোনায় যেটুকু অসহায় অন্ধকার, তাদেরও ছিন্নভিন্ন করতে চায় সেই আলোর ঝলক।

আলোর এই অতিরিক্ত সক্রিয়তার মাঝেই লোকটির মনে পড়ে যায় গত মাসের বৃষ্টিস্নাত সেই দিনের কথা।

১৫ সেপ্টেম্বর। সন্ধে। এসপ্ল্যানেড বাস টার্মিনাস। কলকাতা।

বৃষ্টি নামার আগে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে সাঁঝবেলা। শরতের মেঘ সরিয়ে ধীরে আকাশের দখল নিচ্ছে কালো মেঘের পাল। একটি ধূসর পলিপ্যাক মাঝরাস্তায় ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে হঠাৎ থতমত এবং ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। বিশ্বকর্মা পুজো আসন্ন। চুপিসাড়ে ভাদ্র ঢুকে পড়ছে আশ্বিনের গায়ে। সম্ভবত সেই প্রাক-উৎসব প্রণোদনায় আকাশছোঁয়া একটি ঘুড়ি, হঠাৎ-অর্গলমুক্ত, গঙ্গার দিক থেকে এসে, লটকে পড়ে এক কৃষ্ণচূড়া গাছের ডগায়। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা তাকে বিদ্ধ করার আগে সে কেবল প্রবল মাথা ঝাঁকিয়ে একটু উড়ে নিতে চায়।

নাগরিক পরিপ্রেক্ষিত এলোমেলো করে দেয় এক প্রচণ্ড বজ্রনিনাদ। অতঃপর ক্রমাগত বাদল ও স্থিরবিদ্যুৎ।

ঘুড়িটিকে আটকে রেখেছে যে কৃষ্ণচূড়া, তার নীচেই স্টার্টারের ছোট্ট গুমটি অফিস। আলো-আঁধারি গাছতলা। খুব শান্ত শ্লথ ভঙ্গিতে গুমটির ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল একজন। প্রৌঢ়। পরনে ঢোলা ট্রাউজার ও ফুলহাতা ধূসর জামা। কাঁধে আড়াআড়ি স্লিং ব্যাগ। কালো। বৃষ্টি বাড়তেই একটি নীল ফোল্ডিং ছাতা বার করে মেলে ধরে মাথার ওপর। বুকপকেটে কলম। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পাতলা গোঁফ। ভঙ্গি স্থিতধী হলেও নজর সতর্ক। ডান হাতের কবজি উলটে দেখল ঘড়ি। বোঝাই যাচ্ছে অপেক্ষমান। কেউ আসবে।

মিনিট খানেক পরেই, ঘুড়িটা তখনও ফরফরিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে শূন্যে, আরেকটি লোকের আবির্ভাব। মাথায় রুমাল, রঙচটা সস্তা নীল জিনস আর সবজে টি-শার্ট পরনে লোকটাকে, কর্পোরেশনের লালবাড়ির ঘাগু মুহুরি পিটার হিসেবেই চেনে অনেকে। অনেকে মানে কর্পোরেশনে যাদের কাজকর্ম থাকে। পিটার-মুহুরি মুখ তুলে চায় অপেক্ষমান লোকটির দিকে। পাকানো একটা কাগজ তুলে দেয় লোকটির হাতে। সঙ্গে

সঙ্গে কাগজটি খুলে চোখ বুলিয়ে নেয় লোকটি। পরপর চার পাতা। তারপর পকেট থেকে টাকা বার করে ধরিয়ে দেয় পিটারের হাতে। কাগজ ভাঁজ করে ঢোকায় ব্যাগে। একগাল হেসে ডান হাত কপালে ঠেকায় পিটার। হাসি দেখে মনে হয় প্রত্যাশার থেকেও বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছে সে।

ভাদ্র প্রায় শেষ। কালো মেঘের গেরিলা হামলায় কিছুটা পিছু হটেছে গরম। এইসময় দক্ষিণ থেকে একটা হাওয়া বয়ে যায় মহানগরীর ওপর দিয়ে। যারা চোখ-কান খোলা রেখে পথ চলে, তারা সেই হাওয়ায় একটা গন্ধ পায়। কিন্তু কেউই ঠাহর করতে পারে না কীসের গন্ধ!

পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে টাকাটা রেখে হাসিমুখেই পিটার আবার চোখ তোলে লোকটির দিকে। একি, কোথায় গেল? এদিক-ওদিক তাকিয়ে খোঁজে। কাগজ হাতে পেয়েই ভিড়ের মধ্যে মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে লোকটা! একটা বোটকা গন্ধ ঝাপটা মারে নাকে। নাক কোঁচকায় পিটার। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশের ভিড় মাপে। বৃষ্টির ফোঁটা ঝাপসা করে দেয় তার দৃষ্টি। মাথা থেকে এক ঝটকায় রুমালটা টেনে মুখটা মুছে নেয় পিটার।

শিয়ালদাগামী একটি ট্রামে বসে ব্যাগ থেকে পিটার-মুহুরির দেওয়া কাগজ বার করে লোকটি। ব্যস্ততা দেখে মালুম হয় কাগজটির গুরুত্ব যথেষ্ট। চোখ বোলায় বারংবার। এ-ফোর কাগজে চার পাতার কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। পাশাপাশি নাম আর তারিখ লেখা। নামগুলো বিভিন্ন হলেও পাশের তারিখ এক। ১৭ মে। তথাগত মণ্ডল। সুমন মিত্র। সুগত প্রধান। অমিতাভ ব্যানার্জি। যশ পারেখ। সৌগত রায়। মোঃ মতিয়ুর রহমান। দীপঙ্কর বসু। তিষ্য দাশগুপ্ত। প্রিয়দর্শী ভদ্র। সুমঙ্গল দাস। সিদ্ধার্থ আগরওয়াল। অর্হৎ বড়ুয়া। সুজাত চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি অসংখ্য পুরুষ নাম। পাশে সময় চিহ্নিত। শিরোনামে লেখা ১৭ মে জন্মানো পুরুষ জাতকের নাম, জন্মসময় ও মা-বাবার নাম-ঠিকানার তালিকা।

পরপর সব নাম পড়তে পড়তে লোকটি থমকায়। বুকপকেট থেকে কলম বার করে একটি নাম গোল করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। অর্হৎ বড়ুয়া। জন্মসময় ও বাপ-মায়ের

নামের তলায় দাগ দেয়। মায়ের নাম অঞ্জনা বড়ুয়া। বাবা সন্দীপ বড়ুয়া।

ট্রামে বসেই ফোন-স্ক্যানারে পটাপট তুলে নেয় চার পাতার ছবি। তারপর ছবিটিকে পোর্টেবল ফরম্যাটে নিয়ে, বার্তা আদানপ্রদানের অ্যাপের সাহায্যে, নির্দিষ্ট নাম্বারে পাঠিয়ে দেয় নিমেষে। বার্তাটির প্রাপক দ্রুত ছবিটি নামিয়ে সংযুক্ত করেন মেল-এ। খবর এবার ই-মেল বাহিত হয়ে চলে যায় নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

অঞ্জনা বড়ুয়ার বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল খুঁজে পেতে, সেই অজানা প্রাপকের সময় লাগলো মিনিট খানেক। নৈহাটি সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনের ইতিহাসের শিক্ষক। সময়রেখা জুড়ে অজস্র ছবি। ছেলেরই বেশি। ছেলে হাসলেও ছবি। কাঁদলেও ছবি। পার্কে ছুটন্ত ছবি। বই-পড়ার ছবি। মায়ের গলা জড়িয়ে ছবি। নানা কিসিমের ওঠাপড়ার ছবি। ছবিগুলো ছাপানো হয়ে যায় দ্রুত। রঙিন। ঝকঝকে। কেবল ছেলের নয়, মা-বাবারও। সন্দীপ বড়ুয়ার প্রোফাইলের ছানবিনও হয় দ্রুত। মায়ের মতো সক্রিয় নয় বাবা। তবু যেটুকু তথ্য পাওয়া গেল, তাই-ই অনেক। সে জীবন বীমা অফিসের কর্মী।

মুহূর্তে তৈরি হয়ে যায় ফাইল। ফাইলের ওপর স্টিকারও সেঁটে যায় দ্রুত। স্টিকারে বড় বড় করে ছাপা—অর্হৎ বড়ুয়া। চুশি গাংদ্রুক। চার নদী, ছয় পাহাড়।

৪

সে পিটার, তার চোখের নজর এড়িয়ে একটা লোক ভোজবাজির মতো উড়ে যাবে আর সে ফেকলু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তা কখনও হয়নি, হবেও না। বৃষ্টি ততক্ষণে গতি হারিয়ে ঝিরঝির। খুঁজতে খুঁজতে ট্রামের মধ্যে দেখতে পায় লোকটিকে। হ্যাঁ, এই তো সে! আলো-আঁধারিতে মুখমণ্ডল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। স্মার্ট ফোনটা পকেট থেকে বার করে পিটার।

লোকটা একদিনই দেখা করেছিল সপ্তাহ দু'য়েক আগে। কাগজের চাহিদা শুনে অদ্ভুত লেগেছিল পিটারের। ঠিক সাতবছর আগে, ১৭ মে জন্ম হয়েছে এমন জাতকের কাগজ চাই। না জাতিকা নয়, কেবল জাতকের তালিকা। অফিসে যোগাযোগ করেই পাওয়া যেতে পারে এমন তালিকা, কিন্তু বেশিরভাগ লোকেরই অফিসে গিয়ে তথ্য তুলতে বেজায় অনীহা। দালাল আর মুহুরিরা এই সুযোগ নেয়। পিটার মুহুরির কাছে এসব কাগজ সংগ্রহ বাঁহাতের খেলা। মাউজে কয়েকটা ক্লিক। ফরফর করে বেরিয়ে আসবে কলকাতায় জন্মানো ১৭ মে'র জাতক তালিকা। তবে লোকটার সঙ্গে কথা বলে পিটারের মনে হয়েছিল, এই শহরের লোক নয়।

পেছন থেকে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে পিটার। হ্যাঁ, এই লোকটাই; পিটার নিশ্চিত হয়। দ্রুত হাতে ক্লিক করে ক্যামেরায়।

মন দিয়ে কী যেন পড়ছে। মনে হচ্ছে তার সাপ্লাই-করা কাগজটাই দেখছে খুঁটিয়ে। আবার কাগজের ছবিও তুলছে! হঠাৎই চলতে শুরু করে ট্রাম। দ্বিতীয় শ্রেণিতে লাফিয়ে ওঠে পিটার। পরের স্টপে ট্রাম থামতেই নেমে যায়। ততক্ষণে স্মার্ট ফোনের গ্যালারিতে লোকটার আরও বেশ কয়েকটা ছবি জমা হয়েছে। কোনও কোনও ক্লায়েন্টের ছবি পিটার ক্যামেরাবন্দি করে রাখে। কখন কী কাজে লেগে যায় কিচ্ছু বলা যায় না।

৫

নির্দিষ্ট নাম্বারে খবরটি পাঠিয়ে লোকটিও নেমে যায় ট্রাম থেকে। বোঝা যায় ট্রামে চেপে সে কোথাও যেতে চায় না, কেবল বসে কাজটুকু করার জন্যই সে চেপেছিল। এবার পদব্রজে যাত্রা। হাঁটার ধরনেই বোঝা যায় গন্তব্য নির্দিষ্ট। চৌরঙ্গি রোডের ভিড়ঠাসা ফুটপাথ ধরে ধীরে এগিয়ে যায় গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে। বৃষ্টি শেষ। শহর আবার পথে।

এসপ্ল্যানেডের সন্ধের ফুটপাথে চলাই দায়। আগ্রাসী দোকানদার, সন্দিগ্ধ ক্রেতা ও পথচলতি মানুষের সমারোহে সে সংকীর্ণ পথ প্রায়-রুদ্ধ। ভিড় ঠেলে কোনও রকমে এগিয়ে যায় লোকটি।

গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে এক ক্যুরিয়ার কোম্পানির কাউন্টার থেকে, কাগজ দেখিয়ে, সংগ্রহ করে একটি মোড়ক। আকারে বড়। স্লিং ব্যাগে ঢুকবে না। হাতেই ধরা থাকে সেই মোড়ক। তারপর মেট্রো স্টেশনের দিকে গুটিগুটি পা।

ঢুকে পড়ে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের গহ্বরে। গেটে স্মার্ট কার্ড ঠেকিয়ে দ্রুত নেমে যায় প্ল্যাটফর্মে। উঠে পড়ে নিউ গড়িয়াগামী একটি ট্রেনে।

অফিস-ফেরত যাত্রীদের ভিড়। ভিড়ে কোনোরকমে নিজেকে ঢুকিয়ে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে যায়। একে একে পেরিয়ে যায় বিভিন্ন স্টেশন। কালীঘাট পেরোতে একটা আসনও পেয়ে যায় লোকটি। কোলের ওপর মোড়কটি রেখে বসে। রবীন্দ্র সরোবর পেরিয়ে ট্রেন থামে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনে। বহু যাত্রী নেমে যান। বেশ কিছুটা হালকা হয়ে যায় ভিড়। ট্রেন আবার চলতে শুরু করে। কবি নজরুল বা গড়িয়া বাজার স্টেশন পেরোতেই উঠে দাঁড়ায়। গন্তব্য পরের মেট্রো স্টেশন। শহীদ ক্ষুদিরাম।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে গেটে কার্ড ঠেকিয়ে বাইরে বেরোয়। চলাফেরার সাবলীলতা দেখে মনেই হয় না, এ শহর তার অপরিচিত। ঢালাই ব্রিজ থেকে বাইপাস অভিমুখে একটা ট্যাক্সি ধরে। গন্তব্য বৈষ্ণবঘাটা।

ট্যাক্সিতেই বসে ক্যুরিয়ার-মোড়ক খুলে বার করে আনে ভেতরের বস্তুটি। অন্য একটি মোড়কে মুড়ে ফেলে দ্রুত। ক্যুরিয়ার কোম্পানির মোড়কটি ঢুকিয়ে ফেলে ব্যাগে। তারপর পকেট থেকে কলম বার করে মোড়কের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে কিছু লেখে। কী-ভেবে মোড়ক থেকে ফের বার করে আনে ভেতরের বস্তুটি। স্পাইরাল বাঁধনে বন্দি দিস্তে কাগজ। স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট মুদ্রিত বড় বড় হরফ দৃশ্যমান—কামসূত্র।

৬

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

সূর্য্য পাটে। পশ্চিম আকাশ রক্তাভ। ধুলা উড়াইয়া পান্থনিবাসের প্রধান দ্বারে আসিয়া থামিল এক অশ্বারোহী। এক দ্বাররক্ষী অশ্বরজ্জু ধরিতেই আগন্তুক লাফ দিয়া অবতরণ করিল। অঙ্গে মূল্যবান রেশমবস্ত্র। মাথায় মানানসই উষ্ণীষ। দ্বিতীয় দ্বাররক্ষক অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া পান্থশালার অন্দরে সসম্ভ্রম পৌঁছাইয়া দিতে উদ্যত। অতিথি অশ্বটির গায়ে-মাথায় আদর করিয়া দ্বারপালকে অনুসরণ করিল। বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে বণিক মনে হয়। ধনবান। সেই কারণেই এত সমাদর।

শিপ্রা নদীর পূর্ব দিকে উজ্জয়িনী। নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে এই অতিথিনিবাস। নগর-প্রাচীরের পশ্চিমদ্বার অতিক্রম করিয়া সামান্য অগ্রসর হইলেই দৃষ্টিগোচর হইবে রাজপথ সংলগ্ন এই মনোরম পান্থশালা। পথশ্রমে ক্লান্ত পথিক, বণিক ও পরিব্রাজকদের প্রিয় ডেরা। সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তো আছেই, নিরাপত্তাও এস্থানে যথাযথ। সঙ্গের সামগ্রী বা ধনদৌলত লইয়া অহেতুক দুশ্চিন্তা করিতে হয় না। বিশ্রামশেষে বিদায়লগ্নে যাবতীয় বস্তু অতিথির হাতে নিরাপদে পৌঁছাইয়া যায়।

আগন্তুক প্রশস্ত কক্ষের অভ্যন্তরে ধীর পায়ে প্রবেশ করা মাত্র তাহাকে স্বাগত জানাইতে অগ্রসর হইল অতিথিনিবাসের প্রধান প্রবন্ধক। ততক্ষণে একজন কর্মচারী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে দ্রুত বণিকের পেটিকা লইয়া হাজির।

প্রবন্ধক স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'শুভসায়ম ভদ্রমহোদয়, এই পান্থনিবাসে আপনাকে স্বাগত। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত। সামান্য বিশ্রাম গ্রহণ করুন, পানীয় সেবন করুন, তারপর স্নান করবেন।'

'উত্তম।' স্মিতহাস্য প্রত্যুত্তর বণিকের।

নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া বণিক উষ্ণীষ খুলিয়া রাখিল তাহার পাশে। উত্তরীয়টি আলগা করিল। বিশালাকায় দুই পাখা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল দুই সেবিকা। অপর একজন লইয়া আসিল পানীয়। তৃষ্ণার্ত বণিক পাত্রে দ্রুত চুমুক দেয়। আমমন্থ। দগ্ধ কাঁচা আমের ত্বক মুক্ত করিবার পর তাহার ক্বাথ পিষ্ট করিয়া প্রস্তুত হয় এই পানীয়। উষ্ণতা-বিদারক এই পানীয় শরীরে প্রবেশ করা মাত্র সকল ক্লান্তি শোষণ করিয়া লয়। শরীরে প্রবিষ্ট রৌদ্রতেজকে দেহের সকল রোমকূপের ছিদ্রপথ দিয়া অর্ধচন্দ্র অর্পণ করিল যেন! বণিক এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া সেবিকার হাতে প্রত্যর্পণ করিল পাত্র। সঙ্গে হাসি। আহ্ কী আরাম! মায়ের হাতের আম-পোড়া পানীয়ের কথা মনে পড়িল। পথশ্রমে ক্লান্ত বণিক যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইল।

অতিথিনিবাসের পানশালার প্রশস্ত কক্ষের উত্তরাংশে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থানে বণিক উপবিষ্ট। বিশাল ভিড় না হইলেও, পানশালায় বেশ কিছু গ্রাহক এখনও বর্তমান। প্রত্যেকেই পান ও গল্পচারিতায় মত্ত। না, কিঞ্চিৎ ভুল হইল, প্রত্যেকে নয়। বণিকের প্রতি অধিকাংশের দৃষ্টি না থাকিলেও, একজোড়া চক্ষু প্রবেশমুহূর্ত হইতেই তাহাকে নিরীক্ষণে মগ্ন। পরিমাপ করিতেছে তাহার গতিবিধি। চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বিলক্ষণ সেই মাপ বুঝিল বণিক। দ্রুত দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। এখন আর নয়, প্রয়োজনে পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইবে। হয়ত গুপ্তচর। সম্ভাবনা যথেষ্ট। ইহারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থান করে এই ধরণের পান্থনিবাসে। সংবাদ সংগ্রহ করাই ইহাদের কর্ম্ম। বণিক অতিরিক্ত কোনও গুরুত্ব অর্পণ করিল না।

হাসিমুখী প্রবন্ধক পুনরায় অগ্রসরমান।

'মান্যবর, এবার স্নান করে নিন। আপনার জন্য সর্বোত্তম স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে।'
'আমার পেটিকাটি কোথায়?' বণিক ঈষৎ ব্যস্ত।
'আপনার শয়নকক্ষে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, বিচলিত হবেন না। আপনি সম্ভবত আমাদের অতিথিশালায় প্রথম এলেন!'
'তা বটে। আপনাদের নিরাপত্তার নাম আছে বুঝি?' হাসিয়া বলিল বণিক।

‘অতিথির নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপোষ করি না আমরা। আপনি আসুন মান্যবর।’

‘আমার বস্ত্র?’

‘আপনার পক্ষে উপযুক্ত সূক্ষ্মবস্ত্র আমাদের আছে, আপনি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারেন।’

‘আমি আপন বস্ত্রই পরিধান করব। পেটিকায় বস্ত্র আছে।’

‘আপনার যেমন ইচ্ছা। কৃপা করে যান এদের সঙ্গে।’

প্রবন্ধক সেবিকাদের দিকে ইঙ্গিত করিল।

‘আমমন্থ খুবই উপাদেয় ছিল, ক্লান্তিশোষক।’

‘আরেক পাত্র দেব মান্যবর?’ প্রবন্ধকের বিনীত জিজ্ঞাসা।

‘না, না, এক পাত্রই যথেষ্ট। মিশ্রণটি অপূর্ব। আম ছাড়া আর কী ছিল?’ বণিক প্রণালী জানিতে কুতূহলী।

‘কাঁচা আমের ক্বাথ, গুড়, সামান্য লবণ, জীরক, পুদিনা পাতা, কাঁচা মরিচ আর শীতল জল।’ মুখস্থ বলিল প্রবন্ধক।

‘বাহ, অতি উত্তম! নিমেষেই আমি রৌদ্রদগ্ধভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলাম! কী গুণ এই কাঁচা আমের! আপনারা কি আম সিদ্ধ করেন?’

‘হ্যাঁ মান্যবর। তারপর ক্বাথ নিয়ে—’

‘আমরা সিদ্ধ করি না, কাঠের জ্বালে পোড়াই, তারপর ক্বাথ বার করি। পোড়ানোর ফলে একটা ধোঁয়ার গন্ধ জুড়ে যায় মিশ্রণে—ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম না বলে জিজ্ঞেস করলাম।’

‘আম পুড়িয়ে কি দেব আরেক পাত্র, মান্যবর?’

‘আরে না-না মশাই! এই প্রণালীর মিশ্রণও খুবই সুস্বাদু। চলুন স্নানঘরে যাওয়া যাক।’

দুই সেবিকা উপস্থিত। তাহারা বণিককে লইয়া যায় অন্তঃপুরে। স্নানকক্ষের বাহিরে দুই ব্যক্তি অপেক্ষমাণ। একজন ক্ষৌরকার। অপরজন প্রসাধক। বণিকের গালে বেশ কিছুদিনের না-মুণ্ডিত দাড়ি। অতি যত্নে ক্ষুরতি করিয়া দিল ক্ষৌরকার। ছাঁটিয়া দিল গোঁফ। প্রসাধক গালে ঘর্ষণ করিল স্ফটিকারী। অতঃপর অন্যান্য প্রসাধনদ্রব্য তুলিয়া দিল

স্নানসহায়কের হাতে। আতিশয্য দেখিয়া বণিক বিলক্ষণ বুঝিল তাহার সঞ্চয় হইতে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রার বিয়োগ আসন্ন।

স্নানকক্ষে দুইজন সহায়িকা। অতিশয় যত্নে বণিককে পোশাক-মুক্ত করিতে তৎপর হইল তাহারা। বণিক কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতে। তবে প্রাথমিক জড়তা কাটাইয়া বণিক যেন আত্মসমর্পণ করিল দুই স্নান-সহায়িকার নিকট। প্রারম্ভেই তাহারা স্নানে ব্যবহৃত চন্দনাদি, গাত্রঘর্ষণদ্রব্য, সুগন্ধীচূর্ণ, তৈল প্রভৃতি নিজ নিজ বক্ষ ও বাহুতে স্পর্শ করিয়া আশ্বস্ত করিল আসন্ন স্নান নিরাপদ। ব্যবহৃত দ্রব্যে কোনও বিষ তথা বিপদ লুক্কায়িত নাই। মৃদু হাস্যে বণিক পাল্টা আশ্বস্ত করে, যেন এমত আচরণে সে খুশি।

অন্তর্বাসটুকু বাদ দিয়া সকল পোশাক মুক্ত করাইয়া যুবতীদ্বয় বণিককে বেদীতে শয়ন করাইল। স্বল্পবাস দুই তরুণীর হস্তে যেন ইন্দ্রজাল। খল হইতে আঙুলের ডগায় লেপন তুলিয়া নৈপুণ্যের সহিত চর্চিত করিল অঙ্গে। অতঃপর নরম আঙুলে মর্দন। অঙ্গমর্দনের সুখানুভূতি বণিকের দুই চোখের পাতা এক করিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে জানা নাই, বণিকের সম্বিত ফিরিল হাসির শব্দ আর জলের স্পর্শে। ঈষদুষ্ণ জলে অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া দিল দুই তরুণী। মাঝেমধ্যেই খিলখিলাইয়া হাসিয়া উঠে তাহারা। জালিকা সহযোগে মার্জন করিয়া তুলিয়া দিল প্রলেপ। অতঃপর অতীব ঠাণ্ডা জলের ধারা আসিয়া সিক্ত করিল বণিকের শরীর। একবার ঈষদুষ্ণ, অতঃপর পুনরায় শীতলধারা।

অচিরেই দূরীভূত হয় সকল ক্লান্তি। শরীরের সকল রক্ত যেন হইয়া উঠে চঞ্চল। দুই অঙ্গসংবাহকের যৌবনস্পর্শ, নাকি এই অসাধারণ স্নান, কী যে তাহাকে এত চনমনে করিয়া তুলিল, বণিকের যেন গোচরেই আসে না। অবশ্য এই স্নানের অঙ্গই তো ওই জাদুস্পর্শ। এই দুইকে ভিন্ন করা সম্ভবই বা কীরূপে!

ক্লান্তি অপনোদনের পর পূর্ণ দৃষ্টিতে বণিক চাক্ষুষ করিল দুই সুন্দরীকে। মৃণালভুজ। কয়েতবেলের মতো গোলাকার স্তন। সেই বর্তুলের কেন্দ্রে লালচে কৃষ্ণবর্ণের চূচকবৃন্ত। সিক্ত ও স্বচ্ছ কাঁচুলির আড়ালে তাহারা জাগ্রত। গভীর নাভিমূল। পাতলা কটিদেশের নীচে প্রশস্ত শ্রোণিদেশ। সামান্য কটিভূষণ অগ্রাহ্য করিয়া সে-নিতম্ব যেন আহ্লাদে বিস্ফার করিতেছে। কলাগাছের ন্যায় উরু। ঝর্ণাবৎ উন্মুক্ত জঙ্ঘা।

বণিকের দৃষ্টি দেখিয়া হাস্যে ও লাস্যে ভরিয়া উঠিল দুই স্নানকন্যা। বণিক নিজেকে সংযত করিল।

দুই সুন্দরীর পারস্পরিক কথোপকথনে বোঝা যায়, একজনের নাম বৃন্দা, অপরজন লীলা। লীলা অপেক্ষাকৃত নবীন, ধারে-ভারে-লাস্যে বৃন্দাই তুখোড়। যৌবন অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত মনোযোগ সহকারে তাহাকে প্রস্তুত করিয়াছে। তাই বলিয়া লীলার ক্ষেত্রে কিছু কার্পণ্য রহিয়াছে এমন বলা যায় না। যোগ্য সঙ্গত তাহারও।

পেটিকা উন্মুক্ত করিয়া বণিকের নিজস্ব বস্ত্র পূর্বেই প্রস্তুত রাখিয়াছে এক সেবিকা।

'এই নিন মহোদয়, আপনার প্রিয় পোশাক!' হাসিয়া কহিল বৃন্দা।

বণিক দ্রুত হস্তে পোশাক পরিধান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'লেপনে হলুদ এবং চন্দন ছিল টের পেয়েছি, আরও নিশ্চয়ই কিছু ছিল?'
'কেন ভদ্র, স্নানে আপনি সন্তুষ্ট হননি!' লীলার কপট বিস্ময়।
'রাগমোচনের মতো সন্তুষ্টি দিয়েছেন আপনারা। এমন উত্তম স্নান আমি বহুদিন করিনি।'

বণিকের কথায় পুনরায় খিলখিল হাসি। দুই লাস্যময়ীর লাস্যে বণিক ধরাশায়ী।

'আমি উত্তরের অপেক্ষায় ভদ্রে।' বণিক দ্রুত নিজেকে ফিরিয়া পাইলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা রাখিলেন।

‘কী প্রশ্ন মান্যবর?’ ভ্রু নাচাইয়া সুন্দরী লীলার কপট জিজ্ঞাসা।
‘লেপনে আর কী কী ছিল?’
‘মিশ্রণের উপকরণ নিয়ে আপনার খুব আগ্রহ দেখছি ভদ্র!’ হাসিয়া কহিল বৃন্দা।

বণিক ঈষৎ লজ্জা পাইল। তথাপি কহিল, ‘ভেতরের রহস্য জানতে ইচ্ছা করে।’
‘সব আমাদের নিজস্ব প্রণালী। বাণিজ্য রহস্য জানাব কেন?’

বৃন্দার স্পষ্ট উত্তরে অপ্রস্তুত হইল বণিক। নিজের প্রগলভতায় কুণ্ঠিত হইল। এতটা কুতূহল না দেখাইলেই হইত। আমমন্থ লইয়া তাহার জিজ্ঞাসা পান্থনিবাসে রাষ্ট্র হইয়াছে। সাবধান হইল বণিক।

‘দুঃখিত। অতিরিক্ত কৌতূহল দেখানো উচিত হয়নি। আসলে বহুদিন পর এত উৎকৃষ্ট স্নানে আমি একটু অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।’

বণিকের কুণ্ঠায় ও দুঃখপ্রকাশে দুই স্নান-সুন্দরী হা-হা হাসিতে পরিস্ফুট। কিছুই না-বুঝিয়া বণিক মূর্খবৎ তাকাইয়া রহিল। সুন্দরী বৃন্দার লাস্য তাহাকে গ্রাস করিয়াছে।

হঠাৎ শব্দ। পাখসাট। দীপনের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাহাকে হতবাক করিয়া একটি শ্যেনপক্ষী আসিয়া বসিল বৃন্দার কাঁধে। বৃন্দা তাহার শরীরে হাত বুলাইয়া আদর করিল। পাখি আবার উড়িয়া গেল। কুঞ্চিত কুন্তল সরাইয়া বিলোল কটাক্ষে বৃন্দা কহিল,

‘হলুদ ও চন্দন তো ছিলই। আর ছিল তুলসি, নিমছাল, নিমপাতা, পদ্মপাপড়ি, বেসন আর কক্কোল।’
‘আর কিছু নয়! অদ্ভূত! নগরীতে নগরীতে আপন প্রয়োজনে ঘুরে বেড়াই, এই লেপনে অঙ্গমর্দন সহযোগে স্নান তো আমি পূর্বে করেছি, কিন্তু এমন অনুভূতি তো এই প্রথম! আপনারা নিশ্চিত, আর কিছু ছিল না?’

প্রণালী শুনিয়া বণিক পুনরায় আবেগাপ্লুত। মোহিনীযুগলও হাসিতে হাসিতে সমস্বরে কহিল,

'ছিল তো! ছিল তো!'
'আমি জানতাম, আমি জানতাম! কিন্তু কী সেই জাদুদ্রব্য? অতিরিক্ত কী মিশিয়েছিলেন ওই লেপনে?'

যেন রহস্য উদ্ঘাটিত, বণিক এমনভাবে আগ্রহ দেখাইল। স্নানে সে এতটাই মোহিত, ভাবাবেগ সংবরণ করিতে পারিতেছে না। লেপনে সেই অতিরিক্ত রহস্য কী মিশ্রিত হইয়াছে, যাহা এই স্নানকে অন্য-স্নান হইতে পৃথক করিয়াছে, ইহা জানিতে সে উদগ্রীব। দুই স্নান-দুহিতা যেন মায়াবিনী, তাহাদের প্ররোচনায় তাহার উৎসাহ ক্রমাগত তীব্র।

'আর কী ছিল লেপনে জানতে পারি কি?'
'অবশ্যই!' সমবেত উত্তর।
'কী?'
'হাসি!' পুনরায় যৌথ উত্তর।

কলকল হাসিতে পুনরায় ভরিয়া উঠিল স্নানকক্ষ। বণিকও হাসিল। লাজুক সে হাসি।

৭

স্নান সমাপন করিয়া নূতন পোশাকে পানশালায় আসিয়া উপবেশন করিল বণিক। উপস্থিত এক সেবিকা। একপাত্র পানীয় পুনরায় অর্পিত হইল। পাত্র ঠোঁটের নিকট আনিতেই গন্ধ টের পাইল বণিক। আর তাপবিদারক বা ক্লান্তিশোষক পানীয় নয়, এইবার পরিবেশিত হইয়াছে সুরা। শ্বেতফুলের মাল্য বাম হস্তে পরাইয়া দিল আরেকজন। পরাইবার পূর্বে মাল্য নিজের বুকে স্পর্শ করিয়া আশ্বস্ত করিল, মাল্য নিরাপদ।

অজস্র প্রদীপের আলোয় পানশালা আলোকিত। বণিক স্মিত হাসিয়া পাত্রের কিনারে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। আসব। কপিত্থফলসার, আখের রস ও এক প্রস্থ মধু মিশ্রণ করিয়া প্রস্তুত হয় আসব। রসে অতিরিক্ত কপিত্থ যুক্ত করিলে সুরা উত্তম হয়। এই সুরা উত্তম। বণিক বাম হস্ত নাকের নিকটে নিল। ফুলের সৌরভ। গন্ধ গ্রহণ করিতে করিতেই পুনরায় দৃষ্টি প্রদক্ষিণ করিল গোটা কক্ষ। কিন্তু এতো ভারি চিন্তার ব্যাপার। সেই জোড়াচক্ষু এখনও নিরীক্ষণে! আর তো নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। কে এই যুবক? পান্থনিবাসে প্রবেশের পর হইতেই তাহাকে জরিপ করিতেছে! সত্যই গুপ্তচর! দীর্ঘ এক শ্বাস নির্গত করিল বণিক।

এই ধরণের অতিথিনিবাস ও পানশালায় গুপ্তচর থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু গুপ্তচর কি এত প্রকট হয়! তাহার উদ্দেশ্য কি সে সহজে প্রকাশ করে? একি, যুবক আসন ত্যাগ করিল! বণিক বাম হস্ত হইতে মালা মুক্ত করিতে করিতে দেখিল, সেই যুবক অগ্রসরমান তাহারই আসন অভিমুখে। সত্যই যদি গুপ্তচর হয়, তাহা হইলে সাবধান হইতে হইবে। বণিক মনে মনে প্রস্তুত হইল।

'মহাশয় কি বিদেশী?'

হ্যাঁ-বাচক শির সঞ্চালন করিল বণিক।

'এখানে আসন নিতে পারি?'
'সানন্দে।' দক্ষিণ হস্তনির্দেশে বসিতে অনুরোধ করিল বণিক।
'কোথায় আপনার দেশ, মহাশয়?'
'অনুমান করুন দেখি?' বণিক স্মিত হাসিল।
'অভয় দেন তো বলতে পারি!'
'ভয়ের কী আছে মহাশয়, নির্ভয়ে বলুন!'
'বঙ্গদেশ।'
'নিখুঁত অনুমান। উত্তম আসব আছে এদের সংগ্রহে। গ্রহণে আপত্তি নেই তো?'

অচেনা যুবক আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিল। বণিক বাম হস্ত তুলিয়া আরও এক পাত্র সুরা পরিবেশনের ইঙ্গিত করিল। প্রকাশ না করিলেও বণিক মনে মনে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। অত্যুৎসাহী এই অচেনা মানুষটির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অতীব প্রশংসনীয়।

'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি কীভাবে আপনার দেশ চিহ্নিত করলাম?'

'আমার রেশমবস্ত্র? দুকূল?'

'আরে আপনিও তো দেখছি রসিক মানুষ! ঠিক ধরে ফেলেছেন! বঙ্গদেশীয়দের ক্ষেত্রে, বিশেষত বণিকেরা, সবসময়ই দেখেছি নিজেদের পোশাকে স্বস্তি বোধ করেন। এইরকম দুধসাদা দুকূল আর কোথায় পাওয়া যায়, বঙ্গদেশ ছাড়া?'

'সুমাত্রাদ্বীপের রেশম দেখেছেন কখনও?'

'না, সেই সৌভাগ্য হয়নি।'

'উদিতসূর্যের প্রভার মতো।'

'আহা!'

'আমার কথা নয়। স্বয়ং কৌটিল্যের।' হাসিয়া কহিল বণিক।

'বঙ্গের দুকূল তুলনাহীন। অমন সাদা ও নরম। আহা!' বিস্ফারিত চোখে, ভ্রু-যুগল উপরে তুলিয়া প্রশংসায় ভরিয়া দিল যুবক।

'কাশ্মীরের বস্ত্রও আছে আমার কাছে। চীনদেশ থেকে আনা সুতো দিয়ে ওরা বস্ত্র বোনেন। অতি উত্তম!'

'চীনপট্ট?'

'হ্যাঁ। চীনাংশুক।' কহিল বণিক।

'তবে বস্ত্রের বিচার সুতোর ওপরই হয়।'

'যথার্থ। তবে সুমাত্রাদ্বীপের সূত্রই সর্বোত্তম। কিন্তু কেবল বস্ত্র দেখে আপনি কীভাবে বুঝলেন আমি বঙ্গদেশীয়?' জিজ্ঞাসা বণিকের।

'আর্যাবর্তের মানুষের মতো মুখমণ্ডল আপনাদের নয়। কাঠিন্য কম, অনেক কোমল। এর আগে বঙ্গদেশীয়দের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। দেখলে চিনে নিতে পারি।' হাসিল যুবক। পুনরায় কহিল, 'বঙ্গের রেশমবস্ত্রের বিরাট খ্যাতি। আপনি কি রেশমবস্ত্র বাণিজ্য করেন?'

‘বঙ্গদেশে কেবল রেশম নয়, কার্পাসবস্ত্রও অতি চমৎকার!’ সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিল না বণিক।

‘কাপাস বস্ত্রে খ্যাতি আছে মাহিষকের। মাহিষ্মতীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?’

যুবকের প্রশ্নে ইতিবাচক মাথা নাড়িল বণিক। সুরাপাত্রে এক চুমুক দিয়া কহিল,

‘অবন্তী-দক্ষিণাপথের রাজধানী মাহিষ্মতী, তাই তো? এই উজ্জয়িনী নগরী থেকে খুব বেশি দূরে তো নয় মাহিষ্মতী! সেখানকার কার্পাসবস্ত্রের কথা আমি জানি বিলক্ষণ! আমাদের কার্পাসবস্ত্রও কিছু কম না!’

‘আচ্ছা!’

‘প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশের বস্ত্র দেশ-বিদেশের সর্বত্র প্রশংসিত। আপনি কেবল দুকূল দেখেছেন? মৃদু হাসিয়া কহিল বণিক।

‘আরও একটি দেখেছি।’ যুবক কহিল।

‘কী সেই বস্ত্র?’

‘ক্ষৌম। কিঞ্চিৎ মোটা।’

‘সূক্ষ্ম ক্ষৌমই দুকূল। দুকূল এতোটাই সূক্ষ্ম, ক্ষৌমবস্ত্র সেই তুলনায় বেশ মোটা।’ বর্ণনা করিল বণিক।

‘আপনি কি বস্ত্রই বাণিজ্য করেন?’ যুবকের প্রশ্ন যেন অন্তহীন।

‘কার্পাসবস্ত্র কত সূক্ষ্ম হতে পারে জানেন?’ পুনরায় উত্তর না দিয়া বণিকের প্রতিপ্রশ্ন।

‘গল্প শুনেছি সূক্ষ্ম একবস্ত্রের, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি!’

‘কেন?’ অবাক বণিক।

‘চল্লিশ হাত বস্ত্র সোনার অঙ্গুরীয়’র ছিদ্র দিয়ে গলে যাবে, এতই নাকি সূক্ষ্ম! অসম্ভব!’

যুবকের কথায় অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়িল বণিক। যুবক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতের হাসি হাসিল। বণিকের মাথার ভিতর ঝর্ণার ধ্বনি। উত্তম সুরার কল্যাণে মস্তিষ্কে তাহার ফুর্তি। অধিকন্তু কথার উপরে কথা গাঁথিতে তিনি ভালোবাসেন। কৌতূহলী যুবকও সম্যক অবগমন করিতেছেন, বণিক গল্পপ্রিয়। গল্পে গল্পে আজ রাত জমিবে ভালো।

‘গত কয়েক শত বছর ধরে বঙ্গদেশের গঙ্গাজলী বহু দূর দূর দেশে বণিকরা বিক্রয় করে আসছে। গঙ্গাজলীর নাম করে না এমন দেশ ত্রিভুবনে নাই। মিশর। বোগদাদ। হেলেনা। রোমদেশীয় সুন্দরীরা অঙ্গ দেখাবেন বলে এই বস্ত্র পরতেন। আর আপনি দেখেননি বলে বিশ্বাস করছেন না!’ কপট বিস্ময় বণিকের।

‘সাত পাকে পরিধান করলেও মনে হবে যেন নগ্ন! এও কি সম্ভব?’ যুবকের অকপট বিস্ময়।

‘যা কিছু সূক্ষ্ম, তাই স্বচ্ছ!’ হাসিয়া কহিল বণিক।

‘বাহ্, বেড়ে বলেছেন! যা কিছু সূক্ষ্ম, তাই স্বচ্ছ! স্বচ্ছতাই সূক্ষ্মতা। সূক্ষ্মতাই স্বচ্ছতা।’

‘কার্পাস তুলা থেকে আমাদের মেয়েরা নরম হাতে বের করে আনে মিহি সুতো। ওই সুতো দিয়ে তৈরি হয় গঙ্গাজলী।’ বণিক স্বদেশের সুনামে আবিষ্ট।

‘মেয়েদের হাত কি এতই নরম?’

এইবার যেন ঈষৎ দুষ্টুমিভরা প্রশ্ন যুবকের। পাত্রে পুনরায় চুমুক দেন বণিক। ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসি। বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন যুবকের ইঙ্গিত। ঠোঁটের প্রান্তে হাসি লইয়াই কহেন,

‘নারীর সকল অঙ্গই পেলব। আপনি কি কখনও নারীশরীর স্পর্শ করেননি?’

‘কী যে বলেন! নারীশরীর স্পর্শ করব না! তবে চূচক দুটির মতো নরম আর কিছুই নয়।’ যুবকের দ্রুত উত্তর।

‘অস্থিহীন মাংসপিণ্ড পেলব তো হবেই!’ মৃদু হাসিয়া কহিল বণিক।

আদিরস অতিক্রম করিতে চায় বণিক। সে বেশি উৎসুক যুবকের পরিচয় জানিতে। যদিও গুপ্তচরেরা কর্মক্ষেত্রে সাধারণত সুরা স্পর্শ করে না। এমনকী নারীতেও আসক্তি দেখায় না। এই যুবকের সুরাপানে আপত্তি নাই। সম্ভবত নারীসঙ্গেও। হয়ত গুপ্তচর নয়, তথাপি, কথার পৃষ্ঠে কথায়, চুমুকের পর চুমুকে, কেবল অন্বেষণ করিতে হইবে যুবকের প্রকৃত অভিপ্রায়। যুবককে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিল,

‘মহাশয় কি রাজকর্মচারী?’
‘আমি এক ভাগ্যাহত ব্রাহ্মণ। উজ্জেনীতেই বাস।’
‘ব্রাহ্মণ! আপনি সত্যসত্যই ব্রাহ্মণ!’ বিস্মিত বণিক।
‘মদ্যপান করছি, তাই সন্দেহ প্রকাশ করছেন তো?’
‘ঠিক তাই!’

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল যুবক। কিন্তু প্রত্যুত্তর করিল না।

‘নাম জানতে পারি কি?’ বণিকের জিজ্ঞাসা।
‘শর্ব্বিলক।’
‘বাহ্, উত্তম।’
‘আপনার শুভনাম?’
‘দীপন।’ বণিক মৃদু হাসিয়া কহিল।
‘চমৎকার নাম!’ সুরায় ওষ্ঠসংযোগ করিয়া কহিল শর্ব্বিলক।

শর্ব্বিলক কেন ভাগ্যাহত এক ব্রাহ্মণ, দীপন বুঝিতে পারিল না। অতিরিক্ত উৎসাহী হইয়া আর প্রশ্ন করা উচিত হইবে না। সুরায় পুনরায় চুমুক দিল দীপন। অপেক্ষা করাই শ্রেয়। কথায় শর্ব্বিলকের প্রবল মতি। উপরন্তু উদরে সুরা পড়িয়াছে, অনেক কথা সে এমনিই বলিবে।

‘আমি চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। গ্রহের মারে একটু দুর্বিপাকে আছি।’
‘আমি ভেবেছিলাম আপনি বুদ্ধের শরণাগত।’

দীপনের কথা শুনিয়া হা-হা অট্টহাস্য শর্ব্বিলকের। অকস্মাৎ সেই হাস্য উপস্থিত অভ্যাগতদের ধ্যান কাড়িয়া লইল। সহসা সকলে নিশ্চুপ হইয়া শর্ব্বিলকের দিকে মুখ ফিরাইল। শর্ব্বিলক মুহূর্তে অপ্রস্তুত। কয়েক পল মাত্র, মদিরা হাতে পুনরায় সকলেই

আবার স্ব-স্ব পান ও গল্পে ব্যস্ত হইল। লঘুস্বরে হাসিতে হাসিতেই শর্ব্বিলক দীপনের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করিল,

'উন্মাদ নাকি!'
'কেন, বৌদ্ধরা উন্মাদ কেন?' দীপনের বিস্মিত প্রশ্ন।
'সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও! সঙ্ঘারামগুলো এখন সব কুকম্মের কেন্দ্র!' শর্ব্বিলক কহিল।
'ষোড়শ মহাজনপদের এক জনপদ অবন্তীপুর। প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। সেই প্রাচীন অবন্তীপুরের রাজধানী এই উজ্জয়িনী। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম ক্ষেত্র এই নগর!' পুনরায় বিস্ময় দীপনের।
'থেরবাদের হোতা মহাকচ্ছপায়ন ছিলেন এই নগরীর বাসিন্দা! উজ্জেনীর মর্যাদাই আলাদা!' গর্বিত উচ্চারণ শর্ব্বিলকের।
'তাহলে? তার এমন দশা কেন আর্য্য? ভোজরাজ কি বৌদ্ধদের ওপর নির্মম?' প্রশ্ন দীপনের।
'না, না একেবারেই না। আমাদের রাজামশায়ের তুলনা নেই! উনি জগদগুরুর উপাসক।'
'জগদগুরু তো শিব! উনি শিবের উপাসক? আমি তো শুনেছিলাম—'

বাক্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই দীপন স্তব্ধ হইল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল শর্ব্বিলক। তাহার চোখে যতটা কুতূহল, তাহার অধিক পরিহাস।

'আরে বলুন, বলুন শুনি!'
'শুনেছি উনি কামদেব-রতির পূজাও করেন!'
'অনুমান করেছিলাম এটাই বলবেন, অনেকেই এই নিয়ে উপহাস করে।'
'উপহাসের কিছু নেই, করতেই পারেন কামদেবের পূজা! তবে শিব, শক্তি, কামদেব যাঁরই পূজা করুন, পরধর্মসহিষ্ণু কিনা সেটাই দেখতে হবে।'
'এ বিষয়ে ভোজরাজের দোষ ত্রিভূবনে কেউ দেখাতে পারবে না! আরে এ কেবল উজ্জেনীর কথা নয় মহাই, শাক্যসিংহের মত ও পথের জনপ্রিয়তা এখন চাদ্দিকেই

নিম্নমুখী।'

'তা বটে।'

'যদিও আপনাদের বঙ্গদেশে শুনেছি এখনও লোকে বুদ্ধ-বুদ্ধ করে!'

'ভুল শোনেননি, তবে সে দিন আর বেশিদিন নেই যখন লোকে আর বুদ্ধ-বুদ্ধ করবে না।'

'বলেন কি মহাই, সঙ্ঘারামগুলি ওখানেও শাক্যমুনির পাট চুকিয়েছে!'

'আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে বলা উচিত হবে কি না জানি না, আসলে—'

'নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, আমি ব্রাহ্মণ হতে পারি, কিন্তু বৃত্তিতে নেই। এখন আমার অন্য জীবিকা।'

কথা বন্ধ করিল দীপন। তীক্ষ্ণ চোখে যেন শর্ব্বিলকের মন পড়িয়া ফেলিতে চাহিল। কী অভিপ্রায় এই যুবকের? ইহার সহিত দীর্ঘক্ষণ কথোপকথন কি উচিত হইতেছে?

'আরে আমার কথা পরে বলছি, আপনি বলুন গৌড়বঙ্গের কথা, শুনি।'

'আপনি কি গুপ্তচর?'

সহসা সাবধান হইল দীপন। প্রশ্ন প্রত্যক্ষ। পুনরায় অট্টহাসিতে ভাসিয়া যায় শর্ব্বিলক। কিন্তু সরাসরি প্রত্যুত্তর করিল না। দীপনের সন্দেহ আরও গাঢ় হয়।

৮

১৫ সেপ্টেম্বর। সন্ধে। বৈষ্ণবঘাটা। কলকাতা।

খুব বেশিক্ষণ বসতে হয় না ট্যাক্সিতে। গন্তব্য নিকটেই। ট্যাক্সিতে উঠেই ট্যাক্সিচালককে নির্দিষ্ট ঠিকানা বলে দিয়েছিল লোকটি। জানা ছিল ল্যান্ডমার্কও। একটি চৈনিক খাবারের রেস্তোরাঁর পাশের গলি দিয়ে হেঁটে দ্বিতীয় বাড়ি।

শহরের এই দক্ষিণ প্রান্তে বৃষ্টি নেই। যদিও আকাশ মেঘলা। আলো-অন্ধকার গলি বেয়ে নির্দিষ্ট নাম্বার দেখে দরজার বেল বাজায়। পকেট থেকে বার করে স্মার্টফোনটি। ক্যামেরা দ্রুত ভিডিও মোডে রেখে হাতে রাখে ফোন।

কিছুক্ষণ পর খুলে যায় দরজা। প্রৌঢ় এক মানুষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান।

লোকটি নিজের পরিচয় দিতেই প্রৌঢ় তাকে সমাদর করে ভেতরে নিয়ে যান।

‘স্যার নমস্কার, আপনার মতো মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে ভালো লাগছে।’

অতিথির উদ্দেশে হাতজোড় করে প্রতি নমস্কার করেন প্রৌঢ় মানুষটিও।

‘অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাসের আদেশে লেখাটি আপনাকে দিতে এলাম আর নিজ মুখে বলতে এলাম আমাদের বিভাগে যদি আপনার চরণধূলি পড়ে, আমরা খুবই আনন্দ পাব।’
‘আপনিও ওই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক?’
‘না স্যার, অধ্যাপনা করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমি একজন অশিক্ষক কর্মচারী।’
‘আমাকে স্যার বলবেন না। নাম কী ভাই আপনার?’
‘চিত্রক চন্দ্র।’ মোড়কটি এগিয়ে দিয়ে বলে।

প্রৌঢ় হাত বাড়িয়ে নেন মোড়কটি। হাসেন। বলেন, ‘আমি কবীর খান।’

‘আপনাকে পরিচয় দিতে হবে না স্যার!’ হাসেন চিত্রক। ‘সরসিজস্যার বলেছেন কালিম্পং গুম্ফায় এটা পেয়ে এবং পড়ে উনি খুবই আশ্চর্য হয়েছেন। জানি না হয়ত আপনি আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন লেখাটি। স্যারের তাই ধারণা।’
‘যাওয়ার ব্যাপারে কথা দিতে পারছি না, কারণ আমি অ্যাকাডেমিক কোনও সেমিনারে যাই না। কোনও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যেতেই আমার অস্বস্তি হয়। সরসিজবাবুকে বলবেন। আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।’

‘অবশ্যই বলব। সত্যি কথা বলতে কী, ভাষা ও সাহিত্যে আমারও কিছু ইন্টারেস্ট আছে। আমিও আপনার কিছু লেখা পড়েছি। অভিভূত হয়ে গেছি স্যার। স্যারের কাছে শুনেছি, আপনার বক্তৃতার বিষয়, মানব সমাজে ঈশ্বর কীভাবে জন্মালেন! আমার খুব উৎসাহ আছে স্যার এই বিষয়ে!’

মৃদু হাসলেন কবীর। কেউ তাঁর লেখার বিষয়ে উৎসাহ দেখালে আনন্দ হয় বৈকি!

‘ঈশ্বর জানতে গেলে আগে ভগবানকে জানতে হবে—তবে সকলের আগে জানতে হবে কীভাবে আমাদের সমাজে অহংকারের জন্ম হল—’ হেসে বলেন কবীর।
‘অহংকার পতনের মূল, এটাই তো আমাদের জীবনের সারকথা, তাই না স্যার!’ চিত্রক কথা বাড়ায়। সে আরও শুনতে চায়।
‘আপনি কখনও হিন্দু আইনের বই পড়েছেন?’ প্রৌঢ় প্রশ্ন করেন।
‘ন্-নাহ স্যার!’
‘বললাম না, আমাকে স্যার বলবেন না!’ সামান্য বিরতি, কবীর ফের শুরু করেন, ‘যদি পড়েন তাহলে দেখবেন ওখানে সেলফ-অ্যাকুইজিশন নিয়ে অনেক কথা আছে।’
‘সেলফ-অ্যাকুইজিশন?’
‘স্ব-অর্জন বা স্বোপার্জন। এই স্ব-অর্জনের সবথেকে আদি উদাহরণ হল জ্ঞান আর শৌর্যের অর্জন। কারা পেয়েছিল?’
‘ব্রাহ্মণ?’
‘বাহ্, একদম ঠিক।’

কবীরের মুখে প্রশংসা শুনে চিত্রক লজ্জা পায়।

‘তবে কেবল ব্রাহ্মণ নয়, আরও একজন পেল! জ্ঞান তো পেল ব্রাহ্মণ আর শৌর্য?’

কবীরের দিকে তাকিয়ে থাকে চিত্রক। তার হাতে ফোন। হাসিমুখে নিজেই প্রশ্নের জবাব দেন বর্ষীয়ান মানুষটি।

‘ক্ষত্রিয়। হিন্দু আইনের বইতে সেলফ-অ্যাকুইজিশন চ্যাপ্টারের শুরুতেই স্ব-অর্জনের এই উদাহরণ আছে।’ শান্তস্বরে কবীর বলেন।

‘কিন্তু একটা সময় তো এটা ছিল না! এর তো একটা ইতিহাস আছে!’

‘অবশ্যই আছে! যৌথ পরিবার যতদিন সক্রিয় থাকে, ততদিন কেউ হাঁড়ি ভিন্ন করার কথা ভাবে?’ হাসেন কবীর। ‘পার্টিশন না হলে সেপারেট এস্টেটের প্রশ্নই আসে না! এবার পরিবার থেকে একে সমাজে নিয়ে ফেলুন। সমাজে যৌথতার অধঃপতনেই ঢুকে পড়ে অহং-কার! আমরা করেছি বা এটা আমাদের—যৌথসমাজের ভাবনা। কিন্তু আমি করেছি বা এটা আমার—এই ভাবনা মাথায় কখন জন্মায়?’

‘যৌথতায় যখন ভাঙন ধরে!’ জবাব চিত্রকের।

‘ঠিক, একদম ঠিক বলেছেন! আমি করেছি, এই ভাবনা তখনই জন্মায় যখন যৌথসমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা হয়ে যায় আমি, আমাদের হয়ে যায় আমার!’

গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে চিত্রক। মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে কবীর অতিরিক্ত উৎসাহী।

‘দাঁড়ান, একটা উদাহরণ দিয়ে বলি! ধরুন সবাই মিলে নদী থেকে মাছ ধরেছে, যে যার ভাগ পাবে, এমন সময় একজন বলে বসল, ওই যে লালচে বড় মাছটা আমি ধরেছি, ওটা আমি নেব। ব্যস, চিড় ধরে গেল যৌথতায়! আমার অর্জন, এটা একটা বোধ। একটা চেতনা। এই বোধকেই বলে মৎস্য। মৎ-স্য। আমার অর্জন। এইজন্যই মৎস্যকে মীন বলে। মীন বা mine। এম আই এন ই। মাইন। এই মাইন বা মীন চেতনাই আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষদের মিন-মাইন্ডেড করে দেয়! এই দ্যাখো, আপনাকে আবার লেকচার দেওয়া শুরু করলাম!’

‘কী বলছেন স্যার, আমি মন্ত্রমুগ্ধ! আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি, সাম-হাও, আপনি কি বাৎস্যায়নের কামসূত্র নিয়ে কোনও গবেষণা করছেন?’ বাক-এ ফেরে চিত্রক।

‘কেন বলুন তো?’ সাবধানী প্রশ্ন কবীরের।

‘না মানে শুনছিলাম আর কী!’

‘ঠিকই শুনেছেন। আপনাকে যা বললাম এতক্ষণ, এইসবই আমার বর্তমান চর্চা।’

‘এগুলোর সঙ্গে কি কামসূত্রের সংযোগ আছে?’
‘অবশ্যই আছে!’
‘মাছের ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগল!’ হেসে বলে চিত্রক।
‘একটা বিষয়ে আমার খুবই কৌতূহল ছিল একটা সময়ে—আমাদের ভাষায়, ধনসম্পদের মালিকদের শনাক্ত করতে জলজপ্রাণীদের উল্লেখ করা হয় কেন?’ কবীর বলেন।

চিত্রক চুপ। সে অনুধাবন করতে পারে না ঠিক কী বলতে চান এই প্রৌঢ়। কবীর হাসেন। চিত্রকের অসহায়তা বুঝে নিজেই খোলসা করেন নিজের ভাবনা।

‘চুনোপুঁটি, রাঘব বোয়াল, টাকার কুমীর এই ধরনের শব্দ বা শব্দবন্ধ শুনেছেন নিশ্চয়ই?’

নিশ্চুপ চিত্রক ইতিবাচক মাথা নাড়ে। কবীর বলেই চলেন।

‘খেয়াল করবেন ব্যক্তিমালিকের সঙ্গে তুলনা করে জলজ প্রাণীদের কথা বলা হয়। তাহলে কি ব্যক্তিমালিকের সঙ্গে জলজ প্রাণীদের কোনো সম্পর্ক ছিল? সে-সম্পর্কের কথা কি আমরা ভুলে গেছি? অথচ দেখা যাচ্ছে, আমাদের ভাষায় এখনও তার অজস্র ছায়া থেকে গেছে।’
‘খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!’ চিত্রক চন্দ্রের মুগ্ধতা।
‘সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের ভাষায় এই শব্দগুলোর ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, ধনসঞ্চয় বিষয়ে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট বিরাগমূলক ধারণা ছিল।’
‘কেন বিরাগ?’
‘খারাপ অর্থে শব্দগুলোর ব্যবহার হয় বলেই বিরাগের কথা বললাম। বিরাগ না-থাকলে ওই শব্দগুলি এভাবে ব্যবহার করা যায় না।’
‘তাহলে কি ধনসম্পত্তি বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের সত্যিই কোনও খারাপ ধারণা তৈরি হয়েছিল?’ ফের প্রশ্ন চিত্রকের।
‘যদি হয়, কেন হয়েছিল? ধনসম্পত্তির প্রতি সেই বিরাগ উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা কি আজও বহন করে চলেছি?’

‘খুব, খুবই ইন্টারেস্টিং অবজার্ভেশন!’

‘এমন সব প্রশ্ন আর কৌতূহল যদি আপনার হয়, জানবেন তা যথার্থ! কেননা, এও আমাদের এক প্রাচীন উত্তরাধিকার!’

‘জলচর প্রাণী এখানে আসছে কেন?’ চিত্রক বলে।

‘আদিম যৌথসমাজের স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত সেকালের জনসাধারণকে তখন বলা হত জল।’

‘জল!’ পুনরাবৃত্তি করে বিস্ময় প্রকাশ চিত্রকের।

‘যেকোনও পুরাণ খুলে দেখবেন—জলের কথা আছে।’

‘আচ্ছা।’

‘সেই জলের ভিতরে যার যার কমবেশি ধনসম্পত্তি হয়েছে, তাদের সাধারণভাবে বলা হত মৎস্য।’

‘মৎ-স্য। আমার অর্জন।’ সায় দেয় চিত্রক।

‘সেই ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ যাদের খুবই কম তাদের বলা হত চুনোপুঁটি। যাদের যথেষ্ট সম্পত্তি তারা রুই-কাতলা। আর অন্যদের সম্পদ হরণ করে যারা প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করেছে, তাদের বলা হত রাঘব-বোয়াল। যাদের সম্পত্তি অন্য মৎস্যদের পক্ষে রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, তারা ঘড়িয়াল বা ঘোড়েল এবং যারা কুম্ভের বা নিজস্ব সম্পদাগার-এর মালিক, তারা কুম্ভীর বা কুমীর।’

‘এভাবে ভাবিইনি কখনও!’

‘আমি ভেবেছি! ভাবা প্র্যাকটিস করেছি!’

বলেই হেসে ওঠেন কবীর। চিত্রকও।

‘বড় মাছ ছোটো মাছকে যখন খায় তখন তাকে বলে মাৎস্যন্যায়।’ চিত্রক বলে।

‘বাহ্ এই তো, আপনিও ভাবা প্র্যাকটিস করছেন!’

কবীরের কথায় আরও একপ্রস্থ হাসি দু’জনের। বইয়ের মোড়কটা বিছানায় রেখে, নীচু স্বরে তদ্গত ভঙ্গিতে কবীর বলেন,

‘রসিকতা করলাম চিত্রকবাবু, কিছু মনে নেবেন না!’
‘আরে না-না, খুব ভালো লাগছে আপনার কথা!’
‘মাৎস্যন্যায় হল যখন বেশি ধনবান অপেক্ষাকৃত কম ধনবানকে গ্রাস করে ফেলে। আবার ধরুন, এক ব্যক্তিমালিক বা মৎস্য যখন অন্য-ব্যক্তি মালিকের বা অন্য মৎস্যের ধনসম্পত্তি দেখে সইতে পারে না, হিংসা করে, ঈর্ষা করে, আমরা তাকে কী বলি?’

কবীরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে চিত্রক।

‘মাৎসর্য্য।’ নিজেই উত্তর দেন কবীর।
‘অপূর্ব! এই মৎস্য-বোধই কি কেবল মানবসমাজে অহংকার আনল?’ প্রশ্ন রাখে চিত্রক।
‘মৎস্য-বোধই তো অহংকার!’ দ্রুত প্রত্যুত্তর কবীরের।

৯

‘তন্ত্র বলছে শিব থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ষটত্রিংশৎ বা ছত্রিশটা পদার্থই সব। এগুলোকে বলে তত্ত্ব। এই বিশ্বে এমন তত্ত্ব আছে ছত্রিশটা। এই ছত্রিশটা তত্ত্বের বাইরে জগতে কোন বস্তুই নেই। এই ছত্রিশ তত্ত্বের একটি হল অহংকার।’ চিত্রক বলে।
‘পরিষ্কার হল না। তন্ত্র মতে অহংকার কী?’ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন কবীরের।
‘তমোগুণ যখন ডমিনেট করে, সত্ত্ব ও রজোগুণ নীচে চলে যায়। প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। অহংকার থেকেই তৈরি হয় ভেদ-জ্ঞান। আমি যাই, আমি খাই, এটা আমার—এইসব অহংকার-তত্ত্ব থেকেই উৎপন্ন।’ ব্যাখ্যা করে চিত্রক।
‘ঠিকই আছে—ভুল কিছু নেই—কিন্তু আমি স্পিরিচ্যুয়ালি ব্যাপারগুলো দেখছি না—আড়ালও করছি না বিভিন্ন শব্দপ্রয়োগ করে—আপনার একটি কথা খুবই গুরুত্বপুর্ণ—অহংকার ভেদ-জ্ঞান তৈরি করে।’

কিছুক্ষণ চুপ থেকে কবীর চিত্রকের চোখে চোখ রেখে বলেন, ‘আপনি তন্ত্র পড়েছেন?’

জবাবে হা-হা করে হাসে চিত্রক। মাথা নীচু করে। তারপর দ্রুত মাথা তুলে, কণ্ঠে আবেগ, বলে,

‘আপনার পদধূলি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে আমরা ধন্য হব!’
‘এই বইটি পড়ব। যাওয়ার ব্যাপারে কথা দিতে পারছি না।’
‘এই লেখাটিও স্যার আমায় পড়িয়েছেন।’ প্রৌঢ়ের হাতে সদ্য তুলে-দেওয়া মোড়কটির দিকে ইঙ্গিত করে চিত্রক।
‘লেখকের নাম সরাসরি পাওয়া যায়নি শুনলাম!’
‘ইঙ্গিত আছে—একটা ছোট্ট ইনিশিয়াল আছে একদম শেষে—’

জিজ্ঞাসু কবীর চেয়ে থাকেন চিত্রকের দিকে। তারপর হেসে বলেন,

‘শুনেছি। সরসিজবাবু বলেছেন। এসবি। ব্যস আর কিছু নয়!’
‘লেখকের নামরহস্য যাই হোক, তবে বইয়ের ভেতরের রহস্য সম্ভবত আপনিই উদ্ঘাটন করতে পারবেন।’
‘উপন্যাসের মধ্যে আবার রহস্য কী!’
‘স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে তো আপনার, সরসিজস্যারের মনে হয়েছে এর পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে অন্য কোনও অর্থ, একমাত্র আপনিই উদ্ধার করতে পারবেন স্যার! কালিম্পং মনাস্ট্রির লামাও আপনার কথাই বলেছেন!’
‘সে কী! লামা আমায় চেনেন কী করে!’
‘আপনি জানেন না স্যার, আপনাকে অনেকেই চেনেন! তাছাড়া ওইসব লামারা খুবই রহস্যময়! অনেক কিছুই জানেন। আমার ধারণা কালিম্পং গুম্ফার ওই লামার সঙ্গে আপনি দেখা করলে আপনার উপকারই হবে।’ ডান হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে চিত্রক। ‘আজ আর বসতে পারব না স্যার, দশটায় শিয়ালদা থেকে ট্রেন আছে।’

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় চিত্রক চন্দ্র। অতিথির চোখের দিকে সরাসরি তাকান কবীর। ধারালো চিবুক, দৃষ্টিও।

‘আরে ভাই, এতদূর থেকে এলেন, একটু চা খেয়ে যান!’ কবীর ব্যস্ত হন কিঞ্চিৎ।
‘না স্যার, ট্রেনের তাড়া আছে, আজ উঠি।’
‘আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল।’ হেসে বলে কবীর।
‘আশা করছি আপনি যাবেন। আমাদের অতি উৎসাহই আপনাকে যেতে উৎসাহিত করবে। আমরা আপনার ভাবনার অনুরাগী। আমাদের বঞ্চিত করবেন না স্যার। দেখা হবে তেরই অক্টোবর। না, সরি, চোদ্দই অক্টোবর। তের তারিখ আপনি ট্রেনে উঠবেন। চোদ্দ তারিখ রোববার সকালে আমরা থাকব এনজেপি স্টেশনে। আজ চলি। সরসিজস্যার আপনাকে সামনের সপ্তাহে ফোন করবেন। এই সপ্তাহে উনি একটু ব্যস্ত থাকবেন।’

নমস্কার জানিয়ে বাড়ির বাইরে আসে চিত্রক।

দরজা বন্ধ করেন কবীর। অচেনা একটা গন্ধ তাঁর নাকে এসে লাগে। তিনি এদিক-ওদিক দেখেন, ঠিক ঠাহর করতে পারেন না। বিছানার ওপর থেকে তোলেন বইয়ের মোড়ক। বইটা বার করতে গিয়ে নজর পড়ে মোড়কে।

কাগজের মোড়কে কোনও নাম-ঠিকানা লেখা নেই। মোড়কের একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বাংলায় লেখা—

যদি তোমাদের মন বদলে যায়, যদি তোমরা বিশ্বাসঘাতক হও, তাহলে এইসব দেবতারা তা পরিষ্কার দেখতে পাবেন ও তোমাদের এই রকম শাস্তি দেবেন। জুঃ-এম-পদ-নি-মো।

ভ্রু কুঁচকে যায় প্রৌঢ়ের। লেখাটির বিন্দুবিসর্গ কিছুই ধরতে পারেন না। কোনও গুরুঠাকুরের বাণী-টানি কেউ লিখে রেখেছে সম্ভবত। অতিরিক্ত মাথা না-ঘামিয়ে মোড়ক

থেকে বার করেন অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাস প্রেরিত উপন্যাস। প্রথম পাতায় বড় হরফে লেখা—কামসূত্র।

গলির মুখে এসে ট্যাক্সি ধরে চিত্রক। তার আগে অফ করেছে ভিডিও। ছোটো ছোটো ফোঁটায় শুরু হয় বৃষ্টি। গাড়ির সামনের কাচে থেবড়ে বসে যায় সে ফোঁটা। তারপর গড়িয়ে যায় কাচ বেয়ে। ওয়াইপার চালু করে চালক। গন্তব্য বলে চিত্রক, 'শিয়ালদা।'

বেশ গুছিয়ে শুরু হয় বৃষ্টি। হাঁকডাক দেখে মনে হয় পরিকল্পনা দীর্ঘকালীন। হাতল ঘুরিয়ে জানালার কাচ তুলে দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাইরে। সিক্ত আকাশ। সিক্ত মাটি। বর্ষণধৌত এই অচেনা মহানগরীর বুকে কী খোঁজে চিত্রক?

ছোট্ট একটা শ্বাস ছেড়ে, কানে ইয়ারফোন গুঁজে, চালু করে সদ্য-তোলা ভিডিওটি।

চোখ বুজে শুনতে শুনতে কেবল অস্ফুটে বলে, 'মৎ-স্য! মৎ-স্য!'

১০

১৫ সেপ্টেম্বর। সন্ধে। বৈষ্ণবঘাটা। কলকাতা।

মোড়ক খুলে কবীর বার করেন উপন্যাস। স্পাইরাল বাঁধাই-করা বেশ কিছু পাতা। লেখকের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির প্রথম ও শেষ পাতার ফোটোকপিও দিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক বিশ্বাস। কৌতূহলবশত দু-এক পাতা চোখ বুলিয়ে রেখে দিতে চেয়েছিলেন উপন্যাসটি, কিন্তু পারলেন না কবীর। ভাষা ও কাহিনির আকর্ষণে এগিয়ে গেলেন তরতরিয়ে। একাদশ শতকের উজ্জয়িনী নগরে এক গোধূলি বেলায় এসে পৌঁছেছে এক বণিক। বঙ্গদেশীয়। পথশ্রমে ক্লান্ত বণিক অতিথিশালায় স্নান সেরে মুখোমুখি হয় এক সন্দেহজনক ব্যক্তির। সে কি গুপ্তচর? পাতা উল্টে কবীর এগিয়ে যান।

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

‘ধৈর্য্য ধরুন দীপন, আমি কোনও হানিকারক ব্যক্তি নই। আপনার গতিবিধি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করেছি, আপনার চোখ এড়ায়নি আমি জানি, তাই আপনি হয়ত সন্দেহমুক্ত হতে পারছেন না। কিন্তু বিশ্বাস করুন ভদ্র, আমি নিতান্তই এক সাদামাঠা ব্রাহ্মণ সন্তান। আচ্ছা, আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে মন চাইছে।’

সুরার তাড়নায় মাথা পালকতুল্য হালকা হইলেও দীপন সাবধানী। অচেনা-অজানা যুবকের কথা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নাই। তবুও পুরাপুরি অবিশ্বাসও করিতে পারিল না। ঝুঁকি ও বিপদ তাহার সারা জীবন জুড়িয়া, এই ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে তা আর কতই বা বাড়িবে!

‘কী জানতে চান বলুন?’ হাতের সুগন্ধী মাল্যে নাকস্পর্শ করিয়া কহিল দীপন।
‘আপনি নিশ্চয় শাক্যমুনির শিষ্য!’
‘বণিকের আবার আলাদা ধর্ম্ম কী! ধনলাভের আকাঙ্ক্ষাই তার ধর্ম্ম।’
‘কিন্তু সঙ্ঘারামগুলো শ্রেষ্ঠীনির্ভর। আমি যদ্দূর শুনেছি গৌড়বঙ্গে বণিকেরা বৌদ্ধ।’
‘তারা যে ঠিক কী আমি জানি না আর্য। ব্রাহ্মণকে দিয়ে তারা দশকর্মা করায় আবার বুদ্ধের মন্দিরে ধূপধুনাও দেয়। ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধুলা নেয় আবার মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখলে তাঁকেও দণ্ডবৎ নমস্কার করে।’

দীপনের কথা শুনিয়া পুনরায় অট্টহাস করিয়া উঠে শর্ব্বিলক।

‘তাই বুঝি গৌড়বঙ্গে লোকে আর বুদ্ধ-বুদ্ধ করে না! দুই নৌকায় পা!’ হাসিতে হাসিতেই বলিল শর্ব্বিলক।
‘শর্ব্বিলক, একটি কাহিনী শুনবেন?’
‘কাহিনী? আরম্ভেই বুঝেছিলাম আপনি গপ্পোপ্রিয়। আমিও।’

এইবার হা-হা করিয়া হাসিল উঠিল দীপন।

‘আচ্ছা, বলুন। নিজের উৎসাহেই যখন শোনাতে চাইছেন, কাহিনী আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই।’

শর্ব্বিলক পা-ছড়াইয়া আরাম করিয়া বসিল।

এক চুমুকে অবশিষ্ট সুরা গলায় ঢালিয়া গল্প আরম্ভ করিল দীপন।

‘একটি কচ্ছপ প্রতিদিন সন্ধ্যায় পানার্থে নদীতীরে গমন করে। একদিন হল কী—’
‘কচ্ছপ! বাহ, এই ভর সন্ধেবেলা কচ্ছপ দিয়ে শুরু করলেন!’
‘কাহিনীর মাঝে বাধাদান করলে রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে বিপ্র!’
‘দুঃখিত। আপনি বলুন কচ্ছপ নদীতীরে যাওয়ার পর কী হল?’
‘সেই একই সময়ে একটি শৃগালও আহারের খোঁজে নদীতীরে উপস্থিত। শৃগালকে দেখে কচ্ছপ ভয় পেয়ে গেল। এই বুঝি আক্রমণ করে বসে শৃগালটি! কচ্ছপ করল কী, আপন খোলার ভিতর মুখ লুকিয়ে নিয়ে নির্ভয়ে নদীতে সাঁতার কাটতে লাগল। কিন্তু শৃগালও খুব ধূর্ত। সেও প্রতীক্ষা করতে লাগল কখন কোষ থেকে কচ্ছপটি মুখ বার করবে। কিন্তু কচ্ছপ খুব বিচক্ষণ। প্রাণ বাঁচানোর তাড়নায় সেও কিছুতেই কোটর থেকে তার গ্রীবা বের করে না। বহুক্ষণ অপেক্ষায় শৃগালের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল, শিকার ছেড়ে শেষমেশ স্থান ত্যাগ করল সে। এবার বলুন বিপ্র, কচ্ছপ কোষ থেকে তার গ্রীবা বার করলে কী হত?’
‘তৎক্ষণাৎ হত্যা করত শৃগাল।’
‘এই গল্প বলে স্বয়ং বুদ্ধ শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। বলতেন, হে ভিক্ষুগণ, মার এইরূপে তোমাদের ছিদ্রান্বেষণে ফিরছে—তোমাদের চক্ষুদ্বার, কর্ণদ্বার, নাসিকা, জিহ্বা, দেহ-মনোদ্বার কখন কোন দুয়ার খোলা পায় সেই অবসর খুঁজে বেড়াচ্ছে, সন্ধি পেলেই প্রবেশ করবে। অতএব সাবধান। ইন্দ্রিয়দ্বারের উপর নিয়ত প্রহরী নিযুক্ত রাখ, তা হলে, পাপাত্মা মার

বিফল-প্রযত্ন হয়ে তোমাদের ছেড়ে দূরে চলে যাবে, ঠিক যেভাবে শৃগাল যেমন কচ্ছপ থেকে দূরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।'
'গৌড়বঙ্গে তাহলে কচ্ছপ তার কোষ থেকে গ্রীবা বের করে বিপদে পড়েছে!' মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল শর্ব্বিলক।

শর্ব্বিলকের কথায় ঈষৎ হাসে দীপন। বিস্তারে যায় না। সবিস্তার করিয়া আর কী হইবে! তাহার গৌড়বঙ্গ যে আর পূর্বের ন্যায় নাই, অজানা-অচেনা লোকের সামনে সেইসব অপ্রিয়কথা বলিয়া কী লাভ! কী করিয়া নিজমুখে স্বদেশের নিন্দা করিবে!

সমতটের পশ্চিম অঞ্চল জুড়িয়া বাণিজ্য প্রায় স্তব্ধ। সমাজে বণিক, কারুশিল্পীদের সম্মান তেমন আর নাই। বণিক-শ্রেষ্ঠীদের অর্থানুকুল্য ক্রমহ্রাসমান, বৌদ্ধধর্ম তাই লোকপ্রিয়তা হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য হইতে পুনর্জীবিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ধীরে বাঘের মতো গুটিগুটি পায়ে অগ্রসরমান। বৌদ্ধবজ্রযানীরা গুহ্য তন্ত্র-মন্ত্র-মৈথুনের আড়ালে লুকাইয়া পড়িতেছে। কর্মজ সাফল্যের তুলনায় জন্মগত কৌলীন্য সমাজে ক্রমশ মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে। দীপন অবশ্য মুখে কিছুই বলিল না।

এক পরিচারিকা আসিয়া হাসিমুখে দীপনের সম্মুখে দাঁড়াইল। মৃদু অথচ আন্তরিক কণ্ঠে জানাইল খাদ্য প্রস্তুত, আদেশ পাইলেই করা হইবে পরিবেশন। খাদ্যের কথা শুনিয়াই দীপনের মাথায় ক্ষুধা আসিয়া ভর করিল। আন্দোলন শুরু হইল পেটের অন্দরে।

'আমি ক্ষুধার্ত, এখনই খেতে চাই ভগিনী।'
'আসুন মান্যবর, ভোজনালয়ে আপনার আহার প্রস্তুত।'

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মাথাটি চক্কর খাইল দীপনের।

'কিঞ্চিৎ মদপ্রদ লাগছে যে! অতি উত্তম সুরা পেয়ে একটু অতিরিক্তই পান করে ফেলেছি দেখছি!'

‘মদনাতুর লাগলে বলবেন, এখানে তারও অতি উত্তম ব্যবস্থা!’
‘আর কথা নয়, আসুন আর্য শর্ব্বিলক, আজ নৈশাহারে আপনি আমার অতিথি।’

হাসিয়া শর্ব্বিলককে আমন্ত্রণ জানাইল দীপন। অতিরিক্ত কথা এড়াইল। মানুষটির উদ্দেশ্য এখনও পরিষ্কার না-হইলেও, তাহাকে মনে ধরিয়াছে তাহার।

দীপনের আন্তরিক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না শর্বিলক। দুই জনেই ভোজনালয় অভিমুখে অগ্রসর হইল।

হাত প্রক্ষালনের জন্য পাত্র হইতে জল ঢালিয়া দিল এক সেবিকা। মিষ্টি হাসি তাহার। দীপন লক্ষ করিল অনতিদূরে রন্ধনশালায় ভোজ্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রজ্জ্বলিত দীপমালা ও চুল্লির আগুনে চকিতে দৃশ্যমান হইল দুই স্নান-সুন্দরীর অবয়ব। বৃন্দা ও লীলা। দেহভঙ্গিমা দেখিয়া ভুল হইল না। দীপনের দৃষ্টি বৃন্দার প্রতি স্থির। কাঁচুলিবন্ধনে স্তনদ্বয় উদ্যত। পীনোন্নত কহিলেই যথার্থ বর্ণনা হয়। কটিসূত্র দৃশ্যমান। তাহা হইতে বিপজ্জনক দূরত্বে কটিবস্ত্র বৃহৎ নিতম্ব মাত্র আবৃত করিয়াছে। কৃশ কটির নিম্নে এত বিপুলাকার জঘন কীভাবে, এই ভাবিয়া ঈষৎ বিস্মিত দীপন, কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। নীরব অবলোকন।

তাহারা পাচক নয়, সহায়ক। বিভিন্ন পাকভাণ্ড, পাত্র, পরিভাণ্ড চারিদিকে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। পাশে থরে থরে মৃৎপাত্রে ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ ইত্যাদি। আছে সারি সারি বস্তা। সম্ভবত বস্তায় আছে তণ্ডুল, গোধূম ও চণক। শাক-সব্জীও দৃশ্যমান।

হাত ধুইয়া প্রশস্ত ভোজনকক্ষে আসন গ্রহণ করিল দুই জনেই। সুপিষ্টক, রোটিকা, মেষ মাংস, পলান্ন ও ক্ষীর। পাশে পাত্রে বেশ কিছু ফলমূল। পানীয়ও। দীপন একটু অপ্রস্তুত হয়। এক ব্রাহ্মণকে সে নৈশাহারে আহ্বান করিয়াছে, অথচ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা নাই!

‘কিছু নিরামিষ পদের ব্যবস্থা করা যাবে? আমার অতিথি ব্রাহ্মণ মানুষ।’

পরিবেশনকারিনী হাসিল। শর্ব্বিলকও। দীপন আরও অপ্রস্তুত। নিরামিষ খাবারের কথায় ইহারা হাসিতেছে কেন? একটি সাধারণ চাহিদাকে ইহারা পরিহাস মনে করিতেছে কেন? বিভ্রান্ত দীপন, পরিবেশনকারিনী ও শর্বিলক, প্রত্যেকের দিকে একবার স্থিরদৃষ্টি দিল।

'প্রয়োজন নেই মিত্র। আমি সর্বভুক। স্বল্পাহারি হয়ত নয়, কিন্তু সব খাই আপনাদের গৌড়জনেদের মতো। এরাও জানে।' শর্ব্বিলক আশ্বস্ত করে।
'মদ্যপান, আমিষ আহার ব্রাহ্মণের জন্য নয়, বিশেষত এই আর্যাবর্তে, আমি তো এমনটাই জানি!'
'স্মৃতিশাস্ত্রের দাসত্ব আমি ত্যাগ করেছি। আমায় কেউ ব্রাহ্মণ বলে স্বীকারও করে না।'

আশ্চর্য হয় দীপন। মজাও পায়। দূর-দূরান্তের ভূখণ্ড ঘুরিয়াছে সে, আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ আমিষ ভক্ষক, এমন দৃষ্টান্ত কদাচ পায় নাই। শর্ব্বিলক প্রকৃতই ব্রাহ্মণ তো! সে যাক, রহস্য ক্রমশ প্রকাশ্য হইবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাহার উজ্জয়িনীতে আগমন। একা সে কাজ হইবেনা। কয়েকজন ব্যক্তি প্রয়োজন, যাহাদের বিশ্বাস ক্রয় করিতে হইবে। উপযুক্ত মূল্য দিয়া দক্ষতাও। বিশ্বস্ত ও দক্ষ, আপাতত এমন দুই-একজনের সন্ধান চাই। দেখা যাক, জল কতদূর গড়াইয়া যায়।

ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া দুই-জনেই খাদ্য গ্রহণে মনোনিবেশ করিল। দীপন আড়চোখে চাহিয়া দেখিল শর্ব্বিলকের ভোজন। ক্ষুৎকাতর সে একলা হয় নাই, এই রহস্যময় ব্রাহ্মণের পেটেও ক্ষুধার অগ্নি। দুইজনেই নীরবে দ্রুত খাইতে শুরু করিল। হাত ও মুখ, যুগপৎ দ্রুত সঞ্চালনের দরুণ প্রাথমিক ক্ষুধা নিবারণ হইয়া যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই। অতঃপর উভয়েই ধীরে ধীরে ভক্ষণ করে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য। অবসর হয় কথা কহিবার।

'আপনি তো গৌড়বঙ্গের লোক, মৎস্য আপনাদের প্রিয় খাদ্য।' খাইতে খাইতেই কথা আরম্ভ করিল শর্ব্বিলক।

‘বঙ্গদেশে পুণ্যবান কাকে বলে জানেন?’ পেলব মেষমাংস মুখে তুলিয়াই কহিল দীপন।
‘কাকে, যিনি মৎস্যপ্রিয়?’
‘ওগগর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সংযুক্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা পুণবন্তা।।’
‘মানে কী?’

বুঝিতে পারে না শর্ব্বিলক। খাওয়া থামাইয়া কিঞ্চিৎ হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে দীপনের দিকে।

‘এটি আমাদের দেশে একটি প্রচলিত গীতিকাব্য।’ হাসিল দীপন।
‘আচ্ছা। এটা গাওয়া হয়। সে যাইহোক, এর অর্থ বুঝিয়ে দিন।’ দাঁতের ফাঁকে আটক মাংসের টুকরা খুঁটিয়া তুলিতে তুলিতে হঠাৎ শর্ব্বিলক কহিল।
‘ওগগর ভত্তা মানে গরম ভাত, ঠিক ভাত নয়, চালে-ডালে খিচুড়ি একধরণের; রম্ভঅ পত্তা হল কলাপাতা; এখানে যেমন মৃৎপাত্রে খেতে দেওয়া হয়েছে, আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ কলাপাতায় খায়। গাইক ঘিত্তা মানে নিশ্চয়ই বুঝেছেন?’
‘গাওয়া ঘি?’
‘যথার্থ! দুগ্ধ সংযুক্তা—’
‘সঙ্গে দুগ্ধ থাকবে।’
‘অবশ্যই। মোইলি মচ্ছা হল মৌরলা মাছ, একধরনের ছোটো মাছ, অতীব সুস্বাদু। নালিত গচ্ছা একটি শাক, নলচে শাক। আর এত কিছু সুস্বাদু তখনই হবে যখন পরিবেশন করবে এক নারী! কান্তা। খাচ্ছে কে? যে পুণবন্তা। পুণ্যবান।’
‘বাহ, অতীব সুন্দর!’
‘আমাদের বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের মাছ খাওয়াতে বারণ নেই।’
‘জানি তো! স্মৃতিশাস্ত্র এখনও বঙ্গদেশকে বেঁধে ফেলতে পারেনি।’
‘তবে সেদিন আর বেশি দূরে নেই!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল দীপন।
‘মন চাইছে এবার আপনার সঙ্গেই পাড়ি দিই না কেন গৌড়বঙ্গ!’ বলিয়াই অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়িল শর্ব্বিলক।

‘সুস্বাগতম! চলে আসুন। ধরিবেন মৎস্য, খাইবেন সুখে। রোহিত, শফরী, শোল এবং আঁশযুক্ত সাদা মাছ ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য।’ হাসিয়া কহিল দীপনও।
‘ব্রাহ্মণের জন্য আলাদা মাছ আছে নাকি!’ চোখ নাচাইয়া কহিল শর্ব্বিলক।

হাসিতে হাসিতে উৎফুল্ল হইল দুইজন। ক্রমশ উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে শর্ব্বিলকের সঙ্গ। আহার করিতে করিতে দীপন পরবর্তী পদক্ষেপ ভাবিল। আরও নিবিড় মিত্রতা স্থাপন করিয়া মাহেন্দ্রক্ষণ নির্বাচন করিতে হইবে। ইহাকে দিয়া কাজ হইলেও হইতে পারে। যদিও অমিতভাষীকে সহজে বিশ্বাস করিতে নাই। সুযোগের অপেক্ষায় রহিল দীপন।

১১

কাহিনির আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। বাঙালি বণিক উজ্জয়িনীতে গিয়ে কী করতে চায়? অন্য কাজ সরিয়ে কবীর নাতিদীর্ঘ এই উপন্যাস পাঠে মগ্ন হন। খাওয়ার অপূর্ব বর্ণনা। খাদ্যগ্রহণ করতে করতে দুই সদ্য পরিচিতের কথোপকথন। উপন্যাস ক্রমশ উপভোগ্য। এগিয়ে চলেন কবীর।

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

নৈশভোজ সমাপনে বিদায় লইল শর্ব্বিলক। বিদায়ের আগে, আগামীকাল সকালে দীপনকে লইয়া উজ্জয়িনী নগরী পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

রাত্রি ক্রমশ গভীর। পান্থনিবাসের পানশালাটি প্রায় নির্জন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দুই-একজন অতিরিক্ত মদিরাসক্ত আছে, তাহাদের ক্ষমতা নাই অঙ্গ সঞ্চালনের। অপরের সাহায্য ব্যতীত তাহারা দণ্ডায়মান হইতেও পারিবে না। কক্ষের বাহিরে যাইতে তাহাদের সহায়তা করিতেছে কয়েকজন প্রহরী। কর্মচারীবৃন্দ পানশালা প্রক্ষালন-পর্ব আরম্ভ করিয়াছে।

দীপন পানশালা অতিক্রম করিয়া পান্থনিবাসের অনতিদীর্ঘ উদ্যানে কিছুক্ষণ পায়চারি করিল। অতঃপর হাঁটিতে হাঁটিতে উপস্থিত হইল পান্থনিবাসের পিছনে মন্দুরায়। দেখিতে পাইল নিজের প্রিয় অশ্বটিকে। অশ্বশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী হইতে জানিয়া আশ্বস্ত হইল, তাহার অশ্বের খাওয়া-দাওয়াসহ সকল ব্যবস্থাই যথাযথ হইয়াছে, যত্নের কোনও ত্রুটি হইতেছে না। মস্তক সঞ্চালন করিয়া সমর্থন করিল স্বয়ং অশ্বটি। দীপন তাহার কেশরে হাত বুলাইয়া দিল। আদর করিল গায়ে-পিঠে। মস্তক নামাইয়া দীপনের গায়ে গা ঘষিল অশ্বটি। বড় প্রিয় অশ্ব তাহার। নাম, রৌদ্র।

রৌদ্রের পাশে আরও চারিটি অশ্ব। কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইল দীপনের। এই অশ্বগুলি কাহাদের? সন্ধ্যাকালে তো এই অশ্বগুলি ছিল না! এত রাতে অন্য অতিথিরও পদার্পণ ঘটিয়াছে এই পান্থশালায়? বিভিন্ন প্রশ্ন মনোমধ্যে উত্থিত হয়। অশ্বশালার কর্মচারীকে অন্য অশ্বগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিল। কর্মচারী যা উত্তর দিল তাহাতে প্রমাণ হইল তাহার অনুমান নির্ভুল। চারজন অশ্বারোহী কিছুক্ষণ পূর্বেই পান্থনিবাসে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

অশ্ব রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্মচারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া দীপন হয়শালা ত্যাগ করিল।

পান্থনিবাসে ফিরিয়া প্রবেশ করিল তাহার নির্দিষ্ট অতিথি কক্ষে। চিন্তিত মুখমণ্ডল। কানে বাজিল লামা জয়াকরের সাবধানবাণী। 'সাবধান, খুব সাবধান দীপন! শত্রুপক্ষ তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করতে বাধা দেবে! তোমাকে অনুসরণ করবে তারা! সাবধান! আমি আশা করব, জোবো ছেন-পোর অন্তিম ইচ্ছা তুমি পূরণ করবে! সাবধানে যাও মিত্র! তোমার যাত্রা শুভ হোক! তথাগত তোমার মঙ্গল করুন!'

গৃহের এক প্রান্তে দেখিল পেটিকাটি। কী আশ্চর্য, এতক্ষণ মনেই পড়ে নাই। শুভ্র শয্যার পাশে একটি লঘুখট্বিকা। তাহার উপরে পেটিকাটি। দ্রুত পেটিকাটি খুলিয়া পরীক্ষা করিল। দেখিতে চাহিল সকল দ্রব্য যথাস্থানে আছে কি না। বেশকিছু স্বর্ণমুদ্রা আছে বটুয়ায়। নাহ্, সব ঠিক আছে। আশ্বস্ত হইল দীপন।

বিপুল এক জৃম্ভণ নির্গত হইল, সম্ভবত শুভ্র শয্যাটি দেখিয়া। মাথার অভ্যন্তরে চিন্তার জট। কীভাবে বিশ্বস্ত লোক জোগাড় করিয়া ঈপ্সিত কর্মটি করিবে, অবশ্যই দুশ্চিন্তার বিষয়। খুব বেশি দেরী করা যাইবে না। তাহার উপর দ্রুত কর্ম সম্পাদনের আদেশ আছে। পুনরায় এক জৃম্ভণ সশব্দ উপস্থিত। ঠিক আছে, আজ পথশ্রমে ক্লান্ত। আগামীকাল বিস্তারিত ভাবনার অবকাশ হইবে। আপাতত নিদ্রা প্রয়োজন।

শয়নের প্রস্তুতি লইল দীপন। প্রদীপ নিভাইতে অগ্রসর হইবে, সহসা এক ছায়ামূর্তিকে দেখিতে পাইল কক্ষের বাহিরে, দ্বারের নিকট!

কে ওখানে? স্বর বাহির করিতে হইল না। তাহার পূর্বেই আন্দোলিত হইল সে ছায়া।

ছায়ামূর্তি আলোয় আসিল। বৃন্দা।

স্নান-সুন্দরীর অপাঙ্গবীক্ষণ স্থবির করিয়া দিল দীপনকে।

এক শরীর হাসি লইয়া অগ্রসরমান বৃন্দা। প্রদীপের আলোয় সে আরও মোহময়ী। নিকটে আসিয়া সুন্দরী স্তব্ধ হইল। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়। কখন সে অতি নিকটে উপস্থিত হইয়াছে অনুভব করিতে পারে নাই দীপন। অনুধাবন করিল, যখন বৃন্দা স্পর্শ করিল তাহাকে। তাহার প্রশস্ত নগ্ন বক্ষের উপর বৃন্দা আপন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিল নিবিড় ভঙ্গিতে। মস্তক আকর্ষণ করিয়া চুম্বন করিল ওষ্ঠে। ঘটনার আকস্মিকতায় দীপন তখনও অপ্রস্তুত। স্থিতি হইতে গতিতে আসিতে ব্যয় করিতেছে সময়। কিন্তু তাহাতে বৃন্দার গতিশীলতা কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হইল না।

বৃন্দা কেবল গ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল আলোর উৎস অভিমুখে। সম্ভবত আলো তাহার গতি রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বৃন্দার চোখ সরিল দীপনের চোখ হইতে। ইত্যবসরে নিজেকে ফিরিয়া পাইল সে। পুরুষের স্থিতি আর

কতক্ষণের! বৃন্দার সম্মোহন হইতে মুহূর্তের মুক্তি তাহাকে গতি দিল। ত্বরিত গতিতে আবরণ টানিয়া লইল বৃন্দার শরীর হইতে। বক্ষবন্ধনী হইতে সদ্য মুক্ত, উৎপ্লাবিত দুই স্তন অতি আহ্লাদে করতলগত হইল দীপনের।

নগ্ন বৃন্দা চকিতে ফিরিল। মন্দস্মিতার চোখে তখন বিদ্যুৎ। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র! এ কী, পুনরায় ওইদিকে মুখ ফিরাইতেছে কেন? অবাক দীপন লক্ষ করিল বৃন্দা পুনরায় গ্রীবা বক্র করিল।

অতঃপর সুন্দরী এক ফুৎকারে নিভাইয়া দিল প্রদীপ।

নাগাড়ে পড়ে, লেখা থেকে চোখ তোলেন কবীর। বিছানা থেকে নেমে এক গ্লাস জল খান। দ্রুত আবার ফেরত আসেন লেখার কাছে।

দীপন নামের বাঙালি বণিক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শয্যায়। আনন্দ ও বিস্ময় যুগপৎ তাকে শয্যাশায়ী করেছে। জাদুকরী না-হয়ে যায় না এই মেয়ে! গোধূলিস্নানের সময়ই সে আন্দাজ পেয়েছিল এর ইন্দ্রজালের। সঙ্গে আছে যৌবন আর হন্তারক হাসি। কথায় কথায় বণিক জানতে পারে বৃন্দা তিব্বতের এক তান্ত্রিকের সাধিকা ছিল। তাই সে কামকলায় উত্তম পারদর্শী।

গভীর অভিনিবেশে কামসূত্র পাঠ করেন কবীর।

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

‘তুমি যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে মিলনে এমন অভিজ্ঞতা আমি আগে পাইনি। আমায় চুপ করে বসিয়ে তোমার অঙ্গ সঞ্চালন, প্রথমে ধীরে তারপর দ্রুত, এতে কিন্তু আমার শরীর উত্তপ্ত হল।’

‘হবেই তো! সেই অগ্নিসম উত্তাপে সাধকের দেহের মধ্যে সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। তারপর তা ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্তর ভেদ করে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকে। তখন সাধকের শরীর কাঁপতে থাকে, শরীরে ঘাম হয় এবং মহাসুখ অনুভূত হয়। তখন সাধিকা আর দেহ সঞ্চালন করে না। সে থেমে থাকে। তবে সেটা ক্ষণকালের জন্য মাত্র। তারপর কুলকুণ্ডলিনী নীচের দিকে নামতে থাকে। কিন্তু যখন কুলকুণ্ডলিনী ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামে সাধক সাধিকাকে ইশারা করে। সাধিকা আবার শুরু করে অঙ্গ সঞ্চালন।’

‘অঙ্গ সঞ্চালনের ভার সাধিকারই? সাধক স্থির থাকবে?’

‘সাধক তো সাধনায় বসেছেন! তিনি তো সাধারণ কোনও সঙ্গমে লিপ্ত হচ্ছেন না!’

‘সাধারণ নয় কেন?’

‘আমাদের সাধারণ যৌন মিলনে কাম থাকে। আমাদের সব ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে। মিলনের মধ্য দিয়ে আমাদের সুখ হয়। তবে বড় তফাৎ হচ্ছে, তোমার আমার রেতঃপাত হয়, সাধকের হয় না। তারপর উভয়ের শরীর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে। রেতঃপাতেই উভয়ের শরীরের সুখপ্রাপ্তি। কিন্তু সাধকের ক্ষেত্রে তা আলাদা।’

‘কীভাবে সংবরণ করে তারা নিজেকে?’

‘সুখানুভূতির মধ্যেই সাধক ডুবে যান ধ্যানে। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলে সাধিকা নিজের পদ্মকে সাধকের কঠিনবজ্র থেকে বিমুক্ত করে আসন ত্যাগ করেন। তাঁর কাজ সমাপ্ত। সাধিকার একটাই কাজ। মিলনের মধ্য দিয়ে সাধকের শরীরে মহাশক্তি উৎপন্ন করা।’

কথা বলিতে বলিতে বৃন্দার আঙুল ক্রীড়া করিতেছে দীপনের প্রশস্ত উন্মুক্ত বক্ষে।

‘তোমার মধ্যে কি মহাশক্তি উৎপন্ন হয়েছে প্রিয়?’

‘হ্যাঁ হয়েছিল!’

দীপনের উত্তর শুনিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল বৃন্দা। তবে হাসিতে হাসিতেই লক্ষ্য করিল বণিক কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক।

‘না, মনে হচ্ছে তুমি সুখলাভ করনি?’
‘এমন মনে হওয়ার কারণ?’
‘তুমি অন্য কোনও কথা ভাবছ! মহাসুখ হলে অন্য ভাবনা আসে না।’
‘তা নয়, সুখ আমি পেয়েছি বৃন্দা, কিন্তু মিথ্যে বলব না, অন্য ভাবনাও উপস্থিত!’
‘কী ভাবনা প্রিয়, খুলে বলতে পার, সাহায্য করতে পারি যথাসাধ্য।’

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিল দীপন। প্রকাশের প্রস্তুতি। বৃন্দাও বিরতিভঙ্গের অপেক্ষায়।

‘রাত্রিযাপন করতে আরও চারজন অতিথি এখানে এসেছেন শুনলাম?’ দীপন জানিতে উৎসুক।
‘অতিথিনিবাসে কারা আসবে, অতিথি ছাড়া?’ হাসিয়া বলিল বৃন্দা। ‘অতিথির আসার কোনও তিথি নেই মান্যবর! আপনি বোধকরি অন্য কিছু বলতে চাইছেন।’
‘কোথা থেকে এল অতিথিরা, বলতে পারবে?’
‘না, অতিথির বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানার কথা নয়। তবে স্বরূপ ভোট-চীনীয়।’

অতিথিবর্গের স্বরূপ বর্ণনা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল দীপন। ভোট-চীনীয়! তাহা হইলে ইহারাই জয়াকর কথিত সেই শত্রুপক্ষ! গন্ধ অনুসরণ করিয়া অতি নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। আপাতত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। অতঃপর পরবর্তী পরিকল্পনা।

‘না, আমি এবার নিশ্চিত, তুমি সুখ পাওনি। কোনও মহাশক্তিই উৎপন্ন হয়নি তোমার!’

নিজ ওষ্ঠ দংশন করিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ সিদ্ধান্ত মদালসার। বণিকের অন্যমনস্কতায় সে যেন কিঞ্চিৎ অপমানিত। ডান হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি ব্যস্ত নিজস্ব ক্রীড়ায়। চওড়া বক্ষে বৃন্দার ইতস্তত ভ্রামণিক অনামিকা হঠাৎ দীপনের স্তনবৃন্তে নখরাঘাত করিল। উপর্যুপরি সেই আঁচড়ে নূতন করিয়া যেন জাগ্রত হইল বণিক। মুহূর্তে উধাও হইল শত্রুর আগমন ও আশঙ্কাজনিত দুশ্চিন্তা। বলা বাহুল্য, যাবতীয় কুণ্ঠাও। বৃন্দাকে এক ঝটিকায় চিৎ করিয়া দিল নিজের পাশে।

ফিসফিসাইয়া কহিল, ‘এতক্ষণ সাধিকার খেলা দেখালে তো, এবার আমার খেলা দেখো!’ ‘সত্যি! তুমি জান খেলতে?’ চক্ষু কপট বিস্ফারিত করিয়া, ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল বৃন্দা। প্ররোচনা তাহার অঙ্গে অঙ্গে।

‘আচ্ছা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি!’

হাসিতে হাসিতেই আত্মসমর্পণ করিল বৃন্দা। উৎফুল্ল কুচমুখ আড়াল করিয়াছে তাহার মুখমণ্ডল। চূচকাগ্রে জিহ্বা ঠেকাইল দীপন। আন্দোলিত হইল বৃন্দা। কিছুক্ষণ পর এক লহমায় আবার তাহাকে তুলিয়া কক্ষের গাত্রে ঠাসিয়া ধরিল। দক্ষিণ পা উঠিল বৃন্দার। উত্থানপদ বৃন্দার শরীরে অচিরেই প্রবেশ করিল দীপন। তখনও হাসিতেছে বৃন্দা। বজ্র ও পদ্ম ক্রমশ যুগনদ্ধ।

নিমেষে বৃন্দার হাসি পরিণত হইল শীৎকারে।

১২

কিন্তু বৃন্দার কাছে ধরা পড়ে গেল দীপন। সে-যে নিছক বাণিজ্য করতে উজ্জয়িনী আসেনি, বহুলোক-চরিয়ে-খাওয়া বৃন্দা ধরে ফেলল। দীপন বুঝল এই নারী সামান্য পরিচারিকা নয়! কায়াবাদী তান্ত্রিক সাধনায় সাধিকার ভূমিকা পালন করেছে। ভোটদেশীয় তান্ত্রিকরা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী। তাঁদের সংসর্গ করেছে এই নারী! কামকলায় পটু। অতীব পটু। পান্থনিবাসের রহস্যময়ী নারীর কাছে দীপন স্বীকার করল সে চুরি করতে এসেছে।

চমকে যায় বৃন্দা। দীপন তাকে সাহায্য করতে বলে। তার জন্য উপযুক্ত মূল্য সে দেবে। স্বর্ণমুদ্রা। কিন্তু বৃন্দার চৌর্যবৃত্তিতে কোনও আগ্রহ নেই। শহরের উপযুক্ত তস্কর শর্বিলক।

সে অধঃপতিত ব্রাহ্মণ। এখন চুরি করে। দীপন নিমেষে সিদ্ধান্ত নেয় দ্রুত কর্ম সম্পাদনের জন্য এইরকম দু'তিনজন তার প্রয়োজন। কাজকর্ম দ্রুত সেরে আরও দ্রুত এই নগরী থেকে তাকে সরে পড়তে হবে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুটি তুলে দিতে হবে নির্দিষ্ট হাতে।

তারপরেই ভ্রু-কুঞ্চিত হয় কবীরের। পরবর্তী কথোপকথনের অংশ পড়ে যার-পর-নাই অবাক হন তিনি।

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

'তুমি নগরনটী হওয়ার যোগ্য বৃন্দা।' হাসিয়া কহিল দীপন।

'সে তো বসন্তসেনা। আমার অত যোগ্যতা নেই।'

'সে কি চতুঃষষ্টি কলা জানে?'

'সব কলা?'

'হ্যাঁ, পুরো চৌষট্টিটি!'

'সে তো কেউই জানে না প্রিয়!'

'কেন আমি তো জানতাম চতুঃষষ্টি কলায় পারদর্শীরাই একমাত্র নগরনায়িকা হওয়ার যোগ্য!'

'কোনও একজন মানুষের পক্ষে চৌষট্টি কলা জানা সম্ভব?'

'কেন সম্ভব নয়?' কপট বিস্ময় দীপনের।

'তুমি জানো কোন কোন কলাকে চৌষট্টি কলা বলে?'

'সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন, কেশসজ্জা, পরিচ্ছদ নির্মাণ, সুগন্ধীদ্রব্য প্রস্তুতি এইসবই আর কী!'

'তুমি কি জান রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, তক্ষণবিদ্যা, বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ ইত্যাদিও চৌষট্টি কলার অন্তর্গত?'

'বাপরে, এত কিছু! আচ্ছা চৌষট্টি কলার কোন কোন কলা তুমি জান বৃন্দা?'

'সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন, কেশসজ্জা, পরিচ্ছদ নির্মাণ, সুগন্ধীদ্রব্য প্রস্তুতি ইত্যাদি তুমি যা বললে, তা জানে বেশিরভাগ মেয়েই।'

‘অতিরিক্ত তুমি কী জান?’
‘ম্লেচ্ছিকা বিকল্প।’
‘গূঢ়লেখ?’
‘হুঁ।’
‘তুমি জান সাঙ্কেতিক ভাষা?’
‘জানি প্রিয়। স্নানঘর থেকেই তো আমায় দেখছ, এখনও সন্দেহ কেন?’ হাসিল বৃন্দা।
‘প্রদীপ জ্বালাবে?’

বৃন্দা উঠিয়া প্রদীপ জ্বালাইল। বস্ত্র তুলিয়া কিঞ্চিৎ আবৃত করিল শরীর।

প্রদীপের শিখায় তাহাকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল দীপন। স্তব্ধ চরাচর। না, এই মেয়ে একেবারেই সহজসরল নয়। এতক্ষণ অবাক হইতেছিল বিভিন্ন বিষয়ে বৃন্দার পটুত্ব দেখিয়া। গূঢ়লেখ-অভিজ্ঞ শুনিয়া বিস্ময়ে স্থির হইল দীপন। চিত্রযোগ বা কৌচুমারযোগ জাতীয় ইন্দ্রজাল জানাও ইহার পক্ষে বিচিত্র নয়। যথার্থই কামরূপ-কন্যা।

এক চুমুক জল খান কবীর। ম্লেচ্ছিত বিকল্প কামসূত্র-নির্দেশিত চতুঃষষ্টী কলার অন্যতম কলা। মহাভারতে এর একটা অসাধারণ উদাহরণ আছে। দুর্যোধন পাণ্ডবদের জীবন্ত জ্বালিয়ে দিতে চেয়ে পাঠিয়ে ছিলেন বারণাবতে। যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করেছিলেন বিদুর। কীভাবে করে ছিলেন? বিদুর তো দুর্যোধনের পক্ষে কৌরবদের দিকে! সরাসরি কীভাবে সাবধান করবেন? কিন্তু বিদুর মহাজ্ঞানী। তিনি এই গূঢ়লেখ’র সাহায্য নিলেন। সকলের সামনেই তিনি সাঙ্কেতিক ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন যা একমাত্র যুধিষ্ঠিরই বুঝিতে পারবেন। তিনি এমনভাবে বলেছিলেন যে উপস্থিত কেউই ধরতে পারেননি এর গূঢ়ার্থ। জীবন্ত দহন থেকে বেঁচে ছিলেন পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের মাতা কুন্তী।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র এখন কবীরের আগ্রহের বিষয়। তাঁর পরবর্তী বই নির্মিত হবে কামসূত্রকে কেন্দ্র করে। সেখানে তিনি কামসূত্র-এর অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এক নারীর মধ্যে, যতই বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পটিয়সী হোন, চৌষট্টি কলার বাস্তবতা নিয়ে তুলেছেন

প্রশ্ন। কিন্তু এই উপন্যাসেও একই প্রশ্ন তোলা হয়েছে! এখানেই কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়েছেন তিনি। উৎসাহিতও।

বৃন্দা ম্লেচ্ছিত বিকল্প নামক সাংকেতিক ভাষা জানে শুনে দীপন কাজে লাগাতে চায় বৃন্দাকে। রাজী হয় বৃন্দা তার প্রস্তাবে। বণিকের সান্নিধ্য ছেড়ে ভোর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বৃন্দা। পরদিন শর্বিলকের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে নগর দেখতে বেরোয় দীপন। শিপ্রা নদীর উপকূল ধরে শর্বিলক তাকে নিয়ে যায় এক গোপন স্থানে। সেখানে অপেক্ষায় শর্বিলকের এক সাগরেদ। নাম দর্দুরক। তার কথাবার্তা বন্ধুসুলভ নয়। সে সরাসরি দীপনের উজ্জয়িনীতে আগমনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সায় দেয় শর্বিলকও। তাহার পরিবর্তিত আচরণ বিস্মিত করে দীপনকে। কিন্তু সে ভীত হয় না। অগ্রসর হন কবীর।

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

‘তুমি ঠিক কী কারণে এই নগরীতে এসেছ বলে ফেল তো!’

শর্ব্বিলকের গলায় অন্য সুর। কথা বলার ভঙ্গিতে গতরাতের অন্তরঙ্গতা উধাও। হাসিল দীপন কিন্তু রহিল নিশ্চুপ।

‘আরে মশাই বলুন, চুপ কেন? কানে কথা যায়নি!’ দর্দুরক কহিল। উচ্চারণ তাহার ভদ্রজনোচিত নয়।
‘মহানায়িকা বসন্তসেনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!’ ঋজু উত্তর দীপনের।
‘বসন্তসেনা! কেন? কী উদ্দেশ্যে?’ কিছুটা বিস্মিত হইয়া কহিল শর্ব্বিলক।
‘বলতে আমি বাধ্য নই, তবে যদি আমায় সাহায্য কর তাহলে বলতে পারি।’

ঋজু ও নির্ভীক উত্তর শুনিয়া শর্ব্বিলক ও তার মিত্র কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে দীপনকে। বিদেশী বণিকের এহেন অকুতোভয় আচরণে সে যে কিঞ্চিৎ বিস্মিত, শর্ব্বিলক তাহার অভিব্যক্তি গোপন করিতে পারে না।

‘কী সাহায্য চাইছ শুনি?’ দ্রুত শ্লেষে ফিরিয়া আসিল শর্ব্বিলক।
‘কিছু দস্যু আমার পিছু নিয়েছে, তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করতে হবে!’
‘দস্যু!’
‘ভোটদেশীয়।’
‘কেন ভোটদেশীয় দস্যু তোমার পিছু নিয়েছে? কী উদ্দেশ্য তাদের?’
‘সম্ভবত স্বর্ণমুদ্রা, ঠিক জানি না।’

শর্ব্বিলক এবং দর্দ্দুরক পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিল। গণিকা বসন্তসেনার সহিত দেখা করিতে সুদূর বঙ্গদেশ হইতে একজন যুবক, বণিকের ছদ্মবেশে উজ্জয়িনী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! কেবল তাহাই নহে, সেই যুবককে অনুসরণ করিয়া ভোটদেশীয় দস্যুরাও নগরীতে উপস্থিত! দুশ্চিন্তা ও কুতূহল, একযোগে গ্রাস করিল তাহাদের।

‘নগরনটী বসন্তসেনার কাছে কেন?’ দর্দ্দুরক কহিল।
‘আমি দূত, একটি পত্র তাঁর হাতে তুলে দেওয়াই আমার কাজ।’
‘অভিজ্ঞান দেখালেই প্রবেশ করতে পারবে।’ শর্ব্বিলক কহিল।
‘অভিজ্ঞান আমি পথে হারিয়েছি!’
‘তুমি প্রবেশ করতে পারবে, তোমার প্রাণরক্ষাও করব দস্যুদের হাত থেকে, প্রতিদানে আমরা কী পাব?’ দর্দ্দুরক কহিল।
‘স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নেই আমার কাছে!’ প্রত্যুত্তর করিল দীপন।
‘স্বর্ণমুদ্রাই দরকার আমাদের! রাষ্ট্রদ্রোহে কাজে লাগবে!’ দর্দ্দুরক কহিল।

কথোপকথনে দীপন বুঝিল স্থানীয় শাসক পালকের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হইতেছে। শর্ব্বিলক ও দর্দ্দুরক সেই সংগঠনের মূল পাণ্ডা। তাহারা পালককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া উপযুক্ত শাসকের হস্তে অর্পণ করিবে উজ্জয়িনীর ভার। কথায় কথায় আগামী শাসকের নামও প্রকাশিত হইল।

কটিবন্ধ থেকে একটি বটুয়া বাহির করিয়া ছুড়িয়া দিল শর্ব্বিলকের দিকে। বটুয়া হাতে লইয়া হাসি ফুটিল শর্ব্বিলকের।

'সোনারুপা ছাড়া রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভব নাকি!'

তাহার আচরণ আবার পূর্ববৎ। বন্ধুসুলভ।

বসন্তসেনা, শর্বিলক, দর্দুরক—মৃচ্ছকটিক নাটকের চরিত্রদের নিয়ে কাহিনি বুনেছেন কুশলী লেখক। অনুপুঙ্খ বর্ণনারীতি চমৎকার। সত্যিই আগ্রহ-উদ্দীপক লেখা। এই বাংলা উপন্যাসটি পাওয়া গিয়েছে কালিম্পং-এর গুম্ফায়! অবাক কবীর এগিয়ে যান পরের পৃষ্ঠায়।

দীপন ও শর্ব্বিলকও অগ্রসর হয় বসন্তসেনার প্রাসাদের দিকে। যাওয়ার পথে দীপন তার উদ্দেশ্য খোলসা করে শর্বিলকের কাছে। সে কোনও পত্র দিতে নগরনায়িকার কাছে যাচ্ছে না। একটি গ্রন্থ বসন্তসেনার হাতে তুলে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। উজ্জয়িনী নগরীতে তার আগমনের উদ্দেশ্য নিয়ে সে একের পর এক বিভ্রান্তি তৈরি করতে চায় কারণ গ্রন্থের প্রেরক এমনই আদেশ দিয়েছেন তাকে। কারণ কিছু দস্যু তার পিছু নিয়েছে। তারা সেই গ্রন্থ ছিনিয়ে নিতে চায়।

কিন্তু কী সেই গ্রন্থ?

'কে প্রেরক?'
'লামা জয়াকর।'
'কে তিনি?'
'তিনি মহাগুরু দীপংকর শ্রীজ্ঞানের ভোটদেশীয় শিষ্য।'
'তাই নাকি! তাহলে অনুমান করছি গ্রন্থটি মহাগুরু দীপংকরের লেখা?'
'অভ্রান্ত অনুমান মিত্র!'
'কিন্তু সেই গ্রন্থ বসন্তসেনাকে দেবে কেন?'

‘মহাগুরুর ইচ্ছা প্রাচীন ষোলটি মহাজনপদে সংরক্ষিত থাকবে এই গ্রন্থ। প্রতিটি নগরনটীর পাঠাগারই এই গ্রন্থের উপযুক্ত ঠাঁই।’

‘কী সেই গ্রন্থ মিত্র দীপন?’

‘কামসূত্র!’

‘বাৎস্যায়নের কামসূত্র?’

‘বাৎস্যায়নের কামসূত্র আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় শত বর্ষ আগে লেখা, সেই গ্রন্থ আর ভারতবর্ষে নেই!’

‘নেই মানে! উজ্জেনীতেই কামসূত্রের কয়েকশত ভূর্জ্জপত্র আছে! খুঁজলে আমার গৃহেই মিলবে!’

‘তা আছে, কিন্তু কোনওটাই প্রকৃত বাৎস্যায়নের নয়!’

‘কী বলছ মিত্র! তবে ওগুলো কার লেখা?’

‘গত পাঁচ-ছয় শত বর্ষে সংস্করণে সংস্করণে পরিবর্তিত হয়ে গেছে প্রকৃত কামসূত্র!’

‘এটি কি প্রকৃত?’

‘মহাগুরু দীপংকরের তাই অভিমত। ভোটদেশে গিয়ে সবথেকে বড় বিহারে তিনি এর ভোটদেশীয় অনুবাদ পান, সংস্কৃত থেকে ভোটভাষায় অনূদিত কামসূত্র, উনি ভোটভাষা থেকে আবার সংস্কৃতে ফিরিয়ে আনেন।’

‘ঘরের জিনিস ঘরে ফিরছে, খুব ভালো কথা, কিন্তু মিত্র দীপন, ভোটভাষায় অনূদিত কামসূত্র মূলানুগ হয়েছে, নিশ্চয়তা আছে কি?’

‘তা সত্য বটে, কিন্তু মহাগুরু দীপংকর এমন কামসূত্র স্বদেশে পড়েননি। তাছাড়া লোচাবরা নিষ্ঠাবান।’

‘লোচাব?’

‘ভোটদেশীয় অনুবাদক। এই লোচাবরা মূলের বাইরে গিয়ে এমন কিছু অতিরিক্ত সংযোজন করবে কেন? এগুলো আমার কথা নয়। লামা জয়াকরের কথা।’

‘প্রকৃত কামসূত্র কোথায় আলাদা বর্তমানে প্রচলিতের তুলনায়?’

‘বিশদে বলতে পারব না। আমি পণ্ডিত নই মিত্র!’ হাসিয়া কহিল দীপন।

হঠাৎ সচকিত হইল শর্ব্বিলক। লক্ষ্য করিল দীপন। কিন্তু কেন?

‘পেছনে চর আছে, সাবধান!’

শর্ব্বিলকের সাবধানবাণী শুনিয়া দ্রুত পিছন ফিরিল দীপন। অপর এক অশ্বারোহী চোখে পড়িল, নির্দিষ্ট দূরত্ব রাখিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। দীপন লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া সেই অশ্বারোহী গতি হ্রাস করিল। দীপন বিচলিত হইল।

‘ভয় নেই মিত্র, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর শনির দৃষ্টি আমার ওপর, তোমার নয়, ঘাবড়িও না। তোমার ক্ষতির আশঙ্কা নেই।’
‘তাহলে কি আজ মহানায়িকার বাসভবনে যাওয়া হবে না?’
‘অবশ্যই যাওয়া হবে। পশ্চাতে চর নিয়ে ঘোরায় আমি এখন অভ্যস্ত।’

বাৎস্যায়ন লিখিত প্রকৃত কামসূত্র তিব্বতে আবিষ্কার করেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান! উপন্যাসে এমন তথ্য পেয়ে বিস্মিত হন কবীর। পড়তে পড়তে গড়িয়ে যায় সময়। যখন শেষ হয় উপন্যাস, তার রাতের খাওয়ার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত। খাওয়ার টেবিলে টুম্পা খাবার ঢেকে রেখে গিয়েছে। উপন্যাসটি মাথায় নিয়েই খেতে বসেন কবীর।

১৩

১৬ সেপ্টেম্বর। বৈষ্ণবঘাটা। কলকাতা।

দূর থেকে ভেসে আসছে এক অপার্থিব ধ্বনি। কিন্তু কিছুতেই সেই ধ্বনিকে বর্ণ বা অক্ষরে অনুবাদ করতে পারেন না কবীর। ধাঁধাগোলকে পড়ে তিনি অসহায়। কীভাবে উদ্ধার পাবেন এই কুহক থেকে! কিন্তু হাল ছাড়েন না। ফের ডুবে যান কাজে। এই ধ্বনির মধ্যে কি কোনও সত্তা বাহিত হচ্ছে? কোনও স্বর? স্বর হলে তা কারও-না-কারও সৃজিত আওয়াজ। সেই আওয়াজের মধ্যে সেই সত্তাকে পাওয়া যাবেই। কুকুরের ডাকে যেমন

কুকুরকে পাওয়া যায়, বাঘের ডাকে বাঘকে। চিদাকাশে উড়ে বেড়ানো বিদেহী আত্মার মতো সেই ধ্বনিকে বরণ করে নিতে চান কবীর কোনও বর্ণ দিয়ে। কিন্তু পারেন না।

মরিয়া হয়ে ওঠেন কবীর। শেষ চেষ্টা করেন ধ্বনিটিকে ধরতে। সেই অপার্থিব নিনাদ এবার যেন কানের কাছে এসে ফেটে পড়ে। আর তখনই যায় ঘুমটা ভেঙে। ধাতস্থ হয়ে বুঝতে পারেন তারস্বরে দরজা-ঘন্টি বাজাচ্ছে কেউ। উঠে পড়েন। আটটা দশ। দরজায় নিশ্চয়ই টুম্পা। ক্লান্ত চোখে দরজা খুলে ঢুকতে দেন টুম্পাকে। রেঁধে-বেড়ে-খাইয়ে একপ্রকার তাঁকে আগলে রাখে মেয়েটি।

চোখ-মুখ ধুয়ে আবার বসে যান কাজে। ততক্ষণে বিছানা পাট করে ফেলেছে টুম্পা। পাট করার খুব কিছু নেইও, অজস্র বইপত্র আর খাতার মাঝে, ঘুম এলে ঘুমিয়ে পড়েন কবীর। বারান্দার গ্রিলে কাগজ গুঁজে দিয়ে গেছে সংবাদপত্র বিক্রেতা। খবরের কাগজ দুটি টুম্পা এনে রাখে বিছানায়। সঙ্গে এক কাপ চা ও দু'টি বিস্কুটও। চায়ের কাপে সশব্দ চুমুক দিয়ে কবীর খাতা খোলেন।

'জেঠু, আর একটু চা দেব? একটু বেশি হয়ে গেছে।' হাতে একটা স্টিলের গ্লাস নিয়ে টুম্পা এসে দাঁড়ায় বিছানার পাশে।
'তুই নে।'
'নিয়েছি, তাও বেশি। দেখি ঢেলে দি—'

বড় একটা চুমুক মেরে পেয়ালা এগিয়ে দেন কবীর। অতিরিক্ত চা ঢেলে দেয় টুম্পা।

বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে মুখে দেন কবীর। মনে পড়ে যায় কিছুক্ষণ আগে-দেখা স্বপ্নের কথা। তিনি জানেন, নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময়ের উপায় হিসেবে পরমাপ্রকৃতি প্রাণীদের আওয়াজের ব্যবহার শিখিয়েছেন। প্রকৃতির সেই প্রচেষ্টা কীট-পতঙ্গ-পশু-পাখি পেরিয়ে একদিন আদিম মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হয়। মানবজাতির সেই প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের শুরুতেই তিনি কেবল অ-ই-উ ইত্যাদি ধ্বনিকে সুরে ডুবিয়ে বহু উচ্চারণের

মাধ্যমে ভাব আদান-প্রদান করতে শিখিয়েছিলেন। সেই ভাষা নিয়েই বহুকাল কাটিয়ে দিয়েছিল আদিম মানবজাতি।

সেই সুরেলা ভাষার উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ কি এখনও টিকে আছে? নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করেন কবীর। উত্তরও দেন তিনিই। হ্যাঁ, টিকে আছে বৈকি! এখনও মানবজাতির একটি অংশ ধরে রেখেছে সেই সুরেলা ভাববিনিময়ের ভাষা। তারই নাম 'ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত'। আদিম মানুষ কি অ-ই-উ ধ্বনির অজস্র রূপের মাধ্যমে কোনও নতুন উপলব্ধির কথা, নয়া অভিজ্ঞতার কথা, গেয়ে-গেয়ে জানান দিত? সারা রাত ধরে গেয়ে অন্যদের জানিয়ে দিত? সেই ভাষার খণ্ডহার কি ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকে নেই? হয়তো না-বুঝেই স্রেফ অভ্যাসবশত তালিমের মাধ্যমে ধরে রেখেছেন সকল ওস্তাদ-পণ্ডিত। যাঁরা সঙ্গীত বিশারদ তাঁরা যদি এই আলোকপাত করতেন, বড় ভালো হত। জানা যেত অনেক অজানা কথা।

খাতাটি খোলেন কবীর। বেজে ওঠে মোবাইল ফোন। পর্দায় ভেসে-ওঠা নামটি দেখে আনন্দ পান।

'বলো ধরণী, সকাল সকাল আমায় মনে পড়ল কেন?'
'কবীরদা, আপনি সেদিন দুটো শব্দ মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন—ঈশ্বর আর ভগবান—হরিচরণ খুলে দেখছি ঈশ্বর ও ভগবান সমার্থক নয়!'
'সমার্থক শব্দ বলে কিছু হয় না ধরণী। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ আলাদা। ইশকুলে ছোটোদের শেখানো হয় সূর্যের সমার্থক শব্দ রবি, আদিত্য, অরুণ, অর্ক, ভানু, মিহির, তপন, পুষা ইত্যাদি; এই শব্দগুলোর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক আছে, কিন্তু সমার্থক নয়। অর্ক বা আদিত্য এক নয়। তপন আর অরুণও আলাদা। সূর্যের এক-একটা বৈশিষ্ট বলতে পার।'
'ওহ্ সরি কবীরদা, তা বলেছিলেন বটে! আসলে উনি ঈশ্বর শব্দের প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশটা অর্থ ও তার ব্যবহার দিয়েছেন কিন্তু তার মধ্যে কোথাও ভগবান নেই। আবার ভগবান

শব্দের ক্ষেত্রেও একই কাণ্ড! কোথাও ঈশ্বর নেই! পার্থক্যটা জানতে চাই কবীরদা, কবে যাব বলুন? আপনার সুবিধে মতো।'

'আমি বেকার লোক, যে কোনও দিন চলে এসো। ঈশ্বর ও ভগবান, দুই দর্শন করিয়ে দেব।' আবার হাসেন কবীর।

'আপনার কাছে যাওয়া মানে তো একপ্রকার ঈশ্বরদর্শনই!'

'কেন! ধনী, প্রভু, আঢ্য, রাজা, স্বামী, অধিপতি ইত্যাদি কোনোটাই তো আমি নই!' কবীরের অট্টহাসি।

'হ্যাঁ, এই মানেগুলোই আছে ঈশ্বর শব্দের!'

'এবং মজার কথা হচ্ছে কোনও অর্থেই ঈশ্বরের মহত্ত্ব নেই। আর এতেই তুমি অবাক, তাই তো!'

'হ্যাঁ, অবাক তো বটেই! গতকাল রাতে নেটে একটু বঙ্গীয় শব্দকোষ ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম, কী মনে হল হঠাৎ ওই দুটো শব্দ দেখতে গেলাম, রাতে আর ফোন করলাম না, তাই সকাল সকাল—'

'বঙ্গীয় শব্দকোষ আজকাল ইন্টারনেটে মিলছে নাকি!'

'অনেকদিন আগেই একটা পাবলিক ডিজিট্যাল লাইব্রেরির আর্কাইভে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে যে কেউ ডাউনলোড করতে পারে।'

'বাহ, এই ব্যবস্থা খুব ভালো হয়েছে, শুনে খুব আনন্দ পেলাম ধরণী! মানুষের সম্পদ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে গেছে।'

'তাহলে যিনি ভগবান তিনি ঈশ্বর নন?' ডিকের জিজ্ঞাসা।

'উত্তরাধিকার হিসেবে যেমন যেমন অর্থ ও ব্যবহার উনি পেয়েছেন, সততার সঙ্গে হরিচরণ সেই সেই শব্দ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কোনও প্রাচীন গ্রন্থে তিনি ঈশ্বর-এর অর্থ ভগবান পাননি, তাই লেখেননি, পেলে নিশ্চয়ই লিখে রাখতেন। যাকগে, তুমি ফোন করে ভালো করেছ, নাহলে আমিই করতাম।' বলেন কবীর।

'তাহলে কেবল আমার নয়, সকাল সকাল আমাকেও মনে পড়েছে আপনার!' হেসে বলে ডিকে।

'তোমাকে একটা বই পড়তে দেব ভাবছিলাম—'

'কী বই কবীরদা?'

‘একটি অপ্রকাশিত উপন্যাস! গতকাল হাতে পেয়েছি। চমকে গেছি পড়ে! আর কিছু আপাতত বলছি না।’

‘কার লেখা?’

‘এসবি!’

‘তিনি কে?’

‘ঐতিহাসিক উপন্যাস! আন্দাজ কর!’

‘শরদিন্দু! কী বলছেন দাদা!’

‘খাতার পাতার একদিকে পরপর লেখা—শেষ পাতায় কেবল একটি ইনিশিয়াল—এসবি।’

‘ওরে বাবা, শরদিন্দু’র অপ্রকাশিত উপন্যাস! এতো বিরাট সাসপেন্স!’

শরদিন্দুর ঐতিহাসিক কাহিনি নির্মাণের মুনশিয়ানা নিয়ে এগোয় খানিক বাতচিত। আড্ডার নিয়মে প্রসঙ্গান্তরে যেতেও বেশি সময় লাগে না।

‘উত্তরবঙ্গ ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগ বক্তৃতা দিতে ডেকেছে।’ জানান কবীর।

‘আপনি নাকি বেকার লোক!’ হাসে ডিকে, বলে, ‘খুব ভালো খবর! ‘যাবেন তো?’

‘তুমি জান সেমিনার-টেমিনারে আমি যাই না সাধারণত, এদের এখনও হ্যাঁ বলিনি কিন্তু মনে হচ্ছে যেতে হবে।’

‘গেলে কী নিয়ে বলবেন?’

‘মানব সমাজে কীভাবে ঈশ্বরের জন্ম হল!’

‘আচ্ছা, এবার বুঝলাম কেন আমার মাথায় ঈশ্বর ও ভগবান ঢুকিয়েছিলেন! খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় হবে মনে হচ্ছে! লিখিত ভাষণ?’

‘হ্যাঁ লিখে নিয়েছি, বলতে সুবিধে হয়। নাহলে তুমি তো জানো, কোথা থেকে কোথায় চলে যাব, খেই হারিয়ে যাবে।’

‘পড়ার ইচ্ছে রইল। আচ্ছা কবীরদা আর বিরক্ত করছি না, পরশু যাচ্ছি আপনার বাড়ি। শনিবার। অফিস ছুটি। আর হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন আছে?’

‘বলো?’

‘এই যে বললেন খেই হারিয়ে যাবে, এই খেই মানে কী? সূত্র?’

‘শব্দের প্রতি তোমার একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে দেখছি!’ হাসেন কবীর।
‘আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সহজে আর ভাষাকে নিতে পারি না কবীরদা! চেনা কিন্তু অচেনা শব্দ মাথায় ঘা দেয়! বহু শব্দই তো আছে আমাদের জবানে, যার মানেই জানি না কিন্তু ব্যবহার করি!’
‘খেই মানে সূতার অগ্রভাগ। এটা প্রচলিত অভিধানের অর্থ। শব্দের ভেতরের মানে খুঁজতে হবে। মাথায় ঢুকিয়ে নিলাম।’ কবীর হেসে বলেন।
‘মাথায় একবার ঢুকে গেলে আপনার হাত থেকে কোনও শব্দেরই ছাড়া পাওয়ার জো নেই!’
‘ভাষা একটা চলমান ইতিহাস, আমরা এখনও এর গুরুত্ব বুঝেই উঠতে পারিনি ধরণী। আচ্ছা এই যে বললে, জো, এই জো-এর মানে কী?’
‘এই মেরেছে! বলে বিপদে পড়লাম তো!’

দু’জনেই হেসে ওঠেন সশব্দে।

‘ঠিক আছে, এটা তোমার হোমটাস্ক রইল।’

আবার সমবেত হাসি। ফোনের দু’প্রান্তে দুই অসমবয়সী সঙ্গী টের পেল বন্ধুতার উষ্ণতা।

‘পুজোয় কোথাও লিখছেন?’
‘অন্যপ্রশ্ন নামে একটা ওয়েব ম্যাগে।’
‘বিষয়?’
‘একই বিষয়—ঈশ্বর ও ভগবান—এখন তো এটা নিয়েই পড়ে আছি।’ হেসে বলেন কবীর।
‘এখান থেকে কামসূত্র?’
‘হ্যাঁ, শুরু এখান থেকে—শেষ করব কামসূত্রে।’
‘পড়ব কীভাবে? লিঙ্ক মেল করবেন।’
‘বেরোলে পেয়ে যাবে আশাকরি—’
‘জানাবেন। খুঁজে নেব।’

‘হ্যাঁ পোড়। কিঞ্চিৎ ঈশ্বরের আরাধনা করেছি আর কী! জগৎস্রষ্টার জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন!’ কবীর হাসতে হাসতে বলেন।
‘ঈশ্বরের জন্মরহস্য ও মৃত্যুরহস্য একই সঙ্গে!’
‘ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটান অত সহজ নয় যদিও!’
‘কেন গড ইজ ডেড, অনেকদিন আগেই!’ হেসে বলে ডিকে।
‘কিন্তু ও তো বাণী! তাতে ঈশ্বর কি মরেছেন সত্যি সত্যি?

ফোন রেখে কবীর খানিক পায়চারি করেন। বারান্দা থেকে খানিক ঘুরে আসেন। একটা দুশ্চিন্তা কি ঘিরে ফেলছে তাঁকে? কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই, যেন গা-ঝাড়া দিয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছেন, নিজেকে ফিরেও পান। জলখাবার দিয়ে গেছে টুম্পা। রুটি-বেগুনভাজা। বাঁ হাতে রুটি ছিঁড়ে অর্ধেক বেগুনভাজা দিয়ে মুখে পোরেন। আরও এক কাপ চা দিয়ে যায় টুম্পা। বিছানায় উঠে বাবু হয়ে বসেন কবীর। চায়ে চুমুক দিয়ে ডান হাতে খাতার পাতা ওল্টান।

অসংখ্য শব্দ, আঁকিবুঁকি ও অর্থের সহাবস্থান। কালি-কলমে স্বচ্ছন্দ তিনি। কম্পিউটারে অধিকতর। প্রাচীন এক ডেস্কটপ কম্পিউটার তাঁর লেখাপড়ার সঙ্গি। গতবছর নিবেদিতা একটি ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার পর সে-ই যন্ত্রও আপন হয়েছে কবীরের। তবে মাথার প্রাথমিক জট কালি-কলমেই লিখে রাখেন কাগজে।

কলম তুলে নেন। অসংখ্য শব্দের পরে আরও কয়েকটি শব্দ যোগ হয়।

মৎস্য। অহংকার। ভগবান।

খেতে খেতে সময় নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কলম চালান কবীর। যোগ হয় আরও কয়েকটি শব্দ।

কামদেব। কমোডিটি। ঈশ্বর।

তারপর খাতা-কলম রেখে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। শিরোনামে চোখ বোলান। ভারত-চিন সম্পর্কের টেনশন নিয়ে বড় খবর। দেশের অর্থনীতি গভীর গাড্ডায়, গ্যাসের দাম আরও উর্ধ্বমুখী, সারা দেশে কৃষক ও শ্রমিক বিক্ষোভ অব্যাহত ইত্যাদি নানাবিধ সংবাদ।

সেমিনারে গিয়ে বক্তৃতা করার পণ্ডিতি-বাসনা কোনোকালেই ছিল না। অনুরোধে-উপরোধে যে দু'একটি জায়গায় গিয়েছিলেন কদাচিৎ, অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতদের বালখিল্য প্রশ্ন ও কার্যত বাধা-দেওয়ার প্রবণতা তাঁকে আরও বিতৃষ্ণ করেছে সেমিনার বিষয়ে। বক্তৃতার বহু অনুরোধ প্রায় মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এই আমন্ত্রণে তাঁর সাড়া দেওয়ার কারণ অন্য। গতকাল পর্যন্ত তিনি গররাজি ছিলেন কিন্তু রাতে উপন্যাসটি পড়ার পর বদল করেছেন সিদ্ধান্ত।

বিভাগীয় অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাস কালিম্পং-এর এক অখ্যাত ছোটো গুম্ফা থেকে উদ্ধার করেছেন, কী আশ্চর্য, একটি বাংলা উপন্যাস! গুম্ফার এক বৃদ্ধ লামা সরসিজের হাতে তুলে দিয়েছেন সেই উপন্যাস। রুলটানা বঙ্গলিপি খাতায় লেখা নাতিদীর্ঘ সেই আখ্যান। খুব প্রাচীন লেখাও নয়। লামার মতে সম্ভবত পাঁচের দশক থেকে গুম্ফায় এটি পড়ে আছে।

কীভাবে সেই বাংলা উপন্যাস কালিম্পং-এর গুম্ফায় হাজির হল আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে, তা জানেন না অশীতিপর সেই লামা। সরসিজ সেই উপন্যাস পড়ে চমকে যান। প্রচলিত বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে লেখাটির মূলগত তফাৎ ভাষায়। সাধু ভাষায় লেখা, ভিনটেজ একটা গন্ধও আছে বটে কিন্তু স্টাইলে আদ্যন্ত আধুনিক। পাঁচের দশকে বা তার আগে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা বেশ ব্যতিক্রমী। উপন্যাসের

নামটি পড়েই চমকে যেতে হয়। কামসূত্র। উপন্যাসের নামকরণ এবং যৌনতার অনাড়ষ্ট বর্ণনাতেও কালের ছাপ অস্পষ্ট। সত্তর বছর বা তারও বেশি দিনের পুরনো মনেই হয় না।

খাতা থেকে হাতে-লেখা উপন্যাসটি সরসিজ কম্পিউটারে টাইপ করেন। প্রিন্ট আউট নিয়ে একটি প্রতিলিপি বানিয়ে সটান পাঠিয়ে দেন কবীরের কলকাতার ডেরায়। সরসিজের সঙ্গে বহু বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে টেলিফোনে। কথাবার্তায় মালুম অধ্যাপক মহোদয় অন্যান্য অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতদের তুলনায় যথেষ্ট উদার ও কবীরের কাজ সম্পর্কেও বেশ ওয়াকিবহাল। পড়ে ফেলেছেন তাঁর প্রকাশিত প্রায় সব বই। উপন্যাসটির গুরুত্ব, যদি আদৌ কিছু থাকে, তা একমাত্র কবীরই উপলব্ধি করবেন বলে সরসিজের ধারণা। আলাপের প্রথম দিনেই টেলিফোনে সেমিনারের প্রস্তাবও দেন অধ্যাপক মহোদয়। সেই যাত্রায় সেমিনারে যোগদানের প্রশ্নে কবীর রাজী হননি। কিন্তু উপন্যাসটি পড়তে উৎসাহ দেখান। লেখাটি ডাকে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেন সরসিজ বিশ্বাস। সেদিনই জেনে নেন কবীরের কলকাতার বিস্তারিত ঠিকানাও।

কিন্তু সেই উপন্যাস ডাকে আসে না। এক ভদ্রলোক সশরীর উত্তরবঙ্গ থেকে এসে দিয়ে যান। গতকাল বৃষ্টির সন্ধ্যায় তার বাসায় যিনি এসেছিলেন, সেই চিত্রক চন্দ্র নামক ভদ্রলোকও বেজায় বুদ্ধিমান। চিন্তক। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ। ধারাল চিবুক। কবীরের লেখালেখি তথা ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে জানকারি যথেষ্ট। তাঁরও নাকি বহুদিনের ইচ্ছে ছিল সাক্ষাৎ করার, উপন্যাসটি দিতে আসতে পেরে সেই আকাঙ্ক্ষা সাকার হয়েছে। কবীর তাঁকেও সেমিনারে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে কোনও আশ্বাসবাণী শোনাতে পারেননি।

কিন্তু আজ সিদ্ধান্ত বদলের কারণ মোটেই সেমিনার নয়, ওটি উপলক্ষ্য মাত্র, আসল কারণ কালিম্পং-এর গুম্ফা। হতেই পারে, অশীতিপর লামা কোনও নতুন খেই ধরিয়ে দিতে পারেন। সেই সুতোমুখ ধরে কবীর পেয়ে যেতে পারেন অমূল্যরতন। শব্দের শরীর ছেনে অর্থ নিষ্কাশনের নেশা, ময়নাতদন্তের লোভ, ভেঙে দেয় তাঁর গার্হস্থ্য স্থবিরতা।

উপন্যাসের শুরু একাদশ শতকের উজ্জয়িনী নগরীতে। সেই সময় বাংলায় পালযুগ। সদ্য মারা গেছেন নয়পাল। গৌড়ের সিংহাসনে তখন নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। তিব্বতের সঙ্গে তৎকালীন বাংলার এক বৌদ্ধিক সম্পর্ক স্থাপিত। তিব্বত থেকে তিন বছর পর ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি অতীশ দীপংকর। মারা যাচ্ছেন তিব্বতেই। মৃত্যুর আগে, তাঁর সবথেকে প্রিয় তিব্বতি শিষ্য ব্রোম তোনপা বা জয়াকরের হাতে তুলে দিচ্ছেন অমূল্য এক ভারতীয় সম্পদ। জয়াকর কথা দেন, তিনি সেই সম্পদ পৌঁছে দেবেন গৌড়বঙ্গে, বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রধান আচার্যের হাতে। এক বাঙালি যুবক কীভাবে প্রাচীন সেই ভারতীয় সম্পদ নিয়ে আসবেন বঙ্গে, এই নিয়েই কাহিনি লিখেছেন অজানা লেখক। রোমাঞ্চকর সেই আখ্যানের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বাংলার হাজার বছর আগের ইতিহাস।

পালদের দীর্ঘ শাসনে গৌড় ও মগধ হয়ে দাঁড়ায় ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল। এই সময়েই তখনকার এশিয়ার অর্ধেক ভূখণ্ড তথাগত'র জ্যোতিতে ভাস্বর। গৌড়ের উত্তরে নেপাল পুরোপুরি বৌদ্ধ। তিব্বতও তাই। আরও উত্তরে মোঙ্গলরাও একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। চিনে, কোরিয়ায় এমনকী জাপানেও বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায়। এ সময়ে বুদ্ধের দেশে স্বয়ং বুদ্ধ যদি নির্বাসিত থাকেন, গ্লানির শেষ থাকে না। থাকে আক্ষেপ।

এইসময় পালরাজারাই সমগ্র ভারতের মুখ রক্ষা করেন। তাঁদের সময়ে গৌড় ও মগধ বিশাল বৌদ্ধ জগতের পশ্চিমতম প্রদেশে পরিণত হয়। তিব্বতি সাহিত্য ব্যতীত এই মহান রাজবংশের ধর্মানুরাগ সংক্রান্ত তথ্য প্রায় নেই। প্রায় সব ঐতিহাসিকই বলেন, সেইসব তিব্বতি গ্রন্থ বাংলা বা ইংরাজিতে অনুবাদ হয়েছে খুবই কম। লামা তারনাথ, লামা বু-তোন, সুম-পা খাম-পো'র লেখা সামান্য কিছু অনুবাদ হয়েছে। যেটুকু যা হয়েছে, অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে। সেখানেও বিকৃতি ও অসংলগ্নতা। এই বিষয়ে গবেষণাও হয়েছে খুবই কম।

যদিও চারশ বছরের পাল আমলে বৌদ্ধধর্ম একই অবস্থায় ছিল না। এই প্রসঙ্গে ভারি সুন্দর একটি অংশ আছে উপন্যাসে। নগরনটী বসন্তসেনা দীপনকে জিজ্ঞাসা করছেন

দীপংকরের সম্পর্কে।

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

আসন হইতে উঠিল দীপন। পোটালিকা হইতে বাহির করিল একটি গ্রন্থিত পুঁথি। দুই করতল দিয়া মসৃণ করিল সেই গ্রন্থ। অতঃপর সম্মানের সঙ্গে মহানায়িকার হস্তে তাহা অর্পণ করিল ।

‘শত্রুর ভয়ে আপন অঙ্গে সর্বক্ষণ বহন করেছি এই গ্রন্থ, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হয়ত, মার্জনা করবেন ভদ্রে।’

‘চিন্তা করবেন না ভদ্রমহোদয়, দক্ষ সংস্কারক আছে আমার, সংস্কার করে নেব। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমার পাঠাগারে এই মূল্যবান গ্রন্থ সম্মানের সঙ্গে সংরক্ষিত হবে। মহাগুরুকে আমার প্রণাম জানাবেন।’

‘মহাগুরু আর নেই!’ কহিল দীপন।

‘হ্যাঁ তিনি ভোটদেশে আছেন, আমি জানি।’

‘তিনি ভোটদেশেই তুষিত স্বর্গে গমন করেছেন!’ মাথা নীচু করিয়া কহিল দীপন।

‘সে কী! দীপংকর শ্রীজ্ঞান দেহত্যাগ করেছেন!’ মাথার উপর হাত তুলিয়া প্রণাম করিল বসন্তসেনা।

‘শেষজীবনে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল ভোটদেশীয় শিষ্য জয়াকর। ব্রোম তোনপা। জয়াকরই মহাগুরুর মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ করেন বিক্রমশীলে। মহাস্থবির আচার্যকে পত্রে এই গ্রন্থের কথাও জানান। আচার্য জানতেন বাণিজ্যের সূত্রে আমি দক্ষিণাপথ চিনি। নেপাল সীমান্তে জয়াকর থাকবেন, তাঁর হাত থেকে গ্রন্থ নিয়ে আপনার হাতে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ। আজ আমার কাজ সমাপ্ত এবং আমি বিপন্মুক্ত।’

‘আপনি আপনার কর্ম্ম করেছেন, আপনার শুভ হোক। দৌবারিকের ব্যবহার নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন, পরমকরুণাময়ের কাছে এই প্রার্থনা করি।’

পোটালিকা হইতে দীপন বস্ত্র বাহির করিল। রেশমবস্ত্র। উপহারস্বরূপ তুলিয়া দিল নায়িকার হাতে। অভিভূত হইলেন বসন্তসেনা।

'কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাই ভদ্রমহোদয়! দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পর বঙ্গদেশের অতি উত্তম রেশমবস্ত্র! আমি অত্যন্ত আনন্দিত!' উচ্ছ্বাস গোপন করিলেন না নায়িকা।

বিদায়-নমস্কার করিবার পর দীপন শর্ব্বিলকের সহিত কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত, পিছু ডাকিলেন বসন্তসেনা।

'একটা প্রশ্ন করব মহাশয়?' মহানায়িকা বসন্তসেনা জিজ্ঞাসা করিল অত্যন্ত বিনয়ের সহিত।
'অবশ্যই ভদ্রে!' দীপন বলিল।
'দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাপণ্ডিত, আসমুদ্রহিমাচল জানে। তিনি হঠাৎ কেন ভোটদেশে চলে গেলেন সব ছেড়ে? বৌদ্ধধর্মের কি এতে ক্ষতি হল না? অন্তত বঙ্গদেশ কি এই ক্ষতি সামলাতে পারবে?'

নিশ্চুপ রহিল দীপন। এই প্রশ্ন তো তাহারও। কেবল তাহার কেন, তাবৎ বঙ্গবিদ্বৎসমাজের। তিন বর্ষ পর ফিরিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও তিনি ফিরেন নাই। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু কেন? মহাগুরু দীপংকর কি আশঙ্কা করিয়াছিলেন বঙ্গে আর বৌদ্ধধর্ম নিরাপদ নয়? নয়পাল দীপংকরকে বিক্রমশীল বিহারের প্রধান আচার্য্য করিয়াছিলেন ইহা সত্য। আবার ইহাও সত্য নয়পালের বাসুদেব ও লক্ষ্মী প্রীতিও ছিল।

নয়পাল মৃত। গৌড়ের সিংহাসনে এখন তাঁহার পুত্র বিগ্রহপাল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাঁহার দুর্বলতাও প্রকাশ্য। কিন্তু এ চিত্র নূতন নয়। অভূতপূর্ব নয়। পরম সৌগত ধর্ম্মপালের যুগ হইতে গৌড়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পাশাপাশি চলিতেছে। বঙ্গদেশে কেবল বৌদ্ধরা রাজত্ব করিতেছে, অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীদের কোনও প্রভাব নাই, তাহা নয়। পালবংশ

পরধর্ম্মসহিষ্ণু। বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাপত্তার অভাব আশঙ্কা করিয়া আচার্য্য ভোটদেশে চলিয়া যান এবং আর ফিরিয়া আসেন নাই, এই যুক্তি মানিয়া লওয়া কঠিন।

'অনেকেরই মনেই এই প্রশ্ন আছে ভদ্রে, উত্তর নাই।'

মৃদু হাসিয়া কহিল দীপন। সেই হাসিতে বিষণ্ণতা।

আচার্য দীপংকরের সঙ্গে বাংলার অনেকটা ইতিহাস চলে গেছে তিব্বতে। কবীর জানেন, বাংলার এক বিরাট অজানা ইতিহাস এইভাবে পড়ে রয়েছে তিব্বতের গুম্ফায় গুম্ফায়। তিব্বতের ইতিহাস না-জানলে বাংলার বৌদ্ধ-ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বস্তুত বাংলার ইতিহাসই থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। কিন্তু বাঙালি সেইভাবে নিজেদের ইতিহাস খুঁজতে বেরিয়ে পড়তে পারেনি। পারেনি চিন-জাপান-শ্রীলঙ্কাসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন ইন্দোনেশিয়ার জাভা-সুমাত্রা-বোর্নিও থেকেও, বাঙালির ইতিহাসের হারিয়ে-যাওয়া-সূত্রগুলো পুনরুদ্ধার করতে। বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস খুঁজতে হলে বেরিয়ে পড়তে হবে। সংগ্রহ করতে হবে মিসিং লিঙ্কগুলো। বঙ্কিম বলেছিলেন, যে জাতির ইতিহাস নেই, তাদের দুর্ভাগ্যেরও শেষ নেই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই নিয়ে আক্ষেপের শেষ ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় একজন হরপ্রসাদ বাঙালি পায়নি, এও আরেক চরম আক্ষেপের বিষয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ অগ্রাহ্য করে অবলীলায় হরপ্রসাদ বেরিয়ে পড়েছিলেন বাংলার ইতিহাসের সন্ধানে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদের পুঁথি নেপাল থেকে তিনিই উদ্ধার করেছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গে তিব্বত একটু অতিরিক্ত মনোযোগ দাবি করে।

গৌড় কাহিনির অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও বলেন গৌড়ের ইতিহাসের মধ্যে তিব্বতের ইতিহাস অনুপ্রবেশ করেছে বলেই তিব্বতের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। এমনিতেই তিব্বত দুর্গম রহস্যময় দেশ, এখন চিন-অধিকৃত তিব্বত প্রায় অগম্য। তিব্বত পৌঁছলেও

মহাবিহার ও গুম্ফায় ঢুকে অনুসন্ধান করা প্রায় অসম্ভব। সশস্ত্র চৈনিক সেনার পাহারাদার চোখ সদা-সতর্ক।

কালিম্পং গুম্ফার লামা কি এই বিষয়ে কোনও দিকনির্দেশ করতে পারেন? পাহাড়-যাত্রার এই হাতছানিটুকু আছে বলেই সন্দীপ্ত কবীর উত্তরবঙ্গ যেতে রাজি হয়েছেন। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্যরতন!

১৫

১৮ সেপ্টেম্বর। বৈষ্ণবঘাটা। কলকাতা।

গত পরশু লেখাটি হাতে পাওয়ার পর আজ সকালে অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাসের ফোন পান কবীর। ডাকে পার্সেলটি ঠিকঠাক পৌঁছেছে কিনা, খোঁজ নিতেই ফোনটি করেছিলেন। কবীর তাঁকে বিশদে জানালেন, ডাক নয়, সরাসরি চিত্রক চন্দ্র নামক একজন তাঁর বাড়িতে এসে লেখাটি দিয়ে গেছেন। সব শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন সরসিজ। বেশ জোর দিয়ে বললেন পার্সেলটি তিনি ডাকেই পাঠিয়েছেন এবং সবথেকে বিস্ময়কর ঘটনা হল চিত্রক চন্দ্র নামে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারী নেই!

কোথাও একটা ভুল-বোঝাবুঝি হচ্ছে বোঝা গেলেও, লেখা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য যখন সফল হয়েছে, দু'জনেই সেই যাত্রায় চিত্রক চন্দ্রকে নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন না। কিন্তু খটকাটা কবীরের মাথা থেকে যায় না। যাওয়ার কথাও নয়। কারণ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে কখনওই মনে হয়নি তিনি সাধারণ একজন বার্তাবাহক মাত্র।

তাঁর বর্তমান কাজের সঙ্গে প্রচুর মিল এই উপন্যাসের। বাৎস্যায়নের কামসূত্র নিয়ে তিনিও পড়ে আছেন বেশ কিছুদিন। উদ্ধার করতে চাইছেন কামের সূত্র বা সূত্রাবলি। অধ্যাপক

সরসিজ বিশ্বাসকে এইসব কিছুই জানান না তিনি। কেবল কালিম্পং-এর সেই বৃদ্ধ লামার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিন্তু কবীর কী করে ভুলে যাবেন, সরসিজ বিশ্বাসকে না-জানান সত্ত্বেও তাঁর প্রতিনিধি চিত্রক চন্দ্র জানল কীভাবে কামসুত্র নিয়ে তাঁর বর্তমান চর্চার কথা? খটকা থাকলেও কাজের মধ্যে তালেগোলে বিষয়টি প্রায়-বিস্মৃত হন কবীর।

লেখাটি পড়েই ধরণীকে পড়াবার বাসনা জাগে কবীরের। উপন্যাসের ভেতর লুকিয়ে-থাকা নয়া কোনও ইঙ্গিত, যদি আদৌ থাকে, হয়ত এড়িয়ে গেছে কবীরের চোখ, আবিষ্কার করতে পারে সে-ও। সেই চোখ আছে ধরণীর। গতকাল এক কপি ফোটোকপি তাই করিয়ে রেখেছেন সেই উপন্যাসের।

১৫ অক্টোবর, সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ সেরে মঙ্গলবারই ঢুঁ মারবেন কালিম্পং-এর সেই গুম্ফায়, এমনই পরিকল্পনা হয়েছে সরসিজবাবুর সঙ্গে। শব্দের ব্যুৎপত্তি-সন্ধানী কবীর তাই সবমিলিয়ে উত্তরবঙ্গ সফর নিয়ে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত।

তবে এতটা পথ উজিয়ে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য পাঁচকান করা যাবে না। ডিকে-কেও জানাবেন না কিছু। এমনকী ঘরের লোক, কন্যাসম নিবেদিতাকেও নয়। কামসূত্র তিনি পড়াবেন নিবেদিতাকে। অবশ্যই পড়াবেন। কিন্তু কালিম্পং সফরের কথা গুপ্ত রাখতে হবে। সরসিজের সঙ্গে এ তার গোপনীয়তার অঙ্গীকার। বিষয়টি প্রকাশ করতে বারণ করেছেন তিনি। ফাইলটি পোর্টেবল ফরম্যাটে নিয়ে মেল করে দিতে পারতেন, কিন্তু নিরাপত্তার কারণেই তা তিনি করতে চাননি। সফট কপির পরিবর্তে আপাতত তিনি হার্ড কপিতেই রাখতে চান লেখাটি। উপন্যাসটি নিয়ে বড় পরিকল্পনা আছে সরসিজের। দীর্ঘ ভূমিকা লিখে তিনি উপন্যাসটি প্রকাশ করতে চান। কবীরকে বিশ্বাস করে লেখাটির কপি পাঠাচ্ছেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছে এই কাজে কবীরের টীকা প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে কোনও আপত্তি করেননি কবীর।

কবীর আবার উপন্যাসটির দিকে হাত বাড়ান। সম্পূর্ণ পড়ে ফেলার পরও একটি উপন্যাস তাঁকে আকর্ষণ করছে, এমন ঘটনা ইদানীংকালে ঘটেনি!

উজ্জয়িনীর নগরনটী বসন্তসেনার প্রাসাদে প্রবেশ করছে দীপন ও শর্ব্বিলক। অপূর্ব সে প্রাসাদের অন্দরমহল। বর্ণনাও যথাযথ।

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

বসন্তসেনার প্রাসাদের অন্দরে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইল দীপন। একের পর এক কক্ষ ও কর্ম দেখিয়া দীপনের মনে হইল সে যেন কোনও চারুকলাচর্চ্চা কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছে। সঙ্গীতভবন। নৃত্যভবন। নাট্যভবন। বহু মহলে বিভক্ত প্রাসাদ। সঙ্গীতভবনের নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়াইল দীপন। কার্যত বাধ্য হইল স্থির হইতে। যুবতীদের হাতের আঘাতে পাখোয়াজ বাজিতেছে গভীর নিনাদে, সে যেন মেঘের মতো। কাংস-খঞ্জনিতে তাল পড়িতেছে ক্ষীণপুণ্য তারা খসিয়া পড়িবার ন্যায়। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো বাঁশি বাজিতেছে মধুর সুরে। বীণা কোলে লইয়া ধীর লয়ে বাজাইতেছে কেহ। বৃষ্টিধারার মতো সুর ঝরিয়া পড়িতেছে গায়িকাদের কণ্ঠ হইতে। মধুর গানের সহিত বালিকাদের নৃত্যশিক্ষাও চলিতেছে। তালপত্রে তার, বিটপে মন্দ্র, শিলায় রুক্ষ, সলিলে চণ্ড তাহার ধ্বনি। একইধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন অভিঘাতে সঙ্গীতস্বরের বৈভিন্ন্য সৃষ্টি করিতেছে। শুনিয়া প্রাণ ও মন ভরিয়া উঠিতেছে দীপনের।

শর্ব্বিলক দীপনকে ডাকিয়া লইল অন্য কক্ষে। মহানায়িকা বসন্তসেনা শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। এখন সঙ্গীতরসে মজিলে কার্যসিদ্ধি হইবে না। অতিথিকক্ষে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিল দীপন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন সুন্দরী বসন্তসেনা। রূপ ও গুণের যুগপৎ ছটায় আলোকিত হইল কক্ষ। তাহারা দুইজনেই দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিল। প্রতি নমস্কার জানাইল নগরনটী। পারস্পরিক পরিচয় হইল। সরাসরি প্রশ্ন করিলেন অতিথির উদ্দেশে। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য সবিস্তার করিল দীপন। সব শুনিয়া কিছুটা বিস্মিত হইলেন বসন্তসেনা।

‘ষোড়শ মহাজনপদ তো এখন অস্তিত্বহীন, মহাগুরু দীপংকর কেন মনে করলেন ষোড়শ মহাজনপদের নগরনটীদের পাঠাগারই এই মহামূল্যবান গ্রন্থের উপযুক্ত স্থান?’ জানিতে চাহিলেন তিনি।
‘শিক্ষা, বুদ্ধি, চারুকলার স্থান আর কোথায় ভদ্রে? এই ভবন দেখে আমার মনে হচ্ছে মহাগুরু যথার্থ স্থানই নির্বাচন করেছেন!’

হাসিয়া উঠিলেন বসন্তসেনা। কিছুটা গর্বও যেন মিশিয়া আছে সেই হাসিতে। দ্রুত সংবরণ করিয়া কহিলেন,

‘আমাকে প্রতিমুহূর্তে শুনতে হয়, মনে রাখবে তুমি গণিকা, পথের ওপর জাত লতার থেকে গুরুত্ব বেশি নয় তোমার! টাকায় কেনা যায় এমন পণ্যভূত শরীর ধারণ করি আমি! সাধারণ কেউ হয়ত পৌঁছতে পারে না আমার কাছে, কিন্তু উচ্চকোটির প্রতিটি ব্যক্তি, রাজন্যবর্গ থেকে উচ্চপদের রাজকর্মচারী, সকলেই ভাবে বসন্তসেনা অতীব সুলভ ও বলাৎকার যোগ্যা! অসম্মান প্রতি পদে পদে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় ভদ্রমহোদয়, আজ আমি যে সম্মান পেলাম এমন কখনও পাইনি।’
‘আপত্তি করছি ভদ্রে, উজ্জেনীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়িয়েছেন, প্রতিরোধ করছেন, আমরাও আপনার পাশে আছি। আপনার আচরণ আর পাঁচজন নগরনটীর মতো নয়, এ এক মহাব্যতিক্রম রূপেই গণ্য হবে।’ ঈষৎ উত্তেজিত হইয়াই বলিল শর্ব্বিলক।
‘গণিকা অথবা বধূ—আমার কাছে আর কোনও বিকল্প নেই শর্ব্বিলক! তুমি উপবীত ত্যাগ করতে পার—আমি ইচ্ছে থাকলেও গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করতে পারি না!’
‘উপবীত ত্যাগ করিনি আমি! এই তো!’

কটিদেশে বাঁধা উপবীত বাহির করিয়া প্রদর্শন করিল শর্ব্বিলক। অবাক হইলেন বসন্তসেনা।

‘সে কী! উপবীত এখন কী কাজে লাগে? তুমি তো এখন আর বিপ্র নও!’

‘এখন তো আমি চুরি করি—সিঁদ কাটার সময় মাপ নিতে কাজে লাগে এই উপবীত!’

শর্ব্বিলকের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। ধনী ব্যক্তির প্রাসাদের জীর্ণ অংশে সন্ধিচ্ছেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হয় তস্করকে। শর্ব্বিলক নিজ উপবীত প্রমাণসূত্র রূপে ব্যবহার করে শুনিয়া ভারী কৌতুকবোধ করিলেন বসন্তসেনা।

‘তুমি চুরি কর!’ বিস্মিত দীপনের প্রশ্ন।
‘চৌর্য্য তো স্বাধীন বৃত্তি! অবাক হচ্ছ কেন মিত্র? স্বয়ং কুমার কার্ত্তিকেয়কে পূজা করে এই বিদ্যা শিখেছি গুরুদের কাছে!’
‘কেন চৌর্য্যবৃত্তিতে গেলে তুমি বলো?’ বসন্তসেনা শর্ব্বিলকের উদ্দেশে বলিলেন।

মৃদু হাসিয়া শর্ব্বিলক তাহার চৌর্যবৃত্তি গ্রহণের উদ্দেশ্য জানাইল। সে রাষ্ট্রবিপ্লবে নিয়োজিত। দুরাচারী রাজা পালককে সরাইয়া তাহারা আর্যককে রাজা বানাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ফলত প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিপ্লব মুদ্রা ছাড়া হয়না! বিপ্রবেশ ত্যাগ করিতে সে তাই বাধ্য হইয়াছে। যদিও অন্য আরও একটি কারণও আছে। বসন্তসেনা দীপনের নিকট সেই অন্য কারণ ব্যাখ্যা করিল। শর্বিলক একজন প্রেমিক। বসন্তসেনার সই মদনিকার প্রণয়পাশে সে আবদ্ধ। বেশ্যার বৃত্তিগত বন্দীদশা হইতে তাহাকে মুক্ত করতে চাহিলে নিষ্ক্রয় মূল্য প্রয়োজন। সেই পরিমাণ কার্ষাপণ শর্ব্বিলকের নাই। তাই সে চৌর্য্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

‘কিন্তু ভদ্রে, আপনি সম্পূর্ণ করলেন না!’ অতঃপর শর্ব্বিলক দীপনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, ‘বিনা নিষ্ক্রয়পণে মদনিকা মুক্ত এবং আমি তাকে বধূ রূপে পেতে চলেছি শীঘ্রই। তবে এ কিন্তু রীতি নয়। রীতি মানলে আমি মদনিকাকে পেতাম না। অত কার্ষাপণ আমি সংগ্রহ করতে পারতাম না। না, চুরি করেও না। এক্ষেত্রে ভদ্রে বসন্তসেনার স্বভাবমহত্ত্ব ও ঔদার্যই আমাদের সেই সুযোগ দিয়েছে। তিনি নিষ্ক্রয়মূল্য মার্জনা করেছেন।’

পানীয় ও খাদ্যবস্তু পরিবেশিত হইল। খাদ্যরসিক শর্ব্বিলক দ্রুত কর্ম্মসম্পাদনে মনোনিবেশ করিল।

‘একই অঙ্গে যার প্রেম ও দ্রোহ, সেই প্রেমিক ও বিদ্রোহীকে আমি সমর্থন করি!’ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিলেন বসন্তসেনা।
‘প্রেমই দ্রোহ, দ্রোহই প্রেম! আমি বিশ্বাস করি ভদ্রে।’ মণ্ডায় কামড় দিয়া কহিল শর্ব্বিলক।
‘আর কাম?’
‘কাম তো সবার ওপরে! এ তো কেবল রিরংসা চরিতার্থ করার বিষয় নয়—’ মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু লইয়া অস্পষ্টস্বরে কহিল শর্ব্বিলক।
‘যথার্থ! কাম সকলের ওপরে। কর্ম্মও সকলের ওপরে। কামই কর্ম্ম, কর্ম্মই কাম।’

দীপনের দিকে চাহিয়া হাসিলেন বসন্তসেনা। সে হাসি অপূর্ব।

১৬

দীপন ও শর্ব্বিলকের সঙ্গে কথোপকথনে বসন্তসেনা কাম ও কামসূত্র বিষয়ে এমন কিছু ইঙ্গিত করছেন যা কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নয়, বিস্ময়কর! হাজার বছর পরে কোনও সূত্র ছাড়াই কবীরের মনেও এমন প্রশ্ন উঠছে কীভাবে? সবথেকে বড় রহস্য, আজ থেকে সত্তর কী আশি বছর আগে লিখিত বাংলা ভাষার একটি উপন্যাসে এইসব প্রশ্ন কীভাবে আনছেন লেখক?

অন্দরমহলে প্রশ্ন ও সংশয় নিয়েই বইয়ের পাতা ওল্টান কবীর।

একাদশ শতক। উজ্জয়িনী।

বেলা দ্বিপ্রহর। বসন্তসেনার প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল শর্ব্বিলক ও দীপন। কর্ম্ম সমাপ্ত দীপনের। পান্থনিবাসে দ্রুত ফিরিয়া এইবার প্রস্তুতি লইতে হইবে স্বদেশযাত্রার। আগামীকাল প্রাতে আরম্ভ করিবে যাত্রা। দীর্ঘ পথ। বিদায় জানায় সে শর্ব্বিলককে। বিদায়কালে আরও কিছু স্বর্ণমুদ্রা সে তুলিয়া দিতে চায় মিত্র শর্ব্বিলকের হাতে। কিন্তু শর্ব্বিলক গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। আলিঙ্গন করে দীপনকে।

'কাল প্রাতে আমি থাকব, তোমাকে নিরাপদে কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিতে চাই। পারলে আরও একজন সহচর নেব, তবে একটা দুঃখ থেকে গেল!' দীপনের হাত ধরিয়া কহিল শর্ব্বিলক।
'দুঃখ! কীসের দুঃখ মিত্র?' অবাক প্রশ্ন দীপনের।
'তোমাকে মহাকাল মন্দির দেখাতে পারলাম না!' আক্ষেপ শর্ব্বিলকের।
'ভাগ্যে থাকলে পরে দর্শন হবে। জয় মহাকাল!'
'জয় মহাকাল!'

পরস্পর আপাতত বিদায় জানাইয়া যে যাহার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে অশ্বারোহণ করিল। নগরীর রাজপথ ধরিয়া দ্রুত পান্থনিবাসের দিকে ধাবমান হইল রৌদ্র। বসন্তসেনার শেষ প্রশ্নটি মস্তিষ্কে কাঁটার মতো বিঁধিয়া আছে। আচার্য দীপংকর বিনা বঙ্গদেশ কীভাবে ধর্ম্ম রক্ষা করিবে? পরক্ষণে মস্তিষ্ক নিজেই নির্মাণ করিল উত্তর। গত তের বর্ষকাল যেইভাবে অতিবাহিত করিয়াছে বঙ্গদেশ, সেইভাবেই চলিবে। কেহই অপরিহার্য নয়। কিন্তু সত্যই কি তাই? আবার সংশয় আসিয়া উপস্থিত। এই প্রশ্নকে ঘিরিয়া দোলাচলতা থাকিবেই। ভবিষ্যতই একমাত্র ইহার সদুত্তর দিতে পারিবে।

হঠাৎ চারজন অশ্বারোহী আসিয়া পথ রোধ করিল। ডান হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া থামিতে নির্দেশ করিল। রজ্জু টানিয়া থামাইয়া রৌদ্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল দীপন। কী ব্যাপার? ইহারা কাহারা? মুখমণ্ডল ভোটদেশীয় নয়।

তাহারা নিজেদের রাজকর্মচারী রূপে পরিচয় দিল। বিভিন্ন বিষয় তাহাদের জিজ্ঞাস্য। দীপন বুঝিল শর্ব্বিলকের সহিত তাহার নগর পরিক্রমার সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রধান কর্মচারী কঠিনস্বরে নির্দেশ করিল।

'আপনি বিদেশী, এই শহরের অতিথি, কিন্তু আপনি যাঁদের সঙ্গে ঘুরছেন বা সাক্ষাৎ করছেন তা আপনার পক্ষে অসমীচীন। শর্ব্বিলক রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত। যেকোনও সময়ে বন্দী হবে। নগরনায়িকাও আমাদের সন্দেহের তালিকায়। আপনি আগামীকাল সূর্য ওঠবার আগেই উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করবেন! সূর্যোদয়ের পর আপনাকে এই নগরীতে দেখলে বন্দী করা হবে।'

সাবধানবাণী শুনাইয়া সদলবল তাহারা অন্তর্হিত হইল। রৌদ্র আবার যাত্রা করিল দীপনকে লইয়া।

পান্থনিবাস। উজ্জয়িনী।

পান্থনিবাসে ফিরিয়া কক্ষে সামান্য বিশ্রাম লইয়া স্নানের উদ্যোগ নিল। আজ স্নানে সহায়তা করিল অন্য দুই স্নান-সুন্দরী। বৃন্দা ও লীলা নয়। কাছেধারে তাহাদের দেখিতে পাইল না। এমনকি মধ্যাহ্নভোজনের সময়েও দুই সুন্দরীকে চোখে পড়িল না। ভোজন সারিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাহার নাই। কিন্তু আজ ভোর হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রৌদ্রদগ্ধ হইয়া নগর পরিক্রমা ক্লান্তি আনিয়াছে।

সশব্দ এক জৃম্ভন নির্গত করিয়া শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু যাইতে পারিল না। নিমেষে তাহার কক্ষ বহু নিঃশ্বাসে ভারী হইল। অস্ত্রধারী ছয়জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল তাহাকে। একজন বুকে সজোরে আঘাত করিল। অপ্রত্যাশিত আঘাতে শয্যায় ছিটকাইয়া পড়িল সে। চারিপার্শ্বে ছয় দস্যু। মুখমণ্ডল দেখিয়াই বুঝিতে পারিল ইহারা জয়াকর-কথিত ভোটদেশীয় দস্যুদল।

‘ব্রোম তোনপা কি দিয়েছে তোমাকে?’ তীক্ষ্ণস্বরে কহিল একজন।
‘কিছু দেয়নি তো! কী দেবে?’ কপট বিস্ময় দেখাইল দীপন।
‘মিথ্যাবাদী তুমি! একটি গ্রন্থ দিয়েছে সে!’
‘গ্রন্থ! না কোনও গ্রন্থ দেয়নি। মহাগুরু দীপংকর কিছু স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করেছিলেন, সেই স্বর্ণমুদ্রা বিক্রমশীল মহাবিহারে উনি দান করে গিয়েছেন। সেইগুলিই আনতে আমি নেপাল গিয়েছিলাম।’
‘স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আমাদের উৎসাহ নেই। জোবো ছেনপো জীবিত থাকতেই বহুবার বিক্রমশীলে অর্থ ও স্বর্ণ পাঠিয়েছেন। কিন্তু দেশের কোনও গুপ্ত সম্পদ দেশের বাইরে আমরা যেতে দেব না! জয়াকর কী পাচার করল?’
‘বিশ্বাস কর আমার কাছে কোনও গ্রন্থ নেই!’
‘আমরা তোমার শরীর আর পেটিকা পরীক্ষা করব।’
‘সানন্দে!’ দীপন বলিল।

এক দস্যু পেটিকা খুলিয়া অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল। অপর একজন দীপনের পোষাক নিরীক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। বাধা দিল না দীপন। কটিবন্ধে এখন স্বর্ণমুদ্রা ও একটি ছুরিকা ব্যতীত কিছুই নাই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার পেটিকা নিরীক্ষণকারী দস্যুর দিকে। পেটিকা হইতে বস্ত্র, শুকনো কিছু খাদ্যবস্তু আর স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইল। আর কিছুই পাওয়া গেল না। দস্যুদের পাণ্ডা অগ্রসর হইয়া নিজে পরীক্ষা করিল। অতঃপর চিৎকার করিয়া কহিল,

‘পেটিকা ছেদন কর!’

প্রমাদ গণিল দীপন। এমত নির্দেশ আসিতে পারে, প্রত্যাশা করে নাই সে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিল ছেদনের। দস্যুটি একটি ছুরিকার সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে পেটিকাটি সম্পূর্ণ ছেদন করিল। চোখ বন্ধ করিল দীপন। নাহ্ আর আশা নাই! এই পেটিকা ছেদনের পর তাহার পেটিকা ছেদন করিবে এই দস্যুদল। আপন ভাগ্য সমর্পণ করিল নিয়তির হাতে। কিন্তু এ কী, পেটিকা ছেদন করিয়াও কিছুই পাওয়া গেল না। বিস্ময়ে হতবাক হইল

দীপন। এইমুহূর্তে হয়ত প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু অন্য দুশ্চিন্তা আসিয়া গ্রাস করিল। আচার্যের হস্তে কী তুলিয়া দিবে সে!

দস্যুনেতা তীক্ষ্ণ এক ছুরিকা দীপনের গলায় ঠেকাইয়া চাপাস্বরে কহিল, 'কোথায় রেখেছিস গ্রন্থ, বার কর! না পেলে তোর কণ্ঠ চিরে দেব!'
'আমার কাছে কোনও গ্রন্থ নেই! জয়াকর আমাকে কোনও গ্রন্থ দেয়নি!'
'চুপ মিথ্যাবাদী! গুরু পদ্মসম্ভব পাহাড়ে পাহাড়ে গুহায় গুহায় লুকিয়ে রেখে গেছেন গুপ্তজ্ঞান! তের-মা। তের-মা আমরা বিদেশে পাচার হতে দেব না! এক্ষুণি বের কর সেই গ্রন্থ, না হলে মর!'

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া দস্যুনেতাকে ধাক্কা দিল দীপন। কয়েক হস্ত দূরে গিয়া ভূপতিত হইল ভোটদস্যু। মুহূর্তে বাকি পাঁচ দস্যু ছুরিকা হাতে শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। চিৎকার করিয়া তাহাদের থামাইল নেতা।

'না, কেউ মারবে না ওকে! আমায় আঘাত করেছে ও! ও আমার শিকার!'

ভূতল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল সে। সকলে সরিয়া গেল। শয্যায় বসিয়া আছে দীপন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছে দস্যুনেতার গতিবিধি। উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে নেতা হঠাৎ নিক্ষেপ করিল ছুরিকা।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় দীপন সরিয়া গেল বটে, কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। ছুরিকা পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খাইবার আগে বাম বাহু স্পর্শ করিল। রক্তে ভরিয়া গেল হাত। অন্যদস্যুরা ছুরিকা তুলিয়া মারিতে উদ্যত, শীতল কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।

'থামো! এই নাও গ্রন্থ!'

সকলে মুখ ফিরাইল কণ্ঠস্বরের উৎসের দিকে। বৃন্দা। তাহার হস্তে ভূর্জ্জপত্র। চমকাইয়া উঠিল দীপন। মহাগুরু দীপংকরের মাতৃভাষায় অনূদিত কামসূত্র পেটিকা হইতে চুরি করিয়াছে বৃন্দা!

অগ্রসর হইয়া দস্যুনেতার হস্তে তুলিয়া দিল গ্রন্থ। পাণ্ডার মুখমণ্ডল হাসিময় হইয়া উঠিল। স্থবির দীপন বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল বৃন্দার দিকে। এই নারী এমন কাণ্ড ঘটাইতে পারে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না সে। তাহার পেটিকায় সযত্ন লুক্কায়িত আছে গ্রন্থ, কেমন করিয়া ইহা অনুমান করিল এই নারী? জাদুকরী ভোটদেশীয় তান্ত্রিকের সাধিকা ছিল, এখনও কি ভোটদেশের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ আছে? দীর্ঘশ্বাস ফেলিল দীপন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অচেনা নারীর সহিত এইভাবে অন্তরঙ্গ হওয়া বিরাট ভুল। কিন্তু যা ঘটিবার, ঘটিয়া গিয়াছে। এখন আর অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। শিয়রে সাক্ষাৎ মৃত্যু। দস্যুরা তাহাকে ছাড়িবে না। দীপনের বিস্মিত দৃষ্টি হইতে নিজের চোখ সরাইল বৃন্দা। সর্দ্দার গ্রন্থটি হাতে লইয়া অগ্রসর হইল দীপনের দিকে।

‘আমাদের জাতীয় সম্পদ চুরি ও মিথ্যাভাষণ—দুইয়ের জন্য তোমার একমাত্র শাস্তি, মৃত্যু!’
‘নাহ্!’

বৃন্দার চিৎকারে আবার সকলে ফিরিল তার দিকে। কী বলিতে চায় এই নারী?

‘পরীক্ষা করে দেখ এই গ্রন্থ ভোটদেশের গ্রন্থ কিনা?’

বৃন্দার কথায় সকলের চোখ ঘুরিল দস্যুনেতার হাতের দিকে। নেতা গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইল। পরপর আরও কয়েকটি। অতঃপর চাহিল বৃন্দার দিকে।

‘কী বলতে চাও তুমি?’
‘এটা কি ভোটভাষা?’
‘নাহ্!’

‘কোন ভাষায় লেখা তুমি চিনতে পার কি?’
‘না, পড়তে পারছি না! অচেনা ভাষা!’
‘এটা বঙ্গদেশের ভাষা! ভোটদেশের কোনও পুঁথি নয়!’
‘তবে কি এটা?’
‘গান?’
‘গান? কী গান?’

দস্যুর হাত হইতে ভূর্জ্জপত্র পুনরায় আপন হস্তে লইয়া বৃন্দা পৃষ্ঠা উল্টাইল।

‘করুণা ছড্ডি জো সুণ্ণহিঁ লগ্‌গু
ণউ সো পাবই উত্তম মগ্‌গু।’
‘এর অর্থ কী?’

দস্যুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না করিয়া পত্র হইতে আরও পড়িল বৃন্দা।

‘অহবা করুণা কেবল ভাবই
জন্ম সহস্‌সহি মোক্‌খ ণ পাবই।’
‘দুর্বোধ্য!’
‘এগুলি বঙ্গভাষার দোঁহাগান। ভোটদেশের কিছু নয়!’
‘ওর পেটিকায় এই পত্রগুলি কেন?’
‘জানি না। বণিক কেন পেটিকায় দোঁহাগান নিয়ে ঘোরে, বণিকই বলতে পারবে। তবে সে মিথ্যা বলছে না। আমি পেটিকা অনুসন্ধান করে এই পত্রগুচ্ছ পেয়েছি। অন্য কোনও গ্রন্থ ছিল না।’
‘তুমি ওর পেটিকা অনুসন্ধান করলে কেন?’
‘নিরাপত্তার কারণে। বিদেশীদের পেটিকা আমরা পরীক্ষা করি।’

সহসা হইহই করিয়া ঢুকিয়া পড়িল একটি দল। প্রত্যেকেই অস্ত্রধারী। দীপন অবাক হইয়া দেখিল তাহাদের নেতৃত্বে শর্ব্বিলক। ছয়জনের দস্যুদল অপেক্ষা তাহার দল ভারী। নিমেষে তাহারা ধরাশায়ী করিল ভোটদস্যুদের। দ্রুত তাহাদের হাত বাঁধিয়া স্থানান্তর করিল শর্ব্বিলকের সেনাদল।

বৃন্দা দীপনের নিকট অগ্রসর হইল।

'আমি কিছুই বুঝলাম না বৃন্দা!'
'মহোদয়, আপনার গ্রন্থ নিরাপদে আছে।'
'তাহলে এটা কী?'
'ম্লেচ্ছিত বিকল্প!'

হতবাক হইয়া বৃন্দার দিকে তাকাইয়া রহিল দীপন। শর্ব্বিলক আসিয়া শয্যায় বসিল।

'শ্যেনপক্ষীর নিকট বৃন্দার বার্তা পেয়েই দলবল জুটিয়ে ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি মিত্র, নাহলে বিপদ হত!'
'আমি ততক্ষণে বকবক করে ওদের ব্যস্ত রেখেছিলাম!' হাসিয়া বলিল বৃন্দা।
'শ্যেনপক্ষী!' আরও বিস্মিত হইল দীপন।
'আমাদের পান্থনিবাসের পোষা শ্যেনপক্ষী আছে। বার্তাবাহক। তেজী।'

গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল লীলা। তাহার কাঁধে সেই শ্যেনপক্ষী। হাতে খল। তাহাতে ভেষজ।

'আয় তেজী।'

বৃন্দার ডাকে উড়িয়া আসিল তেজী। হাত বাড়াইয়া দিল বৃন্দা। তাহার কব্জির ওপর আসিয়া বসিল পক্ষী।

‘ক্ষমা করবেন মহাশয়, আমি আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম!’ লীলা অস্ফুটে কহিল।

অতঃপর অগ্রসর হইয়া খল তুলিয়া দিল বৃন্দার হাতে। বৃন্দা খল হইতে দ্রুত ভেষজ তুলিয়া লেপন করিল দীপনের ক্ষতস্থানে। লেপন প্রয়োগের আগে দীপনের কব্জি ধরিয়া গভীরভাবে নাড়ি পর্যবেক্ষণ করিল। অবাক হইল দীপন। এই নারী চিকিৎসাও জানে!

‘ঠিক আছে, তুই যা!’ বৃন্দা বিদায় দিল লীলাকে।
‘বসন্তসেনার হাতে পুঁথি তুলে দিয়ে তুমি নিজেকে নিরাপদ ঘোষণা করেছিলে মিত্র!’

শর্ব্বিলকের কথায় লজ্জিত হইল দীপন।

‘আমার কাছে মহাগুরুর নিজ হস্তে লিখিত বঙ্গভাষায় অনূদিত কামসূত্র আছে। মহাগুরুর টীকাসহ। জয়াকর আমাকে দুইটি গ্রন্থই অর্পণ করেছিল। সংস্কৃত অনুবাদ ও বঙ্গানুবাদ। নায়িকা বসন্তসেনাকে সংস্কৃত অনুবাদ দিয়েছি। পেটিকার বিশেষ প্রকোষ্ঠে রাখা ছিল বঙ্গানুবাদ। দস্যুরা ওই গ্রন্থের খোঁজ পাবে আমি ভাবিনি।’
‘দস্যুরা পেল কোথায়, খোঁজ পেলাম তো আমি!’ বৃন্দা স্মিতমুখে কহিল।

বিস্মিত দীপনের উদ্দেশে তাহার কার্যবিবরণী ব্যাখ্যা করিল বৃন্দা।

‘গতরাতে তোমার মুখে ম্লেচ্ছিত বিকল্পের কথা শুনবা মাত্র আমার সন্দেহ হয়! পুঁথি অপহরণ করে নিয়ে আসার পর সংকেতসূত্রে লিখে দিতে হবে—এমন চাহিদা শুনেই আমি নিশ্চিত হই পুঁথি তোমার নিকটেই আছে! চুরি-টুরি ওসব বানান কথা! ভোরে তুমি কক্ষ ত্যাগ করতেই আমি পেটিকা পরীক্ষা করি এবং পুঁথি পাই।’
‘তারপর?’
‘তারপর আর কী! টানা বসে ম্লেচ্ছিত বিকল্পের জ্ঞান ফলালাম।’
‘আর এই দোঁহাগান?’
‘মুখস্থ ছিল, বলে দিলাম।’

‘কিন্তু মিত্র দীপন, তুমি কেন সাংকেতিক ভাষায় লিখে রাখতে চেয়েছিলে এই গ্রন্থ?’ শর্ব্বিলক জিজ্ঞাসু।

‘ভয়ে! লামা জয়াকর আমাকে বারংবার সাবধানবাণী শুনিয়েছিল। দস্যুদের ভয়। যদি মূল পুঁথি ওদের হস্তগত হয়, তাই সাংকেতিক প্রতিলিপি প্রস্তুত করতে বদ্ধপরিকর ছিলাম আমি।’ বলিল দীপন।

‘খুব দ্রুত করেছি! সাত দিবসীয় কর্ম্ম, এক বেলায় করেছি!’

‘তুমি ওদের বললে বঙ্গদেশের ভাষায় লেখা এই পুঁথি! তুমি কি বঙ্গভাষাতেই—’

‘বঙ্গভাষাতেই ম্লেচ্ছিত বিকল্প প্রয়োগ করলাম আর্য!’ দীপনকে থামিয়ে ঈষৎ লজ্জিত বৃন্দার প্রত্যুত্তর।

‘তুমি বঙ্গভাষা জান, দোঁহাগান জান, সহজিয়া সাধনা জান, তুমি কি গৌড়কন্যা?’ বিস্ময়াবিষ্ট দীপন।

প্রত্যুত্তর না-করিয়া হা-হা হাসিতে আহ্লাদিত হইল বৃন্দা।

১৭

১৮ সেপ্টেম্বর। বৈষ্ণবঘাটা। কলকাতা।

শনিবারের সকাল। চা পান করতে করতে কবীর তাঁর ভাবনার ডালি খুলে বসেছেন। রান্না করছে টুম্পা। পরিবেশ উৎসাহব্যঞ্জক কারণ সকাল সকাল এসে পড়েছে ডিকে। আজ অফিস ছুটি। ছুটির দিনে কবীরদা তলব করলে না-এসে কী পারা যায়! আসতে-না-আসতেই কবীর খান তার হাতে তুলে দিয়েছেন কামসূত্র। সেরে নিয়েছেন উপক্রমণিকাও।

‘আরে চা-টা আগে খাও, ঠান্ডা হয়ে যাবে! পরে পোড়!’

‘শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অপ্রকাশিত উপন্যাস পাওয়া গেল কালিম্পং-এর গুম্ফায়!’ লেখাটি উল্টে-পাল্টে দেখে চমকিত হয় ডিকে।

‘এসবি ইনিশিয়াল আছে বটে আর উপন্যাসটির কাহিনিও আকর্ষণীয়—তাই বলে এসবি মানেই শরদিন্দু নাও হতে পারে! অনুমান মাত্র! সরসিজবাবুও নিশ্চিত নন!’ কবীর বলেন। ‘হাতের লেখা চেক করালেই বোঝা যাবে! প্রকাশকের কাছে কপি পাঠালেই দুধ কা দুধ, পানি কা পানি!’

লেখকের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির ফোটোকপি দেখান কবীর। ছবি তুলে নেয় ডিকে।

‘ভূগোল অত জানি না, তবে কালিম্পং সম্ভবত তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি, তাই না?’ জানতে চান কবীর।
‘লাসা থেকে ইন্ডিয়ার যে ট্র্যাডিশনাল ট্রেড রুট, একসময় সেই ক্যারাভান রোডের প্রধান টার্মিনাস ছিল কালিম্পং।’
‘তাই নাকি!’ ডিকের তথ্যে বিস্মিত হন কবীর।
‘বাষট্টির চিন-ভারত যুদ্ধের আগে যথেষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য হত এই রুটে।’
‘লামা বলেছেন খাতাটা তিনি পাঁচের দশক থেকে গুম্ফায় দেখছেন। তার মানে তখন তিব্বতের সঙ্গে কালিম্পং-এর ভালো যোগাযোগ!’
‘আপনি কি বলতে চাইছেন এটা তিব্বতি ভাষায় লেখা কোনও লেখার বঙ্গানুবাদ?’ ডিকের প্রশ্ন।
‘না। একেবারেই না। এটা একটা উপন্যাস। রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ, সব দিক দিয়েই বাংলা উপন্যাস। শরদিন্দু কি না, জানি না, তবে একজন বাঙালির লেখা বাংলা উপন্যাস! এখানে আমি কেবল কালিম্পং-এর সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগটা বুঝতে চাইছি।’ স্পষ্ট করেন কবীর।
‘যদ্দূর জানি, তিব্বতের সঙ্গে কালিম্পং-এর বহু প্রাচীন সম্পর্ক! বিপ্লবের পরপরই চিন তিব্বত দখল করার জন্য উঠে পড়ে লাগল! দলাই লামার যখন বছর পনের বয়স, অফিসিয়ালি তিনি তখন তিব্বত সরকারের প্রধান হলেন। তার দিনকয়েকের মধ্যে মাও পিএলএ ঢুকিয়ে দিলেন তিব্বতে। তখন লাসা থেকে পালিয়ে দলাই লামা তিব্বত-সিকিম বর্ডারের কাছে ছাম্বি ভ্যালির একটা মনাস্ট্রিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিব্বতের টেরিটরির

মধ্যেই ছিলেন। তখন ওঁর বেশ কিছু আত্মীয়, সহযোগী, মন্ত্রিসভার সদস্য, তাঁদের পরিবারসহ আশ্রয় নিয়েছিলেন কালিম্পং-এ।'

'এটা কোন সময়? ফিফটিজ?' জিজ্ঞাসা কবীরের।

'এটা পঞ্চাশ সালের ঘটনা। উনপঞ্চাশে চিন-বিপ্লব। সিসিপি ক্ষমতায় এল। চেয়ারম্যান হলেন মাও। তবে কিছুদিনের জন্যই দলাই লামা ছাম্বি ভ্যালির গুম্ফায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, পরে আবার উনি ফিরে গেলেন লাসায়। কিন্তু যাঁরা কালিম্পং-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই পাকাপাকি থেকে গেলেন কালিম্পং-এ। অনেক লামাও। দলাই লামার নিজের দাদাও কালিম্পং-এর বাসিন্দা। গেলো থেন্ডুপ। রিসেন্টলি উনি একটা আত্মজীবনী লিখেছেন—পড়েছি বইটা—বেশ বিতর্ক হয়েছে বইটা নিয়ে—অনেক কথা আছে 'ওখানে—' চায়ে চুমুক দেয় ডিকে।

'গেলো থেন্ডুপ! উনিও কি লামা?'

'গেলো থেন্ডুপ এক বর্ণময় ক্যারেকটার। দলাই লামারা পাঁচ ভাই, গেলো ছাড়া সকলেই লামা। সন্ন্যাসী না হয়েও গেলো দলাই লামার পাশে আছেন সর্বক্ষণ। দলাই লামার দূত হিসেবে, কখনও আনঅফিশিয়াল দূত হিসেবেও। এমনকী সিআইএ-এর সঙ্গে লিয়াজঁ করার ক্ষেত্রেও গেলো থেন্ডুপই কি-পার্সন। সে যাইহোক, ওঁর বইতে তিব্বত আর কালিম্পং-এর কানেকশনের হিস্টরিটা আছে—'

'আমি কালিম্পং যাইনি কখনও।'

'আমি গিয়েছি। এটা কোন মনাস্ট্রি?'

'নাম-ধাম তো জিজ্ঞেস করা হয়নি!' জবাব কবীরের।

'দুরপিন দারা মনাস্ট্রির খুব নাম।'

'না, বড় নয়। ছোটোখাটো কোনও মনাস্ট্রি।'

'চিন আক্রমণের পর থেকেই দুরপিন দারায় প্রচুর তিব্বতি বই, পুঁথি নিয়ে চলে আসেন লামারা। শুনেছি প্রচুর টেক্সট আছে ওখানে।'

'এটা তো আমার জানা ছিল না! উল্টোকাণ্ডও ঘটেছে তাহলে! হাজার বছর আগে এখান থেকেই বহু পুঁথি, বিশেষত বৌদ্ধ টেক্সট তিব্বত পাড়ি দিয়েছিল!'

'সে তো দিয়েছিলই! চাইনিজ অ্যাগ্রেসনের পর লামারা আবার সেগুলো নিয়ে এসেছিল ভারতে! এই টোটাল হিমালয়ান রেঞ্জ, অরুণাচলের তাওয়াং থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং,

সিকিম টু লাদাখ, যত গুম্ফা আছে, সব এক-একটি রত্নভাণ্ডার!'
'সব কি আনতে পেরেছে?'
'যা আনা যায়নি সেগুলো আদৌ আর আছে কিনা সন্দেহ!'
'বলছ কী!' উদ্বিগ্ন কবীর।
'ছেষট্টির কালচারাল রেভলিউশেনে বহু গুম্ফা জাস্ট ধ্বংস করে দিয়েছে পিএলএ। নষ্ট করে দিয়েছে প্রচুর আর্টওয়র্ক! পুঁথি। বই। তারপরেও তো আরও পঞ্চাশ-ষাট বছর কেটে গেল। আর কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ!'

প্রকৃতির তাণ্ডবে নয়, মানুষের তৈরি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চিহ্নগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষই! সৃষ্টিসুখের উল্লাসে এমন অনাসৃষ্টির সংবাদ, অসহায় স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছু তৈরি করতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন কবীর। কোনও কথা বলতে পারে না ডিকেও।

'তিব্বতে গিয়ে সামিয়ে মহাবিহারে ঢুকে প্রচুর সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন দীপংকর। অলকা চ্যাটার্জির অতীশ অ্যান্ড টিবেট-এ পড়েছি। পরে দীপংকরের গাইডেন্সে তাঁর শিষ্যরা বহু সংস্কৃত টেক্সট অনুবাদ করেন তিব্বতিতে।' স্তব্ধতা ভেঙে বললেন কবীর।
'ঐতিহাসিকরা তো এমনও বলেন, যে-সংস্কৃত বা পালি টেক্সট আর ভারতে পাওয়া যায় না, তার অনুবাদ হয়ত তিব্বতে মিলতে পারে!' ডিকের সংযোজন।
'দীপংকর তো অবাক হয়েছিলেন সেই কারণেই! ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এমন বহু দুর্মূল্য গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ সামিয়ে মহাবিহারে তিনি দেখেছিলেন।'
'দীপংকর ইলেভেন্থ সেঞ্চুরির—তার মানে তখনই ভারতে বহু টেক্সট ধ্বংস!' ডিকের বিস্মিত জিজ্ঞাসা।
'তার আগের পাঁচশ বছর ধরে এই কাণ্ড ঘটেছে! বৌদ্ধ টেক্সটগুলো দু'ভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে—একদম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে অথবা টেক্সটের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকিয়ে ডিসটর্ট করে দেওয়া হয়েছে!'

‘মূল টেক্সটে ঢুকিয়ে দেওয়া অন্য ভাষ্য বা নতুন শ্লোক, পরে গুঁজে দেওয়া এইসব প্রক্ষিপ্ত অংশ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা ধরে ফেলতে পারেন, স্রেফ ভাষার ব্যবহার দেখেই ধরে ফেলা যায়—’
‘কিন্তু ধরণী, মূল টেক্সট ধ্বংস—আবার তার অনুবাদও যদি নষ্ট হয়ে যায়—সেইসব ধ্বংস হওয়া মানে তো ইতিহাস ধ্বংস হওয়া!’
‘পলিটিক্যাল পাওয়ার তো সবসময় ইতিহাস ধ্বংস করতে চায় কবীরদা! তোমার কোনও অতীত নাই, তার মানে তুমি ফেকলু পার্টি! ফেকলুকে শাসন করা খুবই সোজা! আর এখন তো ইতিহাস মুছে ফেক-ইতিহাস তৈরি হচ্ছে! তবে যা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন লামারা, সেগুলোর এবার অনুবাদ দরকার। বাংলায়।’ হাসে ডিকে।

চায়ের কাপে বিস্কুট ডোবায় ডিকে। বিস্কুটের শরীর চায়ে নুয়ে পড়ার আগেই কসরৎ করে মুখে ঢোকায় দ্রুত। খেতে খেতেই কথা শুরু করে আবার। কথার পরে জমে ওঠে কথা।

‘কবীরদা সেদিন ফোনে যে কথা হল, উত্তরটা জানতে চাই!’ হেসে বলে ডিকে।

কবীর লম্বা একটা সশব্দ চুমুক মারেন চায়ের পেয়ালায়। ডিকের দিকে তাকিয়ে হাসেন। চায়ের পেয়ালাটা রাখেন প্লেটে।

‘ঈশ্বর আর ভগবান তোমার মাথায় এখনও ঘুরছে, তাই তো?’
‘হরিচরণে মানেগুলো দেখে আমি হতবাক! আমরা জানি এক, আর আসল মানে আরেক!’
‘ঈশ্বর নিয়ে বহুকাল ধরে বহু মানুষ নানা কথা বলে আসছে। এই ঈশ্বরে বর্ণনা মূলত শব্দের মাধ্যমে আমরা করি। শব্দের সাহায্যে বর্ণিত ঈশ্বর কেমন? তাঁর স্বভাব-চরিত্র বা কার্যাবলিই বা কেমন? তুমি হরিচরণের ঈশ্বর দেখেছ। ঈশ্বর শব্দের অর্থ এত মহিমাহীন দেখে তুমি অবাক হয়েছ। ভেবেছ, একি কাণ্ড, আমাদের পরিচিত সামাজিক সত্তাগুলির চেয়ে ঈশ্বর বেশি কিছু তো নন!’
‘হরিচরণ তো আর স্বেচ্ছাচার করেননি, উনি যা পেয়েছেন তাই সংকলন করেছেন!’ ডিকে বলে।

‘একদমই তাই! ঈশ্বর মানে যদি ‘অধীনীকরণকারী’ বা ‘সাম্রাজ্যবাদী’ বা ‘দখলদার’ বা ‘অধীনতাব্যাকুল’ বা ‘উপনিবেশ’ বা ‘অনুগত’ ইত্যাদি হয়, তো তাঁর কী করার থাকতে পারে!’ হাসেন কবীরও।

‘এর পর আবার ভগবান! একা রামে রক্ষা নেই—’

‘ওরে বাবা, ভগবান তো আরও বিপজ্জনক!’ বলেন কবীর।

‘হরিচরণ বলছেন ভগবান অর্থ পূজ্য, উত্তম, মহিমান্বিত, প্রভুশক্তিসম্পন্ন—’

‘কিন্তু ভগবান শব্দ এল কোত্থেকে?’ কবীর প্রশ্ন করেন।

‘ভগ থেকে। ভগ এসেছে ভজ্ ধাতু থেকে—ভজনীয়—ঋকবেদে আছে—’

‘গুড! ভগ-এর অর্থ কী কী আছে?’ জানতে চান কবীর।

‘সূর্য্য, চন্দ্র, সৌভাগ্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান—আরও আছে—প্রায় আঠের-উনিশ রকম অর্থ —’

‘ইম্পর্ট্যান্ট অর্থটাই তো বললে না!’

‘কোনটা? সব মনে নেই।’ জিজ্ঞাসু ডিকে।

‘ভগ মানে যোনি!’

‘হুঁ, ক্লিটোরিসকে বাংলায় বলে ভগাঙ্কুর।’

‘যার বল আছে তাকে আমরা কী বলি? বলবান। সেই নিরিখে আমরা বলতেই পারি, যার ভগ আছে সে ভগবান। তাহলে সব স্ত্রীলিঙ্গধারী জীবেরই ভগবান পদবাচ্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা কি হয়েছে?’

‘বরং উল্টোটা হয়েছে। ভগবান শব্দটাই পুংলিঙ্গ শব্দ। এর স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী।’ ডিকে বলে।

‘ভগ মানে যদি যোনিই হয়, তাহলে ভগবান কী করে পুংলিঙ্গ হয়? আর সবচেয়ে চিন্তার বিষয় ঈশ্বরের মতো এত মহৎ এবং পবিত্র চরিত্রের নামকরণে প্রাচীন ভারতবাসী ভগ-এর মতো এমন তথাকথিত ইতর শব্দ জুড়তে গেল কেন?’

হাসতে হাসতে বলেন কবীর। তাঁর সব কথার সুত্র এখনও ধরতে পারছে না ডিকে, কিন্তু শুনতে উদগ্রীব।

‘প্রাচীন ভারতে উৎপাদনের উপায়কে বলা হত ভগ। মিনস অফ প্রোডাকশন। উৎপাদনের উপায় বা মিনস অফ প্রোডাকশন কথাটির যে বিশাল গুরুত্ব আছে, এর জন্য ইকোনমিক্স পড়ার খুব দরকার নেই। শ্রমিককে যে কারণে পুঁজিপতির দুয়ারে যেতে হয়, তার কারণ পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক। কেবল শ্রমজীবীই নয়, মেধাজীবী জনসাধারণও এদের কাছে যায় তাদের মেধা বিক্রি করতে। অর্থাৎ এরাই এখন ভগ-এর মালিক। এরাই এ যুগের ভগবান।’

‘এদের কাছে গিয়ে এদের ভগ-তে নিজেদের শ্রম ও মেধা নিষেক করে!’ ডিকের সংযোজন।

‘যথার্থ বলেছ!’ বাহবা কবীরের।

‘নারীর ভগ-তে বীর্য বা শুক্র নিষেক করলে তখন তা যোনি, তাই তো!’

‘চমৎকার ধরণী! একদম ঠিক বলেছ!’

‘ভগ তখন ভ্যাজাইনা—vagina—এর মধ্যেও দিব্য লুকিয়ে আছে ভগ!’ ডিকে জানায়।

‘গুড!’ কবীরের চোখেমুখে ডিকের জন্য উচ্ছ্বাস। বলেন, ‘কিন্তু ভগ যদি কেবল নারীর ভ্যাজাইনা বা যোনি হত, তাহলে পুংলিঙ্গধারী ভগবান শব্দটি সৃষ্টি করতে হত না, একটিই শব্দ থাকত—ভগবতী!’

‘এখান থেকে কামসূত্রে আসছেন কীভাবে?’

ডিকের প্রশ্নে হাসেন কবীর। তারপর ভাবনার সঞ্চারপথ মেলে ধরেন।

‘আদিম মাতৃতান্ত্রিক যৌথ সমাজে মিন্স্ অফ প্রোডাকশন বা ভগ-এর মালিক ছিল মেয়েরা —তাই তারা ভগিনী—এই ভগিনীরাই আদি ভগবান পদবাচ্য। তখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, সমাজের সমস্ত ধনসম্পদ আর উৎপাদনের উপায়গুলোর মালকিন তারাই। তখন প্রতিটি গোষ্ঠিতে থাকত ভাই ও বোনেরা। ভগ-এর অধিকারিনী হওয়ায় বোনেদের নাম হয়ে গেল ভগিনী। পরে ভগিনীদের এই যৌথসমাজে ভাঙন ধরে। আগমন হয় মৎস্যের। আমি-আমি বোধ অর্থাৎ অহংকার। মহাপ্লাবন। মৎস্যাবতারের গল্প জান তো?’

ডিকের উত্তর উপেক্ষা করেই কবীর বলে চলেন বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্যের কথা। তন্ময় ডিকে।

কামসূত্র ব্যাগে ভরে যখন কবীরের বাড়ি থেকে বেরোল, বেলা পড়ে এসেছে। কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে যাওয়ায়, স্নান-খাওয়া সারতে হয়েছে কবীরের বাসায়। একটা অটো রিক্সা ধরে ডিকে। সেই তিনচাকার বাহন এগিয়ে যায় শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের দিকে।

১৮

প্রস্থানপর্ব। উজ্জয়িনী।

প্রস্থানের পূর্বে, প্রস্তুতির সময় কক্ষে আসিল বৃন্দা। দীপনের হাতে তুলিয়া দিল একটি বস্তু। অবাক দীপন হাতে তুলিয়া দেখিল বস্তুটি। স্বয়ং শাক্যমুনির একটি মূর্তি।

‘এই মূর্তি তুমি পেলে কোথায়?’
‘অনুমান কর?’
‘তোমার সেই ভোটদেশীয় সাধক—’
‘উনিই আমাকে এই মূর্তি দিয়ে বলেছিলেন, সাধনসঙ্গিনীরূপে তোমার ভূমিকায় আমি প্রীত —এই মূর্তি ব্যতীত আমার কাছে কিছুই নাই—এই মূর্তি তুমি গ্রহণ কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই মূর্তি নিয়ে আমি কী করব গুরুদেব?’
‘কী বললেন তিনি?’
‘রেখে দেবে।’
‘ভোটদেশীয় মূর্তি! ভোটদস্যুরা পুনরায় আমার পিছু নেয় যদি!’ সংশয় দীপনের।

বৃন্দার প্রত্যুত্তর না পাইয়া স্মিতহাস্য দীপনের মুখমণ্ডল জুড়িয়া। হাত পাতিয়া সে গ্রহণ করিল উপহার।

'সাধনকর্তার উপহার আমাকে দিলে কেন?'
'ও রেখে আমি কী করব! বহুদিন রেখেছি নিজের কাছে, এবার তোমার কাছে থাক। তুমিই এর মর্ম বুঝবে।' হাসিয়া কহিল বৃন্দা।

মূর্তিটি পেটিকায় নয়, রাখিল কটিবন্ধে। বঙ্গদেশের শিল্পীদের হাতে নির্মিত পাথর বা ধাতুর বহু বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছে সে, এমন মূর্তি কখনও দেখে নাই।

প্রস্থানের পূর্বমুহূর্তে ডাকিল বৃন্দা।

'বণিক, মূর্তি নিজের কাছে রেখ না, কোনও সঙ্ঘারামে দিয়ে দিও।'

স্মিতমুখ দীপন রওনা দিল। সূর্যোদয় হইতে তখনও বেশ দেরী। নূতন পেটিকায় যত্ন করিয়া সকল দ্রব্য পূর্বেই ভরিয়া দিয়াছে বৃন্দা। মহাগুরু দীপংকরের টীকাসম্বলিত, নিজ হস্তাক্ষরে বঙ্গভাষায় অনূদিত কামসূত্র এবং বৃন্দার সাংকেতিক অনুবাদ। প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র। সকল দ্রব্য পেটিকায় উত্তমরূপে বাঁধিয়া পাড়ি দিল স্বদেশ।

আজ আর পরনে সাধের সূক্ষ্ম রেশমবস্ত্র নাই। গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের দুকূল তাহার সংগ্রহে। পুণ্ড্রদেশ, হরিকেল ও বরেন্দ্র'র রেশমবস্ত্র অতি উত্তম। পেলব শ্বেত দুকূলই অধিকতর প্রিয়। পুণ্ড্রদেশের হরিদ্রাভ দুকূলও তাহার সংগ্রহে আছে। কিন্তু আজ আর ইচ্ছা করিল না সেইসব পরিধান করিতে। পেটিকায় ভরিয়া রাখিল সকল উত্তম বস্ত্র। রেশমের পরিবর্তে আজ পরিধান করিল একটি ভুনীধুতি। তাহার নিজগ্রামের তন্তুবায়গণ যেমন বুনিয়া দিয়াছে। কী আশ্চর্য, শয্যার উপর যত্ন করিয়া এই ধুতিটিই রাখিয়া গিয়াছিল বৃন্দা। সে জানে, মধ্য-ভারতের এই অগ্নিপ্রভায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পোশাক সুখদায়ক

হওয়া প্রয়োজন। এই ভুনীধুতি ঈষৎ পুরু কিন্তু প্রবল গ্রীষ্মে এই পোশাকেই অধিকতর স্বচ্ছন্দ দীপন।

পান্থনিবাস পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইল রৌদ্র। কী মনে করিয়া একবার পিছনে ফিরিতেই দেখিল দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে বৃন্দা। না, আর পিছুটান নয়। নিজেকে সংযত করিয়া সম্মুখে চাহিল। বহুদূরের পথ। পূর্বদিকে সোজা বিদিশা, কৌশাম্বী, রাজগৃহ, পাটলিপুত্র, মুদ্গগিরি হইয়া চম্পা। বাণিজ্যের এই পরিচিত পথেই ভ্রমণ করা শ্রেয়। বণিকদল এই পথেই দূর-দূরান্তে বাণিজ্য করিতে যায়, ফলত নিরাপত্তার অভাব নাই।

উজ্জয়িনী নগরীর পশ্চিমদ্বার অতিক্রম করিতেই দৃষ্টিগোচর হইল তিন সঙ্গীসহ শর্ব্বিলক অপেক্ষমান। তাহারা প্রত্যুদ্গমন করিবে। নিরাপদে দীপনকে বিপদসীমা পার করিয়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। চারজন অশ্বারোহী দেহরক্ষীর ন্যায় দীপনের সংলগ্ন হইল।

'নগরীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয় শর্ব্বিলক, তোমরা চলে যাও! রৌদ্র আমায় দ্রুত নিয়ে যাবে।'
'ভয় নেই মিত্র, আমরা খুব বেশিদূর যেতেও পারব না—অন্তত দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকি—'
'দ্বিপ্রহর! সে তো অনেক যোজন পথ! না, মিত্র শর্ব্বিলক, তোমার নিরাপত্তা আগে—'
'কোন পথ ধরবে তুমি মিত্র? সাকেত-শ্রাবস্তী মহাপথ ধরার চেষ্টা কোর না! ওই ছয় যোজন পথ মোটেই নিরাপদ নয়। দস্যুর ভয় আছে।' শর্ব্বিলক পরামর্শ দিল।
'কৌশাম্বী-রাজগৃহের পথে যাব।'
'উত্তম! তোমার গন্তব্য সপ্তগ্রাম?'
'চম্পা!'
'চম্পা কেন!'
'বিক্রমশীল মহাবিহার।'
'ওহ্ আচ্ছা, আগে নিজগৃহে যাবে না!'
'আগে কর্তব্য সমাপ্ত করব, তারপর নিজগৃহ। দীর্ঘ পথ, চলো এগোই।'

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া তাহারা যাত্রা করিতে উদ্যত, মুহূর্তের মধ্যে অন্তত বিশজন, পদাতিক ও অশ্বারোহী, একযোগে ঘিরিয়া ফেলিল তাহাদের। নেতৃত্বে প্রধান নগররক্ষী। পাঁচজনের তুলনায় রাজা পালকের সৈন্যরা সংখ্যায় কিঞ্চিৎ বেশিই! তবু কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া শর্ব্বিলক ও তাহার সঙ্গীরা রুখিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অসম যুদ্ধে প্রতিরোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, এখানেও হইল না। আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল শর্ব্বিলক ও তাহার দুই সহচর। একজন অতীব দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল অন্তত পাঁচজন রক্ষী, কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিল ব্যর্থ হইয়া। দ্রুত অন্তর্হিত হইয়াছে শর্ব্বিলকের সাথী।

রজ্জুতে তিনজনকে বাঁধিয়া ফেলিল নগররক্ষীবৃন্দ। অতঃপর তাহারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান দীপনের দিকে। এতক্ষণ তাহারা দীপনের দিকে চাহিয়াও দেখে নাই। তাহাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শর্ব্বিলককে আটক করা, উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইতেই তাহারা মন দিল দ্বিতীয় কাজে। মিত্র শর্ব্বিলককে রক্ষা করিতে অস্ত্র ধরিবে, না কি কর্তব্যে অবিচল থাকিয়া পুঁথি লইয়া দ্রুতবেগে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে পলায়ন করিবে, বিভ্রান্ত ছিল দীপন। তাহার বিমূঢ়তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। অচিরেই শেষ হইল নগররক্ষীদের প্রাথমিক দায়িত্ব।

একজন রক্ষী আসিয়া রৌদ্রের পিঠ হইতে পেটিকাটি নামাইয়া আনিল। রাখিল প্রধান নগররক্ষীর পায়ের নিকট। তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিয়া নির্দেশ দিলেন,

‘খোলো পেটিকা! কী আছে দেখব!’

অপর এক রক্ষী পেটিকা খুলিতে দ্রুত অগ্রসর হইল। প্রধান নগররক্ষী কহিল,

‘না, ও খুলবে!’

চোখ দীপনের দিকে। দীপন ধীরে অগ্রসর হইয়া খুলিল পেটিকা। প্রধান নগররক্ষী অসির অগ্রভাগ দিয়া পরীক্ষা করিল যাবতীয় দ্রব্য। বস্ত্র। তণ্ডুলসহ কিছু দানাশস্য। অন্যান্য খাদ্যবস্তু। মৃৎপাত্র। বস্ত্রাবৃত দুই পুঁথির দিকে অসি নির্দেশ করিয়া খুলিতে ইঙ্গিত করিল প্রধানরক্ষী। দীপন কাপড় সরাইয়া উন্মুক্ত করিল পুঁথি।

প্রধান নগররক্ষী অন্য এক রক্ষীর দিকে তাকাইল। ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি।

সেই রক্ষী দুই পুঁথিতে অগ্নিসংযোগ করিল মুহূর্তে। চিৎকার করিয়া দীপন বাধা দান করিতে গেলে তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিল অপর এক রক্ষী। ভূপতিত হইল দীপন। মহাগুরু দীপংকরের টীকাসম্বলিত, নিজ হস্তাক্ষরে বঙ্গভাষায় অনূদিত কামসূত্র ভস্মীভূত হইতেছে অগ্নিবলাকায়! এই দৃশ্য দেখিয়া দীপনের শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কী লইয়া যাইবে সে আচার্যের নিকট! কর্তব্য সম্পাদনে সে অকৃতকার্য! কম্পমান দীপনের গাল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল অঝোর অশ্রু। ম্লেচ্ছিকা বিকল্প পটিয়সী বৃন্দার সাংকেতিক অনুবাদও নিমেষে ছাই। বাৎস্যায়নের আদি কামশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে বহুদিন আগেই বিলুপ্ত। ভোটদেশীয় অনুবাদ হইতে দীপংকরের অনুবাদে সেই শাস্ত্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াও শেষরক্ষা করিতে পারিল না। যদিও সংস্কৃত অনুবাদ রহিল বসন্তসেনার নিকট, কিন্তু সেই গ্রন্থও কি রক্ষা পাইবে! বসন্তসেনাও রাষ্ট্রদ্রোহী! তিনি ধৃত হইলে রক্ষীরা কি পুঁথি অবিকৃত রাখিবে! দীর্ঘ এক শ্বাস নির্গত করিল দীপন।

'দীপন উজ্জয়িনীর অতিথি, ওর সঙ্গে এমন ব্যবহারের কারণ কী! আমাকে আটক করছ কর, ওকে ছেড়ে দাও!' ধৃত শর্ব্বিলক চিৎকার করিল।
'ওকে ছেড়ে দেব, ভয় নেই!' শান্তস্বরে কহিল প্রধান নগররক্ষী।
'গ্রন্থ নষ্ট করছ কেন?' শর্ব্বিলক পুনর্ব্বার চিৎকার করিল।
'নির্দেশ আছে!' পুনরায় প্রধান নগররক্ষীর অবিচলিত প্রত্যুত্তর।

পুঁথি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইবার পর প্রধান নগররক্ষী দীপনের উদ্দেশে কহিল,

‘এখান থেকে চলে যাও! এই নগরীতে দ্বিতীয়বার তোমায় যেন দেখা না যায়!’

অন্যান্য দ্রব্য পেটিকায় ভরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল দীপন। পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইল শর্ব্বিলকের দিকে। চিৎকার করিল শর্ব্বিলক,

‘আমার জন্য দুশ্চিন্তা কোর না মিত্র, যে আগুন ওরা জ্বালিয়েছে সেই আগুন নেভানোর ক্ষমতা ওদের নেই! আমরা নেভাব সেই আগুন!’

ডানপায়ের গোড়ালির সামান্য স্পর্শে ধাবমান হইল রৌদ্র।

রৌদ্র কতক্ষণ ছুটিল কে জানে, মাথার ওপর উজ্জ্বল সূর্য তীব্র অগ্নিবর্ষণ শুরু করিতেই রৌদ্রকে থামিতে ইঙ্গিত করিল দীপন। গাছগাছালি পরিবেষ্টিত এক জলাশয়ের নিকট থামিল রৌদ্র। জলাশয় হইতে মৃদ্ভাণ্ডে জল আনিয়া পান করাইল প্রিয় অশ্বকে। পুষ্করিণী সংলগ্ন শষ্পক্ষেত্রে মুখ ডুবাইয়া আহ্লাদে ভোজন শুরু করিল রৌদ্র। চোখে-মুখে জল বর্ষণ করিয়া দীপন বসিল এক বৃক্ষের ছায়ায়। পেটিকা খুলিয়া খাদ্যদ্রব্য বাহির করিতে গিয়া দৃষ্টি পড়িল একটি মৃৎপাত্রে। আমমন্থ। বিস্মিত হইল দীপন। ক্কাথের সহিত বাকি উপকরণ মিশাইয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, কেবল শীতল জল ঢালিবার অপেক্ষা। বহু যত্নে নীরবে পেটিকায় রাখিয়া দিয়াছে সেই মিশ্রণ। আশ্চর্য নারী!

সেই মিশ্রণের সহিত জল মিশাইয়া প্রস্তুত করিল আমমন্থ। পান করিল পরম তৃপ্তির সহিত। সব তাপ যেন নিমেষে ত্যাগ করিল শরীর। জলাশয়ের ধারে বৃক্ষ-ছায়াতলে শুইতে ইচ্ছা করিল।

তরুতলে টানটান করিল শরীর। স্মৃতিপটে সেই নারী আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে স্পর্শ করিল। হাসিল সে। সে হাসিতে বিষণ্ণতা। মাথার অন্দরে প্রগাঢ় শূন্যতা সত্ত্বেও অচেনা এক নারীর জন্য সিক্ত হইল দীপনের হৃদয়।

ডান হাতে স্পর্শ করিল কটিবন্ধ। মূর্তি আছে যথাস্থানেই। নির্মল আবহাওয়ায় ধীরে মুদিত হইল চোখজোড়া।

অতঃপর নিবিড় ছায়ায় নিদ্রাচ্ছন্ন হইল দীপন।

১৯

একাদশ শতক। চম্পা। বিক্রমশীল মহাবিহার।

মহাস্থবির প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দীপনকে নিরীক্ষণ করিলেন। সেই দৃষ্টির সামনে সম্ভ্রমে অধোবদন হইল সে। এমন গভীর দৃষ্টিপাত কেন, বুঝিতে পারিল না। পূর্বে ওঁর সঙ্গে বহুবার কাজের সূত্রে সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু এমত অভিজ্ঞতা এই প্রথম। যেন প্রধান আচার্য তাহার সদর-অন্দর সব পড়িয়া ফেলিতে চান। এই মহাবিহারের সামান্য খাদ্য সরবরাহকারী সে। কেন স্বয়ং প্রধান আচার্য তাহার মতো এক অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহাও অজানা।

এই মহাবিহারের ছাত্র হইবার বাসনা লইয়া একদিন সুদূর ধর্ম্মপুর হইতে এই চম্পায় আসিয়া ছিল সে। তখন সদ্য বিহার ত্যাগ করিয়া ভোটদেশে চলিয়া গিয়াছেন মহাপণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান। গৌড় সিংহাসনে তখন পরম সৌগত পরম ভট্টারক মহীপাল দেবের পুত্র নয়পাল দেব।

দীপনের পিতা সনাতনপালের ইচ্ছা ছিল পুত্র নালন্দায় শিক্ষা লাভ করিবে, কিন্তু নালন্দা বহু দূরের গ্রহ বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিকট মহাবিহার বিক্রমশীলে পুত্রকে লইয়া উপস্থিত হইলেন সনাতনপাল। দীপন এখনও মনে করিতে পারে সেই দিনগুলির কথা। সপ্তগ্রামের নিকট ধর্ম্মপুর হইতে আসিল কর্ণসুবর্ণ। অতঃপর কানসোনার ভিতর দিয়া কজঙ্গল।

কাঁকজোল হইয়া অতঃপর চম্পা। নদীপথেও আসিতে পারিত কিন্তু স্থলপথে সময় সাশ্রয় হয়।

গঙ্গার তীরে এক পর্ব্বতের উপরে প্রাচীর বেষ্টিত বিশালাকার মহাবিহার। অপূর্ব সৌন্দর্য ও নির্জনতা দেখিয়া চমৎকৃত হইল সনাতনপাল। শিক্ষালাভের আদর্শ পরিবেশ বটে! সঙ্ঘারামের জন্য যথার্থ স্থান নির্বাচন করিয়াছিলেন পরমসৌগত ধর্ম্মপাল দেব।

তাঁহার সক্রিয় অনুপ্রেরণায় গৌড় ও মগধে বহু শিক্ষায়তন স্থাপিত হইয়াছে। সেই শিক্ষায়তনে পাঠ সমাপনের পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের নালন্দা যাইতে হইত। কিন্তু নালন্দার দূরত্ব কেবল অধিকতর নয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগলাভ স্থানীয় ছাত্রদের পক্ষে তুলনামূলকভাবে কঠিন। দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীগণের ভিড় নালন্দায়। ধর্ম্মপাল গৌড় ও মগধের স্থানীয় ছাত্রদের সুবিধার্থে চম্পায় গঙ্গার বাম তীরে এক পাহাড়ের উপরে স্থাপন করিলেন বিক্রমশীল মহাবিহার। শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে সত্রে থাকিত। তাহাদের আহার ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যয়ও বহন করিত বিহার। বরং বিদ্যার্থীদের উপার্জ্জন করিবার সুযোগ ছিল। অবসরকালে তাহারা বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি করিত। বিহার হইতেই মিলিত পারিশ্রমিক।

বিহারের ছয়টি দ্বার ছয়টি বিদ্যাভবনের দিকে উন্মুক্ত। কিছুদিন পূর্বেও এই মহাবিহারের প্রধান আচার্য ছিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান। আচার্য নারোপা তাঁহাকে প্রধান আচার্যের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এক-একজন দ্বারপণ্ডিত এক-একটি বিদ্যাভবনের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁহাদের সাহায্য করেন আরও একশত আটজন আচার্য।

মহাবিহারের প্রয়োজনীয় সকল ব্যয়ভার আপন স্কন্ধে লইয়াছেন পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল। তাঁহার সামন্তবর্গও অর্থ সহায়তা করিতেন যথাসাধ্য। সেই ধারা চলিতেছে। রাজাধিরাজ মহীপাল দেবের পুত্র মহারাজ নয়পাল দেবও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন মহাবিহারের সকল প্রয়োজনে। প্রধান আচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান সম্প্রতি মহাবিহার ছাড়িয়া গমন করিয়াছেন ভোটদেশ। শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে বিহারে। যদিও,

ভোটদেশে যাইবার পরেও, প্রতিমুহূর্তে তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া ছিল বিক্রমশীল মহাবিহার। মহাবিহারের সুবিধা-অসুবিধা, ভালো-মন্দ, একমুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নাই দীপংকর। ভোটদেশে দক্ষিণা-স্বরূপ প্রাপ্ত স্বর্ণ প্রতিবৎসর নিয়ম করিয়া বিহারে পাঠাইতেন। তাঁহার শারীরিক বিহনে বিহার শূন্য হইলেও, মহাবিহার জুড়িয়া তাঁহার অদৃশ্য উপস্থিতি।

মহাবিহার দেখিয়া মোহিত হইল তরুণ দীপন। বিহারের প্রধান প্রবেশ দ্বারে নাগার্জ্জুনের মূর্তি খোদিত। এই মহাবিহারের পাঠক্রমে আছে ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়াও জ্যোতির্ব্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদসহ বিজ্ঞানের নানা বিষয়। বিহারের কেন্দ্রস্থলে মহাবোধির এক পূর্নাবয়ব মূর্তি ও একটি মন্দির। পাশে বিজ্ঞানভবন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে গুহ্যতন্ত্র অধ্যয়নের জন্য অষ্টোত্তর শত মন্দির। এতই বিশালাকার এই সঙ্ঘারাম, একসঙ্গে নাকি আট সহস্র বিদ্যার্থী মিলিত হইতে পারে বিহারের মুক্ত অঙ্গনে।

প্রাচীরের বাহিরে অভিভাবক ও অতিথিদের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। পুত্রকে লইয়া সনাতনপাল উঠিলেন ধর্ম্মশালায়। প্রাচীরের পিছনে পাহাড়ের উপর হইতে নীচে দেখা যায় গঙ্গা। বালক দীপন বসিল একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর। দিনাবসানের আলো আকাশের গায়ে রঙের প্রলেপ লাগাইতে ব্যস্ত। একটি পাথরের টুকরা তুলিয়া ছুঁড়িল দীপন। সেই পাথর নীচে নদীগর্ভে বিলীন হইল।

কিন্তু দীপন তাহার পিতার স্বপ্ন সাকার করিতে ব্যর্থ হয়। মহাবিহারের ছয়জন দ্বার পণ্ডিতকে তর্কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তবেই মিলিত বিহারে শিক্ষার্থী হইবার ছাড়পত্র। দীপন সেই পণ্ডিতদের সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ভগ্ন মনোরথে সনাতন ধর্ম্মপুর ফিরিয়া যান।

সনাতনপালের প্রপিতামহ ছিলেন তাম্রলিপ্তির এক সার্থবাহ। ইহাদের নেতৃত্বে বণিকদল দুই চক্রযুক্ত, দুই বলীবর্দ্দবাহিত শকটে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। এক-একটি সার্থবাহে কখনও কখনও পাঁচশত শকটও থাকিত। এমনকি রাত্রিকালেও নাকি তাহারা থামিত না। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান দেখিয়া

তাহারা সময় নির্ণয় করিত। নৌকাও থাকিত বৃহৎ সার্থবাহে। পথে নদী পড়িলে পারাপারের জন্য ব্যবহৃত হইত সেই নৌকা। পথে দস্যুর ভয় ছিল, তাই তাহারা নিজেরা সকলে দলবদ্ধ থাকিত কেবল নয়, অস্ত্রশস্ত্রেও সুসজ্জিত থাকিত।

তাম্রলিপ্তি থেকে রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী ও গঙ্গা হইয়া নদীপথে নৌকা যাইত পাটলিপুত্র। পথে পড়িত বিক্রমশীল এবং নালন্দা মহাবিহার। তাম্রলিপ্তি হইতে নালন্দার দূরত্ব ষাট যোজন। পিতামহের নিকট সেই বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা শুনিয়া সনাতনপাল উত্তেজিত হইত। বণিকেরা স্থলপথেও যাইতেন। দূরত্ব এই পথে অপেক্ষাকৃত কম। কজঙ্গল ও চম্পা হইয়া স্থলপথে পণ্যবোঝাই গরুর গাড়ি পৌঁছাইত পাটলিপুত্র।

সনাতনপালের পূর্বপুরুষ এইপ্রকার এক বণিকদলের অগ্রনায়ক ছিলেন। কিন্তু বাণিজ্যের সুদিন গত। বিশালাকার সার্থবাহের বাস্তবতা বহুদিন হইল আর নাই। তাম্রলিপ্তি বন্দর পরিত্যক্ত। আরাকানের নিকট রম্মদেশে নতুন সমুদ্র বন্দর হইয়াছে। তাম্রলিপ্তির আর কোনও গুরুত্ব নাই। সাগরও রাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্বে দণ্ডভুক্তি অঞ্চলে সরিয়া গিয়াছে। তাম্রলিপ্তি হইতে অর্ণবপোত ভাসাইয়া দূর দেশে পাড়ি দেওয়াও বঙ্গদেশের বণিক ও নাবিকদের নিকট এখন স্বপ্নবৎ। নদীগুলিও গতি ও পথ হারাইয়া শীর্ণ। সমতটের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের বাণিজ্যধারাও শুকাইয়া গিয়াছে নদীগুলির মতোই।

তাম্রলিপ্তি হইতে বাণিজ্য পথ গিয়াছে কামরূপ, আরাকান হইয়া আরও দক্ষিণে অন্যান্য দেশেও। তাম্রলিপ্তি সমুদ্রবন্দর থেকে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত সিংহল, পারস্যসহ আরব দেশগুলিতে। শ্যামদেশ, কম্বোজ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সুবর্ণদ্বীপের সহিত তাম্রলিপ্তি বন্দরের মাধ্যমে বঙ্গদেশ তথা জম্মুদ্বীপের দৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমে ক্ষীণ হইল।

দক্ষিণ-পশ্চিম সমতটের বণিকরা দুরাবস্থার মুখে পড়িয়া, এমনকি বৃত্তি পরিবর্তন করিতেও বাধ্য হইলেন। অধিকাংশই ভূমি ক্রয় করিয়া কৃষিকাজে অতিরিক্ত নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। বাণিজ্যের অভাবে নদীতীরবর্তী নগরগুলির উজ্জ্বল অস্তিত্ব আর রহিল না।

নাগরিক জীবনযাত্রার এক প্রকার অবসান হইল। দীপনের পূর্বপুরুষও ভূমি ক্রয় করিয়া কৃষিকাজে মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু রক্তে বাণিজ্যধারা প্রবাহিত হইলে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করিবে কে? দীপনের পিতা সনাতনপাল তাম্রলিপ্তি অঞ্চল ত্যাগ করিয়ে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল সপ্তগ্রামের নিকট আসিয়া গৃহ বাঁধিল বাণিজ্যের আশায়। দীপন তখন শিশু। সরস্বতীর তীরে নদীবন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের নামডাক শুরু হইয়াছে। ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী হইতে নির্গত সরস্বতী নদীই ছিল ভাগীরথীর প্রধান স্রোত। এই পথেই বঙ্গীয় বাণিজ্যতরী ভাসিতেছে দূর-দূরান্তের লক্ষ্যে। সপ্তগ্রামের নিকট ধর্ম্মপুরে বাসা বাঁধিয়া নূতন করিয়া স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিল সনাতনপাল।

কয়েক পুরুষের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র স্থিত হওয়া খুব সহজ কাজ নয়। বাণিজ্য হইতে দীর্ঘদিন দূরে থাকিবার দরুণ বাণিজ্যিক রীতিনীতিও প্রায় বিস্মরণে। ফলত অধরা রহিল সফলতা। কিন্তু সাধ ও স্বপ্নের কী হইবে? সনাতনপালের ইচ্ছা পুত্র তাঁহার নালন্দায় অধ্যয়ন করুক, নিদেনপক্ষে বিক্রমশীল।

বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমাগত পড়িতেছে। বাঙ্গালি বণিকের পক্ষে আগামীদিন সুখকর হইবে কী না, নিশ্চয়তা নাই। কিছু ভূমি ও পারিবারিক বাণিজ্যবৃত্তি রহিল, দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের হয়ত অভাব হইবে না, কিন্তু অভাব হইবে অন্য বস্তুর, সম্মান ও স্বীকৃতির। ইহার সহিত শিক্ষার সংযুক্তি প্রয়োজন। তাহা হইলে রাজকর্মচারী হইবার পথও খোলা থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি থাকিলে প্রায়-লুপ্ত সামাজিক সম্মানও পুনুরুদ্ধার হইবে।

দীপনের ব্যর্থতা তাহার পিতা সনাতনপাল মানিতে পারে নাই। কেবল পুত্রের অপারগতা নয়, কিছু সামাজিক কারণও তাঁহার মাথায় বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি শেষদিন অবধি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের বণিকবৃত্তি পূর্বের ন্যায় সক্রিয় থাকিলে তাঁহার পুত্র অবশ্যই মহাবিহারে অধ্যয়নের সুযোগ পাইত। বাণিজ্যই যাহাদের জীবিকা—বণিক, সার্থবাহ, কারুশিল্পীগণের সামাজিক সম্মান আর পূর্বের মতো নাই। তাহা থাকিলে দীপন অবশ্যই

মহাবিহারে অধ্যয়ন করিত। দীপন অবগত তাহার পিতা এই দৃঢ় ধারণা লইয়াই চোখ বুজিয়াছেন।

সে অবশ্য এইরূপ ধারণায় বিশ্বাসী হইতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু দিনকাল দ্রুত পরিবর্তনশীল, তাহা বুঝিতে পারে বিলক্ষণ। মহারাজ নয়পাল দেব ছিলেন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অনুগত। পিতার মতো তিনিও বুদ্ধানুরাগী কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সমৃদ্ধি ক্রমশ অদৃশ্য। বৌদ্ধমন্দিরগুলি ক্রমশ ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত হইতেছে। ভগবান বুদ্ধের মূর্তিকে লোকে এখন রুদ্র ভৈরবমূর্তি বলিয়া পূজা করে। সম্প্রতি মহারাজ নয়পাল দেবের প্রয়াণের পর সিংহাসনে তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব। পতন রোধ করিবার ক্ষমতা কি তাঁহার আছে? উত্তর মিলিবে ভবিষ্যতে।

'এখানে অধ্যয়নের সুযোগ তোমার হয়নি কিন্তু বিহারের সংস্পর্শে থাকবার সুযোগ তুমি পেয়েছে। বিহারের কয়েক সহস্র আবাসিকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের দায়িত্ব লাভ করেছ তুমি। স্বয়ং মহারাজ নয়পাল দেব তোমার এই আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। তুমি জান দৃঢ় চরিত্রগৌরব ও নৈতিক শৃঙ্খলার কেন্দ্র এই বিহার।' সামান্য বিরতি লইয়া প্রধান আচার্য পুনরায় কহিলেন, 'তোমাকে আজ এত কথা কেন বলছি তুমি জান?'
'আচার্য আমায় ক্ষমা করবেন, আমি কি কোনও অপরাধ করেছি?' জোড়হাতে বলিল দীপন।

বিহারের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসফল হইয়াই দীপন সিদ্ধান্ত লইয়াছিল, সে তাহার পূর্বপুরুষের বৃত্তিতে ফিরিবে কেবল নয়, সাফল্যও করায়ত্ত করিবে। দূরদেশে বাণিজ্যে পুনরায় বাহির হইবে তাহার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায়। মহাবিহারে দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব পাইবার পূর্ব্বে সে দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য করিত। কী বাণিজ্য সে করিত না! সোনা, রূপা, তামা, গন্ধক, কাঁসা, পিত্তল, পারা, সামুদ্রিক প্রবাল, মুক্তা, মাছরাঙার পালক, কচ্ছপের খোল, সুগন্ধী আগর গাছের ডাল ও ছাল, হাতির দাঁত, সিন্দুর, যবক্ষার, মসুর, গোধূম, সর্ষপ, কুলত্থ, কাচপাত্র, জীরক, হরিদ্রা, গুড়, খৈ—লাভজনক সকল দ্রব্য সে বাণিজ্য করিত।

বিহারে দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব পাইবার পর দূর-দূরান্তরে আর প্রতিবৎসর যাইতে পারিত না, কিন্তু চেষ্টা করিত দুই বৎসরে একবার বাহির হইতে। সরবরাহকারী রূপে ক্রমে সে বিহারের একজন হইয়া উঠিল। আচার্যগণ, প্রধান আচার্য, অধ্যক্ষসহ সকলের সহিত নিয়মিত সাক্ষাৎ হয়, ছাত্রদের সঙ্গে তো অধিকতর হয়। অন্যান্য প্রবন্ধক ও রন্ধনশালার কর্ম্মচারিবর্গের সহিত আরও বেশি হয়। এমন কোনও গর্হিত কাজ কি সে করিয়াছে যাহার নিমিত্ত স্বয়ং প্রধান আচার্য তাহাকে আজ্ঞা করিতে পারেন! দীপন মনে করিতে চেষ্টা করিল।

'তোমাকে নেপাল ও ভোটদেশের সীমান্তে যেতে হবে বৎস।' আচার্য কহিলেন।

অবাক দীপন চাহিয়া রহিল আচার্যের দিকে। কোনও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আছে কি ওই অঞ্চলে? নিশ্চুপ থাকিয়া আচার্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা করিল।

দীপংকর শ্রীজ্ঞানের মৃত্যুসংবাদসহ তাঁহার ভোটদেশীয় প্রিয় শিষ্য জয়াকরের কথা বিস্তারিত বলিলেন আচার্য। আচার্য দীপংকরের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী জয়াকরের নিকট হইতে কী আনিতে হইবে তাহাও বুঝাইলেন বিশদে।

দীপন বুঝিল কোনও শাস্তি নয়, প্রধান অধ্যক্ষ তাহাকে বৃহৎ এক দায়িত্ব সঁপিয়াছেন। মনে মনে দীপন নিজেকে প্রস্তুত করিল।

২০

একাদশ শতক। স্বয়ম্ভূচৈত্য। নেপাল।

‘আমি ব্রোম তোনপা জলবেই-জুং-নে। তোমাদের ভাষায় জয়াকর। জোবোজের শিষ্য।’

প্রতিনমস্কার করিয়া দীপন তাঁহার পরিচয় দিল। প্রদর্শন করিল প্রধান আচার্যের অভিজ্ঞান। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নেপালের স্বয়ম্ভূচৈত্য উভয়ের মিলনস্থল। নির্দিষ্ট ধর্মশালার কথাও বলিয়া দিয়াছেন প্রধান আচার্য। এই মর্মেই জয়াকরের বার্তাপ্রেরককে প্রধান অধ্যক্ষ প্রতিবার্তা পাঠাইয়াছিলেন। দীপন কিছু পূর্বেই স্বয়ম্ভূচৈত্য পৌঁছাইল। লামা জয়াকর এক বেলা পরে উপস্থিত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখপ্রকাশ করিল। পথশ্রমে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত সে স্নান করিল না, শ্বেত তুষারাবৃত ভূখণ্ডের অধিবাসীরা সহজে স্নান করিতে চায় না। ভোজন করিল।

ভোজনান্তে দীপনের হাতে তুলিয়া দিল বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি পোট্টলিকা। ভিতরে দুইটি পুঁথি। বাৎস্যায়নের কামসূত্র-এর ভাষান্তর। তিব্বতী অনুবাদ হইতে দুইটি পৃথক ভাষায় অনুবাদ। প্রথমটি পুনরায় মূল সংস্কৃতে প্রত্যাবর্তন, অপরটি বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর। কেবল অনুবাদ নয়, টীকাও লিখিয়াছেন দীপংকর। লামা জয়াকর দীপনকে বুঝাইয়া দিল কীভাবে কাহাকে কোথায় এই গ্রন্থদ্বয় অর্পণ করিতে হইবে।

বস্ত্রাবৃত পোট্টলিকাটি দুই হাতে গ্রহণ করিয়া দীপন কপাল স্পর্শ করিল। অতঃপর কহিল,

‘লামা জয়াকর, সমগ্র গৌড়বঙ্গ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের অপেক্ষায় ছিল—’
‘জানি বৎস! আমাদের প্রাপ্তি, তোমাদের ক্ষতি!’
‘বঙ্গদেশকে কাঙাল করে ভোটদেশ সমৃদ্ধ হল—’

এই বাক্যে লামা জয়াকরের মুখমণ্ডল ঈষৎ নিষ্প্রভ হইল। অতর্কিতে বলিয়া ফেলিয়া নিজেই নিজেকে অভিশম্পাত দিল দীপন।

‘পূজনীয় লামা, আমায় ক্ষমা করবেন, এইরূপ বাক্য বলা আমার উচিত হয়নি!’

হাতজোড় করিয়া কহিল দীপন। সে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত। ম্লান হাসিয়া জয়াকর কহিল,

'তোমার একার বাক্য নয় পুত্র, আমি জানি এই বাক্য সমগ্র গৌড়বঙ্গের বাক্য।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া জয়াকর পুনরায় কহিল,

'বিক্রমশীলের অধ্যক্ষ স্থবির রত্নাকর নাগছো লোচাবকে বলেছিলেন, তিন বৎসরের জন্য তোমরা দীপংকরকে পাবে, ঠিক তিন বৎসর পর এই মহাবিহারেই তাঁকে ফিরিয়ে দেবে। নাগছো লোচাবও অধ্যক্ষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিন বছর পর তিনি প্রভুকে ভারতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। প্রতিশ্রুতি মতো তিন বছর পর জোবোজেকে নিয়ে তিনি আমাদের চিরোং নগরে উপস্থিতও হয়েছিলেন, সেখান থেকে বালপোজং সীমান্ত। বালপো'য় তখন কোনও গোলযোগ চলছিল, কিন্তু কতদিন আর অপেক্ষা করা যায়! তবুও বেশ কিছুদিন অপেক্ষার পর জোবোজে ফিরে এলেন আবার আমাদের মাঝে। ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।'

'গৌড়বঙ্গে তথাগত'র ধর্ম্ম এখন তান্ত্রিক অনাচারে জর্জ্জরিত—এই সন্ধিক্ষণে আচার্য দীপংকরের অভাব অনুভব করছি আমরা। এও আমার একার কথা নয় পূজনীয়, স্বয়ং অধ্যক্ষ ও প্রধান আচার্যের কথা।' দীপন কহিল।

'ঠিক এই কারণেই পশ্চিম তিব্বতের রাজারা জোবোজে অতীশকে আমাদের দেশে আমন্ত্রণ করেছিলেন।'

'কী কারণে?'

'ধর্ম্মচর্চ্চার নামে তখন আমাদের দেশে অবাধ যৌনাচার, নরবলি, গুপ্তবিদ্যাসহ নানা অনাচার—ধর্ম্ম পাঁকে নিমজ্জিত—ধর্ম্মসংস্কারের কারণেই তাঁকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়ার এত তাড়না ছিল—'

'যদিও তন্ত্রশাস্ত্রে ওঁর পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত।' দীপন বলিল।

'তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্র-অনাচার এক নয় পুত্র! আমাদের দেশ এমনিতেই তান্ত্রিক অনাচারে আচ্ছন্ন—আমাদের দেশের অবস্থা বুঝে নিয়ে জোবোজে কোনও তন্ত্রমত প্রচার করেননি!'

‘সেকি, তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ আচার্য দীপংকর ভোটদেশে তন্ত্রমত পরিহার করেছিলেন!’ বিস্মিত হয় দীপন।
‘শাস্ত্র নিম্ন অধিকারীর হাতে পড়লে শাস্ত্র থাকে না, স্থূল শস্ত্র হয়ে ওঠে! জোবোজে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন গুহ্যমন্ত্রের উল্লেখ আমি তিব্বতে করব না, কেবল প্রজ্ঞাপারমিতা চর্যার কথাই বলব। প্রথমে চিত্তোৎপাদের জন্য, তারপর বোধিসত্ত্ব সম্বরের জন্য তোমরা সচেষ্ট হও।’

লামা জয়াকরের কথায় মনস্তাপে পীড়িত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল দীপন। স্বদেশের ধর্ম্মসংস্কারে যাহার নেতৃত্ব প্রয়োজন ছিল, তিনি বিদেশে ধর্ম্মসংস্কারের কাজ করিয়াছেন! তথাপি, ইহা কি কেবল আচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞানের দোষ, গৌড়বঙ্গও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেও শেষপর্যন্ত ফিরিলেন না কেন? নেপালের গোলযোগ তো অনন্তকাল ছিল না! গোলযোগের কারণে পুনরায় ভোটদেশে ফিরিয়া যাইবার পরও অনধিক দশ বৎসর তিনি ভোটদেশে ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর চেষ্টা করেন নাই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের!

কিন্তু কেন? গৌড়বঙ্গের ধর্ম্মীয় অধঃপতনের সংবাদ কি তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল? নাকি স্বদেশের প্রতি কোনও অভিমান ছিল তাঁহার? যে নয়পাল দেবকে তিনি পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন, পরামর্শ দিতেন পিতৃব্যের অধিকারে, সেই নয়পাল দেবও কি সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাকে ভোটদেশ হইতে ফিরাইয়া আনিতে?

দীপনের মাঝে মাঝেই মনে হয়, গৌড়নৃপতি তথা গৌড়বঙ্গ কি আদৌ আচার্য দীপংকরের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন? বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষসহ আচার্যগণেরও কি আন্তরিক চাহিদা ছিল, আচার্য দীপংকর ফিরিয়া আসুক! প্রশ্ন রহিয়া গেল, রহস্যও। এইভাবেই কি একদিন সমগ্র গৌড়বঙ্গের বিস্মরণে চলিয়া যাইবেন তিনি? ভবিষ্যতে মিলিবে উত্তর। পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞানের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিল দীপন, অতঃপর সহসা কহিল,

‘লামা জয়াকর আমায় ক্ষমা করবেন, এই রচনা হয়ত আচার্য দীপংকরের, কিন্তু প্রমাণ কী?’ সংশয় ব্যক্ত তাহার প্রশ্নে।

‘সংস্কৃত ভাষান্তরের প্রমাণ নেই, বঙ্গানুবাদে আছে।’

‘কী সেই প্রমাণ?’

‘জোবোজের স্ব-হস্তাক্ষর! প্রধান আচার্য ও মহাধ্যক্ষ নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন সেই হাতের লেখা, আমার বিশ্বাস। তাছাড়া প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই রচনা আমি দিতে আসব কেন?’

‘প্রাণের ঝুঁকি!’ বিস্মিত দীপন।

‘পোন-পো এখনও সক্রিয় আমাদের দেশে—তারা মনে করছে আমি তের-মা তুলে দিচ্ছি বিদেশীদের হাতে!’

‘পোন-পো! তের-মা!?’

বোধগম্য হয় না জয়াকরের কথা। বিহ্বল প্রশ্ন করিয়া দীপন হাঁ করিয়া থাকে উত্তরের আশায়।

‘পোন আমাদের দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম। গুরু পদ্মসম্ভব হিমালয়ের অজস্র হ্রদ, পাহাড়, গুহা, জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গেছেন অজস্র মন্ত্র। জ্ঞানের গুপ্তভাণ্ডার সেইগুলি। লুকিয়ে-রাখা এই গুপ্তধনকে বলে তের-মা। পোনপন্থীদের ধারণা আমি স্বদেশের সেই সম্পদ পাচার করে দিচ্ছি!’

‘তারা কি আপনাকে প্রাণে মারতে চায়, পূজনীয়?’

‘কেবল আমাকে নয়, তোমাকেও!’

‘আমাকে কেন!’

হতবুদ্ধি দীপনের শিরদণ্ড বাহিয়া আতঙ্কের ঠাণ্ডা ধারা বহিয়া যায়। মহাগুরু দীপংকরের রচনা উদ্ধারে প্রাণসংশয়ের কোনও সম্ভাবনা আছে, এমন কোনও ইঙ্গিত করেন নাই প্রধান আচার্য। তিনি কি জানিতেন এই সম্ভাবনার কথা?

‘তোমার হাতে তুলে দিয়েছি সেই গুপ্তধন, এখন থেকে তুমিই ওদের মূল লক্ষ্য!’

‘কিন্তু আপনি তো বলছেন এই রচনা আচার্য দীপংকরের! গুরু পদ্মসম্ভবের তের-মা’র কথা কেন আসছে!’

‘স্বদেশী সবকিছুকেই ওরা তের-মা বলে!’

‘কিন্তু তা তো নয়!’

‘অন্ধবিশ্বাসের ওপর যুক্তি কাজ করে না পুত্র!’

‘লামা জয়াকর, এ জিনিস তো ভারতবর্ষের নিজস্ব, বাৎস্যায়নের রচনা! তিনি তো ভোটদেশীয় ছিলেন না! আপনার দেশের বহু লোচাব নালন্দা ও বিক্রমশীল বিহারে এসে বহু গ্রন্থ নিজভাষায় অনুবাদ করে স্বদেশে নিয়ে গেছেন! বিক্রমশীলে এমন বহু ভোট-পণ্ডিত, লোচাব এখনও আছেন! কেবল অনুবাদ নয়, সংস্কৃত পুঁথির প্রতিলিপিও করেন তাঁরা! এগুলো কীভাবে তের-মা হবে!’

‘আর তর্ক-প্রতর্ক নয়, এদের হাত থেকে বাঁচতে আমাকে ঘুরপথে আসতে হয়েছে, তাই কিঞ্চিৎ দেরী হয়েছে। তুমি এইবেলাই বেরিয়ে পড়, পুত্র! সূর্যাস্ত হতে এখনও কিছু দেরী আছে, তার আগেই তোমাকে বালপো থেকে যতদূর পার চলে যেতে হবে।’

‘বালপো!’

‘তোমরা যাকে নেপাল বল, আমরা বলি বালপো!’ স্মিত মুখে বলিল লামা জয়াকর। ‘আজ সূর্যাস্তের আগে লুম্বিনী পৌঁছতে পারবে পুত্র?’

‘কত ক্রোশ পথ লুম্বিনী?’

‘প্রায় নব্বই ক্রোশ!’

‘পারব!’

‘উত্তম! তোমার অশ্ব তেজোদীপ্ত, পারবে মনে হয়!’

রৌদ্রের গায়ে আদর করে দীপন। হাসে।

‘আশীর্ব্বাদ করুন লামা জয়াকর!’

‘আগামীকাল শ্রাবস্তী হয়ে সোজা উজ্জয়িনী যাবে। নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখবে। প্রয়োজন হলে বিভ্রান্ত করবে। তথাগত তোমার সহায় হোন!’

কোন পথে কোথায় পৌঁছাইয়া কাহাকে কী অর্পণ করিতে হইবে পুনর্ব্বার বলিলেন জয়াকর। গ্রন্থদ্বয় পেটিকার গোপন অংশে রাখিল দীপন। স্বয়ম্ভূনাথকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিল ভোটদেশে আচার্য দীপংকরের প্রধান শিষ্য জয়াকরকে।

অতঃপর, যাত্রা আরম্ভ। কিছুদূর অগ্রসরের পর চিত্তচাঞ্চল্য হইতেছে দেখিয়া দীপন অনুধাবন করিল, পণ্ডিত জয়াকর তাহাকে কেবল দুইটি পুঁথি অর্পণ করেন নাই, মানসিক উচাটনও দান করিয়াছেন।

পশ্চাতে ভোটদেশীয় দস্যুগণ ও তজ্জনিত শঙ্কা রাখিয়া, দীপন আরও জোরে ছুটিতে ইঙ্গিত করিল প্রিয় অশ্বকে। প্রভুর আদেশে রৌদ্র অধিক দ্রুতগামী হইল।

২১

১৮ সেপ্টেম্বর। বৈষ্ণবঘাটা। কলকাতা।

রাত প্রায় ন'টা। বিছানায় বসে ল্যাপটপে লেখায় মগ্ন কবীর। গুমোট আবহাওয়া। মাথার ওপর সশব্দ ঘুরছে পাখা। বেজে ওঠে ফোন। ধরণী। ফোন ধরে চেয়ার থেকে উঠে পড়েন। এগিয়ে যান বারান্দার দিকে। কপালের বিজবিজে ঘাম ছুঁয়ে যায় আশ্বিনের বাতাস।

'বলো?'
'আমি অনেকটা পড়ে ফেলেছি কামসূত্র!' ওপ্রান্ত থেকে হেসে বলে ডিকে।
'বই হাতে পেলে কি আর রাখা যায়!' হা-হা করে হাসেন কবীর।

মাথার ভেতর উপন্যাসটা দখল নিয়েছে। আজ সকালেই ডিকে হাতে পেয়েছে সে-লেখা, এর মধ্যে পড়েও ফেলেছে বেশ খানিকটা। কবীরদার বাড়ি থেকে ফেরার পথে ট্রেনে, বাড়ি

ফিরে সন্ধেয়, সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে সময়। বস্তুত বই হাতে পেলে ফেলে রাখতে পারে না ডিকে। কালিম্পং-এ প্রাপ্ত, জনৈক এসবি নামক লেখকের অপ্রকাশিত বাংলা উপন্যাস, এমন চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে মূল আকর্ষণ তৈরি করে দিলেন কবীরদা, এক্ষেত্রে না-পড়ে ফেলে রাখার প্রশ্নই নেই! কেবল তাই নয়, লেখাটির নিজস্ব টানই পড়িয়ে নিচ্ছে ডিকেকে।

'খুবই ইন্টারেস্টিং! কিন্তু প্রশ্ন আছে!' বলে ডিকে।
'সে তো থাকবেই, তোমাকে ওইজন্যই তো পড়তে দেওয়া!'
'দীপংকর এমন কোনও অনুবাদ করেছেন এবং টীকা লিখেছেন, এর কোনও ঐতিহাসিক তথ্য আছে? না কি পুরোটাই লেখকের কল্পনা?'
'ধরে নাও কল্পনা! ধরে নাও সামিয়ে মহাবিহারে দীপংকর এমন কিছুই পাননি। তার অনুবাদ ও নিজে-লেখা বইয়ের তালিকা তাঁর জীবনীকাররা দিয়েছেন, সেখানে কামসূত্র নেই। এসব আমরা জানি। এর পরেও উপন্যাস লেখক নিজে তো লিখেছেন এমন একটি ভাষ্য! এটাই তো চমকপ্রদ আমার কাছে!'
'পড়তে পড়তে আরেকজন বাঙালির কথা মনে পড়ছিল!'
'কে?'
'শরৎচন্দ্র দাস।'
'উনিও তো নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে তিব্বত গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই আছে ওনার। তিব্বত নিয়ে লেখা সব বইয়ে ওঁর রেফারেন্স থাকে।' কবীর বলেন।
'তবে ওনার তিব্বত অভিযান নিয়ে বড়সড় অভিযোগ আছে!' ডিকে জানায়।
'অভিযোগ! কেন?'
'উনি ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর ছিলেন!'
'গুপ্তচর!' অবাক হন কবীর।
'খুব ইন্টারেস্টিং গল্প! একটা সময় তিব্বতি সরকার নিজেদের দেশে পশ্চিমিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। এটা করে মূলত চিনের চাপে। তিব্বতকে নিষিদ্ধ দেশ করার উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আটকান! তখন থেকেই তিব্বত নিষিদ্ধ দেশ। লাসা নিষিদ্ধ নগরী। নিষিদ্ধ করার ফলে ব্রিটেন তো তিব্বত সম্পর্কে ডিটেইলস তথ্য পাচ্ছে না! ব্রিটিশ

সিংহের ঘুম উড়ে যাচ্ছে! এত বড় একটা দেশ, যেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট জায়গায়, কিছু জানতে না-পারলে ম্যাপ বানান হবে কী করে! সেন্ট্রাল এশিয়া ডমিনেট করবে কীভাবে!

'ভাবো একবার, তখন থেকেই চিন তিব্বতের ওপর কন্ট্রোল করে!' কবীর বলেন।

'তিব্বতের লোকেশনটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট! ব্রিটিশরা তখন তিব্বত ঢুকতে চাইছে, চিন দিচ্ছে না! চিন জানে ব্রিটিশরা একবার তিব্বত ঢুকে পড়লে সব গেল! গোটা সেন্ট্রাল এশিয়ায় ছড়ি ঘোরাবে! তাই ঢুকতে দেওয়া যাবে না—'

'এখানে শরৎ দাস কীভাবে এল!'

'এটাই মজা! ব্রিটিশ সরকার তখন গুপ্তচর খুঁজতে শুরু করল। পেয়ে গেল শরৎ দাসকে। তবে যে কথাটা ইন্টারেস্টিং এই উপন্যাসের সূত্রে—শরৎচন্দ্রও এক গুম্ফা থেকে প্রাচীন ভারতীয় পুঁথি নকল করে নিয়ে এসেছিলেন!'

'কী পুঁথি?'

'যে গুম্ফায় তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন সেখানে খুঁজে পেলেন দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্রের অবদান-কল্পলতা আর চান্দ্র ব্যাকরণ।'

'অবদান-কল্পলতা! বুদ্ধের জীবনের সব গল্প-কাহিনি আছে ওতে—তিব্বতিরা একটা পটচিত্র বানায়—কী যেন বলে ওরা—'

'থাংকা।' ডিকে বলে।

'হ্যাঁ থাংকা। ওখানে বেশিরভাগ ছবি এই ক্ষেমেন্দ্র'র টেক্সট থেকে নেওয়া।'

'শরৎচন্দ্রের গুপ্তচরগিরির খবর রাষ্ট্র হতেই চিন খড়্গহস্ত হল। শরৎ পালিয়ে এলেন দার্জিলিং-এ। কিন্তু প্রত্যেকটি লোক যারা শরৎ দাসকে সাহায্য করেছে তাঁদের ধরে ধরে মৃত্যুদণ্ড দিল চিন, নয়ত জেল।'

'এও তো এক উপন্যাস!'

'একজ্যাক্টলি কবীরদা! পুরো স্পাই থ্রিলার একটা!'

'শরৎ দাসের এই দিকটা আমার একদম অজানা ছিল।' কবীর মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন।

'খুশি হয়ে তাঁকে প্রচুর পুরস্কারও দিয়েছিল ইংরেজ বাহাদুর। রায় বাহাদুর খেতাব দেওয়া হয়েছিল তো বটেই, অর্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার খেতাব পর্যন্ত! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কামসূত্র উপন্যাসে পুঁথি পাচারের জন্য কে পুরস্কার পাবে আর কে শাস্তি?'

ডিকের কথায় হা-হা করে হেসে ওঠেন কবীর। বাঁ-হাতে বাঁ-কানে ফোন চেপে ডান হাতে তর্জনী ঠোকেন বারান্দার গ্রিলে। ধাতব শব্দ শুনে গলির আলো-অন্ধকারে হেঁটে-যাওয়া একটা কুকুর চমকে তাকায়।

হাসতে হাসতে ডিকে বলে, 'দীপন কি শেষপর্যন্ত কাজে সফল হয়ে পুরস্কৃত হবে? আর শাস্তি পাবে দীপংকরের শিষ্য জয়াকর? না কি বৃন্দা? দু'জনেই দীপনকে সাহায্য করেছে। আমি এখনও শেষে যাইনি—এই সাসপেন্সটা এখনও আছে! তবে আপনার সাম্প্রতিক কাজের সঙ্গে মিল আছে।'
'চৌষট্টি কলায় একক কোনও ব্যক্তির পারদর্শিতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলছে! এ তো আমার বহুদিনের ভাবনা! কামসূত্র আসলে কী, এটা নিয়েই তো পড়ে আছি!' হেসে বলেন কবীর।

ফোন ছেড়ে কবীর আবার বসে পড়েন কম্পিউটারের সামনে। পর্দায় ছেড়ে-আসা অক্ষরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারেন না। যত এগিয়ে আসছে সময়, ছোট্ট একটা টেনশন চারিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই মাথা থেকে সংশয় তাড়াতে পারছেন না।

উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? কালিম্পং-এর গুম্ফা তাঁকে এত অতিরিক্ত আকর্ষণ করছে কেন? কে এই চিত্রক চন্দ্র?

অন্দরমহলে প্রশ্ন ও সংশয় নিয়েই কি-বোর্ডে সচল করেন আঙুল।

ওদিকে ডিকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ওল্টায় পাতা।

২২

একাদশ শতক। উজ্জয়িনীর সন্নিকট।

হঠাৎ কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভোররাতে উঠিয়া পান্থনিবাস হইতে বাহির হইয়াছে, বিশ্রামের সুযোগ পায় নাই, তাই জলাশয় ও বৃক্ষচ্ছায়ার অনুকূল পরিবেশে অচিরেই নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তীব্র রৌদ্রালোকে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের ক্লান্তি কিছুটা অপনোদন হইল। কিন্ত ইহারা কাহারা, দলে দলে এই জলাশয় অভিমুখে আসিতেছে? কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হইয়া দীপন বুঝিল ইহারা বণিকের দল। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দূরে কোনও দেশে যাইতেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত দলটি জলাশয় ও বৃক্ষচ্ছায়া দর্শনে উল্লসিত হইয়া অতি আগ্রহে অগ্রসর হইতেছে। হঠাৎ রৌদ্রের কথা স্মরণ হইল, কোথায় সে অশ্ব? পেটিকা?

অদূরে শষ্পক্ষেত্রে পরম নিশ্চিন্তে ভোজন করিতেছে সে। তৃণভোজনরত রৌদ্রকে দেখিয়া অকস্মাৎ ঊষাকালের সকল ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। পুনরায় তাহাকে গ্রাস করিল শূন্যতা। কীভাবে শূন্য হাতে প্রধান আচার্যের নিকট গিয়া দাঁড়াইবে? প্রধান আচার্য কি বিশ্বাস করিবেন সকল ঘটনা? মহাগুরু দীপংকর শ্রীজ্ঞানের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি উজ্জয়িনীর রক্ষীদল অগ্নিসংযোগে ছাই করিয়া দিয়াছে, বিক্রমশীল সঙ্ঘারামে কেহ বিশ্বাস করিবে এই কথা? সে কী করিয়া মুখ দেখাইবে?

মহাবিহারে যাইবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ, দীপন আর কখনওই বিক্রমশীলে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিক্ষার্থী হইয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই, সরবরাহকারী রূপেও থাকিতে পারিল না! চরম হতাশা গ্রাস করিল তাকে।

বণিকের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কলরবে সেই স্থান সহসা মুখরিত। অনেকে বৃক্ষতলে শয়ন করিল। কেহ কেহ জলাশয়ে নামিয়া পড়িল শীতল জলে স্নান করিবার আনন্দে। বৃক্ষতলে দীপনকে দেখিয়া কেহ কেহ আলাপ করিতে আসিল।

তাহাদের সহিত কথোপকথনে ঈষৎ নির্ভার হইল দীপন। বুকের উপর পাথর সরিয়া যাওয়ায় স্বাভাবিক শ্বাস নিতে পারিল সে।

সার্থবাহ লোকটি বড় চমৎকার। তাহাকে দেখিয়া পূর্বপুরুষের কথা মনে পড়িল। তিনিও এমনই কোনও দলের সার্থবাহ ছিলেন। কিন্তু আজ হায়, কোথায় সেইসব বিগত দিনগুলি! বণিকের দল আসিতেছে শ্রাবস্তী হইতে। যাইবে উজ্জয়িনী। সেইখান হইতে মাহিষ্মতী, পৈঠান হইয়া সোজা পশ্চিমে ভারুকচ্ছ। শেষে সূর্পারক।

দীপনকে তাহাদের দলে যোগদানের আহ্বান জানাইল সার্থবাহ। প্রস্তাবে আহ্লাদিত হইলেও দীপন বণিক দলপতিকে জানাইল এখন সে সমতটে স্বগৃহে যাইবে, অতঃপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত লইবে।

তাহাদের সহিত কথোপকথন ও আহারে আরও কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইল। অতঃপর বণিকের দলকে বিদায় জানাইয়া পুনরায় রৌদ্রের পিঠে উঠিল। সব হারাইয়া এখন সে কী করিবে, কোথায় যাইবে, এতক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশয় ছিল। আর সংশয় নাই। সোজা যাইবে স্বগৃহ ধর্ম্মপুরে। মনে পড়িতেছে মায়ের মুখ। বহুদিন এই জিহ্বা মৎস্য হইতে বঞ্চিত, মৎস্যমুখ না করিলে শান্তি নাই।

কিন্তু শান্তি কি মিলিবে এত সহজে! হৃদয় জুড়িয়া অশান্তি। নিয়তির এ কী খেলা! বিক্রমশীল তাহার কপালে নাই। শিক্ষার্থী রূপে অধরা, অন্যরূপে হাতছাড়া। হঠাৎ মাথার উপর পাখসাটে চমকাইয়া উঠিল। এক পক্ষী উড়িয়া আসিয়া, বসিতে চাহিতেছে তাহার কাঁধে। পক্ষীটি কি অসুস্থ? আহত? রৌদ্রকে থামাইল। পক্ষীটি আসিয়া বসিল দীপনের কাঁধে। এ কী, এই পক্ষী তো বৃন্দার! শ্যেনপক্ষী। পান্থনিবাসের নিজস্ব বার্তাবাহক, নাম তেজী। সে কেন উড়িয়া আসিয়াছে? অবাক হইল দীপন।

তেজীর পায়ে বাঁধা এক টুকরা গাছের বাকল। ভূর্জ্জপত্র। বৃন্দা কি কোনও বার্তা পাঠাইল? পুনরায় বিয়োগব্যথায় কাতর হইল মন। মাত্র দুই দিনের পরিচয়ে এক নারী কীভাবে এত

আপন হইয়া উঠিল! তেজীর পা হইতে সেই বাকল খুলিল।

পত্রলিখন দেখিয়া হাসি ফুটিয়া উঠিল মুখমণ্ডলে। ম্লান সে হাসি। কেবল এক দীর্ঘশ্বাস নয়, দৃষ্টিও ঝাপসা হইল। এক নারীর জন্য বেদনা নয় মাত্র, দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থতার গ্লানিও যুক্ত হইল সম্মিলিত সন্তাপে।

দিপন বিন্দা মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।।
মেছিত বিকপ্প কোই সরিরহি লুক্কো।
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো।।

পুনরায় পাঠ করিল বৃন্দা-প্রেরিত ভুর্জ্জপত্র। এই নারী দোঁহাগানও রচনা করিতে পারে! পক্ষীকে পানীয় দিল, কিছু দানাশস্যও। পানীয় ও শস্য খাইয়া উড়িয়া গেল তেজী।

দীপনকে লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইল রৌদ্র। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দীপনের মনে হইল, উজ্জয়িনী প্রত্যাবর্তন করিলেই তো সমস্যার সমাধান হইতে পারে! মহানায়িকা বসন্তসেনার পাঠাগার হইতে গ্রন্থের প্রতিলিপি করাইলেই তো তাহার মুখরক্ষা হয়! মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল দীপনের মুখ। এমন চিন্তা পূর্বে আসে নাই কেন! অনুশোচনা হয় তাহার।

রৌদ্রকে ঘুরাইয়া উজ্জয়িনী অভিমুখে চালিত করিতে উদ্যত হইবে, এমন সময়ে অন্য চিন্তাও উপস্থিত হইল। উজ্জয়িনীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিপদসংকুল। উপরন্তু রক্ষীদল তাহাকে দুই-দুইবার সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে! সতর্কতা উপেক্ষা করিয়া পুনর্বার উপদ্রুত অঞ্চলে উপস্থিত হইলে রক্ষীরা কি তাহাকে আর ছাড়িবে! প্রাণে না মারিলেও হয়ত কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিবে! মুহূর্তকাল পূর্বে মুখমণ্ডলে যে উজ্জ্বলতা ফিরিয়া আসিয়াছিল, ততোধিক দ্রুততায় তাহা অন্তর্হিতও হইল। রৌদ্র'র অভিমুখ পরিবর্তন না করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

চিত্তচাঞ্চল্য লুকাইতে পারিল না দীপন। ভোটদস্যুদের ভয় আর নাই, তথাপি মন চঞ্চল কেন? একটি মুখশ্রীই বারংবার ভাসিয়া উঠিতেছে মন-মুকুরে। কেমন করিয়া এই নারীকে ভুলিবে সে!

দিপন বিন্দা মিলি মিলি মাঙ্গা
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।

দুইজনে মিলিয়া মহাসুখ সাঙ্গ করিয়াছে তাহারা। বাণিজ্যে বাহির হইয়া পথে সে পূর্বেও বেশ্যাগমন করিয়াছে, কদাচ এই উপলব্ধি হয় নাই। কখনও কোনও গণিকা তাহাকে মোহগ্রস্ত করিতে পারে নাই। বৃন্দা তাহাকে জয় করিল কীভাবে!

পোশাকের অন্দর হইতে আবার বাহির করিল সেই বাকল। দুই পংক্তির পর সে লিখিয়াছে,

মেছিত বিকপ্প কোই সরিরহি লুক্কো
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো।

ম্লেচ্ছিত বিকল্প লুকিয়ে আছে শরীরেই, যে তা জানতে পারে, মুক্ত হয় সে-ই। পোশাকের অভ্যন্তরে রাখিয়া দিল বৃন্দার পত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির অর্থ অনুধাবন করিতে পারিল না দীপন। বৃন্দার সহিত 'মহাসুহ সাঙ্গা'-এর স্মৃতি রোমন্থন করিতে করিতে অগ্রসর হইল স্বগৃহাভিমুখে।

দুই-তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর হঠাৎ রৌদ্রকে থামাইল। ম্লেচ্ছিত বিকল্প লুকাইয়া আছে শরীরেই, যে তাহা জানিতে পারে, মুক্ত হয় সে-ই। কেন এমন কথা লিখিল বৃন্দা? কী লুকাইয়া আছে শরীরে? নিজের শরীরের দিকে তাকাইল। কিন্তু কী লুকাইয়া

আছে শরীরে তাহা ধরিতে পারিল না। পায়ের ইঙ্গিতে রৌদ্র পুনরায় ছুটিতে শুরু করিল, কিন্তু বৃন্দার দোঁহা কণ্টকের ন্যায় দীপনের মনে বিঁধিয়া রহিল।

কয়েকজন পথিককে দেখিল পথে। ইহার অর্থ সম্মুখে কোনও লোকালয় আছে। রৌদ্র তাহার নিজস্ব তালে দৌড়াইতেছে। হাওয়ায় ফুলিয়া উঠিতেছে ধুতি। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল ধুতির পাড়ে। দ্রুত রজ্জু টানিয়া থামাইল রৌদ্রকে। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল দীপন। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফ দিয়া নামিয়া মুহূর্তে টান মারিয়া অঙ্গাবরণ খুলিয়া ফেলিল। চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া দেখিল ধুতির নির্দিষ্ট একটি অংশ জুড়িয়া সারিসারি অক্ষরমালা। এমনই সে লিখন, সহজে দৃষ্টিগোচর হইবে না।

দীপন বুঝিল বৃন্দার দোঁহার অর্থ। ম্লেচ্ছিত বিকল্প সে ধুতির গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছে। ভোরে শর্ব্বিলকের এক সঙ্গী পালাইয়াছিল, নিশ্চয় সে-ই গিয়া তাহাকে খবর দিয়াছে। রক্ষীদল পুঁথি নষ্ট করিবে অনুমান করিয়া, সংবাদ পায়ে বাঁধিয়া তেজীকে উড়াইয়া দিয়াছে আকাশে। হাঁফ ছাড়িয়া যেন বাঁচিল দীপন।

হঠাৎ হাসির শব্দে সম্বিত ফিরিল তাহার। কয়েকজন পথিক তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে। কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতেছে কয়েকজন কৃষক, তাহাকে দেখিয়া কৌতুক তাহাদেরও। কিন্তু দীপন হাসির কারণ হইবে কেন? নিজেকে দেখিয়া দ্রুত অনুধাবন করিল হাসির মর্মার্থ। তাহার নগ্নতাই তাহাদের হাস্যোদ্রেক করিতেছে।

দ্রুত হস্তে পেটিকা হইতে অন্য পরিধান বাহির করিয়া অঙ্গাবরণ করিল। ভুনীধুতি যত্নসহ পাট করিয়া রাখিল পেটিকায়। পথিকদের উদ্দেশে হাসি ফিরাইয়া লাফ দিয়া পুনরায় উঠিয়া পড়িল রৌদ্রের পিঠে। উজ্জয়িনীর সেই রহস্যময়ী নারীকে মনে মনে দিল সহস্র চুম্বন।

ধর্ম্মপুর পৌঁছাইয়া প্রথমেই খুঁজিতে হইবে ম্লেচ্ছিত বিকল্প পারদর্শী কোনও পণ্ডিত। সংকেতলিপির রহস্যোদ্ধার করিতে হইবে সর্বাগ্রে। অতঃপর আচার্য্য দীপংকরের টীকা-ভাষ্যসহ 'কামসূত্র' তুলিয়া দিতে হইবে মহাবিহারের বর্ত্তমান প্রধান আচার্য্যের হাতে।

দীপনকে লইয়া অগ্রসর হইল রৌদ্র। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল নগর উজ্জয়িনী। শর্ব্বিলকের মিত্রতা। বসন্তসেনার আভিজাত্য। আর চমকপ্রদ এক নারী, বৃন্দা।

কটিবন্ধে হাতের স্পর্শে অনুভব করিল শাক্যমুনির মূর্তি। অতঃপর স্ফূর্তির সহিত তীব্র বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। কিন্তু দীপন কল্পনাও করিতে পারিল না, সংকেতলিপি ও মূর্তির সূত্রে সম্মুখে কী ভয়ঙ্কর বিপদ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

।। প্রথম অধিকরণ 'ধর্ম' সমাপ্ত।।

অর্থ

২৩

১৩ অক্টোবর। সকাল। বৈষ্ণবঘাটা। কলকাতা।

‘হ্যাঁ। আগে বলো পুজো কেমন কাটল? অনেকদিন ছুটি পেলে।’

‘ওই আরকি, শুয়ে-বসে, বই পড়ে। আরও একবার পড়লাম কামসূত্র।’ কবীরের সওয়ালে হেসে জবাব ডিকের।

শনিবারের সকাল। আজ রাতের দার্জিলিং মেলে যাত্রা। গোছগাছ সম্পূর্ণ। বেজে ওঠে ফোন। পর্দায় নাম দেখে কবীরের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। ডিকেকে তর্জনী তুলে ‘একমিনিটের অপেক্ষা’র ইঙ্গিত করে ফোন ধরেন কবীর।

‘বলো নিবেদিতা, খবর কী?’

‘আপনার শিলিগুড়ি যাত্রা তো আজ?’

‘সন্ধ্যায়।’

‘আসছি। কিছু শুকনো খাবার দিয়ে আসব।’

‘সে এসো, কিন্তু খাবার-টাবার লাগবে না।’

‘সঙ্গে কিছু ড্রাই ফুড রাখা ভালো। এই বিস্কিটস্, চকোলেট। আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।’

‘গৌরাঙ্গকেও নিয়ে এসো। অনেকদিন দেখি না।’

‘সে যাবে কি না জানি না। তবে আমি যাচ্ছি।’

‘তোমার দিল্লির যাওয়ার কথা বলেছিলে এর মধ্যে—’

‘কাল রাতে ফিরেছি।’

‘ওহ্ আচ্ছা। রাজধানীর হাওয়া কেমন?’

হাসে নিবেদিতা। বলে, ‘অক্টোবরে রাজধানীর ওয়েদার ভালো, তবে রাজনীতির হাওয়া বেশ গরম! ওক্কে খানদা, যাচ্ছি, গিয়ে কথা হবে।’

নিবেদিতার ফোন রেখে কবীর ফিরতে চান ছেড়ে-আসা কথোপকথনে।

‘খুব ভালো করেছ আবার পড়ে! আমি ফিরে আসি কালিম্পং থেকে, তারপর আলোচনা করব।’ স্মিত কবীর বলেন ডিকের উদ্দেশে।
‘আপনি কালিম্পং যাচ্ছেন নাকি!’ বিস্ময় ডিকের।

খানিক অপ্রস্তুত হন কবীর। মুখ ফসকে কালিম্পং-এর কথা বলে ফেলেছেন, অথচ গোপন রাখার কথা ছিল।

‘দেখেছ কালিম্পং-কালিম্পং করছি কেবল!’ হাসেন কবীর।
‘তবে যেতে পারলে ভালো হত দাদা, ওই লামার সঙ্গে দেখা করা দরকার।’
‘ঠিকই বলেছ। এই যাত্রায় হয়ত হবে না, দেখি পরে কখনও—’
‘যাচ্ছেন যখন একবার ঘুরে আসবেন—বেশি তো দূর নয়—’

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় আলোচনা। একসময় কথার মাঝেই বেজে ওঠে দরজা-ঘন্টি। উঠে গিয়ে দোর খুলে দেয় ডিকে। নিবেদিতা। মাথায় তোলা রোদচশমা। মৃদু হাসে ডিকেকে দেখে। ঘরে ঢুকেই সোজা চলে যায় ভেতরে। খাবার টেবিলের ওপর রাখে মস্ত এক ব্যাগ। এই বাড়িতে তার নিয়মিত যাতায়াত আছে, অনাড়ষ্ট আচরণে তা বোঝা যায়।

‘খানদা, মনে করে ঢুকিয়ে নেবেন।’ তারপর রান্নাঘরের দিকে সামান্য গলা তুলে বলে, ‘অ্যাই টুম্পা, জেঠুর ব্যাগে মনে করে ঢুকিয়ে দিবি এইগুলো। খানদা লাগেজ নিশ্চয়ই বেশি হয়নি?’
‘আরে না, না, স্রেফ একটা ব্যাগ। দু’সেট জামাকাপড়, টুকিটাকি জিনিস আর ল্যাপটপ।’ কবীর বলেন।

ছোট্ট তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে টুম্পা। মুখে হাসি। হাত দিয়ে ওর থুতনি স্পর্শ করে আদরের ভঙ্গি নিবেদিতার।

‘শুকনো খাবার আছে, জেঠুর ব্যাগে ভরে দিবি।’
‘এখনই দিয়ে দিচ্ছি! তুমি চা খাবে তো দিদি?’
‘শুধু চা? কোনও টা নেই?’ হাসি নিবেদিতার।
‘আছে। পরোটা, কারি পাতা দিয়ে শাদা আলুর তরকারি আর ল্যাংচা।’ টুম্পার সহাস্য উত্তর।
‘উফ, দারুণ!’

বলতে বলতে বিছানার দিকে এগিয়ে যায় নিবেদিতা। কবীর ও ডিকে দু’জনেই হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে। কবীরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বিজয়ার প্রণাম। কবীর নিবেদিতার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

‘ডিকেবাবু যখন এসে গেছেন, কঠিন-কঠিন আলোচনা চলছে নিশ্চয়ই!’

নিবেদিতার কথায় হো-হো হাসি দু’জনেরই। হাসি সামলে ডিকে বলে,

‘ইন্টারেস্ট থাকলে সহজ, না-থাকলেই কঠিন!’

সূক্ষ্ম একটা খোঁচা আছে ডিকের কথায়, বুঝতে পেরেও হেসে এড়িয়ে যায় নিবেদিতা। হাতব্যাগ থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মোছে।

‘কালিম্পং আর কামসূত্র নিয়ে কথা হচ্ছিল। কঠিন কিছু নিয়ে নয়।’ হাসেন কবীর।

তারপর কালিম্পং-এ প্রাপ্ত বাংলা উপন্যাসটির প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয়ের কথা বলেন কবীর। নিবেদিতা আলোচনায় অংশ নিতে পারে সহজেই কারণ ইতোমধ্যে কবীরের উৎসাহে সে

পড়ে ফেলেছে উপন্যাসটি।

‘উপন্যাসের ভাষা-ভঙ্গি পড়ে প্রাচীন মনে হয়, তবে খাতাটা দেখা দরকার। ওটা দেখলে বোঝা যাবে কতটা প্রাচীন!’ বলে নিবেদিতা।

সে সাংবাদিক। যাচাই না-করে সিদ্ধান্ত জানাতে চায় না।

‘ঠিক। এক্সপার্টের কাজ।’ সহমত হয় ডিকে।
‘খাতা আমি দেখিনি। তবে উপন্যাসের ভাষা সাধু হলেও ভঙ্গি আধুনিক।’ কবীরের উত্তর।
‘ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাখালদাস বা হরপ্রসাদের একরকম ভাষা-ভঙ্গি, আবার শরদিন্দুর আরেকরকম।’ নিবেদিতা বলে। ‘তবে এটা পুরনো স্টাইলে লেখা নয়। মানে ওল্ড ন্যারেটিভ নয়।’
‘ভাষা শরদিন্দুর কাছাকাছি হলেও, সবথেকে বড় যেটা—দৃষ্টিভঙ্গি, একেবারেই আলাদা। ইতিহাসকে দেখার চোখটাই আলাদা এখানে।’ কবীর তাঁর পর্যবেক্ষণ জানালেন।
‘তাহলে এসবি শরদিন্দু নন বলছেন?’ প্রশ্ন নিবেদিতার।
‘অতীব সন্দেহ আছে! এমন ভাবনার কোনও উপন্যাস শরদিন্দুর আছে কি?’ উত্তর কবীরের।
‘শরদিন্দুর বর্ণনারীতির সঙ্গে মিল আছে কিন্তু—উজ্জয়িনীর বর্ণনা প্রায় কুমারসম্ভবের কবি’র কাছাকাছি—’ নিবেদিতা বলে।
‘নিবেদিতা তুমি হরপ্রসাদের বেণের মেয়ে পড়েছ?’ জানতে চান কবীর।
‘না।’
‘পড়ে ফেল। বেণের মেয়েও লুকিয়ে আছে এই উপন্যাসে।’ কবীর হেসে বলেন।
‘শরদিন্দুর বিষয়টা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না কবীরদা! হাতের লেখাটা একটু চেক করাতে হবে।’ কবীরের দিকে তাকিয়ে বলে ডিকে।
‘তবে একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং লেগেছে—হাজির, পুদিনা বা জরিপের মতো শব্দের ব্যবহার! এগার শতকের গল্প, ইসলাম তখনও বাংলায় আসেনি। শরদিন্দুর ভাষা ব্যবহারে কি এই অ্যানাক্রনিজম আছে?’ প্রশ্ন নিবেদিতার।

‘বাহ্, ভালো বলেছেন! তবে সুকুমারী ভটচাজ মৃচ্ছকটিক বাংলা অনুবাদ করার সময় এসব পাত্তাই দেননি! আরবী-ফার্সি শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগের স্বাধীনতা নিয়েছেন!’ ডিকে বলে।
‘কিন্তু শরদিন্দু?’ ডিকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন নিবেদিতার।

সবাইকে জলখাবার দেয় টুম্পা। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে যায় তার সদ্ব্যবহারও।

‘তুইও খেয়ে নে মা।’ কবীর বলেন টুম্পাকে।
‘খাব জেঠু। তুমি খাও।’
‘যা-যা থাকবে সব বাড়ি নিয়ে যাবি।’
‘হ্যাঁ হ্যাঁ জেঠু, ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তুমি বেরোবে কখন?’
‘সাড়ে সাতটা-পৌনে আটটা নাগাদ। একটু আগে-আগেই যাওয়া ভালো। জ্যাম-ট্যাম হলে মুশকিল।’
‘ওমা, সে তো অনেক দেরি। আমি বিকেলে তো আসছি।’ টুম্পা বলে।
‘আপনি তাহলে ন’টার মধ্যেই স্টেশনে ঢুকে যাচ্ছেন! ওক্কে, আমি যাব।’ খেতে খেতে বলে ডিকে।
‘আরে না, না, স্টেশনে আর আসতে হবে না।’ আপত্তি করেন কবীর।
‘আরে আপনাকে সি-অফ করতে যাব না! নিবেদিতা যাবেন নাকি?’
‘নাহ্, আমার হবে না। আচ্ছা খানদা, এখন উঠব, অফিস যাব। ভালো করে ঘুরে আসুন। আর হ্যাঁ, একটা নাম্বার এসএমএস করে দেব, আমাদের শিলিগুড়ি ব্যুরোর, কোনও অসুবিধে হলে ফোন করবেন। আর আমার ফোন তো রইলই!’

উঠে পড়ে নিবেদিতা। টুম্পা এগিয়ে আসে। বুকে জড়িয়ে তাকে আদর করে।

‘আপনারা কবীরদার পাশে একটু দাঁড়ান—টুম্পা এসো—একটা ছবি তুলি।’ ডিকে বলে। উদ্দেশ্য নিবেদিতা।

নিবেদিতা ও টুম্পা এসে বসে কবীরের পাশে। ছবি তোলে ডিকে তার স্মার্টফোনে।

‘এবার আপনি এসে বসুন, টুম্পা একটু তুলে দে তো!’ বলে নিবেদিতা।

টুম্পাকে ফোন দিয়ে ডিকে এসে বসে কবীরের পাশে। সকলে মিলে ছবি তোলা হয়। আনন্দ পান কবীর। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ি এইভাবে সরগরম হলে আহ্লাদ হয় বৈকি!
‘গাড়ি এনেছ তো?’ নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করেন কবীর।
‘হ্যাঁ।’
‘ধরণী, তুমি যাবে নাকি নিবেদিতার সঙ্গে?’
‘ডিকেবাবু কোথায় যাবেন?’ নিবেদিতা তাকায় ডিকের দিকে।
‘আপনার অফিস মানে তো সেক্টর ফাইভ! লাভ হবে না গিয়ে।’ হেসে বলে ডিকে।
‘কোথায় নামালে আপনার সুবিধে হবে বলুন?’
‘আপনার রুটে কোনও মেট্রো স্টেশন পড়বে না, ছাড়ুন!’ হাসে ডিকে।
‘চলুন, আমি ক্ষুদিরামে নামিয়ে দেব। এই তো একটুখানি! ঢালাই ব্রিজ।’
কথা আর না-বাড়িয়ে নিবেদিতার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে ডিকে। চালকের আসনে নিবেদিতা। কোলে ব্যাগ নিয়ে ডিকে তার পাশেই।

‘আপনার বাড়ি বারাসাত, তাই না?’ নিবেদিতার প্রশ্ন।
‘না, নিউ ব্যারাকপুর। বারাসাতের আগে।’
‘দমদমে নেমে আবার লোকাল ট্রেন?’
‘হুঁ।’
‘ছবিগুলো পাঠিয়ে দেবেন।’
‘হুঁ।’

সামান্য একটা বিরতি। কেটে কেটে নিবেদিতা বলে,

‘ব্যক্তি খানদা ও তাঁর ভাবনা, দুটো ব্যাপারেই আমার যথেষ্ট ইন্টারেস্ট আছে।’
‘জানি।’ অস্ফুটে ডিকের জবাব।

স্তব্ধতা। আর কোনও কথোপকথন হয় না। নীরবতা ভঙ্গ করার তেমন কোনও ইচ্ছে হয় না ডিকের। বক্রোক্তি সহজে সহ্য করার মেয়ে নিবেদিতা নয়। তখন প্রত্যুত্তরে নির্মল হাসি দেখেই ভেবেছিল জবাব আসবেই। কটাক্ষ মনে রেখে সটান উপযুক্ত উত্তর ফিরিয়ে দিয়েছে নিবেদিতা। কিঞ্চিৎ মজা পায় ডিকে। চলমান গাড়ি থেকে সামনের দিকে তাকায়। সামনেই ঢালাই ব্রিজ। চারমাথার মোড়ের সামান্য আগেই নেমে যায় ডিকে।

মৃদু হেসে দু'জনেই একে-অপরকে বিদায় দেয়। নিবেদিতা ইউ-টার্ন নিয়ে বেরিয়ে যায়। ডিকে এগিয়ে যায় শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের দিকে।

২৪

১৩ অক্টোবর। লালবাজার। পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স। কলকাতা।

রাত ন'টা পঁয়ত্রিশ। ল্যান্ড ফোন বেজে ওঠে লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যান্টিক থেফট সেকশনে। রিসেপশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী, রিং হতেই সচকিত হয়ে ফোনটি ধরেন। পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে ফোন। গাড়িবোমা বিস্ফোরণের খবরে লালবাজারে এমনিতেই অতিরিক্ত তৎপরতা। সঙ্গে যুক্ত হল আরও এক বিপদ। খবর শুনে কিছুটা বিস্মিতই হন পুলিশকর্মী। আজ সব খবর কি পার্ক স্ট্রিটেই!

আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম থেকে ফোন এসেছে পার্কস্ট্রিট থানায়। খুব দামি একটি মূর্তি চুরি গেছে কিছুক্ষণ আগে। চোরের হদিশ সিসি টিভি ফুটেজেও নেই। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কথা শুনেই নিমেষে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে নেন অ্যান্টিক থেফট সেকশনের রিসেপশন কর্মী। আধিকারিককে অপেক্ষা করতে বলে ফোনটি ফরোয়ার্ড করেন সেকশনের তরুণ অফিসার-ইন-চার্জ রিয়াজ আলম-এর কাছে।

দামি মণিমাণিক্য খচিত সোনার মূর্তি, ফলত মূর্তির নিজস্ব একটা মূল্য আছেই, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এর অ্যান্টিক মূল্য। এক বৌদ্ধ গুরুর মূর্তি। বহু পুরনো। স্বয়ং দলাই লামা নাকি মূর্তিটি মিউজিয়ামকে উপহার দিয়েছিলেন। কেবল অ্যান্টিক মান নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। সব শুনে রিয়াজ বোঝে, কেস সিরিয়াস। এই জাদুঘরের যা নামডাক, কিছুক্ষণের মধ্যেই খুব হইচই শুরু হয়ে যাবে মিডিয়ায়। ন্যাশানাল নিউজ হতেও সময় নেবে না। মুহূর্তে জাতীয় চ্যানেলগুলো নেমে যাবে আসরে। পার্ক স্ট্রিটের গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ইতোমধ্যে যথেষ্ট নজর কেড়েছে জাতীয়স্তরে। মূর্তি চুরির খবর বাইরে এলে তো সোনায় সোহাগা!

ফোনে আঙুলের ছোঁয়ায় নাম্বার খোঁজে রিয়াজ। ডিসি ডিডিকে সব জানায়। জয়েন্ট কমিশনার রজত রায়কেও আগাগোড়া জানিয়ে রাখে। জয়েন্ট কমিশনার রজত স্যারের নির্দেশে ফোর্স নিয়ে রিয়াজ নিজেই রওনা দেয় মিউজিয়ামের দিকে।

পোর্টিকোতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঢুকে যায় ভেতরে। অফিস, রিসেপশন, টিকিট কাউন্টার সব একতলাতেই। ডিরেক্টর নিজেই এগিয়ে আসেন রিয়াজের দিকে।

ডিরেক্টরের থেকে দ্রুত জেনে নিতে চায় যাবতীয় তথ্য। চারপাশে চোখ বোলায়। বিশাল এলাকা। এখান থেকে টিকিট নিয়ে লিফটে উঠে যেতে হয় মিউজিয়াম দর্শনে। চারটি লিফট। সিঁড়ি। তিনতলা থেকে শুরু হয় সফর, শেষ হয় দশতলায়। মিউজিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্ব বেসরকারি নিরাপত্তা এজেন্সির হাতে।

দোতলায় ডিরেক্টরের ঘর। অন্যান্য অফিসারদেরও এখানেই চেম্বার। ভদ্রলোক বেজায় ঘাবড়ে গেছেন। বাতানুকূল ঘরেও তাঁর কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম। বিদ্যুৎ দফতরের ফোন কলটিই যে সব নষ্টের গোড়া, ধীরে ধীরে ডিরেক্টর সবটা বলেন রিয়াজ আলমকে।

‘প্রায় মিনিট পনের অপেক্ষার পর আমাদের চিফ সিকিউরিটি অফিসার ফোন করেন সাপ্লাই অফিসে। ওরা ফোনের কথা অস্বীকার করে। এমন কোনও ফোন নাকি ওরাই

করেইনি! ওদের হাই-ভোল্টেজ আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, পার্ক সার্কাসে। তাছাড়া গ্যাস ইনসুলেটেড ট্রান্সফর্মার সিস্টেমে আগুন লাগার প্রশ্নই ওঠে না। সালফার হেক্সাফ্লোরাইড নামে একটা গ্যাস মেইনলি এখানে ব্যবহার করা হয় যা নন-ইনফ্লেমেবল। একেবারেই দাহ্য নয়। খুবই সেফ বলে হোল ওয়ার্ল্ডে এখন এই পদ্ধতিতে কাজ হয়। টেনশনের মুহূর্তে আমি—মানে পুরো একটা হোক্স কল করে—'

আর বলতে পারলেন না ডিরেক্টর। বসে পড়লেন সোফায়। এইভাবে বোকা বনে তিনি বিপর্যস্ত। রিয়াজ পুরো বিষয়টা বুঝে নিতে চায়। তাই সে জারি রাখে প্রশ্নমালা।

'মিউজিয়াম বন্ধ হয় কখন?'
'সাড়ে সাতটায়।'
'সিসি টিভির মনিটরে কে ছিল?'

মিউজিয়ামের একজন নিরাপত্তা রক্ষী এগিয়ে এল। মাথা নীচু করে বলল, 'আমি স্যার।'

'অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি?'
'না, স্যার।'
'মনিটর রুম?' জানতে চায় রিয়াজ।
'আসুন।'

নিজেই রিয়াজকে নিয়ে একতলায় আসেন ডিরেক্টর। একটি ঘরের দিকে এগোন। তিনি কিছুটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে। পিছু নেন প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিক।

ঘরের ভেতর সারি সারি টিভি মনিটর। প্রতি তলের প্রতিটি ঘর, করিডোর, সিঁড়ি সর্বত্র ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার অধীনে। রিয়াজ গভীর মনোযোগ দিয়ে ভিডিও ফুটেজ দেখতে শুরু করে।

‘একজন ভিজিটরের পক্ষে একদিনে সবটা দেখা কার্যত অসম্ভব, এত বড় আমাদের মিউজিয়াম!’ ডিরেক্টর বলেন রিয়াজকে।
‘এত বড় বিল্ডিং, এতগুলো ক্যামেরা, মাত্র একজন নজরদারী করছেন মনিটরে! সম্ভব নাকি!’
প্রশ্নটা করে সরাসরি তাকায় ডিরেক্টরের দিকে। দৃশ্যত অপ্রস্তুত ডিরেক্টর। তিনি তাকান প্রধান নিরাপত্তা অফিসারের দিকে। কিছুটা ইতস্তত করে অফিসার বলেন,

‘পাঁচজন আছেন স্যার।’
‘মোট পাঁচজন?’
‘হ্যাঁ স্যার।’

মিউজিয়ামের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব এজেন্সির। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে এজেন্সির গাফিলতি প্রকাশ্য হয়। এমনিতেই যথেষ্ট চাপ অনুভব করছেন, রিয়াজের প্রশ্নের চোটে প্রধান রক্ষী কিছুটা ঘাবড়েও যান।

‘কিন্তু আমি তা জানতে চাইছি না। একসঙ্গে কতজন মনিটরে বসে? একজনের পক্ষে তো সম্ভব নয় এতগুলো মনিটর লক্ষ রাখা!’ চোখা প্রশ্ন রিয়াজের।
‘ভিজিটিং আওয়ারে পাঁচজনই একসঙ্গে মনিটরে থাকে স্যার! প্রত্যেকের আলাদা আলাদা দায়িত্ব দেওয়া আছে স্যার! সাড়ে সাতটার পরে আজ একজন বসে ছিল।’
‘মূর্তিটা কোথায় ছিল?’
‘টিবেটান বৌদ্ধধর্ম বিভাগে। আটতলায়।’ আধিকারিক উত্তর দেন।
‘ওই বিভাগ কি গোটা আটতলা জুড়ে?’
‘হ্যাঁ স্যার।’
‘মূর্তিটা ঠিক কোথায় ছিল, স্পেসিফিক জায়গাটা বলুন।’
‘ওই বিভাগেই গুরু রিন-পো-ছে নামে এক গ্যালারি আছে। ওখানে।’
‘ক’টা ফ্লোর মিউজিয়ামের?’
‘দশটা স্যার।’

‘ছাদের দরজা?’

‘বন্ধ স্যার।’

‘সদর দরজা ছাড়া আর কোনও দরজা আছে?’

‘আছে স্যার, পেছনে। বন্ধ স্যার।’

‘ইমারজেন্সি ডোর?’

‘আছে স্যার, বন্ধ।’

‘তাহলে পালাল কী করে?’

সকলে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিক অধোবদন। ডিরেক্টর বিভ্রান্ত।

‘দরজা-জানালা সব অটুট। একটা চোর কীভাবে ঢুকল আর কীভাবে বেরল যখন বলা যাচ্ছে না, তার মানে চোর ভেতরেই আছে। সন্ধে ছ’টা থেকে যাঁরা যাঁরা মিউজিয়ামে উপস্থিত ছিলেন, সকলকে এখানে চলে আসতে বলুন!’ ওসি রিয়াজ আলমের কণ্ঠস্বর ধারাল। তীক্ষ্ণ।

সব নিরাপত্তা রক্ষী ও কর্মী-অফিসারদের ডেকে নিলেন ডিরেক্টর। প্রত্যেকে সারি দিয়ে দাঁড়ান। মিউজিয়ামের মূল ফটক বন্ধ করে দিয়ে বসান হয়েছে পুলিশ প্রহরা। কার্যত জাদুঘর ঘিরে ফেলে পুলিশ বাহিনী। মনিটরিং ঘরে বসে যান তিন জন অভিজ্ঞ কর্মী। রিয়াজের নির্দেশ, পর্দায় কড়া নজর রাখতে হবে।

‘সবাই এসেছে?’

‘একজন মিসিং স্যার!’ নিরাপত্তা আধিকারিক বলেন।

‘হোয়ট! কে সে?’

উত্তর না-দিয়ে মাথা নীচু করেন নিরাপত্তা আধিকারিক।

২৫

১৩ অক্টোবর। আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। পার্ক স্ট্রিট। কলকাতা।

‘কী হল, বলুন? কে মিসিং?’

রিয়াজের প্রশ্নের উত্তরে ইতস্তত করেন আধিকারিক।

‘বলুন?’ গলা চড়ায় রিয়াজ।
‘আটতলার মেইনটেনেন্স স্টাফ।’
‘সে ডিউটিতে ছিল আজ?’
‘ছিল।’
‘তাহলে আটতলার মেইনটেনেন্স স্টাফ এবং মূর্তি, দুই-ই গায়েব! তা এটা বলতে এত হেজিটেট করছেন কেন? আশ্চর্য!’

কিছুটা থই পায় রিয়াজ। ভেতরের লোক বা তাদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এই ধরনের অপরাধ বিরল। মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণের কর্মচারী মূর্তির কদর বোঝে। প্রাচীন পেইন্টিং, মূর্তি আর ম্যানাস্ক্রিপ্ট হাতাবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে আর্ট-মাফিয়ার দল। বেশ মোটা মূল্যে বিকিয়ে গেছে এই কর্মী। অথবা লোভে পড়ে নিজেই চুরি করেছে মূর্তিটা। অবশ্য এরপর নিজে যদি বেচতে চায় বাজারে, বেচা প্রায় অসম্ভব। উল্টে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর্টের চোরাচালানের একটা প্যারালাল জগৎ আছে, হদিস জানা না-থাকলে চোরাই শিল্পকর্ম বিক্রি করা যায় না।

কিন্তু এই স্টাফ যে একা নয়, তা বোঝা যায় ভুয়ো টেলিফোন কল দেখে। খুব কায়দা করে গোটা ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ঘটনার অনুক্রম বোঝার চেষ্টা করে রিয়াজ। গাড়িবোমা। ফোন কল। পাওয়ার কাট। গাড়িবোমার অনুষঙ্গ ব্যবহার করে

ফোন করা হয়েছে, তার মানে গাড়িবোমা বিস্ফোরণও কি ছক কষেই! তাই যদি হয়, এ তো বিশাল চেইন! বড় চক্রের কাজ বলেই মনে হচ্ছে!

‘কিন্তু সে পালাল কী করে?’ রিয়াজের প্রশ্ন।
‘পাওয়ার কাটের অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে স্যার। তাছাড়া আমাদের নিজেদের কর্মীকে আমরা সন্দেহ করব কেন স্যার! এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে পালিয়েছে!’ আধিকারিকের উত্তর।
‘ফোন করেছিলেন?’
‘ফোন, ওয়াকি সব বন্ধ!’
‘ওই কর্মীর ফাইল দেখি। কোথায় থাকে, কোন থানা?’
‘মন্টু ভট্টাচার্য। খুব দক্ষ স্টাফ স্যার। অত্যন্ত ভালো মানুষ। অবাক হয়ে যাচ্ছি স্যার ওর আচরণে। ও শিবপুরে থাকে। হাওড়া। শিবপুর থানার আন্ডারেই হবে স্যার।’
এক এএসআই-কে ডেকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে মন্টু ভট্টাচার্যের ছবি-ঠিকানাসহ বিশদ বিবরণ পাঠিয়ে দিতে বলে। অফিসের কম্পিউটারে রক্ষিত মন্টু ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে দ্রুত বার্তা পাঠান অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর। কমিশনারেটে ফোন করে দেয় রিয়াজও।

ফোন করে সোজা উঠে যায় আটতলায়। ইতোমধ্যে ফরেনসিক দল এসে, শুরু করে দিয়েছে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফিঙ্গার ও ফুটপ্রিন্ট স্কোয়াডও লেগে পড়েছে কাজে। রিয়াজ তাদের সঙ্গেই ঢোকে মূল জাদুঘরে। এগিয়ে যায় তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গ্যালারির সামনে। ডিরেক্টরও আছেন। গ্যালারির সামনে একটা বোটকা গন্ধ নাকে আসে।

‘কীসের গন্ধ?’ জিজ্ঞাসু রিয়াজ।

দু’বার নাক টেনে গন্ধ নিয়েই গম্ভীর হয়ে যান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ। রিয়াজের প্রশ্নের উত্তর দেন না।

খুব চেনা-চেনা গন্ধ। কিন্তু কীসের গন্ধ ঠাহর করতে পারে না রিয়াজ। দু-চারবার নাক টেনে গন্ধটা অনুধাবনের চেষ্টা করে। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর রিয়াজের কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলেন,

'স্যার গন্ধটা চেনা!'
'আমারও চেনা লাগছে কিন্তু ধরতে পারছি না!' নীচু গলায় বলে রিয়াজ।
'বাঘের গায়ের গন্ধ স্যার!'
'বাঘের!'

চমকে যায় রিয়াজ। বাঘের গায়ের গন্ধ কীভাবে এল এখানে? ডেকে পাঠায় ডগ স্কোয়াডকে।

২৬

জোর করে ডিরেক্টর পাওয়ার কাট করতে বাধ্য করলেন, নচেৎ নিরাপত্তা আধিকারিক একেবারেই রাজি ছিলেন না এই ধরনের পদক্ষেপে। সন্দেহ তাঁর ছিলই, মিনিট পনের অপেক্ষা করার পর যখন তিনি দেখলেন বাইরে রাস্তায় বা দোকানে বা অন্য বাড়িতে অবাধ আলো জ্বলছে, সরাসরি তিনি ফোন করলেন বিদ্যুৎ দফতরে। দফতরের বয়ান শুনে, দ্রুত দৌড়ে গিয়ে, সেন্ট্রাল সার্ভিস ব্রেকারের মূল স্যুইচ সচল করেন। আলোয় ভরে ওঠে জাদুঘর।

ডিরেক্টরকে সব কথা খোলসা করে বলতেই আবার নার্ভাস হয়ে পড়েন তিনি। শুরু করেন চিৎকার। প্রতিটি তলের গ্যালারি পরীক্ষা ও ইনভেন্টরি ধরে ধরে জিনিসপত্র মেলানোর নির্দেশ দিলেন। এই অন্ধকারে কিছু খোয়া গেল কিনা জানা দরকার। প্রতিটি তলের নির্দিষ্ট

রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীসহ নিরাপত্তা কর্মীরা শুরু করেন নিরীক্ষণ। তখনই নজরে আসে একজনের অনুপস্থিতি। আটতলার কর্মী মন্টু নিখোঁজ।

প্রধান কিউরেটরকে নিয়ে আটতলায় উঠে গেলেন স্বয়ং ডিরেক্টর। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃশ্যমান হল তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম বিভাগের গ্যালারির কাচ এক জায়গায় সযত্ন বিচ্ছিন্ন। পরপর সজ্জিত গুরু রিন-পো-ছের আট অবতারের একটি অদৃশ্য। তালিকা মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল সবথেকে দামি মূর্তিটিই অপহৃত। তন্নতন্ন করে আটতলার সমস্ত গ্যালারি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরীক্ষা করান ডিরেক্টর। আপাতত আর কিছু নজরে আসছে না। বাকি তলগুলোর গ্যালারি, বারংবার তত্ত্বতালাস করে দ্রুত রিপোর্ট দিতে বললেন নিরাপত্তা আধিকারিককে।

চোখে-মুখে উত্তেজনা নিয়ে তিনি নীচে নামেন এবং ঢুকে যান নিজের ঘরের অন্দরে। মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসেন। মিনিট দশেক সময় নিয়েছেন নিরাপত্তা আধিকারিক প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। এক-একটা মিনিটকে একযুগ মনে হয় ডিরেক্টরের। চাকরি বাঁচবে কিনা ঠিক নেই কিন্তু সম্মানহানী ঠেকাতে পারবেন না নিশ্চিত। তাঁকে ছেড়ে কথা বলবেন না অছি পরিষদের সদস্যরা।

প্রধান কিউরেটর ঘরে ঢোকেন। কানের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে কিছু বলে আবার বেরিয়ে যান। লম্বা একটা শ্বাস নেন ডিরেক্টর। ঘড়ি দেখেন। সাড়ে ন'টা বাজেনি। এখনও পাঁচ মিনিট দেরি। অন্য দিন এতক্ষণে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নেওয়ার কথা। আবার চোখ যায় ঘড়ির দিকে। ঠিক দশ মিনিট পর ফোন করবেন পার্কস্ট্রিট থানায়।

রাত ৯.২৫। মধ্য-কলকাতা।

ঠিক তখন, মধ্য-কলকাতার এক হোটেলের ক্যাশ কাউন্টারে এসে দাঁড়ায় একটি লোক। ঢোলা প্যান্ট ও গায়ে হাফহাতা জামা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পাতলা গোঁফ। ডান হাতে ঘড়ি। বাঁ-কাধে বড় ঝোলা ব্যাগ। একটু আগেই পার্ক স্ট্রিট থেকে গাড়ি করে

নেমেছে হোটেলের বেশ খানিকটা আগে এক গলির আলো-অন্ধকারে। বাকি পথ হেঁটে পৌঁছায় হোটেলে।

ক্যাশ কাউন্টারের ছেলেটি খাতা বার করেন। খাতায় পরবর্তী গন্তব্য লিখে লোকটি সই করে বিল মিটিয়ে দেয় দ্রুত। তারপর বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। আড়চোখে অপস্রিয়মাণ লোকটির দিকে একবার তাকিয়ে খাতায় চোখ দেন কাউন্টারের ছেলেটি। গন্তব্য শিলিগুড়ি। ট্রেন ধরার তাড়া আছে সম্ভবত। ছেলেটি সময় ও তারিখের ফাঁকা জায়গা ভরাট করতে তুলে নেন কলম।

ততক্ষণে ফুটপাথ ধরে হেঁটে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে লোকটি। হ্যারিসন রোডে পড়তেই হাঁটা থামায়। রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ে বিশাল এক বহুতল বিপণিতে। চাপে চলমান-সিঁড়িতে। উঠে যায় সোজা চারতলায়। ঝাঁ-চকচকে বিভিন্ন দোকানঘর। বাড়ছে রাত। খরিদ্দারের সংখ্যা কমছে। শান্ত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক দেখে লোকটি এগিয়ে যায় নির্জন প্রস্রাবাগারের দিকে। ঝাড়ন হাতে মেঝে পরিষ্কার-রত চারতলার ঝাড়ুদার লম্বা অলিন্দের অন্য প্রান্ত থেকে লক্ষ করেন লোকটিকে। দূর থেকে চোখ তুলে একবার চেয়ে আবার তিনি নিজের কাজে ফেরেন। মেঝে মুছতে মুছতে করিডোর বেয়ে ক্রমে এগিয়ে আসেন টয়লেটের দিকে।
কয়েক মিনিট অতিক্রান্ত। ধীরে নীরবতা নেমে আসছে গোটা মল জুড়ে। শত পায়ের ছাপ যত্ন করে মুছে ফেলতে হবে। আবার অপেক্ষা আগামিকালের। অলিন্দে অলিন্দে নতুন পদচিহ্ন পড়বে উপভোক্তার। গমগমিয়ে উঠবে অজস্র বিপণী। কাজ করতে করতেই কর্মীটি আবার চোখ তোলেন। আলখাল্লার মতো পোশাক পরিহিত এক সন্ন্যাসীকে দেখে কিছুটা থতমত খান তিনি। এই সাধু এখানে কী করছেন? সম্ভবত প্রস্রাবাগারে গিয়েছিলেন। মৃদু হেসে নমস্কারের ভঙ্গি করলেন। সন্ন্যাসীও হাসলেন।

মেঝে মুছতে মুছতে কর্মচারীর খটকা লাগে। বহুক্ষণ ধরেই তিনি মেঝে পরিষ্কার করছেন, কই, এই সাধুকে তো খেয়াল করেননি! কখন ঢুকলেন ইনি?

কী মনে করে, কর্মীটি কিছুক্ষণ থমকান, তারপর এগোন টয়লেটের দিকে। মুখ বাড়ান ভেতরে। শুনশান। খালি। তাহলে একটু আগে যে লোকটা ঢুকল, সে কোথায় গেল? ঝাড়নটা দেওয়ালের গায়ে রেখে এগিয়ে যান প্রস্রাবাগারের দিকে। নাকে আসে বোটকা একটা গন্ধ। কীসের গন্ধ? নির্জন চারতলায় টয়লেটের ভেতর একা দাঁড়িয়ে বেশ ভয় পেয়ে যান সাফাই কর্মী। দ্রুত বেরিয়ে আসেন টয়লেট থেকে। বাইরে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকান। খোঁজেন সন্ন্যাসীকে। না, কেউ নেই। শূন্য করিডোর।

ততক্ষণে সন্ন্যাসী ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে ঢুকে গেছেন এক বিপণিতে। কোনও দিকে না-তাকিয়ে একটি বড়সড় ট্রলি ব্যাগ পছন্দ করে দাম-মেটাবার কাউন্টারের দিকে গেলেন। দ্রুত দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন কমপ্লেক্স থেকে।

উঠে পড়লেন একটি গাড়িতে। গাড়িটি যেন তাঁর অপেক্ষাতেই ছিল। সন্ন্যাসী বাঁ-হাত তুলে ঘড়ি দেখলেন। পৌনে দশটা। মিটে গেছে প্রথম কাজ। মসৃণ। এবার দ্বিতীয়।
মহাত্মা গান্ধী রোডের দু'পাশের দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ করার পালা। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কার্ড তৈরি করেন যে দোকানি, ঝাঁপ বন্ধ করে প্রণাম করেন তালায়। ঠ্যালাওয়ালা রাস্তার ধারে ঠ্যালা রেখে একটি জিরিয়ে নিচ্ছেন। ফুটপাথের ফলবিক্রেতা রয়েসয়ে গুটিয়ে ফেলতে চান আয়োজন, যদি সম্ভাবনাময় শেষ খদ্দেরটিকেও ধরিয়ে দিতে পারেন দুটি আপেল, বেদানা বা এক থোকা আঙুর।

বৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন চলমান মহানগরের দিকে।

২৭

নৈরঞ্জনা নদীর পশ্চিম তীরে বিশাল অরণ্য। কুমার বনে প্রবেশ করে নব তৃণে আচ্ছাদিত একটি অশ্বত্থবৃক্ষের পাদদেশে উপস্থিত হলেন। ওই বৃক্ষের নীচে নিমীলিত নয়নে পদ্মাসনে

ধ্যানে উপবেশন করলেন বোধিসত্ত্ব-কুমার। তাই দেখে স্বর্গের দেবতারা আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। বনের পশু এবং পক্ষীগণ তখন কোনও শব্দ করল না। বায়ুদ্বারা আন্দোলিত বনের বৃক্ষসমূহের মরমর শব্দ উঠল না। সমস্ত বন তখন নিশ্চল, নিশ্চুপ।

বোধিলাভের সঙ্কল্পে দৃঢ় শাক্যপুত্র সিদ্ধার্থের ধ্যানস্থ মূর্তি দেখে জগতের জীবসকল ও দেবতারা সকলে আনন্দিত হলেও একজন কিন্তু আনন্দিত হল না। কে সে? সে হল মার। সে আনন্দ তো পেলই না, উল্টে তাঁর অতিশয় ক্ষোভ জন্মাল। কিন্তু এই মার কে?

মদনের পুষ্পবাণ ও কামপ্রবৃত্তির অধীশ্বর যিনি এবং যিনি মোক্ষ ও সদ্ধর্মের শত্রু, তিনিই মার। তাঁর তিন পুত্র, তিন কন্যা। বিভ্রম, হর্ষ ও দর্প তাঁর তিন পুত্র। তিন কন্যা হল রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা। মার তাঁর পুত্রকন্যাদের উদ্দেশে বললেন, এই মুনি পরম জ্ঞানের অভিলাষে সঙ্কল্পের কঠিন কবচ ধারণ করে আমার অধিকার খর্ব করতে ধ্যানে বসেছে। বোধি লাভ করলে এই শাক্যমুনি জগতে মুক্তির উপায় জানালে আমি বৃন্তচ্যুত ফলের মতো খসে পড়ব। অতএব এই মুনির ধ্যানভঙ্গ করতে হবে। প্রবল নদীস্রোত যেমন সেতু ভঙ্গ করে সেইভাবে এই মুনির ওপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তারপরেই মার তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে শাক্যসিংহের ওপর বাণ প্রয়োগ করল। তারপর কী ঘটল? শাক্যসিংহের ধ্যান কি ভঙ্গ করতে পারল মার? কীভাবে বোধিলাভ করলেন শাক্যপুত্র?

আট-নয় বছরের বালক দাওয়া গল্প শুনছে হাঁ করে। বুদ্ধচরিত থেকে গল্পের আকারে তথাগত'র জীবনের গল্প শোনাচ্ছিলেন এক বর্ষীয়ান লামা। সঙ্ঘারামে ছোটো ছোটো শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দায়িত্ব নেন বয়স্ক লামারা। বছর দেড়েক হল জোগচেনের এই সঙ্ঘারামে শিক্ষার্থী লামা হয়ে এসেছে দাওয়া।

সাত বছরের জন্মদিনে বাড়িতে জ্যোতিষীরা ভিড় করেছিল। মা-বাবা উৎকণ্ঠায় তাকিয়েছিল তাঁদের দিকে। কী বলবেন তাঁরা? কী ভবিষ্যৎবাণী করবেন সাত বছরের বালক দাওয়ার জন্মকুণ্ডলী দেখে? গ্রামের আরও লোকজন ভীড় করেছে। এসেছে গাঁওবুড়ো। গ্রামের গুম্ফার দুই লামা। জন্মকুণ্ডলী পড়েই জ্যোতিষীরা চিহ্নিত করল দাওয়া লামা-লক্ষণযুক্ত।

সেই থেকে সে মা-বাপ-বাড়ি ছেড়ে চলে আসে সঙ্ঘারামে। এখানে তিনটে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। তিনটে সঙ্ঘারামের প্রধান লামা একজনই। ক্রুকু দ্রেমে। তিনি গুরু। গুরুকে তারা বলে লো-পোন। অশীতিপর সেই বুড়ো লামা খুব ভালো। ছোটোদের সঙ্গে মিশে যেতেন শিশুর সারল্যে। প্রথম প্রথম মন বসত না দাওয়ার। বাড়ির জন্য, মা-বাবার জন্য মন কেমন করত। কিন্তু আস্তে আস্তে অগ্রজ লামাদের যত্ন ও সাহচর্যে ভালো লেগে গেল সঙ্ঘারামের পরিবেশ। বেশি ভালো লাগল লো-পোনকে।

ছোট্ট দাওয়া ধীরে ধীরে ভালোবেসে ফেলল তাঁর লামাজীবন। সে জানল মার-এর ভীতিপ্রদর্শনের পরও শাক্যমুনি ভীত হলেন না, ধ্যানাসনও ত্যাগ করলেন না। তারপর শর নিক্ষেপ করল মার। না, শাক্যমুনি গ্রাহ্য করলেন না। অতঃপর মার শাক্যমুনিকে নানাভাবে বিধ্বস্ত করার জন্য তার নিজস্ব সেনাবাহিনীকে স্মরণ করল। মুহূর্তে বিভিন্ন অনুচরবর্গ শূল, গদা, কুঠার, মুষল ইত্যাদি নিয়ে অশ্বত্থবৃক্ষের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে শাক্যমুনিকে ঘিরে ফেলল। এই অনুচরদের কারও মুখ শূকরের ন্যায়, কারও অশ্বের, কারও গর্দভের, কারও ব্যাঘ্রের, কারও ভল্লুকের, কারও সিংহের। আবার কারও হস্তীর। কারও একটি মাত্র চক্ষু, কারও বহুমুখ, কারও স্ফীত উদর।

মার-এর কাহিনী শুনে উত্তেজিত হত ছোট্ট দাওয়া। তার মনে হত শাক্যমুনির ধ্যান বিনষ্টকারী মার ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে সে। নিজেকে বীরপুরুষ ভাবত দাওয়া। অগ্রজ লামা তার মুণ্ডিত মস্তকে হাত বুলিয়ে শোনাতেন মার-এর ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনী।

মার-এর অনুচরবর্গের কেউ ত্রিশূল হাতে নৃত্যরত, কেউ গদা হাতে লাফাচ্ছে। কেউ বৃষের মতো ডাকছে, কেউ নিজের লোম থেকে আগুন বার করছে। মার-এর সৈন্যদের এমন আচরণে সারা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। ধরিত্রী কেবল কম্পিত হল না, প্রকৃতিও চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রবলবেগে বায়ু বইতে শুরু করল, রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হল। মার-এর অনুচরদের এই আচরণে শাক্যমুনি ক্রুদ্ধ হলেন না। তাঁর মানসিক বিকারও উৎপন্ন হল

না। গাভীদের মধ্যে সিংহ যেমন স্থির অবস্থান করে, তিনি তেমনই রইলেন। মার-এর অনুচরবর্গ শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারল না। এমনকী পিশাচগণ এসেও শাক্যমুনির কোনও ক্ষতিসাধন করতে ব্যর্থ হল। সকলে অনুভব করল, জগতের জীবসকল সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন, তারা তীরে উঠতে অক্ষম, এই সকল অসহায়দের যিনি উদ্ধার করতে কঠিন শ্রম করেন, সেই রকম সহৃদয় পরাক্রমী তেজী দৃঢ় মুনিকে বাধা দেওয়া অপরাধ। তারা এও বুঝল এই মুনি পরমজ্ঞান লাভ করে, জগতের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেই স্বীয় আসন থেকে গাত্রোত্থান করবেন।

শাক্যমুনির জীবন কাহিনী শুনতে শুনতে লামা-জীবনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে দাওয়া, সঙ্ঘারামের পরিমণ্ডল ক্রমশ গ্রাস করছে মন ও শরীর। কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যে বদলে গেল সব। পরিবর্তন এল ধর্মীয় আবহাওয়ায়। অনুপ্রবেশ করল রাজনীতি। শুরু হল অশান্তি। বয়স্ক লামারা আলোচনা করতেন অজানা আশঙ্কার। বিদেশি শত্রুরা এসে নাকি দখল করে নেবে তাদের প্রিয় দেশ! ছোট্ট দাওয়া কিছুই বুঝতে পারত না। মাথায় ঢুকত না কোনও শঙ্কার মেঘ। কিন্তু শেষপর্যন্ত একদিন ছোট্ট মাথাতেও প্রবেশ করল আতঙ্ক।

বাতানুকূল গাড়ির ভিতর বসে বাইরে চেয়ে থাকেন বৃদ্ধ লামা। শক্ত হয় চোয়াল। আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও সেদিনের সেইসব দৃশ্য তিনি ভুলতে পারেননি। শয়নে-স্বপনে তারা আসে ফিরেফিরে। মাথার ভেতর এক স্থায়ী চিত্রমালা হয়ে থেকে গেছে সেই দৃশ্যাবলী। না, একমুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারেন না! পারা যায় না!

তাদের সঙ্ঘারামেও একদিন ওরা এল। ওরা মানে ভিনদেশি সৈন্যদল। চৈনিক। অন্তত শ'খানেক সৈন্যের একটি বাহিনী। এসেই প্রচুর অর্থ, বাসস্থান ও খাবারের দাবি করল। গাঁয়ের মোড়ল ও গুম্ফার লামারা মিলে কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করল, এমনকী ব্যবস্থা হল থাকারও। ঠিক হল, গুম্ফার ভেতরেই, উপাসনাগৃহে, তারা থাকবে। এত লোককে থাকতে দেওয়ার মতো পরিসর, এক গুম্ফা ছাড়া, গাঁয়ে আর কোনও জায়গা নেই।

গোটা বাহিনী হইহই করে ঢুকে পড়ল গুম্ফায়। কিন্তু শান্তিতে বাস করার উৎসাহ তাদের নেই। অচিরেই ধারণ করল নিজ মূর্তি। ধর্ম-কর্ম তারা মানে না। তারা মনে করে ধর্মই যত নষ্টের মূল।

আদিবুদ্ধ বজ্রধর। পদ্মের ওপর তিনি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। বুকের মাঝে স্থাপিত তাঁর দুই হাত। হাতে বজ্র ও ঘণ্টা। বজ্র দক্ষিণ হস্তে, ঘণ্টা বামে। বজ্রযানী বৌদ্ধদের কাছে বজ্রধর শূন্যমূর্তি। তাঁর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। সেই শক্তির সঙ্গে কখনও তিনি যুগনদ্ধ। বজ্রযানী বৌদ্ধরা এই যুগনদ্ধকে বোধিচিত্ত মূর্তি রূপে পুজা করেন। এছাড়া আছেন পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের পঞ্চশক্তি। তারা, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা ও লোচনা। বজ্রযান দেবমণ্ডলের প্রতিটি মূর্তি বা চিত্র, বহু যত্নে ও পবিত্র উপচারসহ, গুম্ফার উপাসনা-গৃহ সজ্জিত।

মুহূর্তে সেই পবিত্র উপাসনা-গৃহ পরিণত হল নরকে। ভূপতিত হল শাক্যসিংহের ধাতুর মূর্তি। গুরু পদ্মসম্ভব ও অবলোকিতেশ্বরের কাষ্ঠমূর্তি ছিটকে পড়ল মেঝেয়। অন্যান্য দেবদেবীদের দুর্দশাও অনুরূপ। থাংকা হল ছিন্নভিন্ন। ধাতুর দামি তৈজস চূর্ণ করল হেলায়। নিজস্ব ভাষায় তাদের চিৎকারের, অর্থ বোধগম্য না-হলেও, ভঙ্গি দেখেশুনে বোঝাই যায় ইতর শব্দ প্রয়োগ করছে তারা। পরম ভক্তি ও মমতায় যে গ্রামবাসীরা মূর্তি, ছবি বা থাংকা বুকে আগলে রক্ষা করতে গেল, ভারি বুটের লাথি জুটল তাদের মুখে, বুকে, পেটে।

গুম্ফায় মাখন-বাতি বা কর্‌মে জ্বালানো তিব্বতি ধর্মীয় রীতি। কর্‌মে নিভে-যাওয়া বা নিভিয়ে-দেওয়া গুরুতর পাপ এবং অশুভ লক্ষণ হিসেবেই চিহ্নিত। চিনারা ঠিক সেটাই করল। থু-থু করে থুতু ছিটিয়ে নিভিয়ে দিল মাখন-প্রদীপ। মঙ্গলদীপ আর অনির্বাণ হল না। দীপ নিভিয়ে দেওয়ায় তীব্র প্রতিবাদে চিৎকার করে ওঠে এক লামা। এখনও নাম মনে আছে তাঁর। জোগচেন সোপা।

সোপা'র সঙ্গে আরও দু'জন লামাও প্রতিবাদ করেছিল সামগ্রিক অন্যায় আচরণের। এই তিন লামারই পরিণাম হল ভয়াবহ। গ্রামবাসীদের দিয়েই তিনটি গর্ত খোঁড়াল প্রান্তরে। তিনজন লামাকে বুটের ডগা দিয়ে লাথি মেরে-মেরে ফেলল এক-একটি গর্তে। তারপর

দশজন গ্রামবাসীকে বন্ধুকের ডগায় বাধ্য করল তিন লামার ওপর মূত্রত্যাগ করতে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে গ্রামবাসীরা তা-ই করল। করতে বাধ্য হল। যারা ইতস্তত করল তাদের জুটল বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো আর লাথি। শেষে সৈন্যরাও কেউ কেউ পেচ্ছাপ করল লামাদের গায়ে।

তারপর তাদের গলায় শেকল বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল উঁচু পাহাড়ে। মাঠ থেকে সংগ্রহ করিয়ে, বালতি ভরিয়ে, মাথায় নিতে বাধ্য করল মানুষের মল। মাখন-প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করেছিল যে লামা, জোগচেন সোপো, তাকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে চতুষ্পদের ভঙ্গিতে হাঁটাল, ভাঙা পাথরের টুকরোর ওপর দিয়ে। প্রায় পনের মিনিট চলার পর লামার দুই হাঁটু রক্তাক্ত, না, সেখানেই শেষ হল না সেই পর্ব। ঝোপঝাড় থেকে কাঁটা এনে বিছিয়ে দিল পথে। তার ওপর দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করল লামাকে।

তিন গুম্ফার লামাসহ অন্তত সাতশো সন্ন্যাসীকে ওরা গ্রেফতার করল। প্রধান লামা বৃদ্ধ ক্রুকু দ্রেমে হতভম্ব। প্রাণবন্ত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কয়েকঘণ্টায় যেন স্থবির। দূরে দাঁড়িয়ে প্রিয় লো-পোনের দিকে দৃষ্টি যায় দাওয়ার। জপমালা হাতে বিড়বিড় করে আউড়ে চলেছেন মন্ত্র। এবার ওদের চোখ পড়ল তাঁর ওপর। উন্মত্ত চিতা যেন আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে গেছে শিকার। লো-পোনকে ঘিরে ধরে অন্তত দশ-বারো জন সৈন্য শুরু করল ঠাট্টা-মস্করা। ধীরে ধীরে প্রধান লামার সঙ্গে ওরা যা করল, শিউরে উঠল উপস্থিত সকলে।

২৮

সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সম্মাননীয় ব্যক্তিকে আক্রমণের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর সম্মানে আঘাত করা। তাঁর নাম বদনাম করা। চিনারা ঠিক তাই করল। প্রথমেই লো-পোনের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করল, তাঁর নাকি অনেক টাকা ও সম্পত্তি। প্রতিবাদ করেন লো-পোন। তাঁর বিরুদ্ধে একের-পর-এক মিথ্যে অভিযোগ, বদনামের পাহাড় বানাল জনসমক্ষে। কেবল

অর্থনৈতিক দুর্নীতি নয়, চরিত্র নিয়েও কটাক্ষ। লামা হয়েও তিনি পতিতার সঙ্গ করেন, লুকিয়ে বিয়ে করেছেন ইত্যাদি নানা অশালীন অভিযোগ। প্রতিটি অভিযোগেরই প্রতিবাদ করছিলেন বৃদ্ধ লো-পোন। শান্তস্বর তাঁর।

ওই শান্তমূর্তি, স্থির আচরণ সহ্য করতে পারল না সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। হঠাৎ এক সৈন্য বৃদ্ধ লামার মুণ্ডিত মস্তকে তার বজ্রমুষ্টি দিয়ে আঘাত করল, কাতরে উঠলেন বৃদ্ধ মানুষটি। আরেকজন পেছন থেকে এসে ধাক্কা দিল প্রবল। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন লো-পোন। ছিটকে গেল জপমালা। ছুটে গেল দুই শিষ্য গুরুকে দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে। ভারী বুটের লাথিতে তাদের সরিয়ে দিল সৈন্যদল। কাতরাতে কাতরাতে ডান হাতে ভর দিয়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন লো-পোন। একজন সৈন্য হাসতে হাসতে এসে কেটলি থেকে তাঁর মাথায় ঢেলে দিল গরম জল। ফুটন্ত।

সেই দৃশ্য মনে পড়লে, কেঁপে ওঠেন বারংবার। এখনও। মুষ্টিবদ্ধ হয় ডান হাত। জানালা দিয়ে চেয়ে থাকেন বৃদ্ধ লামা আলোকিত মহানগরের দিকে, কিন্তু দৃষ্টি বরফের দেশে। স্বদেশ।

হিমালয়ের কাঁখে তাঁর দেশ। বছরের অধিকাংশ সময় বরফের চাদরে মোড়া। তাদের ভাষায় পো-দিউল। বরফের দেশ। যখন রোদেলা হয় পাহাড়, গ্রীষ্ম আসে, পাহাড়ে পাহাড়ে রুক্ষ ঢালে গড়িয়ে চলে তাঁদের জীবন। সেইসব নুড়ি ও পাথর, জীবনের উপলখণ্ড নিতান্তই আটপৌরে। চাহিদাহীন। নীল আকাশ, সফেদ মেঘ আর হরিৎ বুগিয়ালের কোলে ছবির মতো লেপ্টে থাকে আটপৌরে গ্রামগুলো। চাষবাস কিছু হয় বটে, পশুপালনই প্রধান বৃত্তি ছোটো ছোটো জনপদের। অজস্র ইয়াক, ভেড়া আর বুনো তিব্বতি ছাগল চরে বেড়ায় সবুজ উপত্যকায়।

পাইন, বার্চ, তিব্বতি সাইপ্রেস, ওক, চাইনিজ জুনিপারসহ অসংখ্য সরলবর্গীয় গাছের মেলা। গাঁয়ের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে রঙিন দার-চেন ধ্বজা। পাইন গাছ থেকে অপর প্রান্তের পাইনে ঝোলান অজস্র রঙিন লুংদার। কাষায় বস্ত্রাবৃত লামা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করেন মন্ত্র। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।

একজন বোধিসত্ত্ব প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের সঙ্গী। বোধি অর্থে জ্ঞান আর সত্ত্ব হল সারাৎসার। তিনি অব্যক্ত বুদ্ধ। বুদ্ধের জন্মজন্মান্তরের এই দশাই বোধিসত্ত্ব-দশা। বোধিসত্ত্বের মধ্যে বুদ্ধের বীজ নিহিত। ক্রমে সেই বীজ ফেটে বুদ্ধত্বে রূপ নেয়। বোধিসত্ত্বদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর আর মঞ্জুশ্রী প্রধান। মঞ্জুশ্রী চিরনবীন। জ্ঞানের দেবতা। তিনি বাগীশ্বর। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি। তাঁর সঙ্গিনী তারা। অবলোকিতেশ্বর করুণার প্রতিমূর্তি আর তারা প্রজ্ঞার। অবলোকিতেশ্বর এই দুঃখময় দুনিয়া অতিক্রম করতে মানুষকে সাহায্য করেন।

ওঁ মণিপদ্মে হুঁ—মাত্র তিনটি শব্দ, বোধিসত্ত্বের সবচেয়ে পবিত্র ও কার্যকরী সিদ্ধমন্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে কুলকুণ্ডলিনীর বীজমন্ত্র হুঁ। মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে, কুলপীঠ বা মূলাধার চক্রকে বলে মণিপদ্ম। তিন শব্দের এই মন্ত্রটি বোধিসত্ত্বেরও সিদ্ধমন্ত্র। সেই মন্দ্রস্বর ভেসে বেড়ায় গাঁয়ের বাতাসে। চরাচর অপাপবিদ্ধ। গাঁয়ের মোড়ল আর জপমালা-মণিচক্র হাতে গুম্ফার লামাই গাঁয়ের অভিভাবক। প্রকৃতির বুকে এই জীবন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত কিন্তু আনন্দময়। সেই আনন্দ এক লহমায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয় বিদেশি সৈন্যদল।

মাথায় ফুটন্ত জল দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় অশীতিপর বৃদ্ধের। লো-পোনের সেই ছটফটানি সহ্য করতে পারে না কেউ। গ্রামবাসীরা চিৎকার করে ওঠে। সমবেত।

ছোট্ট দাওয়াও পারে না সইতে। হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা পাথরের টুকরো তুলে ছুঁড়ে মারে কেটলি-হাতে সেই সৈন্যের দিকে। পাথরের টুকরোটা সজোরে গিয়ে লাগে কপালে। গলগলিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে সেনার কপাল বেয়ে।

অন্য এক সৈন্য দৌড়ে এসে দাওয়ার ঘেঁটি ধরে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে অন্যান্য সৈন্যদের মাঝে। রক্তাপ্লুত সৈন্যটি হাসতে হাসতে ছোট্ট দাওয়ার কাছে আসে। পায়ের বুট দিয়ে সরিয়ে দেয় তার চীবর। তারপর ডান উরুর ওপর কেটলি থেকে ছরছর করে ফেলে গরম

জল। কঁকিয়ে ওঠে শিশু দাওয়া। কেবল সন্ন্যাসীরা নয়। গ্রামবাসীরাও প্রতিবাদে গর্জে ওঠে।

তার ফলও হয় মারাত্মক।

গোটা গ্রামটাই মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপ। যতটা শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে অনেক বেশি। কষ্টসহিষ্ণু পাহাড়ি জনজাতির মানুষ তারা। ঘৃণা ও অপমানে ঠকঠক করে কাঁপছিল সকলে।

সেদিনের সাত-আট বছরের এক বালক, প্রায় সত্তর বছর আগে দেখা সেই দৃশ্য আজও এই বৃদ্ধ বয়সে ভুলতে পারেন না। গাড়ি ওঠে শিয়ালদা ফ্লাইওভারে। বাঁদিকের জানালা দিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চেয়ে থাকেন আলোকিত স্টেশন চত্বরের দিকে।

২৯

আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। পার্ক স্ট্রিট। কলকাতা।

ডগ স্কোয়াডের প্রশিক্ষিত পোষ্যটি আটতলার গ্যালারি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজা দিয়ে বাইরে বেরোল। তারপর ছুটল ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। কুকুরটা পাঁচিলের কাছে গিয়ে চিৎকার করছে দেখে বোঝা গেল, সন্দেহভাজন পাঁচিল টপকে পালিয়েছে। দক্ষিণ-পুবের পাঁচিলের পাশেই ফুটপাথ। কুকুরটাকে ঘুরিয়ে প্রধান ফটকের দিকে নিয়ে গেলেন পুলিশকর্মী। পাঁচিলের পাশে ফুটপাথে নিয়ে যাওয়ার পর সে ছুটল ভিড়ের দিকে। জ্বলন্ত গাড়িটিকে নিরাপদ দূরে দড়ি দিয়ে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ভিড় এখন অনেকটা পাতলা। পুলিশের কুকুর দেখে সমবেত জনতা ছেড়ে দিল জায়গা। কুকুরটা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে এদিক-ওদিক খানিক ছোটাছুটি করল, তারপর ভিড় পেরিয়ে ছুটল রডন স্ট্রিট আর পার্ক

স্ট্রিটের মোড়ে। তারপর এদিক-ওদিক খানিক ছোটাছুটি করে, কোনও নির্দিষ্ট দিকে না-গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিভ্রান্ত। হাওয়ায় মিলিয়েছে গন্ধ। তালিমপ্রাপ্ত কুকুরও ঠাহর করতে ব্যর্থ।

ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে রাস্তার সিসি ক্যামেরার নির্দিষ্ট সময়ের ফুটেজ আনতে পাঠায় এক সহকর্মীকে। তারপর ফের আটতলার গ্যালারিতে ফেরে রিয়াজ।

আট ধর্মপাল বা দ্বারপালের মধ্যে একমাত্র দেবী পেলডেন লেহ্‌মো। ধর্মপালদের মুখাবয়ব ও আকার-আকৃতি ভয়ানক প্রকৃতির হলেও তাঁরা কেউই ক্ষতিকারক নন। এঁরা সকলেই বোধিসত্ত্ব। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের রক্ষা করার জন্য এঁরা নিয়োজিত। তিব্বতি সরকারের রক্ষাকর্ত্রী পেলডেন লেহ্‌মো। এমনকী ভারতে নির্বাসিত তিব্বতি সরকারকে তিনিই রক্ষা করেন বলে বিশ্বাস করেন তিব্বতিরা। মহাকাল, আট ধর্মপালের অপর একজন, তাঁর সঙ্গী।

‘পেলডেন লেহ্‌মোর সংস্কৃত নাম কী জানেন?’

দু’দিকে মাথা নাড়ে রিয়াজ।

‘শ্রীদেবী।’ বলেই মুচকি হাসেন কিউরেটর।

চিফ কিউরেটর ভদ্রলোকের থেকে মিউজিয়ামের প্রাথমিক পরিচয় পেতে থাকে রিয়াজ। তার অ্যাকাডেমিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ডিরেক্টর নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন কিউরেটরকে। বুকের পরিচয় পত্রে লেখা আছে নাম। তনুময় পাল।

মহাকাল ও শ্রীদেবীর ভয়াল চিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে রিয়াজ। এতদিন হয়ে গেল মিউজিয়ামটি কলকাতায় চালু হয়েছে, কখনও দর্শন করতে আসতে পারেনি। যাও-বা

আজ এল, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তদন্তের সূত্রে। ভেতরে ভেতরে কিছুটা কুণ্ঠিতই হয় রিয়াজ।

‘ওই মূর্তিটি ছাড়া আর সব কিছু ঠিকঠাক আছে?’ কিউরেটর তনুময় পালকে জিজ্ঞাসা করে রিয়াজ।
‘ইনভেনট্রি মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আরও ভালো করে দেখতে হবে। তবে প্রাইমা ফ্যাসি যা রিপোর্ট দিয়েছেন চিফ সিকিউরিটি অফিসার, ওই মূর্তিটাই মিসিং!’ উত্তর দেন ডিরেক্টর। এখন তিনি কিছুটা ধাতস্থ।

‘চোর তাহলে ওই মূর্তিটাই নিতে এসেছিল!’
‘তাই তো মনে হচ্ছে!’
‘বুদ্ধের মূর্তি?’
‘না। গুরু পদ্মসম্ভবের।’

জিজ্ঞাসু চোখে চিফ কিউরেটর তনুময় পালের দিকে তাকিয়ে রইল ওসি রিয়াজ আলম।

‘তিনি রিন-পো-ছে। তিব্বতের মহাগুরু। তাঁকে দ্বিতীয় বুদ্ধ বলে।’
‘কী আছে স্পেশালিটি এই মূর্তির?’
‘গুরু রিন-পো-ছে’র অনেক রূপ। সবথেকে ক্রুদ্ধ রূপ হলো গুরু বজ্র বা বজ্রকুমার। তিব্বতি ভাষায় বলে দোরজে জে-লো। সমস্ত বাধাবিপত্তি যিনি দূর করেন। শুভশক্তির বিরুদ্ধে সব অশুভশক্তিকে তিনি ধ্বংস করেন—’
‘মূর্তিটা গুরু বজ্রকুমারের?’ তনুময়বাবুকে থামিয়ে প্রশ্ন করে রিয়াজ।
‘গুরু পদ্মসম্ভবের।’
‘পরিষ্কার করে বলুন স্যার, বুঝতে পারছি না।’
‘গুরু পদ্মসম্ভবের আটটা রূপ। প্রধানত আটটা রূপ। মূর্তিটা এই আট রূপের একটি বজ্র বা বজ্রকুমারের। বোঝা গেল?’
‘মূর্তির বিবরণ দিন প্লিজ।’

‘এক বাঘিনীর পিঠে গুরু রিন-পো-ছে দাঁড়িয়ে আছেন নাচের ভঙ্গিতে। ডান হাতে বজ্র আর বাঁ হাতে একটা কাঁকড়া বিছে।’
‘সোনার?’
‘হ্যাঁ। ছবিটা দেখাও।’ কিউরেটর এক কর্মচারীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

ক্যাটালগ থেকে ছবি বার করেন সেই কর্মচারী। চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছবিটা দেখে রিয়াজ। মূর্তিটার একটা ভয়াল রূপ আছে। ভীতু কুকুরের মতো শুয়ে আছে বাঘটা। তার ওপরে ভয়ঙ্কর এক পুরুষ যেন তাণ্ডব-নৃত্যের ভঙ্গিমায়। কানে তার মাকড়ি, গলায় নরমুণ্ডমালা। মাথায় কোঁকড়া চুল। ভয়ানক দুই চোখ। আবার একটা তৃতীয় নয়নও আছে কপালের মাঝে। পোশাক তিব্বতি লামাদের মতো। ভেতরের বস্ত্র ঢেকে রেখেছে আলখাল্লার মতো উপরিবাস।

‘এই মিউজিয়াম কারা চালায় স্যার?’ রিয়াজের প্রশ্ন ডিরেক্টরকে।
‘ট্রাস্টি বোর্ড আছে।’
‘খবর দিয়েছেন বোর্ড মেম্বারদের?’
‘না। ম্যানেজিং কমিটির সবাইকে দিয়েছি। পাঁচজন মেম্বার। একজন এইমুহূর্তে আউট-অফ-স্টেশন। সেক্রেটারিসহ বাকিরা এক্ষুনি এসে পড়বেন। তারপর ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বারদের খবর দেব।’
‘মিডিয়া?’ রিয়াজের জিজ্ঞাসু চোখ ডিরেক্টরের দিকে।
‘না, আমরা কাউকে ফোন করিনি।’

৩০

ডিরেক্টরকে নিয়ে নীচে নামে রিয়াজ। আবার ডেকে পাঠায় নিরাপত্তা আধিকারিককে। নিরাপত্তার একটা ঢিলেমি আছেই। এত মূল্যবান সামগ্রী আছে যে মিউজিয়ামে, সেখানে

আরও আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার প্রয়োজন। রিয়াজের অভিযোগ কিছুটা মেনেও নেন আধিকারিক।

ভবনের ভূগোল বুঝতে হলে বিল্ডিং-এর নকশা দেখা দরকার। একতলায় দেওয়ালের গায়ে বোর্ডে অঙ্কিত নকশাটির কাছে এগিয়ে যায় রিয়াজ। পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে। তারপর টেবিলে-রাখা ভবনের মিনিয়েচার মডেলটিও যাচাই করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

বিভিন্ন এলাকা বা জোন-এ ভাগ করা ভবন। জরিপ করে জোনড এরিয়া। বুঝে নেয় সিঁড়ি আর লিফটের অবস্থান। করিডোরের দৈর্ঘ্য ও জানালার গ্লাস প্যানেলগুলোর মাপ নোট করে ফোনের ডকুমেন্ট ফাইলে। গুনে নেয় গ্যালারি আর স্টোরের সংখ্যা। চিহ্নিত করে ইন্টারন্যাল দরজাগুলো। টুকে নেয় পেরিমিটার ফেন্সিং ও মূল ফটক থেকে ভবনের দরজার দূরত্ব।

‘আপনাদের নিশ্চয়ই টুয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন সিকিউরিটি?’
‘হ্যাঁ স্যার।’
‘পার্সোনেলরা থাকে, না বাড়ি থেকে যাতায়াত করে?’
‘দু’রকমই আছে স্যার। আমাদের কোয়াটার্স আছে বেগবাগানে। ওখানে অনেকেই থাকে যাদের দূরে বাড়ি।’
‘মন্টু ভট্চায যাতায়াত করত!’
‘ওর তো স্যার কাছে বাড়ি।’
‘ইন্ট্রুডার ডিটেকশন সিস্টেম বলতে ওই পিআইআর ডিটেকটর আর সিসি টিভি?’
‘হ্যাঁ স্যার।’

প্রাচীন মূর্তি, তৈলচিত্র, ছবি, অস্থি, বিভিন্ন নথি, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বিশ্বের সব মিউজিয়ামের অন্দরমহলই বিশেষভাবে সজ্জিত। মিউজিয়ামের ক্ষেত্রে ক্লাইমেট কন্ট্রোল সিস্টেম খুব জরুরি। এলাকা অনুযায়ী তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার ভারসাম্য

রক্ষাই এক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই মিউজিয়ামেও কলকাতার জলবায়ুর সাপেক্ষে অন্দরমহলের তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্দিষ্ট উচ্চতায় বাঁধা।

‘বিল্ডিং-এর এইচভিএসি সিস্টেম মিউজিয়াম ম্যানুয়াল ফলো করছে তো? প্ল্যানটা দেখাবেন।’ বলে রিয়াজ।
‘হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়ই দেখাব।’

রিয়াজ জানে, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের স্বার্থেই দুনিয়ার সব জাদুঘর বা হেরিটেজ বিল্ডিং-এর সব ঘরেই হিটিং, ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম বা এইচভিএসি স্থাপন করতে হয় সুচারুভাবে। এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিরাপত্তাজনিত কারণেও প্রয়োজন। প্রতিটি হল-ঘর বা গ্যালারিতে অজানা গতিবিধি চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় প্যাসিভ ইনফ্রারেড সেন্সর বা পিআইআর-এর মাধ্যমে।

দু’জন এএসআইকে ডেকে নেয় রিয়াজ। পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় ফরেনসিকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক কী রিপোর্ট তাঁদের তৈরি করতে হবে। আটতলার গ্যালারির পিআইআর ডিটেকটর পরীক্ষা করতে হবে, দেখতে হবে কীভাবে কাজ করছে যন্ত্র। ডেটা লগার-এ কী তথ্য রেকর্ড আছে? তাছাড়া কতটা কার্যকরীভাবে বসান আছে সিসি টিভি, দেখতে হবে তা-ও। সিকিউরিটি লাইটিং কতটা উপযুক্ত, জ্বালিয়ে-নিভিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে তাপমাত্রার তারতম্য হলে বা এসি বন্ধ করে দিলে পিআইআর কতটা কাজ করছে বা আদৌ করছে কি না। দর্শনীয় বস্তুগুলো কীভাবে, কতটা দূরত্বে দর্শকদের কাছে প্রদর্শিত হচ্ছে, এমনকী গ্যালারির সাজসজ্জাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও নিরাপত্তা-বিধি জড়িত।

একজন কর্মী যখন পলাতক, রিয়াজ জানে কেস খুব জটিল হবে না, তবুও ফাইলে রাখতে হবে নিরাপত্তা-গাফিলতির সব রিপোর্ট। সবটা বুঝে দু’জন কনস্টেবলকে নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যান দুই পুলিশ আধিকারিক। মিউজিয়ামের দু’জন কর্মী ও চারজন নিরাপত্তা রক্ষীও তাঁদের সঙ্গী হন।

অ্যান্টিক থেফট সেকশনে কাজে ঢোকার পর জাদুঘরসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভবনের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ বিধি নিয়ে পড়াশোনা করেছে রিয়াজ। হায়দ্রাবাদে এই বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার-কর্মশালাতেও অংশ নিয়েছিল সে। এছাড়া বিভিন্ন শহরে একাধিক সর্বভারতীয় ট্রেনিং কর্মসূচিতেও, জয়েন্ট কমিশনার রজতস্যার পাঠিয়েছিলেন রিয়াজকে। এখান থেকে কয়েক-পা-দূরত্বের ভারতীয় জাদুঘরে বহুবার গিয়ে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছে নিরাপত্তা ম্যানুয়াল, কিন্তু কখনও এই মিউজিয়ামে আসা হয়নি। আগাম জানাবোঝা থাকলে কাজ করতে সুবিধে হয়। সেই আফসোস এখনও যায় না রিয়াজের।

‘পিআইআর ডিটেকটরের রেঞ্জ কতটা?’
‘একমাত্র রেস্ট্রিকটেড এরিয়ার মধ্যেই আমাদের পিআইআর ইনস্টলড আছে। ওখানে কেউ ঢুকলেই আলো জ্বলবে, অ্যালার্ম বাজবে।’ সিকিউরিটি অফিসার বলেন।
‘কোনও অ্যালার্ম বাজেনি?’
‘না, স্যার।’

অবাক হয় রিয়াজ। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম নামক গোটা গ্যালারিটাই সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্গত। সেই এলাকায় না-ঢুকে মূর্তি নেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া কাচের প্যানেল বিচ্ছিন্ন ছিল, তার মানে চোর অবশ্যই সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকেছিল! তাহলে ইনফ্রারেড সেন্সর কাজ করল না কেন?

‘পিআইআর ডিটেকটরে ব্যাটারি ব্যাকআপ ছিল তো?’
‘ছিল।’
‘সিসি ক্যামেরায়?’
‘না স্যার।’
পিআইআর কাজ করে মূলত তাপমাত্রার তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। তখন মোশন ডিটেক্টর ডিভাইজ-এর সেন্সর সতর্ক হয়। ডেটা লগারে রেকর্ড করে রাখে সেই অচেনা গতিবিধি। অতিরিক্ত সতর্কতাস্বরূপ অ্যালার্মও বেজে ওঠে কখনও কখনও। দেখা যাক ডেটা লগার-এ কিছু পাওয়া যায় কিনা। রিয়াজ আবার জিজ্ঞাসায় ফেরে।

‘আচ্ছা কি-ম্যানেজমেন্ট কেমন আপনাদের? চাবি কীভাবে হস্তান্তর হয়?’

প্রশ্নটা করে আধিকারিকের দিকে তাকিয়েছে রিয়াজ উত্তরের আশায়, হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু হয় একতলা জুড়ে। মুহূর্তে সচকিত হয়ে রিভলবার বার করে পজিশন নিয়ে নেন নিরাপত্তা আধিকারিক। সতর্ক হয় রিয়াজও। তাঁর সঙ্গী পুলিশ অফিসারদের হাতেও উঠে আসে আগ্নেয়াস্ত্র।

সকলের চোখ দক্ষিণ সিঁড়ির দিকে। সকলকে বিস্মিত করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন মন্টু ভট্টাচার্য। ছবি দেখেছে একটু আগে, তাই মুহূর্তে চিনতে পারে রিয়াজ। প্রায় নগ্ন, কেবল একটি জাঙিয়া তাঁর পরনে। সমবেত চিৎকারে স্তম্ভিত মন্টু দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিক রিভলবার হাতে দৌড়ে যান।

‘কী ব্যাপার মন্টু? তুমি কোথায় ছিলে? এই অবস্থা কেন তোমার?’

উত্তর দিতে পারেন না মন্টু ভট্টাচার্য। কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েন সিঁড়িতে। তাঁর অন্য সহকর্মী কয়েকজন দৌড়ে যান। সকলে ধরাধরি করে এনে সোফায় বসান তাঁকে। ডুকরে ডুকরে কাঁদেন কেবল।

সহকর্মীরা গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেন, কিন্তু মন্টুর কান্না থামে না।

৩১

সকাল থেকে মিউজিয়ামে যতজন ঢুকেছে এবং তারা কখন বেরিয়েছে, ফুটেজ দেখে সকলের ছবি আলাদা করার নির্দেশ দেয় রিয়াজ। হুকুম মতো একজন এএসআই বসে

গেলেন কাজে।

মিউজিয়ামের ভেতর অফিসার ও কর্মচারীদের তল্লাসি এবং জিজ্ঞাসাবাদ এখনও চলছে। মন্টু ভট্টাচার্য তাঁর বয়ানে যা জানিয়েছেন, সব কথা সত্যি হলে, অত্যন্ত জটিল হতে চলেছে এই কেস। যত জটিল হবে নিষ্পত্তি তত অধরা। দলাই লামার উপহার দেওয়া ঐতিহাসিক মূর্তি চুরি হয়েছে, ফলত গুরুতর চাপ যে আসবে ওপরমহল থেকে, নিশ্চিত রিয়াজ।

মূর্তি সম্পর্কে আরও জানতে চায় রিয়াজ। চুরির মোটিভ স্পষ্ট না-হলে মূর্তি-রহস্যের কিনারা করা শক্ত। কিউরেটর তনুময় পালকে নিয়ে আবার আটতলায় ওঠে রিয়াজ। এগিয়ে যায় তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গ্যালারির দিকে।

'আচ্ছা স্যার, পদ্মসম্ভব কি তিব্বতে খুব ইম্পর্ট্যান্ট গুরু?' রিয়াজ জিজ্ঞাসা করে কিউরেটরকে।
'তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার অনেকটাই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন ইনি, এমন বলা যেতেই পারে। এই যে আমরা লামাদের দেখি বিভিন্ন গুম্ফায়, বলতে পারেন তিব্বতের লামাতন্ত্র গুরু পদ্মসম্ভবের সৃষ্টি। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সেভেন্থ সেঞ্চুরিতে চালু হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পথটা মসৃণ ছিল না।'
'কেন? বাধা কী ছিল?'
'বড় করে বলব না ছোটো করে?' কিউরেটর জানতে চান।
'ছোট্ট প্রয়োজনীয় অংশটা বলুন। বড় করে পরে শুনব।'
'আর্ট হিস্টরিতে আমার পিএইচডি আছে। সারাদিন বলে যেতে পারি ডিটেইলে—'
'পরে একদিন শুনব স্যার, খুব ইন্টারেস্টিং! এখন অত ডিটেইলে যেতে চাইছি না, বলুন ইন আ নাট শেল!'

হেসে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল মিলিয়ে ক্ষুদ্রত্বের মুদ্রা দেখায় রিয়াজ। কিউরেটরও মুচকি হাসেন প্রত্যুত্তরে। বেশ লাগছে এই ভদ্রলোককে। পণ্ডিত কিন্তু নীরস নন। নিজের স্বচ্ছ ধারণা আছে বিষয় সম্পর্কে, ফলত সবিস্তার বুঝিয়ে দিতে পারেন প্রাঞ্জলভাবে।

‘টিবেটান ধর্ম মূলত মহাযান-বজ্রযান আর বৌদ্ধতন্ত্রের একটা মিশেল। আর আছে পোন।’

‘পোন?’

‘তিব্বতের প্রাচীনতম ধর্মের নাম বোন। বি-ও-এন। তিব্বতি উচ্চারণে পোন। এই পোনও মিশে আছে তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে।’

‘আচ্ছা।’

‘এই পোন ঠিক ধর্ম ছিল না। এ আসলে কিছু আচার — যেমন ড্রাগন-পুজো, নরবলি ইত্যাদি। চেঞ্জ আনলেন এক রাজা, তাঁর নাম স্রোং সন গাম্পো। চিন আর নেপালের দুই রাজকন্যাকে বিয়ে করে তিনি বৌদ্ধ হয়ে গেলেন। এইসব অনেক আগের কথা। সেভেন্থ সেঞ্চুরি।’

‘রাজা বৌদ্ধ হলেন কেন?’

‘চিন আর নেপালের রাজারা তো বৌদ্ধ! রাজকন্যারাও তাই। নেপালের রাজকন্যা ভ্রিকুটিদেবী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন অক্ষোভ্যবজ্র, মৈত্রেয় আর তারাদেবীর মূর্তি। চিনের প্রিন্সেস ওয়েনচেন নিয়ে এসেছিলেন শাক্যমুনির ইয়াং রাজপুত্র মূর্তি। রানিদের চাপে রাজামশাই বৌদ্ধধর্মকেই দেশের রাজধর্ম বানিয়ে দিলেন। ব্যাস, গোটা তিব্বত জুড়ে শুরু হয়ে গেলো বৌদ্ধধর্ম ও মতের চর্চা। গড়ে উঠলো বহু মনাস্ট্রি। এইসব মনাস্ট্রিকে বলা হয় গুম্ফা, কেন বলুন তো?’ চোখ নাচিয়ে বলেন কিউরেটর।

‘কেন?’ বিহ্বল প্রশ্ন রিয়াজের।

‘রাজা স্রোং সন গাম্পোর নামেই মনাস্ট্রিগুলোর নাম গাম্পো। গাম্পো কথাটাই মুখে মুখে হয়ে গেল গুম্ফা।’

‘তাই নাকি!’ রিয়াজ বলে।

‘যাইহোক, এই পোনের সঙ্গে নতুন বৌদ্ধধর্মের একটা টেনশন সবসময় ছিল। পোন-এর সমর্থকরা বৌদ্ধধর্মের বাড়বৃদ্ধিকে মোটেই ভালো চোখে দেখত না। তক্কে তক্কে ছিল। কীভাবে একদিন বাগে পেয়ে উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা বৌদ্ধধর্মের সব্বোনাশ করা যায়। তো একসময় এসে গেল সুযোগ। রাজা হঠাৎ মারা যেতেই গোটা তিব্বতে দেখা দিলো অস্থিরতা। অরাজকতাও বলা যায়। সেই সুযোগে পোনধর্মের লোকেরা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কায়দা করে তন্ত্রকে মিশিয়ে দিল।’

‘তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গ্যালারিতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কথাটা লেখা ছিল।’

‘হ্যাঁ, এই তন্ত্রের ব্যাপারটা আলাদা করা খুব কঠিন তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম থেকে। যদিও শুরুর দিকে শ’খানেক বছর ধরে দুই ধর্মের মধ্যে লড়াই চলল। তুমুল লড়াই! দুই ধর্মের লড়াই হলে দেশের মধ্যে যা হয় বুঝতেই পারছেন, ভারতবর্ষের লোক আমরা, ধর্মের লড়াই আমরা ভালো বুঝব!’

মুচকি হাসেন কিউরেটর। তারপর আবার শুরু করেন,

‘গোটা দেশে অরাজকতা, সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। সেইসময় তিব্বত দেশে এল এক শক্তিশালী রাজা। নামটা বলছি না, খুব খটোমটো, মনে রাখতে পারবেন না! তিনি এসে ঘোষণা করলেন, আমাদের এক ধর্মগুরুর দরকার, যিনি দুটো ধর্মের সমন্বয় করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। শান্তির বাণী শোনাবেন। শুরু হলো খোঁজ। গুরু চাই।’
‘সেই গুরুই পদ্মসম্ভব?’
‘হ্যাঁ। তিব্বতে তাঁর নাম গুরু রিন-পো-ছে। বলা হয়, তিনি নাকি একটি পদ্মফুলের মধ্যে জন্মেছিলেন, তাই পদ্মের নামে তাঁর নাম। তিনি এসেই সমস্ত অশুভ শক্তিকে হঠিয়ে দিলেন। ফিরিয়ে আনলেন শান্তি। তিব্বতে তিনি সেকেন্ড বুদ্ধ হিসেবে পুজো পান।’

মন দিয়ে শোনে রিয়াজ। গুরু পদ্মসম্ভবের ইতিহাস সহজে ও সংক্ষেপে শোনান তনুময় পাল।

‘পাহাড়ে যেখানেই যাবেন, যে কোনও মনাস্ট্রিতে, একটা অদ্ভুত মূর্তি বা ছবি দেখবেন, একটু ভয়ানক চেহারা, শান্ত সৌম্য তথাগত রূপ নয়—উনিই গুরু রিন-পো-ছে। গুরুকে তিব্বতিতে বলে লা-মা। উনি তাই লামা পদ্মসম্ভব। প্রত্যেক তিব্বতি পরিবারের অন্তত একটি শিশুকে গুম্ফায় উৎসর্গ করা হয়। পরবর্তীকালে তারা তিব্বতি বৌদ্ধগুরু বা লামা হন, এই যে ধর্মীয় পদ্ধতি এই ব্যবস্থা তৈরি করেন লামা পদ্মসম্ভব।’
‘এই মূর্তি আপনারা কীভাবে পেলেন?’ রিয়াজ নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেরত আসতে চায়।

রিয়াজের প্রশ্নে তনুময় পাল কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। রিয়াজও। অ্যাকাডেমিক চর্চা থেকে হঠাৎ বিষয়মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার কারণেই সম্ভবত এই বিরতি। রিয়াজ কেবল নিরীক্ষণ করে যায় কিউরেটরের অভিব্যক্তি।

'দলাই লামা এই মিউজিয়াম উদ্বোধনে এসেছিলেন—উনিই দান করেছিলেন এই মূর্তি!' বলেন কিউরেটর তনুময় পাল।

'গ্যালারিতে রিন-পো-ছে'র অন্য মূর্তিও তো ছিল!' রিয়াজের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, ছিল তো। ওঁর আটটা রূপের মূর্তিই ছিল।'

'সবই কি আর্ট মার্কেট থেকে পাওয়া?'

'নাহ্। কেবল এইটাই।'

'তাহলে এই মূর্তিটা স্পেশাল?'

'স্পেশাল তো অবশ্যই! মূর্তিগুলোর মধ্যে সবচে প্রাচীন!'

'চুরির পেছনে আর কোনও মোটিভ?'

'আর কিছু আছে কিনা বলতে পারব না। তবে অ্যান্টিকের যে ইন্টারন্যাশানাল মার্কেট আছে, তাতে প্রচুর দাম আছে এই মূর্তির। তাছাড়া—'

'তাছাড়া?' রিয়াজ অতিরিক্ত সব তথ্য জেনে নিতে চায়।

'বাঘের ওপর চড়ে বজ্রধারী পদ্মসম্ভব তিব্বত থেকে অশুভ শক্তিকে একদা তাড়িয়ে ছিলেন। তিব্বতিরা আজও বিশ্বাস করে, গুরু রিন-পো-ছে আবার ফিরে আসবেন। ফিরে এসে তিব্বতকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করবেন। অশুভ শক্তি বলতে এখন ওরা চিনকেই বোঝে! সেইদিক থেকে এই মূর্তির একটা অন্য গুরুত্ব আছে। ঐতিহাসিক ও পলিটিক্যাল ভ্যালু আছে।'

ফোন বাজে রিয়াজের। এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর।

'স্যার, ফুটেজগুলো রাফ্‌লি দেখলাম। তিনজনকে চিহ্নিত করেছি। দু'জন মেল একজন মহিলা।'

'তারপর?'

‘তিনজনেই বিভিন্ন সময়ে ঢুকেছে মিউজিয়ামে, কিন্তু বেরিয়েছে কিনা ফুটেজ দেখে বোঝা যাচ্ছে না।’
‘মানে বেরোনোর ছবি নেই!’
‘না!’
‘ওকে, প্রিন্টআউট নিয়ে নাও। আর তিনটে ছবিই আমায় মোবাইলে পাঠাও।’

তিনজন মিউজিয়াম থেকে বেরিয়েছে কিনা ফুটেজে স্পষ্ট নয়। তার মানে কি মিউজিয়ামে মূর্তি চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছিল তিনজন? সকলেই কি গ্যালারিতে লুকিয়ে ছিল? সিসি টিভি বিকল হয়েছিল, ফলত পনের মিনিটের ফুটেজ অমিল। সেন্সর কাজ করেনি। ওই পনের মিনিটেই সব ঘটে গেল! মূর্তি চুরি ও পলায়ন! কিন্তু বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার আগের ফুটেজেও সন্দেহজনক কিছু নেই। কীভাবে ফাঁকি দিল সিসি টিভি? এদিকে মন্টু ভট্টাচার্য কিছুই বলতে অপারগ। আপাতত থই পায় না রিয়াজ।

এদিকে প্রতিটি কর্মচারী ও নিরাপত্তা-কর্মীদের আলাদা-আলাদা জেরা ও তল্লাশি শুরু হয়েছে। তিনজনের ছবি মনিটরে দেখানো হয় ডিরেক্টরসহ সব কর্মচারীকে। সকলকে বলা হল সেই তিনজনকে চিহ্নিত করতে। কেউ এই তিনজনকে আলাদা করে নজর করেছে কি না।

কিছু অস্থায়ী কর্মীও আছেন মিউজিয়ামে যাঁরা এই মুহূর্তে অনুপস্থিত, ছুটি হয়ে গিয়েছিল তাঁদের ঘটনা ঘটার আগেই। উপস্থিত সকলের মতামতে বোঝা যায়, এরা তিনজনের কেউই মিউজিয়ামের কর্মী নন, বাইরের লোক। সম্ভবত দর্শনার্থী।

গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ঘটনাস্থলে উপস্থিত অফিসারদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে রিয়াজ। গতিপ্রকৃতি দেখে কখনওই মনে হচ্ছে না এটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। আরডিএক্স বা আইইডি জাতীয় শক্তিশালী কোনও বিস্ফোরক গাড়ির ভেতর পাওয়া যায়নি। কোনও হতাহতেরও খবর নেই। উত্তেজনা ক্রমশ স্তিমিত হচ্ছে মিডিয়া তথা উপস্থিত জনতার। জল দিয়ে আগুন নেভানোর পর বম্ব-ডিজপোজাল স্কোয়াডের লোকজন এসে প্রাথমিক

পরীক্ষা করেছেন গাড়ি। এরপর পরীক্ষা করবেন ফরেনসিক দল। ভেতরে সম্ভবত টাইমারসহ খুব সাধারণ মানের বিস্ফোরক ছিল। তবুও ঝুঁকি না-নিয়ে অপেক্ষা করছে পুলিশবাহিনী। বিস্তর উদাহরণ আছে যেখানে পুলিশ প্রাথমিক ভুয়ো বিস্ফোরণে ঠকে গিয়ে গাড়ির নিকটবর্তী হতেই ঘটেছে প্রকৃত বিস্ফোরণ। ঠেকে শিখে পুলিশ এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, বিস্ফোরক-বাহিত কোনও সন্দেহজনক গাড়ির কাছে সহজে যায় না।

জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রজতস্যার গাড়িবোমা সাইটে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেন এখানেও। ফোনে রিয়াজ আগাপাছতলা সবটা জানাতেই স্যার গম্ভীর হয়ে যান। সাইট ঘুরে মিউজিয়ামে ঢুঁ মারার কথা বলেন। রিয়াজ অপেক্ষায় থাকে স্যারের।

রজতস্যারই তাকে বিধাননগর কমিশনারেট থেকে তুলে এনেছিলেন লালবাজারে। সকলেই জানে রিয়াজ আলমের মাথার ওপর জয়েন্ট সিপি রজত রায়ের আশীর্বাদের হাত আছে। কিন্তু সেই আশীর্বাদ অমূলক নয়, এটিও সংশ্লিষ্ট মহলের সবাই জানে। লালবাজারে এখন যে ক'জন দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিবান অফিসার আছেন, রিয়াজ আছে তাঁদের প্রথম সারিতেই।

করিডোরের জানালায় এসে দাঁড়ায় রিয়াজ। গোটা শহরটা যেন আলোর মালা পরে আছে। বহুতল থেকে রাতের শহরের প্যানোরামিক উন্মেষ দেখে বেশ আরাম হয় চোখের। অপূর্ব এই দৃশ্য থেকে ফেরান যায় না দৃষ্টি। অন্ধকার দিগন্ত বিস্তৃত। তার মাঝে আলোর প্রতিভাস। অন্ধকারের তুলনায় সেই আয়োজন যথেষ্ট অপ্রতুল। সোজা নীচের দিকে জাদুঘরের পাদদেশে তাকায় রিয়াজ।

পার্ক স্ট্রিট ক্রমাগত রাত্রিকালীন। গ্লো-শাইন বোর্ডের ঝলক। এলইডি আলো মেখে ব্র্যান্ডগুলি পথের পাশে খদ্দেরের জন্য অপেক্ষারত। গোরস্থানের পাশে এখনও ধোঁয়া। একটা গাড়ি নিজের মিথ্যে অস্তিত্ব পুড়িয়ে রাতের পার্ক স্ট্রিটের নকশা একচুলও বদল করতে পারে না। সদর দেখেই অন্দর বোঝা যায়। পানশালার অন্দরমহল নিশ্চয়ই ক্রমশ মুখরিত।

চোখ বোজে রিয়াজ। রজতস্যার আসার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। ঘটনাক্রম আবার সাজায় মনে মনে। ফোনটা বেজে ওঠে। ফোনটা ধরে আবার জানালা দিয়ে ভাসিয়ে দেয় চোখ।

'বলো।'
'স্যার আপনার ফোনে পাঠিয়ে দিয়েছি।' ফোনে এএসআই-এর স্বর।
'থ্যাঙ্ক ইয়ু! আরও ভাল করে দ্যাখো। ভিড়ের মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। তিনজনেই সিসি ক্যামেরা এড়িয়ে গেলো, হয় নাকি!'
'ওকে স্যার!'

স্মার্টফোন খুলে তিনজনের ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখে রিয়াজ। প্রথমজন মাঝারি উচ্চতার পাঞ্জাবি ও ট্রাউজার্স-পরা একটি লোক। চোখে রিমলেস চশমা। থুতনিতে সামান্য দাড়ি। বয়স সম্ভবত তিনের কোঠায়। দেখে মনে হচ্ছে ভারতীয় নয়। বিদেশি। দ্বিতীয়জন শাড়ি-পরা, কপালে টিপ, পায়ে স্নিকার এক মাঝ-বয়সী মহিলা। তৃতীয়জনের পরনে ঢোলা প্যান্ট ও গায়ে হাফহাতা জামা। প্রৌঢ়। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পাতলা গোঁফ। ডান হাতে ঘড়ি।

বিদেশি ঢুকেছে সকালে, মিউজিয়াম খোলার পরপরই। মহিলা দুপুরে। তৃতীয়জন সন্ধে ছ'টা নাগাদ, মিউজিয়াম বন্ধের ঘণ্টা দেড়েক আগে।

এরা কি তিনজনেই একদলে? তিনজনেই কীভাবে সিসি ক্যামেরা এড়িয়ে গেল?

দলে বিদেশি আছে মানে আন্তর্জাতিক কোনও র‍্যাকেটের কাজ? প্রশ্নে-প্রশ্নে তোলপাড় হয় রিয়াজের অন্দরমহল।

৩২

১৩ অক্টোবর। শিয়ালদা স্টেশন। কলকাতা।

বারাসাত লোকাল ধীরে ধীরে ঢোকে চার-এর এ প্ল্যাটফর্মে। বইটা ব্যাগে ঢুকিয়ে সিট ছেড়ে ওঠে ডিকে। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে এগোয়। লোকের পেছনে নামার-লাইনে না-দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে গিয়ে দাঁড়ায়, যেদিকে প্ল্যাটফর্ম নেই। ট্রেনে ওঠার জন্য প্ল্যাটফর্মে প্রবল ভিড়। ট্রেন থামার আগেই লাফিয়ে উঠতে শুরু করেছে যাত্রীর দল। তার তাড়া নেই। সবাই নেমে যাক, উঠে যাক গৃহমুখী জনতা, তারপর সে নামবে ধীরেসুস্থে।

ওঠা-নামা পর্ব মেটার পর ডিকে নেমে দক্ষিণে হাঁটতে থাকে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। প্ল্যাটফর্মের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকার কথা কবীরদার। একটু এগোতেই দেখতে পায় কবীরকে, প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে প্রশস্ত ফাঁকা জায়গায় ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাত নাড়ে ডিকে। কবীর খানও দেখে হাত নাড়েন।

‘কখন এলেন?’

‘মিনিট দশেক।’

‘বাহ্, জ্যাম-ট্যাম ছিল না!’

‘আমায় তুলে দিয়ে তোমার বাড়ি ফিরতে তো অনেক রাত হবে!’

‘আরে না, না, আমার জন্য চিন্তা করবেন না, শেষ ট্রেনেও যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে আমার! ওসব ছাড়ুন, একটা বিষয় হঠাৎ আজ মাথায় এল আপনার বাড়ি থেকে ফেরার সময়—অ্যাদ্দিন তেমন কিছু ভাবিনি, আজ আলোচনার মাথায় এল! একটা খটকা!’

‘খটকা! কীসের খটকা?’

‘কালিম্পং থেকে একটা অপ্রকাশিত বাংলা উপন্যাস আপনার কাছেই এল কেন, যে উপন্যাসের ভাবনার সঙ্গে আপনার ভাবনার মিল! সেখানেই হালকা একটা খটকা লাগছে আমার কবীরদা!’

‘অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাস আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত, উপন্যাসটি পেয়ে আমার কথাই মনে হয়েছিল তাঁর!’ কবীর জানান।

‘হতে পারে, তবে ওই কালিম্পং সংযোগটা অদ্ভুত লাগছে!’ সংশয় জানায় ডিকে।
‘তোমাকে বলা হয়নি, লেখাটি বাড়ি এসে আমাকে দিতে এলেন যিনি তাঁকে অধ্যাপক বিশ্বাস চেনেন না! এমন লোককে উনি পাঠাননি এবং ওই নামে কোনও লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন না!’
‘মানে!’ কিছুই বুঝতে পারে না ডিকে।

যাওয়ার দিন যত এগিয়ে এসেছে, মাঝেমাঝেই কবীরের মস্তিষ্কে হানা দিয়েছে সেই তীক্ষ্ণ চোখ আর চিবুক। অনুদ্ঘাটিত রহস্য বিঁধে আছে কাঁটার মতো। চিত্রক চন্দ্র পর্ব বিস্তারিত বলেন কবীর। বেজায় বিস্মিত হয় ডিকে।

‘সে কী! এই রহস্যময় বিষয়টি পরিষ্কার না-করে আপনি যেতে রাজি হয়ে গেলেন!’
‘সরসিজবাবুও তেমন কিছু বললেন না, আমিও কথায় কথায় ভুলেও গেছি! লেখাটা আমার কাছে পৌঁছে গেছে, তাতেই অধ্যাপক মশাই খুশি। ভেবে নিয়েছেন ক্যুরিয়ারের লোকজন কী-বলতে-কী-বলেছেন আর আমিও কী-বুঝতে-কী-বুঝেছি!’ হা-হা করে হাসেন কবীর।

অগণিত যাত্রী ও তাঁদের বাড়ি ফেরার হুড়োহুড়ির মধ্যেই ডিকের কানে পৌঁছে যায় টুকরো-টুকরো সংবাদ। পার্কস্ট্রিটে বিস্ফোরণ। বহু হতাহত। স্মার্ট ফোন খুলে ইন্টারনেটে খোঁজ করে খবরের সত্যতা। দু-একটা ছোটো পোর্টাল আর বড় খবরের কাগজের ডিজিটাল সংস্করণে ব্রেকিং নিউজ পায়। বিস্তারিত রিপোর্ট তারা এখনও করে উঠতে পারেনি। ঘোড়ার মুখ থেকে খবর জানতে বার্তা পাঠায় রজতকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রজত রায় বাল্যবন্ধু ডিকে-কে জানিয়ে দেয়, নাথিং সিরিয়াস! নো ক্যাজুয়ালটি রিপোর্টেড!

‘পার্কস্ট্রিটে একটা কার-বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে!’ কবীরকে খবর দেয় ডিকে।
‘ওমা! সে কী কাণ্ড!’ কবীর হতবাক।
‘না, বিরাট কিছু নয়, এখনও পর্যন্ত মারা যাওয়ার খবর নেই!’ কবীরকে আশ্বস্ত করে ডিকে।

‘যাক বাবা, মানুষের মৃত্যুসংবাদ আর নিতে পারি না! ট্রেন কি দিল?’

প্ল্যাটফর্মের দিকে দু-পা এগিয়ে দেখে নেয় ডিকে।

‘হ্যাঁ দিয়েছে। চলুন।’

কবীরের ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোয় ডিকে। পেছনে কবীর।

৩৩

দার্জিলিং মেল। শিয়ালদা স্টেশন। কলকাতা।

এ-ওয়ান কামরা। টুএসি। লোয়ার বার্থ নাম্বার পঁচিশ। নির্দিষ্ট কামরায় নির্দিষ্ট আসন খুঁজে নিয়ে কবীরকে বসায় ডিকে। নিজেও বসে পাশে। দশটা পাঁচে ছাড়বে মেল। সময়ের বেশ কিছুটা আগেই প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে ট্রেন। ব্যাগটি আসনের তলায় ঢুকিয়ে পা-তুলে গুছিয়ে বসেন কবীর। এসি টু-টায়ার। বাকি তিনজন সহযাত্রী এখনও অনুপস্থিত।

ডিকেকে পাশে পেলে কবীর নিশ্চুপ থাকেন না। অনর্গল বলে যান নিজের ভাবনার কথা, চর্চার কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য যাত্রীরা এসে তাঁদের নির্দিষ্ট আসনের দখল নিলেন। নিজের চর্চার বিষয়ে কথা বলার সময় পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান থাকে না কবীরের, মগ্ন হয়ে যান আলোচনায়, কিন্তু অচেনা-অজানা লোকজনের সামনে এই ধরনের আলাপন অপছন্দ ডিকের। সে ঘড়ি দেখে। প্রায় দশটা ছুঁই ছুঁই ঘড়ির কাঁটা। উঠে পড়ে ডিকে।

‘সাবধানে যাবেন দাদা, কাল পৌঁছে সময় করে একটা ফোন করে দেবেন।’
‘উপন্যাসটা ভালো করে দেখে রেখ—ফিরে কথা বলব।’
‘নিশ্চয়ই! সাবধানে যাবেন।’

বলতে বলতেই আসে নিবেদিতার ফোন। ডিকেকে হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে কবীর নিবেদিতার ফোন ধরেন। ডিকে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোয়।

দরজা দিয়ে নামার মুখেই মুখোমুখি হয় এক সন্ন্যাসীর। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পোষাকই পরিচয় নির্দেশ করছে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দরজা দিয়ে উঠতে উদ্যত। হাতে মস্ত এক ট্রলি ব্যাগ। ডিকেকে দেখে তিনি একটু পিছিয়ে গিয়ে হাতের ইঙ্গিতে ডিকেকে নামতে অনুরোধ করেন। ডিকে না-নেমে মৃদু হেসে পেছনে সরে যায়। ইঙ্গিতে উঠে আসতে বলে সন্ন্যাসীকে। তিনি উঠে আসতে চেষ্টা করেন ট্রলিটা হাতে নিয়ে। কিন্তু বড় আকারের ট্রলি ব্যাগটি টেনে তুলতে কি পারবেন বৃদ্ধ? এগিয়ে যায় ডিকে। ট্রলিটি তুলতে সাহায্য করতে চায়। নিজে আগে ট্রেনে উঠে ডানহাতে এক হ্যাঁচকায় ট্রলিটি তুলে নেন সন্ন্যাসী। ট্রলিটি বেশ বড়। হয়তো ভারীও। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে একহাতে, অবলীলায়, ট্রলিটি তুলতে দেখে কিঞ্চিৎ অবাক হয় ডিকে। সন্ন্যাসী মৃদু হাসেন ডিকের দিকে তাকিয়ে।

‘থ্যাঙ্ক ইয়ু মাই সন! তথাগত আপনার মঙ্গল করুন!’ মুখে আশীর্বাণী। তারপর কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে যান বাতানুকূল কামরার ভিতর।

নেমে যায় ডিকে। ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। আপ বারাসাত লোকালের সময় প্রায় হয়ে গেছে। স্বগৃহমুখী মানুষের ঢল এখনও অব্যাহত। ডিকেও নিজেকে ভাসিয়ে দেয় সেই জনপ্লাবনে।

৩৪

১৩ অক্টোবর। আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। পার্ক স্ট্রিট। কলকাতা।

আচমকা অন্ধকার হওয়ার ঠিক আগে, আটতলার রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী মন্টু ভট্টাচার্য হলঘরের ভেতর একটি বোটকা গন্ধই কেবল পাননি, চাপা একটি গর্জনও শুনতে পান, সম্ভবত কোনও জন্তুর। তারপর আর কিছু তাঁর মনে নেই। একটু ধাতস্থ হয়ে মন্টু জানিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতা।

সিসি টিভি ফুটেজ বা পিআইআর সেন্সর কাজ করেনি। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া অবশ্যই সিসি টিভি বিকল হওয়ার কারণ কিন্তু পিআইআর ডিটেকটর ব্যাটারি চালিত, সেই সেন্সর কাজ করল না কেন? ডেটা লগারেও কিছু মেলেনি।

জয়েন্ট সিপি রজত রায়, জাদুঘরের ডিরেক্টর, সিকিউরিটি অফিসার, এভিডেন্স রিকভারি পার্সোনেলসহ দু'জন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও রিয়াজ, ডিরেক্টরের চেম্বারে বসেন প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিতে। রজতস্যারকে রিয়াজ একান্তে আগেই রিপোর্ট করেছে। স্যারকে নিয়ে ঘুরেও এসেছে আটতলার গ্যালারি।

'ইনফ্রারেড সেন্সর অন্ধকারে কাজ করে?' ফরেন্সিক দলকে রজত রায়ের প্রশ্ন।
'করে স্যার।'
'কীভাবে করে মেকানিজমটা বলুন, সহজে বুঝতে পারি এমনভাবে বলবেন।'
'যে কোনও মানুষের শরীর থেকে আইআর রেডিয়েশন বেরোয়, এটা একটা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, এর ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণ ভিজিবল লাইটের থেকে কম। ইনফ্যাক্ট সমস্ত অবজেক্ট থেকেই নন-জিরো তাপমাত্রায় একটা থার্মাল রেডিয়েশন বেরোয়। আর অ্যাবসোলিউট জিরো বলে তো ফিজিক্যালি কিছু হয় না, ফলত থার্মাল রেডিয়েশন সবকিছু থেকে বেরোবেই!'
'থার্মাল রেডিয়েশনই কি আইআর রেডিয়েশন?' রজত আরও বুঝতে চায়।
'ইনফ্রারেড রেডিয়েশন থার্মাল রেডিয়েশনের একটা পার্ট। এটা মূলত একটা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ। এর মধ্যে কেবল আইআর নয়, রেডিও ওয়েভও থাকতে পারে। দিস আইআর রেডিয়েশন ইজ ডিটেক্টেবল বাই আ পিআইআর মোশন সেন্সর। সেন্সর এরিয়ার রেঞ্জের মধ্যে এলেই আলো জ্বলে ওঠে। অ্যালার্মও বাজে।'

‘টেম্পারেচরের একটা ডিফারেন্স তৈরি হয়, তাই তো?’ রজত বলে।
‘একজ্যাক্টলি স্যার! মিউজিয়ামের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা তাপমাত্রা আছে, সেখানে আমরা কেউ ঢুকলে তাপমাত্রার একটা তারতম্য হয়, এই তফাতটাই সেন্সর ধরতে পারে। এখানে ইমেজিং আইআর সেন্সর নেই, থাকলে স্যার দেখান যেত টোটাল ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের মধ্যে কেবল ইনফ্রারেড অংশেই হিউম্যান বডি কীভাবে গ্লো করে।’
‘থার্মোগ্রাফিক ক্যামেরা দিয়ে ইমেজ তৈরি করা যায়।’ রজত বলে।
‘একজ্যাক্টলি স্যার!’ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বলেন।
‘ইমেজ-ফিমেজ ছাড়ুন, সেন্সর তো কোনও অবজেক্টকে ডিটেক্টই করতে পারেনি! ডেটা লগারে কিস্যু নেই!’ রজত স্বমহিমায়।

বিশেষজ্ঞ চুপচাপ। সকলের চোখ তাঁর ওপর। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

‘তার মানে এই সেন্সর ফাঁকি দেওয়া যায়?’ রজত আবার।
‘মোশন ডিটেক্টর সেন্সর এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় স্যার! কোথায় এই যন্ত্রটি লাগান আছে জেনে নিয়ে নিজেকে এর চোখের আড়াল করে ফেলা যায়। ঝানু লোক হলে করে ফেলতে পারে।’
‘এখানে যা দেখলাম, দেওয়ালেও আছে, আবার সিলিং-এও লাগান আছে যন্ত্র! কীভাবে আড়াল করবে?’

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ আবার নিশ্চুপ। তাকিয়ে থাকে রজত তাঁর দিকে। বস্তুত প্রতিটি চোখই তাঁর দিকে।

‘এক্ষেত্রে আড়াল করা শক্ত স্যার! তবে হাঁটুমুড়ে বসে নীচু হয়ে খুব ধীরে মুভমেন্ট করলে মোশন ডিটেক্টর ধরতে পারে না।’

চেয়ার থেকে উঠে মেঝেতে হাঁটুমুড়ে বসে ভঙ্গিটা দেখান বিশেষজ্ঞ।

‘সে কী!’ বিস্মিত রজত।

‘আসলে বেশিরভাগ মোশন ডিটেক্টর এমনভাবে কনফিগারড থাকে যে ছোটো কোনও প্রাণীর গতিবিধি, কুকুর বা বেড়াল, ছাড় দেওয়া থাকে।’ মেঝেতে বসেই বলেন ফরেন্সিক বিশষজ্ঞ।

‘ডোমেস্টিক পেট?’

‘হ্যাঁ স্যার। এইসব মেশিন ডোমেসটিক ইউজ হয় তো, তাই! এই বিল্ডিং-এর মেশিনের কনফিগারেশনেও ছাড় আছে স্যার! যন্ত্র এইসব ক্ষেত্রে কোনও বিপদঘন্টি বাজায় না।’

‘এখানে মিউজিয়ামের মধ্যে পেট কোথা থেকে আসবে?’

বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু নিরুত্তর থাকেন।

‘স্যার, মন্টু একটা গন্ধ পেয়েছে স্যার! চাপা গর্জনও শুনেছে!’ এবার নিরাপত্তা আধিকারিক তথ্য যোগানে এগিয়ে আসেন।

‘পেট গর্জন করছে আজকাল!’ ব্যঙ্গ রজতের গলায়।

‘ব-বাঘ!’ আমতা-আমতা করে বলে নিরাপত্তা আধিকারিক।

‘বাঘ!’

অবিশ্বাস, বিস্ময়, ব্যঙ্গ—সব একাকার হয়ে যায় রজতের উচ্চারণে। আধিকারিকের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রজত।

কী বলতে চান এই সিকিউরিটি অফিসার?

৩৫

‘বাঘ স্যার, টাইগার!’ আবার বলেন নিরাপত্তা আধিকারিক।

‘মিউজিয়ামে বাঘ ঢুকেছে মূর্তি চুরি করবে বলে!’
‘হ্যাঁ স্যার!’
‘কী বলছে এ?’ রজত তাকায় রিয়াজের দিকে।
‘বাঘের গর্জন স্যার! ম-মন্টু শুনেছে!’ আধিকারিক আবার স্পষ্ট করে বলেন।
‘মন্টু গাঁজা খায় বুঝলাম, আপনিও খান?’ সটান প্রশ্ন রজতের।

নীরবতা গোটা ঘর জুড়ে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বলেন,

‘একটা বোটকা গন্ধ স্যার ঢুকে আমরাও পেয়েছি। ওসি স্যারও পেয়েছেন।’

রজত তাকায় রিয়াজের দিকে। রিয়াজ বলে, ‘ইয়েস স্যার! আমাদের একজন এএসআই বললেন বাঘের গায়ের গন্ধ!’

স্যারের মুখ দেখে রিয়াজ বুঝল উত্তর একেবারেই পছন্দ হয়নি। উঠে দাঁড়ায় রজত। রিয়াজ জানে স্যারের মেজাজ-মর্জি। বাঘ-টাগের কথা শুনেই ক্ষেপে গেছেন। রিপোর্ট করার সময় সচেতনভাবে এইসব তথ্য রজতস্যারকে বলেনি সে। এই সিকিউরিটি অফিসার সরাসরি স্যারকে এইসব গাঁজাখুরি কথাই বলে বসবেন, ভাবতেই পারেনি রিয়াজ।

‘তবে স্যার যন্ত্র, মানুষ না জন্তু, তা বোঝে না, এক্ষেত্রে খুব ছোটোখাটো মানুষ বা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নীচু হয়ে কেউ যদি ধীরে মুভমেন্ট করে তাহলে ডিটেক্টর ধরতে পারবে না। যন্ত্রের সামনে কাগজ বা পিচবোর্ড দিয়ে সেন্সর আড়াল করেও একে ফাঁকি দেওয়া যায়।’ উঠে দাঁড়িয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বলেন।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শোনে রজত। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। প্রমাদ গোনে রিয়াজ। সে জানে এবার আরও আক্রমণাত্মক হবেন স্যার।

দীর্ঘদিন আইপিএস রজত রায়ের সঙ্গে কাজ করছে। স্যারের মেজাজমর্জির খবর রাখে সে।

‘তাহলে মোদ্দা কথা হল, এইসব সেন্সর-টেন্সর কোনও কাজের না, এদের ফাঁকি দেওয়া যায় সহজেই! এই বডি গুটিয়ে নীচু হয়ে পিআইআর ডিটেকটর ফাঁকির কেসটা, এখানে যেমন দেখালেন, যন্ত্রের সামনে একটু হাতেকলমে টেস্ট করে রিপোর্ট দেবেন, অ্যালং উইদ ভিডিও রেকর্ডিং।’ তারপর ডিরেক্টরের দিকে ফিরে বলে, ‘আর এই যে ডিরেক্টর মশাই, এই যদি আপনাদের সিকিউরিটির ছিরি হয়, চুরি তো হবেই! একটি গৃহপালিত বাঘ এসে গ্যালারি থেকে মূর্তি চুরি করছে, অ্যাঁ! গাঁজাখোরদের রেখেছেন মূর্তির পাহারায়! দেখি সেই রত্নের মুখ দেখি!’

শেষ কথাটা রিয়াজের উদ্দেশে বলে রজত ঘর থেকে বেরোয়। স্যারের পিছু নেয় রিয়াজ। মন্টু ভট্টাচার্য তখনও সিঁড়িতেই বসে, দেহও অনাবৃত। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছেন। রজত তাঁকে একঝলক দেখেই রিয়াজের উদ্দেশে বেশ চেঁচিয়েই বলে,

‘একি, এর এর’ম অবস্থা কেন? বাঘ একে না-খেয়ে জামাকাপড় খুলে নিয়ে চলে গেছে!’

‘স্যার এর পোশাক মিসিং! ইনিও কিছু বলতে পারছেন না। চিফ সিকিউরিটি অফিসারের সন্দেহ এর ইউনিফর্ম পরেই কালপ্রিট হুড়োহুড়ির মধ্যে বেরিয়ে গেছে।’ রিয়াজ ব্যাখ্যা করে।

‘স্যার, মন্টুর মোবাইল বা ওয়াকি কিছুই কাজ করেনি!’ সিকিউরিটি অফিসার বলেন।

‘ধুর! ওগুলো কিছু না—পোর্টেবল জ্যামার চাঁদনিতে চাইলেই পাওয়া যায়! অনলাইনে কেনে না রেকর্ড থাকে বলে!’

রজত মাছি-তাড়ানোর ভঙ্গিতে সিকিউরিটি অফিসারের কথা উড়িয়ে দেয়। মন্টু ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর রিয়াজকে বলে,

‘একে কাস্টডিতে নাও! বিএসিটা মেজার করবে। যদি কিছু না-পাও একটা ড্রাগ টেস্ট করাবে। মুতিয়ে স্যাম্পল নিয়ে নাও। স্যালাইভাও নেবে।’ রিয়াজের থেকে মুখ ফিরিয়ে রজতের রক্তচক্ষু আবার মন্টু ভট্টাচার্যের দিকে, সঙ্গে হুঙ্কার, ‘ড্রামাবাজি বার করে দেব!

গ্যালারিতে বাঘের গর্জন শুনেছে! শ্রীনাথ বহুরূপী এসে ওনাকে ল্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছে! এখন উনি জাঙিয়া পরে র‍্যাম্পে হাঁটবেন! যত্তসব গেঁজেল!'

এরপর আবার ডিরেক্টরের দিকে ফিরে তর্জনী উঁচিয়ে বলে, 'আর আপনারা কেউ শহর ছাড়বেন না। দরকার মতো ডাকব। এখন ওসি রিয়াজ আলমকে কো-অপারেট করুন।'

তারপর একান্তে রিয়াজকে ডেকে আরও কিছু নির্দেশ দিয়ে চলে যায় রজত। নীরবতা নেমে আসে জাদুঘরে।

পার্কস্ট্রিট থানার এক সাব-ইন্সপেক্টর এলাকার ট্রাফিক সার্জেন্টের থেকে ব্রিদ-অ্যালাইজার নিয়ে আসেন। মন্টুর নিঃশ্বাস মেপে সেই শ্বাস-স্যাম্পল থেকে ব্লাড-অ্যালকোহল কন্টেন্ট নিতে উদ্যোগী হয় পুলিশ।

জয়েন্ট সিপি রজত রায়ের আবির্ভাব, নির্দেশ এবং তৎপরবর্তী পুলিশি তৎপরতা, জাদুঘরে উপস্থিত অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে তৈরি করে চাপা আতঙ্ক। এতক্ষণ মূর্তিচুরির গুরুত্ব তেমন মালুম হয়নি কিন্তু হঠাৎ মন্টু ভট্টাচার্যের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশে নেমে আসে হাড়হিম ত্রাস।

এমতাবস্থায় প্রত্যেককে জেরা করে লিখিত বয়ান নিতে আজ রাত কাবার হবে। অনেকেই বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিলেন পরিস্থিতি। পুলিশি ঝামেলায় যে তাঁরা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়লেন, এই সারসত্য বুঝে গেলেন সকলে।
একতলার বৃহৎ পরিসরের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘটনাক্রম জরিপ করে রিয়াজ। একান্তে ডেকে স্যার যা বললেন কানে বাজছে এখনও।

'এটা ছিঁচকে চুরি নয় রিয়াজ, কার-বম্ব ব্লাস্ট করিয়ে অ্যাটেনশন ডাইভার্ট করিয়েছে! এরপর তুমি সিকিউরিটি অফিসারকে তুলবে। পরে ডিরেক্টর। ও ব্যাটা সুয়োমোটো

ডিসিশন নিয়ে পাওয়ার অফ করিয়েছে! একটাকেও সন্দেহের বাইরে রেখ না! ডিরেক্টর টু দারোয়ান, সব্বাই! মিউজিয়ামে চুরি ভেতরের লোক ছাড়া হয় না!'

৩৬

দার্জিলিং মেল। শিয়ালদা স্টেশন। কলকাতা।

দশ মিনিটও লাগল না শিয়ালদা স্টেশন পৌঁছতে। ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করালেন একটু দূরে। গাড়ি থেকে নামলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। ট্রলি ব্যাগ নামিয়ে দেন ড্রাইভার। মৃদু হেসে ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে ট্রলি ব্যাগটা নিয়ে হাঁটা শুরু করেন বৃদ্ধ। সোডিয়াম ভেপারের হরিদ্রাভ আলোয় ভেসে যাচ্ছে স্টেশন চত্বর। উৎসবের ছোঁয়ায় স্টেশনে একটু বেশি আলোকসজ্জা। দৈনিক যাত্রীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। বেশিরভাগেরই লোকাল ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরার তাড়া। লটবহর নিয়ে উত্তরবঙ্গমুখী দূরপাল্লার যাত্রীরাও চলেছেন নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম অভিমুখে। উৎসব ও ছুটির আমেজ তাঁদের সর্বাঙ্গে।

ত্রি-চীবরে সজ্জিত বৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ট্রলি ব্যাগ টানতে টানতে ধীরে ঢুকে পড়লেন স্টেশনে। ভিতরে উজ্জ্বল লাল হাত-কাটা জামা। কটিবন্ধ। ওপরে কালচে রক্তবর্ণ চীবর। চোখে রিমলেস চশমা। মাথা ন্যাড়া। সন্ন্যাসী পেরিয়ে গেলেন মেটাল ডিটেকটর গেট। কারশেড থেকে বেশ কিছুক্ষণ আগেই ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে।

দার্জিলিং মেল। যাত্রীরা বেশিরভাগই উঠে পড়েছেন যে-যার নির্দিষ্ট কামরায়। সন্ন্যাসীও উঠে পড়লেন। ওঠার আগে কেবল ট্রেনের গায়ে সাঁটা যাত্রী-তালিকাটিতে বুলিয়ে নিলেন চোখ। দরজা দিয়ে ওঠার মুখেই বাধা। ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে আসতে চাইছেন দেখে সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ পিছিয়ে এসে লোকটিকে নেমে আসতে সুযোগ দিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক না-নেমে টয়লেটের দিকে কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। তারপর হাত দেখিয়ে সন্ন্যাসীকে আহ্বান করলেন ট্রেনে চড়তে। মৃদু হেসে সন্ন্যাসী উঠে পড়তে চাইলেন ট্রেনে।

বড় ট্রলি ব্যাগটি নিয়ে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করতেই, ভদ্রলোক দ্রুত এগিয়ে এসে বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত। বৃদ্ধ প্রয়োজন বোধ করলেন না সাহায্যের। নিজে আগে ট্রেনে পা দিয়ে, এক ঝটকায় তুলে নিলেন ভারী ট্রলি ব্যাগ। কিন্তু ভুললেন না ভদ্রলোকের সদিচ্ছার ইঙ্গিত। ট্রেনে উঠেই ধন্যবাদসূচক আশীর্বাদ করলেন ভদ্রলোককে। হাসলেন মৃদু। প্রত্যুত্তরে হাসলেন ভদ্রলোকও। তারপর নেমে গেলেন।

ট্রলি ব্যাগটি টেনে, দরজা ঠেলে, অপ্রশস্ত করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। কয়েকটা আসন পেরিয়ে, কামরার মাঝামাঝি, বাঁদিকে দাঁড়াতেই নজর পড়ল প্রৌঢ় মানুষটির ওপর। ফোনে কথা বলছেন পরিচিত কারও সঙ্গে। 'ওয়েলকাম খানসাহেব, দেখা হবে!' যেন বললেন মনে মনে। তারপর ট্রলি ব্যাগটি টেনে করিডোর দিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেন। এবার নজর পড়ল বাচ্চাটির ওপর। বয়স বছর সাত-আট হবে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকেই। উজ্জ্বল রঙিন লামার পোশাকই তাকে আকৃষ্ট করেছে। সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন। ডানদিকের লোয়ার বার্থে বসা ভদ্রলোককে মুখে হাসি নিয়েই বললেন,

'বসতে পারি?'

ভদ্রলোক সসম্ভ্রম সরে গিয়ে বসতে আহ্বান করলেন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে। করিডোর থেকে টেনে ট্রলিটি সিটের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে সন্ন্যাসী বসলেন। শিশুটি তখনও হাঁ। লক্ষ করলেন বৃদ্ধ শিশুটির কৌতূহল।

'নমো বুদ্ধায়!' বলে উঠল শিশুটি।

ছোট্ট ছেলেটির মুখে 'নমো বুদ্ধায়' শুনে চমৎকৃত হলেন সন্ন্যাসী। উজ্জ্বল হল তাঁর চোখ-মুখ। তিনিও প্রত্যুত্তরে বললেন,

'নমো বুদ্ধায়! তথাগত তোমার মঙ্গল করুন!'

শ্রদ্ধা ও সমীহ বাচ্চাটির মা-বাবার চোখেও। সন্ন্যাসী তাদের দিকে তাকিয়েও হাসলেন। মা-বাবা দু'জনেই হাত জোড় করে নমস্কার করল। প্রতি-নমস্কার করলেন সন্ন্যাসীও।

'কী নাম তোমার বেটা?'
'অর্হৎ বড়ুয়া।'
'বাহ, অর্হৎ!'

কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট সময়েই নড়ে উঠল ট্রেন। তারপর চলতে শুরু করল ধীরে। যাত্রীরা অনেকেই কপালে হাত ঠেকিয়ে নিরাপদ শুভযাত্রার প্রার্থনা করেন। অঞ্জনাও ঈশ্বরের উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকায়। সন্ন্যাসীও চোখ বুঝে সেরে নিলেন প্রার্থনা। তাদের যাত্রাশুরুর খবর, বাড়িতে ফোন করে মা-বাবাকে জানিয়ে দেয় সন্দীপ।
অঞ্জনা বুঝতে পারে না, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বার্থ কোনটি। চারটি বার্থে চারজন, ছেলেকে নিয়ে অঞ্জনা একটি লোয়ার বার্থে শোবে। সন্দীপ ওপরে। বাকি দুটি আপার ও লোয়ারের দু'জনও উপস্থিত। তাঁরা বসে আছেন আপাতত লোয়ারেই। তাঁদের পাশেই বসেছেন সন্ন্যাসী। অঞ্জনা সন্দীপের দিকে তাকায়।

ট্রেন তার নিজস্ব গতি নিয়ে নিয়েছে। সন্ন্যাসীর নির্দিষ্ট আসন নিয়ে বাকি দুই যাত্রীরও প্রশ্ন আছে, বুঝতে পারে অঞ্জনা। সম্ভবত ভাবগম্ভীর পোশাক ও বয়সের কথা ভেবে কেউই আগবাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন না সন্ন্যাসীকে। বলতে বলতেই চলে আসেন টিটি। সকলের টিকিট পরীক্ষা করেন। সন্ন্যাসী তাঁর হাতে টিকিট দিয়ে বলেন,

'আমাকে একটা লোয়ার বার্থের ব্যবস্থা করে দেবেন প্লিজ? এই কামরাতেই আমার আপার বার্থ আছে।'

যাঁর লোয়ার বার্থ আছে সেই ভদ্রলোককে টিটি অনুরোধ করেন। তিনি মুহূর্তে রাজী হয়ে যান। সন্ন্যাসী লাজুক হেসে বলেন,

‘থ্যাঙ্ক ইউ মাই সান।’

ভদ্রলোক হেসে তাঁর লাগেজ নিয়ে চলে যান। সন্ন্যাসী তাঁর ট্রলি ব্যাগ সিটের নীচে রাখতে সচেষ্ট হতেই সন্দীপ হাত লাগায়। ধন্যবাদ জানান সন্ন্যাসী। পা-তুলে গুছিয়ে বসেন। অর্হৎ তখনও হাঁ করে দেখে যাচ্ছে উজ্জ্বল সন্ন্যাসীকে।

‘কোন ক্লাসে পড় তুমি অর্হৎ?’
‘ক্লাস টু।’
‘ভেরি গুড!’
‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ পাল্টা প্রশ্ন অর্হতেরও।
‘গ্যাংটক। তুমি?’
‘পিং পং / কালিম্পং। ডিং ডং / কালিম্পং। কিং কং / কালিম্পং। সিং সং / কালিম্পং।’

ছোট্ট অর্হতের জবাব শুনে খুব মজা পান লামা।

‘বাহ, আপনাদের ছেলে তো খুব স্মার্ট। এটা কি কোনও ছড়া?’
‘অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা। আমার শ্বশুরমশাই শিখিয়েছেন।’ অঞ্জনা বলে।
‘আচ্ছা, আচ্ছা, অন্নদাশঙ্করের কিছু প্রবন্ধ পড়েছি। অপূর্ব! উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হোক অর্হৎ বড়ুয়ার।’

ছেলের প্রশংসা করলে মায়েদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। অঞ্জনা গদগদ হয়ে বলে,

‘আশীর্বাদ করুন স্যার!’

অঞ্জনার কথায় হা-হা করে হেসে ওঠেন সন্ন্যাসী। ঘাবড়ে যায় অঞ্জনা। সন্দীপ তাকিয়ে থাকে। অর্হৎ বলে,

‘তুমি হাসছ কেন?’

‘তোমার মা আমাকে স্যার বলছে!’ আবার হা-হা করে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ।

‘ন্-না মানে—’ অঞ্জনা নার্ভাস।

‘ভন্তে বা ভদন্ত বল।’ অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলে সন্দীপ।

‘বলতেই পারেন তবে ওগুলো থেরবাদী সম্ভাষণ। আমি লামা, দাওয়া লামা।’

‘দলাই লামা!’ অঞ্জনা কিছুটা বোকার মতোই বলে ফেলে।

‘নো মাই ডিয়ার! হিজ হোলিনেস দলাই, আমি দাওয়া। দলাই মানে সমুদ্র। আর দাওয়া মানে চাঁদ।’

‘গ্যাংটক যাবেন, তার মানে আপনি কি রুমটেক মনাস্ট্রি, মানে—’ অঞ্জনা বলে।

‘হ্যাঁ আমি রুমটেক যাব। কাল ধর্মচক্র প্রবর্তন দিবস। সকালে শিলিগুড়িতে কিছু কাজ সেরেই বেরিয়ে যাব।’

‘ওর জন্ম বুদ্ধ পূর্ণিমায়!’ হেসে বলে অঞ্জনা।

‘আন্দাজ করেছিলাম।’ হাসেন বৃদ্ধ লামা। তারপর অঞ্জনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘অর্হৎ নামটার জন্য!’

সকলে হাসে। অর্হৎ নিমেষে মিশে যায় অচেনা যাত্রীর সঙ্গে। আপার বার্থের যাত্রী বেশি কথাবার্তা না-বলে ওপরে উঠে যান। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েও পড়েন। অর্হৎ নেহাৎ শিশু, তার হাজারো প্রশ্ন থাকবেই, কিন্তু তার বাবার কৌতূহলও কম নয়। কথামালা খুলে বসে সন্দীপ।

বৃদ্ধ লামার চোখ স্থির। স্মিতমুখ। চেয়ে থাকেন ছোট্ট অর্হতের দিকে। গত মাসে কর্পোরেশন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এই বালকের খবর। তারপর সোর্স মারফৎ পারিবারিক এই যাত্রার খবর নিয়ে আসে পাসাং।

৩৭

২৩ সেপ্টেম্বর। বুধবার। নৈহাটি স্টেশন।

বিকেল ৪.৪৮-এর শান্তিপুর-শিয়ালদা ডাউন ট্রেন। মহিলা কামরায় শিক্ষকদের খোশগল্প। হাসাহাসি। নৈহাটি থেকে ট্রেনে উঠল নৈহাটি সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনের ইতিহাসের শিক্ষক অঞ্জনা বড়ুয়া ও আরও কয়েকজন সহশিক্ষক। কয়েকজন আসন ছেড়ে উঠে জায়গা দেয় ওদের। গল্পগুজবে মেতে ওঠে সকলে। শিয়ালদা এখনও এক ঘণ্টার পথ।

স্কুল থেকে বেরিয়েই অঞ্জনা রোজকার মতো ফোন করে নিয়েছে বাড়িতে। বাড়ি থেকে বেরোনো ইস্তক প্রতি ঘণ্টায় একবার ফোন করা তার চাই। আয়ার কাছে জানতে চাওয়া, কী করছে তার আদরের অর্হৎ। আয়ামাসি খুব ভালো, তাছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন, তাঁরাও যথেষ্ট খেয়াল রাখেন তাঁদের প্রিয় নাতির, কিন্তু মায়ের মন, অঞ্জনা ঘনঘন ফোন না-করে থাকতে পারে না।

নিত্যযাত্রীদের ট্রেনের আড্ডায় দ্রুত বদলে বদলে যায় আড্ডার বিষয়বস্তু। রেসিপি থেকে রাজনীতি। খেলা থেকে পুজোর ছুটিতে ভ্রমণ। এবার বেশিরভাগই যাচ্ছে পাহাড়। অঞ্জনাও।

‘তুই তো দার্জিলিং মেল পেলি, তাই না রে অঞ্জনা?’

‘হ্যাঁ, পেয়েছি গো।’

‘আমি উত্তরবঙ্গ। তাও টু-এসি পেলাম না রে! থ্রি হল।’

‘আমি টু-এসি পেয়েছি সম্পূর্ণাদি।’

‘কবে যাচ্ছিস?’

‘তেরোই অক্টোবর।’

‘বর ছুটি পেল?’

‘টিকিট তো কেটে রেখেছি। আশাকরি পেয়ে যাবে।’

‘তোমার যাওয়া কবে গো সম্পূর্ণাদি?’

‘বিশে। তোর ঠিক পরের সপ্তাহে। হ্যাঁ রে, অর্হৎবাবুর কী খবর?’
‘উফ আর বোলো না! কাল রাতে আবার এক অঘটন করেছে!’
‘কেন, কী করলো?’
‘ঠাম্মার বিছানায় উঠে পরপর লাফ মারছে নীচে—’
‘ওমা, তারপর?’
‘আর কী, পড়লো হুমড়ি খেয়ে! দরজার কোনায় লেগে মাথায় ইয়াব্বড় এক আলু!’
‘ওমা সেকি! কী দুষ্টু বাবা!’
‘কী করি বলো! ঠাকুরের কাছে রোজ প্রার্থনা করি ছেলেটাকে একটু শান্ত করে দাও বাবা!’
‘না, না ঠিক হয়ে যাবে। বড় হতে হতে ঠিক হয়ে যাবে। কত বয়স হল রে ওর?’
‘এই তো সাত হল। বুদ্ধজয়ন্তীতে!’
‘ওহ্ হ্যাঁ, উনি তো বুদ্ধবাবু!’

সম্পূর্ণার কথায় আশেপাশের অনেকেই হেসে ওঠে।
‘আর বোল না, বুদ্ধপূর্ণিমা তিথির তো পরিবর্তন হয়, ফলে জন্মদিন দু’বার করতে হয়।’
‘ওমা, তাই নাকি!’
‘হ্যাঁ, সতেরো মে জন্মতারিখ, সেদিন তো হবেই। বুদ্ধজয়ন্তীর দিন আবার হবে। ওর ঠাম্মা করে। এবার সাতই মে ছিল বুদ্ধজয়ন্তী। দু’বার জন্মদিন।’ অঞ্জনা হাসে।
‘বাহ্ অর্হৎবাবুর তো বেজায় ফুর্তি! আচ্ছা, তোর শ্বশুরবাড়ি তো বুদ্ধিস্ট, তাই না?’
‘হ্যাঁ, তবে এখন সব মিলেমিশে গেছে।’
‘চিন্তা করিস না অর্হৎবাবুকে নিয়ে, বুদ্ধের চ্যালা কি আর অশান্ত থাকবে? শান্ত হয়ে যাবে।’
সকলে হেসে ওঠে। অন্য বিষয়ে ঘুরে যায় আড্ডার অভিমুখ।
কামরার দ্বিতীয় দরজা সংলগ্ন জানালার পাশে-বসা এক মহিলা কান খাড়া করে গিলে নেয় যাবতীয় কথোপকথন। হাতের স্মার্ট ফোনটি সে রেকর্ডিং মোডে দিয়ে রেখেছে। অঞ্জনা-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার অপেক্ষায় সে হাপিত্যেশ। গত আট দিন ধরে এই মহিলা সন্তর্পণে অঞ্জনাকে অনুসরণ করছে খবরাখবরের আশায়, অঞ্জনা টেরও পায়নি। শিয়ালদা থেকে নৈহাটি এবং নৈহাটি থেকে শিয়ালদা, এই এক-এক দুই ঘণ্টার ট্রেন যাত্রার ধারাবিবরণী

ধরে রাখে এই মহিলা। তারপর সেই ফাইল রাতে পাঠিয়ে দিতে হয় নির্দিষ্ট নাম্বারে। প্রতিদিন দু'টি ফাইল। গত আটদিন ধরে নিপুণতার সঙ্গে এই কাজ করে চলেছে সে। কেবল রেকর্ডিং ফাইলই নয়, আড্ডা থেকে উদ্ভূত অঞ্জনা-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সঙ্গে সঙ্গে টেক্সট করতে হয় তাকে।

মহিলা মোবাইলে দ্রুত হাতে লিখতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে বার্তা চলে যায় নির্দিষ্ট নাম্বারে। মাত্র কয়েকটি কথা লেখা সেই বার্তায়। 'বেঙ্গলি বুদ্ধিস্ট। ১৩ অক্টোবর। দার্জিলিং মেল। টু-এসি। তিনজন।'

৩৮

২৩ সেপ্টেম্বর। লাচুং। উত্তর-পূর্ব সিকিম।

বিকেলের প্রার্থনা সদ্য সমাপ্ত। লাল চীবর পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক বালকের দল গুম্ফার বিশাল ছাদে দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলছে নীচু গলায়। তারা শিক্ষার্থী। ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝবয়সী এক লামা। হাতে তাঁর জপমালা। লাল চীবর পরিহিত এক শিক্ষার্থী লামা এগিয়ে যায় তাঁর দিকে। নীচু গলায় কিছু বলে। সচকিত হয়ে ওঠেন মাঝবয়সী। কিছুটা উত্তেজনাও যেন প্রকাশিত তাঁর শরীরী ভাষায়। একটু দ্রুত পা চালিয়েই প্রবেশ করলেন তিনি গুম্ফার অভ্যন্তরে।

কোনও গুম্ফার ভেতরে ঢুকলে দিন-রাত মালুম হয় না। গবাক্ষ-বাহিত ঢিমে আলোয় সবসময়ই মিশে থাকে এক শান্ত আঁধার। প্রায় বারো ফুট চওড়া দেওয়াল ভেদ করে তেমন কোনও শব্দও প্রবেশ করতে পারে না অন্দরে। অনন্ত স্তব্ধতা। দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই উপাসনাগৃহ। বিশাল তার আকার। চারিদিকের দেওয়াল সাদা, নীল, সবুজ ও লাল রঙে চিত্রিত। দেওয়ালের গায়ে উঁচু বেদিতে শাক্যমুনির মূর্তি।

বেদির সামনে লাল মেঝেতে বিশাল মণ্ডল। মণ্ডলের ওপর প্রদীপ। তিব্বতি প্রথা অনুযায়ী প্রতিটি প্রদীপে ইয়াকের দুধজাত মাখন। তথাগত'র দক্ষিণে গুরু পদ্মসম্ভবের বিশাল মূর্তি। আছেন তিন বোধিসত্ত্ব। মঞ্জুশ্রী বা বাগীশ্বর। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর আর বজ্রপাণি। তিন বোধিসত্ত্ব যেমন আছেন, পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তিও আছে। কাঠ-খোদাই সেইসব মূর্তিতে জীবন্ত হয়ে আছেন বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি। অবলোকিতেশ্বরের পাশে আছেন দেবী তারা। তবে সকল দেব-দেবীর মূর্তি নেই। অনেকেই আছেন দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রে।

বিশালাকার থাংকা ঝুলছে দেওয়াল থেকে। তাদের গায়ে অঙ্কিত বৌদ্ধ দেবদেবীর চিত্র। হেরুক ও বজ্রবারাহীর যুগনদ্ধ চিত্রও আছে অবলোকিতেশ্বরের পাশে।

মণ্ডল পরিবেষ্টন করে চারজন লামা মন্ত্রোচ্চারণ করছেন নীচু গলায়। প্রদীপ উদার হাতে বিলিয়ে দিচ্ছে নরম আলো। সুললিত মন্ত্রোচ্চারণের মৃদু সুর ছড়িয়ে পড়ছে বিশাল কক্ষে।

উপাসনাগৃহের দক্ষিণ দরজা দিয়ে বেরিয়েই সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশে সরু একফালি গলি। গলি পেরিয়ে অনতিপ্রশস্ত এক চত্বর। চত্বরের দক্ষিণে একটি ঘর। গুম্ফার সবথেকে পবিত্র ঘর। গোন থাং।

বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের নিজস্ব দেব-দেবী ছাড়াও তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম রক্ষাকারী কয়েকজন দেব-দেবীর বাসও গুম্ফায়। তাঁদের কাজ অপদেবতার হাত থেকে তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম তথা তামাম তিব্বতকে রক্ষা করা। এঁরা ধর্মপাল। ধর্মপালের পূজা হয় গোন থাং-এ। পবিত্র সেই ঘরে ঢোকার মুখে একটি ইয়াক আর একটি চিতা দণ্ডায়মান, যেন পাহারাদার। তবে তারা স্টাফড, চামড়ার ভেতর হাড়-মাস নেই, ফলত নিষ্প্রাণ।

অন্ধকার গোন থাং-এ আলাদা কোনও আলো নেই। মাখন-প্রদীপ জ্বলে ধর্মপালদের মূর্তির সামনে। রঙিন কাপড়ে সম্বৎসর ঢাকা থাকেন তাঁরা। চিত্রিত থাংকাগুলোও আচ্ছাদিত। কখনও গোন থাং-এ পূজার আয়োজন হলে সরান হয় আচ্ছাদন। তখনই আত্মপ্রকাশ করে

মূর্তি। মহাকাল, যম, যমন্তক, হয়গ্রীব দেবতার পাশে একমাত্র দেবী পেলদেন লেহ্‌মো। বহু মাথা, বহু পদ, বহু হস্ত বিশিষ্ট সেইসব মূর্তিগুলো, নিবিড় অন্ধকারে মাখন-প্রদীপের আলোয় দৃশ্যত ভয়ঙ্কর।

গোন থাং-এর পাশে সরু করিডোর পেরিয়ে ডান দিকে একটি ঘর। লামা প্রবেশ করেন সেই ঘরে।

কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন এক তরুণ সন্ন্যাসী। মুণ্ডিত মস্তক। পরনে রক্তবর্ণ তিন চীবর। লামা ঢুকতেই উঠে দাঁড়ান তিনি। চেয়ারে বসতে অনুরোধ করেন লামাকে। তারপর সন্ন্যাসী কম্পিউটারের সামনে সামান্য ঝুঁকে, মেলবক্স খুলে, বার করেন একটি ই-মেল। তারপর আবার পেছনে গিয়ে দাঁড়ান। চোখে চশমা এঁটে চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে অন্তত তিনবার সেই বার্তাটি পড়েন লামা। তারপর নীরবে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই আবার সিঁড়ির কাছে যান। দোতলায় ওঠেন। ডানদিকে দীর্ঘ অলিন্দ পেরিয়ে মস্ত পাঠাগার। আবার সিঁড়ি। তিনতলায় উঠেই খোলা চত্বর। লামা কিছুক্ষণ জিরোন। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় ওঠা শ্রমসাধ্য।

ভুটানের পারো উপত্যকায় তাগশাং বিশ্ববিখ্যাত গুম্ফা। মেঘের কোলে শুয়ে থাকা সেই তাগশাং পালফুগ গুম্ফাকে বলা হয় টাইগার্স নেস্ট। তিব্বতি ভাষায় তাগশাং মানে বাঘের গুহা। শীতল হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় কাহিনী। বহু বছর আগে গুরু পদ্মসম্ভব এখানে এক গুহায় চারমাসের জন্য ধ্যানে ছিলেন। কিন্তু এই দুর্গম পাহাড়ের গুহায় তিনি এলেন কীভাবে? এই নিয়েও কাহিনি ছড়িয়ে আছে পারো উপত্যকাসহ সমগ্র ভুটানে। মেঘের গায়ে মেঘ জমে। গল্পের গায়ে গল্প।

তিব্বতের এক রানি, এশি চোগিয়াল, ছিলেন পদ্মসম্ভবের শিষ্যা। গুরু সেই শিষ্যাকেই পরিণত করলেন বাঘে। বাঘিনী এশি চোগিয়াল গুরুকে নিয়ে এলেন এই পারো পাহাড়ের

গুহায়। গুরু ধ্যান শেষে আবির্ভূত হলেন অষ্ট-অবতারে। গুরু পদ্মসম্ভবের আট রূপ। আট নাম। পরে ভুটানের এক রাজা তেনজিং রাগবে গুরু পদ্মসম্ভবের স্মরণে এই গুহাকে ঘিরে তৈরি করেন একটি বৌদ্ধমন্দির। প্রতি বছর প্রচুর ভ্রমনার্থী দর্শন করেন এই মন্দির। পারো পাহাড়ের খাড়াই ঢালে এই গুম্ফায় পর্যটকদের উঠতে হয় রীতিমত ট্রেক করে।

উত্তর-পুর্ব সিকিমের লাচুং টাউন থেকে ভারত-চিন সীমান্ত প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। সীমান্তের ওপারেই তিব্বত। লাচুং থেকে মাউন্ট কাতাউ-এর দিকে যেতে পাহাড়ের ঢালে আছে এমনই এক গুম্ফা। আকারে অনেকটাই ছোটো। পারো পাহাড়ের গুম্ফার মতো অতটা দুর্গম নয়। তবুও সেই গুম্ফাকে লাচুং-এর স্থানীয় অধিবাসীরা বলে তাগশাং গুম্ফা। এখানেও আছে গুহা। গুহাশয়। তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এই প্রাচীন ঞিংমাপা ধারার বৌদ্ধমন্দির।

সূর্যাস্ত আসন্ন। দূরে রক্তাভ আকাশের কোলে পাহাড়। আরও দূরে বরফাবৃত পর্বতশ্রেণি। অপেক্ষাকৃত নিকট পাহাড়ের গায়ে সবুজ বনানী। অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা। গ্রীষ্মে এই উপত্যকা জুড়ে কেবল লাল রোডোডেনড্রন। এলাকাবাসী বলে লালি গুরাস। এই শেষ-বর্ষা রোডোডেনড্রনের সময় নয়।
গুম্ফার চারপাশে দৃশ্যমান সফেদ চোর্তেন। লাল, নীল, সাদা রঙের অজস্র পতাকা চারিদিকে। কাপড়ের ছোটো ছোটো লুংদার পতাকা-শৃংখল গুম্ফার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে পাইন গাছের সঙ্গে বাঁধা। লুংদারগুলি উড়ছে হাওয়ায়। বাঁশ বা লোহার পাইপে দার-চেন পতাকাগুচ্ছ মাটি থেকে অনেকটা ওপরে বাঁধা। বৌদ্ধ প্রার্থনা-পতাকা মাটিতে স্পর্শ করা নিষেধ। হাওয়ায় কাঁপছে তারাও। রক্তবর্ণ পোশাকে উজ্জ্বল বৌদ্ধলামার দল কর্মব্যস্ত।
শীতল হাওয়ার ঝাপট এসে সচকিত করে লামাকে। দ্রুত দৃষ্টি নামিয়ে, হাতে জপমালা ধরে তিনি পেরিয়ে যান প্রশস্ত চত্বর। ধীর পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়ান এক কক্ষের দোরগোড়ায়। কানে ভেসে আসে মন্দ্র কণ্ঠস্বর।

‘তখন রাজা মিলিন্দকে বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেন জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, আপনি রৌদ্রের খর তাপে পদব্রজে এসেছেন না রথে এসেছেন? রাজা বললেন, আমি পায়ে চলে বেড়াই

না, রথেই এসেছি। নাগসেন আবার বললেন, যদি আপনি রথেই আসেন, আমাকে বলুন মহারাজ রথ কী? ঈশ অর্থাৎ সামনের লম্বা দণ্ডটি কি রথ? নাকি রথচক্রের মধ্যমণ্ডল অর্থাৎ অক্ষই রথ? নাকি চক্র, যুগকাষ্ঠ, রজ্জু বা প্রতোদ-দণ্ডটি রথ?

রাজা নিশ্চুপ। সামান্য বিরতি নিয়ে নাগসেন বললেন, এগুলির কোনওটাই রথ নয় মহারাজ, রথ একটি শব্দমাত্র! তাহলে, রথে এসেছি, একটি অসত্য ভাষণ! এবার রাজা উত্তর দিলেন। যুগকাষ্ঠ, ঈশ, চক্র, চক্রনাভি, আসন—সব মিলিয়েই রথ। আমি সত্যই বলেছি!

তাই যদি হয় মহারাজ, রূপ-বেদনা-সংস্কার-বিজ্ঞান সব মিলিয়েই নাগসেন। তার আভ্যন্তরিক বিষয় আর কিছু নেই।'

যেমন ভরাট কণ্ঠস্বর, তেমনই বাচনভঙ্গি, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শোনেন লামা। এই মানুষটি কথা বললে না-শুনে উপায় নেই। এই শান্ত ও সমাহিত ভঙ্গি দেখে কে বুঝবে ভেতরে কতটা আগুন পুষে রেখেছেন মানুষটি।

যখন এই গুম্ফায় থাকেন তখন মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে কথা বলেন। বিদ্যাচর্চার সময় বিঘ্ন ঘটান উচিত নয়, লামা তাই বুঝতে পারেন না, কী করবেন। অধ্যয়নের সময় বাধা সৃষ্টিতে যদি অসন্তুষ্ট হন, সাত-পাঁচ ভেবে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করেন লামা।

যে খবর ই-মেল বাহিত হয়ে এসেছে, সেই অতীব গুরুত্বপুর্ণ সংবাদ তাঁকে এই মুহূর্তেই জানান দরকার। যা-থাকে-কপালে ভেবে লামা এগিয়ে যান দরজার দিকে। কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হয়ে কানে আসে। অপূর্ব সে উচ্চারণ, অপূর্ব সে কথন।

৩৯

‘জীবাত্মা হল পঞ্চ স্কন্ধের সমাহার। স্কন্ধ কী? বৌদ্ধমতে যে সব উপকরণে জীবের জীবন সংগঠিত, তাদের বলে স্কন্ধ। পাঁচ স্কন্ধ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার আর বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধ কমবেশি মাত্রায় সব জীবেই আছে। এই পাঁচ উপাদান বা স্কন্ধ তৈরি করে কোনও সত্তাকে। এগুলো অনাত্ম অর্থাৎ আত্মাবিহীন। অনিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নয়। এগুলো দুঃখময়ও বটে।

দুঃখের উৎপত্তি কীভাবে হয়? থেগ পা মাং পা অর্থাৎ হীনযানে বলা হয়েছে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের কারণেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। থেগ পা চেং পো বা মহাযানে আরও একধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে দৃশ্যমান বাহ্যবস্তু মাত্রই অলীক। অস্তিত্বের অর্থ শূন্য অস্তিত্ব।

ক্ষণিক অস্তিত্ব কী? দৈনন্দিন জীবনে আমরা কত কিছুই দেখি, যেমন এই টেবিলটি, একে দেখে আমাদের মনে হয় এটা স্থির। নিশ্চল। কিন্তু বৌদ্ধমতে কোনও কিছুই স্থির নয়, নিশ্চলও নয়। স্থির ও নিশ্চল যাকে বলছি, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি একইরকম ক্ষণিক অবস্থার প্রবাহমাত্র। এই প্রবাহকেই বৌদ্ধদর্শনে কখনও বলা হয় সন্তান, কখনও সন্ততি আবার কখনও বা ক্ষণ।

হেরাক্লিটাস নামে এক গ্রিক দার্শনিক বলেছিলেন, আমরা একই নদীতে দু’বার স্নান করতে পারি না। কেন এমন কথা বলছেন উনি? কারণ নদীর ধারা বহমান, যে ক্ষণে যে জলধারায় তুমি স্নান করেছ, সে ক্ষণও আর নেই, সেই জলধারাও নেই। সেই ক্ষণ সেই জলধারাকে নিয়ে চলে গেছে। এখন আবার তুমি নদীতে ডুব দিতে চাইলে নতুন ক্ষণে নতুন জলধারা পাবে। আসলে কোনও বস্তুই এক-ক্ষণের বেশি স্থায়ী হয় না। এই মতকেই বলে ক্ষণিকবাদ। এই ক্ষণিকবাদ অনুযায়ী একটি বস্তু যে ক্ষণে সৃষ্টি হয়, সেই পরক্ষণেই সেই বস্তু ধ্বংস হয়। আমরা বস্তুর এই সৃষ্টি ও বিনাশের রহস্য জানি না, তাই আমরা তাদের স্থির ও নিশ্চল ভাবি।’

দরজার কিনারে গিয়ে দাঁড়ান মাঝবয়সী লামা। অনতিপ্রশস্ত কক্ষ। নিরাভরণ। মেঝেয় গালিচা পাতা। ভেতরে কেদারায় উপবিষ্ট এক প্রাচীন লামা। নীচে বসে আছে কয়েকজন শিক্ষার্থী। ঘরে প্রবেশ না-করে দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করেন লামা।

‘বৌদ্ধধর্মে আমি বলে কি কোনও কিছুকেই স্বীকার করা হয় না? হয়, অবশ্যই হয়। কিন্তু এই আমি কে? পঞ্চস্কন্ধকে অবলম্বন করেই তার একটা দৈনন্দিন সত্তা তৈরি হয়। এই আমি-ব্যক্তিসত্তার পেছনে কোনও আত্মা নেই, এই আমি নাম-রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।’

কথা থামিয়ে বৃদ্ধ লামা লক্ষ করেন দুয়ারে উপস্থিত মাঝবয়সী লামাকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। মাঝবয়সী লামা সসম্ভ্রম উচ্চারণ করলেন।

‘রিন-পো-ছেই!’
‘কী খবর পাসাং, ভেতরে এসো!’

লামা প্রবেশ করেন অন্দরে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লামা পাসাং-এর দিকে চেয়ে থাকেন প্রাচীন লামা। তাঁর একহাত পোষ্যের মাথায়। পোষ্যটি রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে গালিচার ওপর। কক্ষে প্রবিষ্ট লামাকে সে মুখ ফিরিয়েও দেখে না।

‘রিন-পো-ছেই, বার্তা এসেছে!’

সামান্য ক্ষণের জন্য দৃষ্টি স্থির। তীব্র চাহনি। লামা পাসাং চোখ নামিয়ে নিলেন। বৃদ্ধ লামা, নীচু কিন্তু ভরাট কণ্ঠস্বরে, বললেন,

‘বোস এখানে। শেষ করি তারপর শুনব।’

৪০

বর্ষীয়ান লামা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আবার শিক্ষাভাষণ শুরু করেন। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে লামা পাসাংও নিবিষ্ট শ্রোতা। বৃদ্ধ লামা তৃতীয় সারিতে বসা এক শিক্ষার্থীর দিকে আঙুল-নির্দেশ করে বলেন,

‘তোমার নাম তেনজিং, এই তেনজিং কী? কিছুই না, একটা নাম মাত্র। লোকের ব্যবহারের জন্য একটা সংজ্ঞা। এই তেনজিং নামটা তোমাকে বা তোমার দেহের অন্তর্নিহিত যে মানুষটি আছে, তাকে কি বোঝাতে পারছে? না, পারছে না। কিন্তু এবার তেনজিং প্রশ্ন করতেই পারে, আমার মধ্যে আমিই যদি না-থাকে তাহলে এখানে বসে শিক্ষণ কে নিচ্ছে? ব্যক্তিসত্তা বলে যদি কোনও বিষয় না-থাকে তাহলে আচার্যই বা কে, লো-পোন কে বা রিন-পো-ছে? আমাদের চিত্ত ক্রমশ সংশয়াচ্ছন্ন। রহস্যাবৃত। তেনজিং ভাবছে আমি তাহলে কে? তেনজিং-এর মুখটা কি তেনজিং না কি হাতটা? ওর লোম, দন্ত, নখ, ত্বক, মাংস কোনটি তেনজিং?’

মস্ত এক হাই তুলল পোষ্যটি। সামান্য বিরতি। তেনজিংসহ শিক্ষার্থীরা প্রায় দমবন্ধ করে গুরু’র বচনের অপেক্ষায়। আবার শুরু করলেন লামা।

‘যুগকাষ্ঠ, ঈশ, চক্র, চক্রনাভি, আসন—সব মিলিয়েই যেমন রথ, তেমনই রূপ-বেদনা-সংস্কার-বিজ্ঞান সব মিলিয়েই তেনজিং। রথের শরীরের কোনও অংশে বা তার সমগ্র শরীরের ভেতর রথ বলে আসলে কোনও আলাদা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। কেবল রথের সমগ্র বিন্যাসটাকে বোঝাবার জন্যই রথ একটি বস্তুহীন ধারণা মাত্র। তেমনি ব্যক্তিমানুষ বা আত্মাও আমাদের পঞ্চস্কন্ধের বিন্যাসকে বোঝাবার জন্য একটা নাম মাত্র। আমাদের চৈতন্যই প্রতিমুহূর্তে আলাদা হয়ে স্মৃতির ভেতর একটা ঐক্যের বোধ তৈরি করে। সেন্স অফ ইউনিটি। একতা। সেই একতার বোধ থেকেই জাগে আমাদের ব্যক্তিমানুষ বা আত্মার কল্পনা। আমাদের বৌদ্ধশাস্ত্র বলে আত্মা আমাদের কল্পনা মাত্র, আর কিছু নয়।

যিনি এই স্কন্ধপুঞ্জ বা উপাদানসমূহের মধ্যে আত্মার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করেন, তিনি জানেন যে ব্যক্তি হিসাবে তাঁর কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, এবং ঠিক সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে তাঁর চারপাশের বস্তুনিচয়ের কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠাও অসম্ভব। কাজেই জগতে এমন কিছুই নেই যা তাঁকে আনন্দিত অথবা দুঃখিত করতে পারে। ফলে তিনি বিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ। তিনি অর্হৎ।

থেগ পা মাং পা-তে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু থেগ পা চেং পো-তে নিজের মুক্তির কোনও স্থান নেই। জগতের সকল মানুষ, সকল পশু-পক্ষীর মুক্তি আগে, তারপর নিজমুক্তি। জগৎ যতক্ষণ বন্ধনাবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাদের মুক্তির জন্য প্রয়াস ও সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করাই আমাদের মহাযানীদের প্রধান কাজ।

—আমরা কারা?
—জ্যাংচুপ সেম্পা!

লামার প্রশ্নে সমস্বরে উত্তর। অনুচ্চ স্বর।

‘হ্যাঁ, জ্যাংচুপ সেম্পা। আমরা বোধিসত্ত্ব। আজ এই পর্যন্ত থাক, আবার আগামিকাল।’

শ্রদ্ধার্পণ করে শিক্ষার্থীরা বিদায় নেয়। বৃদ্ধ লামার পূর্ণ দৃষ্টি এবার পাসাং লামার দিকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ডান হাত পোষ্যের মাথায়। মস্ত এক হাঁ করে পোষ্যটি একবার ঘাড় নাড়ায়। পরম আদরে তার মাথায় হাত বোলান বৃদ্ধ লামা। পোষ্যটি একটি বরফচিতা। হিমালয়ান স্নো লেপার্ড। নাম তার কেতু।

‘বলো!’
‘তেরো তারিখের দার্জিলিং মেল।’
‘বাহ্, খুবই ভালো কথা। কলকাতা থেকে হরণের ঝামেলা করতে হবে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমও হবে না। ঝুঁকিও কম। কী বল?’

‘আজ্ঞে, রিন-পো-ছেই!’
‘সেদিন ধর্মচক্র প্রবর্তন দিবস। শুভ দিন।’
‘আজ্ঞে, রিন-পো-ছেই! দেবনামপ্রিয় সেদিন দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাছাড়া পূর্ণিমাও আছে।’
‘বাহ্! তেমন অসুবিধা না-থাকলে মহামতি অশোকের মতো সেদিনই না-হয় দীক্ষা পাবে শ্রীমান অর্হৎ। সাত বছর সম্পুর্ণ হয়েছে তার। যে কোনও দিনেই করা যায়। তবে কাল অন্য আরেকটা কারণে দিনটা আমার বেশি পছন্দের—তুমি জান—’

লামা পাসাং-এর শান্ত দৃষ্টি। মৃদুস্বরে বললেন,

‘বাবাসাহেব।’

ঈষৎ মাথা নাড়িয়ে সায় দেন বৃদ্ধ লামা।
‘চোদ্দই অক্টোবর। উনি সেইদিন দীক্ষাভূমিতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। গ্রেট সান অফ ভারতবর্ষ! জাতপাতের বিলোপ চেয়েছিলেন একমাত্র উনি, আর কেউ না। আমি তাঁকে মানি। তবে কাল দীক্ষা একান্তই নাহলে হবে পঁচিশে’র সকালে। আলোর উৎসবের দিন। গুরু চোংখাপা শ্রীমান অর্হতের মঙ্গল করুন!’

নীরবতা। চোখ বন্ধ বৃদ্ধ লামার। কিছুক্ষণ পর ধীর ধীরে বলেন, যেন স্বগতোক্তি,
‘বৌদ্ধজয়ন্তীর জাতকে আমার আগ্রহ। স্বয়ং গুরু পদ্মসম্ভব আমাদের সহায়, আশীর্বাদস্বরূপ বৌদ্ধ পরিবারের ছেলে জুটিয়ে দিয়েছেন তিনি। বড়ুয়া পদবী দেখেই আমি তৎক্ষণাৎ নির্বাচন করি অর্হৎকে। বড়ুয়ারা বৌদ্ধ হয়।’
‘বড়ুয়ারা চট্টগ্রামের প্রাচীন বৌদ্ধ।’ পাসাং লামা বলেন।
‘চিটাগং গিয়ে দেখেছি বড়ুয়া কমিউনিটি। একটা অংশ অবশ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার পার্টিশনের আগেই কলকাতায় চলে গিয়েছে। পরেও গিয়েছে। শ্রীমান অর্হতের পূর্বপুরুষও নিঃসন্দেহে দেশত্যাগী। যাইহোক, আমার যাত্রার ব্যবস্থা কর।’
‘রিন-পো-ছেই, আপনি নিজে যাবেন?’
‘মূর্তি উদ্ধার কে করবে, পাসাং?’

নিরুত্তর পাসাং লামা। বৃদ্ধ লামা আবার বলেন,

‘এই প্রাচীন পবিত্র মূর্তিতে হাত দিয়েছে বুদ্ধবিরোধী শক্তি—সেই শক্তি শাস্তি পাবে! পাবেই!’ সামান্য বিরতি নিয়ে পুনর্বার বলেন, ‘পবিত্র মূর্তি উদ্ধার করবে কে পাসাং?’

অধোবদনে পাসাং লামা। রা নেই মুখে। ভয় ও ভক্তিতে আড়ষ্ট।

বৃদ্ধা লামা যেখানে বসে আছেন, তার বিপরীত দেওয়ালে ঝুলছে একটি থাংকা। কালচক্র মণ্ডল। হাতে আঁকা। অনুপুঙ্খ এবং নিঁখুত নক্সা। নক্সার ভেতরের রঙগুলি গৃহমধ্যস্থ এই ম্লান আলোতেও উজ্জ্বল। লাল। হলুদ। শাদা। কালো। সামনের ছোটো টেবিলের ওপর রাখা টিবেট রিভিউ, টিবেট ক্রনিকলসহ কয়েকটি ম্যাগাজিন। পত্রিকার ওপর রাখা কাঠের তিনটি অদ্ভুত শলাকা। ডার্ট। তীক্ষ্ণ।

ধীরে মুখ তোলেন পাসাং। মণ্ডলের জ্যামিতিক চিত্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিশ্চুপ।

স্তব্ধতার মধ্যে কেবল ঘুরে বেড়ায় বৃদ্ধ লামার প্রশ্ন। তিনি নিজেও চুপ। দুই লামা ও এক শ্বাপদের উপস্থিতিতে প্রশ্নটা ঘুরবে, তড়পাবে গোটা ঘরময়, এই অনুমোদন যেন দিয়েছেন তিনি নিজেই। কিন্তু এই নিথরতার লাগামও তাঁর হাতে। অবিচলিত স্বরে নিজেই ভঙ্গ করেন নীরবতা।

‘তিনটি কাজ আছে। শ্রীমান অর্হৎ, মূর্তি-উদ্ধার আর—’ আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান বৃদ্ধ লামা।

‘কলকাতার সেই পণ্ডিত মানুষ!’ অস্ফুটে পাসাং।

‘তবে তাঁকে আনতে যেতে হবে না। তিনি নিজেই এসে ধরা দেবেন। কলকাতায় গিয়ে এমন জিনিস তাঁর হাতে দিয়ে এসেছে চিত্রক চন্দ্র, না-এসে তিনি থাকতে পারবেন না! কালিম্পং থেকে উনি আমাদের হেফাজতে হবেন।’

‘তাঁকে কি এখানেই আনা হবে, নাকি—’ পাসাং লামা জানতে চান।
‘ক্রমশ প্রকাশ্য। তবে কালিম্পং-এ উনি যেন একা আসেন!’
‘আজ্ঞে রিন-পো-ছেই!’
‘আমি ছাড়া কে যাবে কলকাতায়? তুমি তো জান এই কাজগুলো আমি নিজে করতে চাই সবসময়! গুরু পদ্মসম্ভব আমাদের সহায়, ভয় কী?’ হাসেন বৃদ্ধ লামা।
হাসতে হাসতেই আবার বলেন, ‘তবুও সাবধানের মার নেই। আবার মারেরও সাবধানতা নেই। স্বয়ং তথাগত প্রতিহত করেছিলেন মার-কে। আমি নিজে না-গেলে কে করবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো? পদে পদে বসে আছে স্বয়ং মার তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য। সব পরিকল্পনা ঠিক আছে তো?’
‘আজ্ঞে!’

বুকের কাছে দু’হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন পাসাং লামা। তারপর কক্ষ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হবেন, পিছু ডাকেন বৃদ্ধ লামা।

‘শোনো!’
‘রিন-পো-ছেই!’ ঘুরে আবার মাথা ঝোঁকান লামা।
‘পাসাং, আরেকটা ব্যবস্থা করতে হবে। সেমিনার তো ১৫ অক্টোবর, সোমবার?’
‘আজ্ঞে!’
‘কলকাতার পণ্ডিতকে তের তারিখের টিকিট ধরিয়ে দাও। একসঙ্গে ভ্রমণ করা যাবে। কী বল?’ হাসেন বৃদ্ধ লামা।
‘যথা আজ্ঞা রিন-পো-ছেই!’
‘আর শোন, ইন্ডিয়ান আর্মিকে একটা চিঠি দিয়ে দিও।’

ভারত-চিন সীমান্তের নিকটবর্তী বলে এখানে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হয় ভারতীয় সেনার মাধ্যমে। সেনাবাহিনীর থেকে প্রয়োজনীয় পারমিট নিয়েই ভ্রমণার্থীরা এখানে ঢুকতে পারে। যদিও সেই সংখ্যা খুবই সীমিত। বেশিরভাগ সময়ই সেনাবাহিনীর থেকে অনুমোদন মেলে না। লাচুং-এর বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট মূলত লাচুং টাউন, লাচুং গুম্ফা ও ইয়ুমথাংগামী।

অনেকে ইয়ুমথাং থেকে রোডোডেনড্রন ভ্যালি হয়ে লাচেন অবধি যায়। কিন্তু লাচুং থেকে পুবে মাউন্ট কাতাউ-এর দিকে ট্যুরিস্ট সংখ্যা স্বল্প। এই ছোটো গুম্ফাটি ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য জনপদও নেই এই অঞ্চলে। লেপচা ও তিব্বতিদের ছোটো দু-একটি গ্রাম আছে। প্রায় দশ হাজার ফুট পাহাড়ের ওপরে এই এলাকা দুর্গম। নির্জন। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কম। প্রয়োজনীয় দ্রব্য তারা পেয়ে যায় লাচুং টাউনেই। কিন্তু, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয় এই গুম্ফাকে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা সবসময়ই প্রয়োজন।

'আজ্ঞে, দিয়ে দেব।'
মাথা ঝুঁকিয়ে বৃদ্ধ লামাকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান পাসাং লামা। ঘরে থেকে বেরোতেই চোখ পড়ে ছেলেটার ওপর। তেনজিং। শিক্ষার্থী। সকলেই চলে গেছে, সে কেবল হাঁ-করে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ লামার ঘরের দিকে।

- কী রে তেনজিং, তুই এখনও যাসনি! কী করছিস এখানে?
- আজ্ঞে লামা, আমি মানবমুক্তির জন্য কাজ করব!
- নিশ্চয়ই করবি, আগে শিক্ষা শেষ কর! এখন যা!

চলে যায় তেনজিং। অপস্রিয়মান বালকের দিকে নজর থাকে পাসাং লামার। তেনজিং অদৃশ্য হওয়ার পরও তিনি অনড়। পিছন ফিরে একবার তাকান বৃদ্ধ লামার ঘরের দিকে।

কেদারা ত্যাগ করেন বৃদ্ধ লামা। কাষ্ঠাসনে উঠে উঁচু জানালার কাছে আসেন। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তাকিয়ে থাকেন নির্জন পর্বতশ্রেণির দিকে। দূরের পাহাড়গুলি ছাড়িয়ে তাঁর প্রসারিত দৃষ্টি চলে যায় দূরতম তুষারাবৃত পর্বতমালা অভিমুখে।

সেই তুষারশৃঙ্গ অতিক্রম করলেই তাঁর স্বদেশ। মাতৃভূমি।

'রিন-পো-ছেই!'

দরজাপ্রান্তে আবার উপস্থিত পাসাং লামা। মুখমণ্ডলে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়।

‘কী পাসাং, আর কিছু বলবে?’

‘আজ্ঞে রিন-পো-ছেই! ট্রেনিং শুরু হয়েছে—আপনি কি—’

‘এখনই আমি যাব না। তুমি দেখে নাও!’

‘আজ্ঞে রিন-পো-ছেই!’

‘অর্হৎ বড়ুয়ার অপারেশন মসৃণ করতে হবে, কিন্তু ১৩ অক্টোবর রাতের কাজটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। সবথেকে কঠিনও! মিউজিয়াম থেকে মূর্তি-উদ্ধার! ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী ওদের দেখে নিচ্ছ তো?’

‘আজ্ঞে রিন-পো-ছেই!’

‘কলকাতায় কবে মহড়া শুরু করবে?’

‘অক্টোবরের এক থেকে টানা দশদিন!’

‘শিলিগুড়ির টিম?’

‘ওদের মহড়াও চলবে একই সময়ে!’

‘বাহ্, কলকাতায় আমার সঙ্গী হবে যারা আজ রাতে ওদের আবার পাঠিও।’

‘আজ্ঞে পাঠিয়ে দেব রিন-পো-ছেই!’

‘কোনও অনাবশ্যক রক্তপাত আমি চাই না, মনে রেখ।’

‘আজ্ঞে রিন-পো-ছেই!’

‘আর কিছু বলবে পাসাং?’

‘আজ্ঞে রিন-পো-ছেই!’

‘বলো?’

‘তেনজিং খুব মনোযোগী ছাত্র, খুবই সম্ভাবনাময়!’

‘জানি। তবে এখনও দায়িত্ব নেওয়ার মতো পরিপক্ক হয়নি।’

‘আজ্ঞে রিন-পো-ছেই!’

‘পাসাং, তেনজিং-এর দিকে নজর রেখ—এরাই ভবিষ্যৎ—নরখাদক বাহিনিকে হঠিয়ে এরাই একদিন দেশ স্বাধীন করবে! আমি হয়তো তখন থাকব না, কিন্তু পাসাং, বুকের

ভেতরের আগুনটা জ্বালিয়ে রেখ! নিভতে দিও না!'

বৃদ্ধ লামা জানালা থেকে সরে এসে আবার এসে বসেন চেয়ারে। পোষ্য বরফচিতা কেতু যথাস্থানেই উপবিষ্ট। চিতার মাথায় হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করেন লামা। চোখে তার লাঞ্ছিত স্বদেশের ছবি। মুখে বিদেশি বাহিনির অত্যাচারের কথা।

'গ্রামের সেই উজ্জ্বল আনন্দ নিমেষে গুঁড়িয়ে দিল বর্বরের দল! শেষ করে দিল, পোকা-মারার মতো থেঁৎলে দিল সাধের গ্রাম, ভালোবাসার দেশ। কোনও বাহিনী যে এমন নির্মম হতে পারে, না-দেখলে বিশ্বাসই হয় না।'

বহুশ্রুত অভিজ্ঞতা আবার শোনেন পাসাং। দেশ তিনি দেখেননি, ভারতেই তাঁর জন্ম। শৈশবে সদ্য নির্বাসিত, বিদেশে আশ্রিত স্বদেশবাসীর অমানুষিক যন্ত্রণাভোগ দেখেছেন তিনি। এমনকী নতুন প্রজন্মের বালক তেনজিংও সেই কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবনের বাইরে নয়। বৃদ্ধ লামার ক্রমবর্ধমান ক্রোধের আঁচে নিজেকেও সেঁকে নেন পাসাং।

'এই বাহিনীর নাম কিনা গণমুক্তি ফৌজ! পিএলএ। পিপলস লিবারেশন আর্মি! এরা মানুষকে মুক্তি দেবে? হে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, হে গুরু পদ্মসম্ভব, হে দেবী তারা, আমায় শক্তি দিন! এ হিংসা পবিত্র! এ ক্রোধ পবিত্র! এই পবিত্র হিংসা ও ক্রোধ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই না! চাই না! আমি কেবল সত্যের পথে থাকতে চাই! অসত্যকে উৎখাত করতে চাই সত্যের মাধ্যমে!'

মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ লামা। টেবিল থেকে তীক্ষ্ণ শলাকা তুলে ছুঁড়ে মারলেন কালচক্র মণ্ডল অঙ্কিত থাংকায়। একটি নয়, দুটি নয়, ছুঁড়লেন পরপর তিনটি শলাকা। তিব্বতি থাংকাটি যেন ডার্টবোর্ড। চাঁদমারি। মণ্ডলের ঠিক মাঝখানে পদ্ম। পদ্মটির কেন্দ্রে গিয়ে বিদ্ধ হয় প্রথম শলাকা। তারপর বাকিদুটি তার পাশে।

দৃশ্যত ক্রুদ্ধ লামার চোখ-মুখ দিয়ে আগুন নির্গত হচ্ছে। আগ্নেয়গিরি সুপ্তোত্থিত। বুকের ভেতর যেন বয়ে যাচ্ছে গরম লাভার স্রোত। বরফাবৃত পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা শীতল বাতাসও ঠাণ্ডা করতে পারে না বৃদ্ধকে। থরথর করে কাঁপতে থাকেন তিনি।

লাঞ্ছনা। অসম্মান। স্বাধীনতাহীনতা। মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত মানুষ ভরকেন্দ্রহীন। নিরালম্ব। ক্রোধ এখানে মুহূর্তে পরিচয় বদল করে হয়ে যায় যন্ত্রণা। ফলত এই অবসরে, হারিয়ে-ফেলা সেই মায়াময় বরফের দেশের জন্য, দু'ফোঁটা অকিঞ্চিৎকর অশ্রুও গড়িয়ে যায় গাল বেয়ে।

ডান হাত দিয়ে ডান উরুর ওপর হাত বোলান। উরুর কোঁচকানো চামড়া আজও গণমুক্তি ফৌজের উজ্জ্বল স্মারক হয়ে থেকে গেছে। কেতু কী বুঝে উঠে আসে। গাঁ ঘেষে দাঁড়ায় প্রভুর।

নিজেকে সংযত করেন বৃদ্ধ লামা। বাইরে থেকে ভেসে আসে মন্ত্র। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই সিদ্ধমন্ত্র—ওঁ মণিপদ্মে হুঁ—কখন যেন মুক্তির মন্ত্র হয়ে যায়।

বুকে দু'হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জানান পাসাং লামা। আড়চোখে একবার কেতুর দিকে তাকিয়ে ধীরে বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে।

বরফচিতা কেতুকে ভয় পান না, এমন মানুষ এই গুম্ফায় নেই। কেতুর এক সঙ্গী ছিল, রাহু। একবার এক সন্ন্যাসীকে স্রেফ খেয়ে ফেলেছিল সে শ্বাপদ। গুম্ফা চত্বরে, রাহুর আক্রমণে ছিন্নভিন্ন, সন্ন্যাসীর মরণদৃশ্য, আজও স্মৃতিতে দগদগে। অনেকেই আড়ালে বলে, এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছিল সেই সন্ন্যাসী, অসভ্যতার জন্য সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং বৃদ্ধ লামা। রাহুকে দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। জ্যান্ত। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যায় রাহু। সঙ্গী বিহনে কেতুও, তারপর থেকে, খানিক মনমরা। বিরক্ত। ফলত হিংস্র। এক্ষেত্রেও ফিসফিসানি আছে গুম্ফায়, কোনও অবাধ্যতার জন্য রাহুকে হত্যা করেছিলেন স্বয়ং বৃদ্ধ লামা। বৃদ্ধ লামা ও তাঁর পোষ্যদের ঘিরে হরেক কাহিনি ডানা মেলে ঘোরে গুম্ফার আনাচে-কানাচে।

কেতুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন বৃদ্ধ।

তারপর বিড়বিড় করে বলেন,

‘অপহরণ। দশশীল মন্ত্রের দ্বিতীয় মন্ত্র। জীবহত্যা, অপহরণ, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন ও সুরাপান—এই পঞ্চপাপ থেকে নিবৃত্তি—ভিক্ষুদের উদ্দেশে বিশেষ বিধান। আমি জেনেশুনে এই পাপ করছি কারণ সত্যকে অবলম্বন করে অসত্যকে পরাজিত করার কথাও শাস্ত্রেই বলেছে।’

বরফচিতা কেতুর মাথায় ডান হাতের তালু রেখে চোখ বন্ধ করে লামা অস্ফুটে উচ্চারণ করেন, ‘চুশি গাংদ্রুক।’

৪১

আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। পার্ক স্ট্রিট। কলকাতা।

জয়েন্ট কমিশনার রজত রায় চলে যাওয়ার পর দুই এসআই-এর সঙ্গে বসে রিয়াজ। জাদুঘরের প্রত্যেক অফিসার ও কর্মচারীর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দোতলায় একটি ঘরে বসেছে তারা। এক-এক করে কর্মচারীরা ঢুকছেন ঘরে। বাইরে অপেক্ষারত বাকিরা। উপস্থিত অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে, সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য, দুটো ঘরে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করে রিয়াজ। পুরো প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করছেন দু’জন পুলিশকর্মী। দুটো ঘরেই পালা করে যায় রিয়াজ। তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে জিজ্ঞাসাবাদ-পর্ব। দরকারে প্রশ্ন করে নিজেও।

হাতে ল্যাপটপ নিয়ে ঘরে ঢোকেন একজন এএসআই। রিয়াজের কাছে এসে কানে কানে কিছু বলেন।

‘স্যার এই দু’জনকে আইডেন্টিফাই করা গেছে। এরা বেরিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। কেবল এই লোকটির বেরোবার কোনও ছবি নেই।’

চোখে রিমলেস চশমা, থুতনিতে সামান্য দাড়ি, মাঝারি উচ্চতার পাঞ্জাবি ও ট্রাউজার্স-পরা বিদেশি লোকটি বেরিয়ে গেছে। পায়ে স্নিকার-পরা মহিলাও। তাহলে পড়ে রইল কে? ঢোলা প্যান্ট ও গায়ে হাফহাতা জামা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পাতলা গোঁফ। ডান হাতে ঘড়ি। রিয়াজ গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখে লোকটাকে।

‘এই ছবিটা আমাদের সমস্ত ইনফর্মারদের দিয়ে দাও! যদিও খুবই আনইম্প্রেসিভ চেহারা, তবু এই শহরে কেউ তাকে দেখবে না, হতে পারে না!’
‘ওকে স্যার।’

এএসআই ল্যাপটপ থেকেই ছবিটা সকলকে একসঙ্গে বার্তাবহনকারী অ্যাপের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। লিখে দেয়, খোঁজ চাই। প্লিজ রেসপন্স ক্যুইকলি।

স্মার্টফোন খুলে তৃতীয় লোকটির ছবি আবার দেখে রিয়াজ। ঢুকেছে সন্ধে ছ’টা নাগাদ, মিউজিয়াম বন্ধের ঘণ্টা দেড়েক আগে। মিউজিয়ামে ঢুকল অথচ বেরোল না! লোকটা কি এখনও মিউজিয়ামে আছে? একটি দশতলা বাড়ির ভেতরে, যে কোনও জায়গায়, লুকিয়ে থাকা কী এমন কঠিন কাজ! আর যদি বেরিয়ে যায়, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বেরিয়েছে! স্নিফার ডগের ইঙ্গিত অনুযায়ী পাঁচিল টপকেছে একজন বা একাধিক ব্যক্তি, তারপর রাস্তায় কিছুদূর এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে! প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ-কুকুর বিভ্রান্ত হওয়ার একটাই অর্থ, বদগন্ধী চোর নিজস্ব খোসবাই বদলে ফেলেছে।

তল্লাসি করতে হবে বহুতলের প্রতিটা কোনা। কোনও বন্ধ ঘর, স্টোর রুম, টয়লেট আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে হবে। ভেতরের লোক জড়িত থাকলে চোরকে জাদুঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখা অসম্ভব কাজ নয়। আরও নিবিড় নিরীক্ষণ দরকার। ফোন করে অতিরিক্ত বাহিনী ডাকে রিয়াজ।

মন্টু ভট্টাচার্যকে জামাকাপড় পরান হয়েছে, থেমেছে তাঁর কান্নাও। রিয়াজ ভেবেছিল, পুলিশ-হেফাজতের গল্প শুনে কান্না আরও বাড়বে, কিন্তু বাড়েনি, উল্টে থেমে গেছে। আশ্চর্য হয় রিয়াজ। জিজ্ঞাসাবাদের ঘর দুটোয় চক্কর দিয়ে সে তৃতীয় একটি ঘরে বসে। প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিক ও মন্টু ভট্টাচার্য, দু'জনকে আলাদা করে জেরা করে সে নিজে। মুখোমুখি বসিয়েও চলে জিজ্ঞাসাবাদ। ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন মন্টু।

আলো চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, তিনি আটতলার গ্যালারিতে যা-যা দেখেছেন ঘটনাক্রম অনুযায়ী পরপর বলে যান। অন্ধকার হওয়ার ঠিক আগে, একটা মুখোশ উড়ে এসে পড়েছিল মন্টুর পায়ের সামনে। সেই মুখ তিনি চেনেন। মহাকাল। দেবী পেলদেন লেহ্‌মোর সঙ্গী মহাকালের মতো অবিকল সেই মুখ। মন্টুর কথায় অবাক হয় রিয়াজ। আটতলার আনাচ-কানাচ খুঁজেও মেঝেয় কোনও মুখোশ পড়ে থাকতে দেখেনি সে ও তার সঙ্গীরা।

কিউরেটর তনুময় পাল জানান, গ্যালারিতে তিব্বতের বিখ্যাত লোকনৃত্য ছম-এর মুখোশ আছে, সে মুখোশ বিশাল। হাওয়ায় উড়ে এসে পড়বে, এমন কোনও ছোটো মুখোশ গ্যালারিতে নেই। রিয়াজের অনুমতি নিয়ে ইন্টারনেটে খুললেন ছম-নাচের ভিডিও। সামান্য অংশ দেখে ইশারায় বন্ধ করতে বলে রিয়াজ। একগাল হেসে ভিডিও বন্ধ করে ফোন পকেটে ঢোকালেন কিউরেটর।

জিজ্ঞাসাবাদের শেষে মন্টুর সঙ্গে প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিককেও পুলিশ কাস্টডিতে নেওয়া হয়। ত্রাস সঞ্চার হয় কর্মচারী মহলে।

হাজির হয় অতিরিক্ত বাহিনী। দ্রুত চারটে দলে ভাগ হয়ে যায় তারা। রিয়াজ আবার শুরু করে সুলুকসন্ধান। একতলা থেকে দশতলা, তন্নতন্ন করে সন্ধান চালাতে হবে। চারটে দল শুরু করে দেয় কাজ। একটি দলের নেতৃত্বে রিয়াজ নিজেই।

এক এসআই এগিয়ে আসেন রিয়াজের দিকে। রিয়াজ তাকায়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ইন্সপেক্টর তার ফোনটা এক হাতে চাপা দিয়ে নীচু গলায় বলেন,

'স্যার, পিটার লাইনে আছে, কথা বলতে চায় আপনার সঙ্গে।'
'কোন পিটার? মুহুরি?'
'হ্যাঁ।'
'কী বলতে চায়?'
'আপনাকেই বলবে বলছে!'

পিটার কর্পোরেশনের লালবাড়ির ঘাগু মুহুরি। মিউটেশন, ট্রেড লাইসেন্স, বিনোদন লাইসেন্স, সম্পত্তি কর, বিল্ডিং প্ল্যান, জন্মমৃত্যুর পুরনো রেকর্ড, নতুন সার্টিফিকেট, জমির রেকর্ডসহ হেন কাগজ নেই পিটারের আওতার বাইরে! দায়িত্ব নিয়ে সে সমস্ত দরকারি নথি তুলে দেয় মক্কেলের হাতে। এর পাশাপাশি আরও একটা কাজও করে পিটার। গুপ্তচরবৃত্তি। লালবাজারের খোচর সে। পুলিশের ইনফর্মার।

কয়েক মিনিট আগে ছবি পাঠান হয়েছে, এর মধ্যেই পিটারের ফোন! নির্ভরযোগ্য খবরী সে। কী বলতে চায় পিটার? কী খবর আছে ওর কাছে?

হাত বাড়িয়ে ফোনটা নেয় রিয়াজ।

'বল পিটার, কী খবর?'

৪২

১৩ অক্টোবর। দার্জিলিং মেল।

‘ভন্তে, আমরাও বুড্ঢিস্ট!’
‘হ্যাঁ বাংলায় বড়ুয়ারা অনেকেই থেরবাদী বৌদ্ধ।’
‘এখন আর সেইভাবে কিছু নেই যদিও। সব মিলেমিশে গেছে। ও তো ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে।’
‘শ্রীমান অর্হতের মুখে নমো বুদ্ধায় শুনে আমি অভিভূত! এটাই পারিবারিক শিক্ষা।’
‘আমার বাবার থেকে শিখেছে। বাবা মহাবোধি সোসাইটির খুব অ্যাক্টিভ মেম্বার। সুরজিৎ বড়ুয়াকে সোসাইটির সবাই চেনে। সব প্রোগ্রামে তো যানই, প্রতিটা এজিএম অ্যাটেন্ড করেন। বাবা অর্হৎকে নিয়ে মঠে যান প্রায়ই। আমরাও যাই।’ সন্দীপ বলে।
‘আপনারা বৌদ্ধ, অর্হতের জন্মও বুদ্ধপূর্ণিমায়—হোয়াট আ্যা কো-ইনসিডেন্স! খুবই এক্সেপশনাল ঘটনা!’

সন্দীপের দিকে তাকিয়ে হাসে অঞ্জনা। লক্ষ করেন বৃদ্ধ লামা।

‘কী ব্যাপার? ভুল বললাম কিছু?’ লামা জিজ্ঞাসু।
‘না, না—আসলে কো-ইনসিডেন্সটা ম্যানুফ্যাকচার্ড! মে-মাসে ওর ডেলিভারি ডেট পড়তেই আমরা ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করি শুভদিনেই যদি—আসলে এখন তো সব সিজার কেস —’
‘ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ম্যানুফ্যাকচার্ড কো-ইনসিডেন্স! এটা দারুণ বলেছেন!’ হা-হা করে হাসেন সন্ন্যাসী।

ছোট্ট অর্হৎ মায়ের মোবাইল নিয়ে খেলতে চায়। দিতে চায় না অঞ্জনা। ছেলের বায়নার মধ্যেই অঞ্জনা ফোন করে কানে ধরিয়ে দেয় ছেলের।

‘নাও, দাদুনের সঙ্গে কথা বল।’

অর্হৎ দাদুনের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে যায়। সন্দীপের দিকে একবার চেয়ে অঞ্জনা হাসিমুখে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে বলে,

‘কালিম্পং-এ এই প্রথম যাচ্ছি, ওখানেও তো অনেক মনাস্ট্রি আছে। মনাস্ট্রি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।’

‘অনেক গুম্ফা আছে কালিম্পং-এ। প্রাচীন সব গুম্ফা। তবে ট্যুরিস্ট বেশি যায় দুরপিন পাহাড়ের মনাস্ট্রিতে।’ প্রবীন লামা হেসে বলেন।

‘দুরপিনদারা মনাস্ট্রি তো, হ্যাঁ নাম শুনেছি! যাব।’ উৎসাহ নিয়ে বলে অঞ্জনা।

‘স্বয়ং হিজ হোলিনেস দলাই লামার পা পড়েছিল ওই গুম্ফায়!’ প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলেন লামা।

‘তাই নাকি? বাহ্, ডেলো পাহাড় ঘুরে আমরা দুরপিন গুম্ফায় যাব।’

‘দূরবীন?’ অর্হৎ ঢুকে পড়ে আলোচনার মাঝে।

‘দুরপিন।’ অঞ্জনা ছেলের চুল ঠিক করে দিতে দিতে বলে।

‘তোমরা নিশ্চয়ই টাউনের মাঝখানেই থাকবে, সকলেই তাই থাকে। ওখানেই হোটেল-বাজার। টাউনের একদিকে দুরপিন পাহাড়, ঠিক অন্যদিকে ডেলো। একটা উত্তরে তো অন্যটা দক্ষিণে। দুরপিনদারা কিছুটা কাছে, গুম্ফা ঘুরে ডেলো পাহাড়ে যায় সবাই।’ হেসে বলে লামা।

‘আচ্ছা, আচ্ছা!’ হাসে অঞ্জনাও।

‘আচ্ছা ভন্তে, নেক্সট দলাই লামা কে হবেন?’

সন্দীপের অকস্মাৎ প্রশ্নে কিছুক্ষণের নীরবতা। বৃদ্ধ লামা প্রশ্ন ও তার রেশটুকু অতিবাহিত করলেন সুস্মিত ভঙ্গিতে। তারপরে ধীরে বললেন,

‘ইটস নো লংগার বি আ রিলিজিয়াস কোয়েশ্চেন মিস্টার বড়ুয়া, এটি এখন একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন!’

‘ওহ্ সরি! আসলে—’ বিব্রত হয় সন্দীপ।

‘সরি বলার কিছু নেই, এই প্রশ্ন আপনার একার নয়, এমনকী কেবল তিব্বতিদেরও নয়, এই প্রশ্ন গোটা বিশ্বের!’

‘তা ঠিক, চিন এই ধর্মীয় প্রশ্নকে রাজনৈতিক প্রশ্ন বানিয়ে দিয়েছে!’ সন্দীপ বলে।

হাসেন বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী। সেই হাসিতে কতটা বেদনা, কী পরিমাণ হতাশা আর কতটা স্বপ্নিল জেদ মিশে আছে, টের পায় না সন্দীপ ও অঞ্জনা। সন্দীপ কেবল খেয়াল করে সন্ন্যাসী 'তুমি' সম্বোধন করেও আবার 'আপনি'তে ফিরে গেছেন। দলাই লামার প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ তোলা ঠিক হয়নি।

'আমাদের বাংলার সঙ্গে কিন্তু তিব্বতের বহু প্রাচীন যোগাযোগ। সেই অতীশ দীপংকরের সময় থেকে—' কথার অভিমুখ ঘোরাতে চায় সন্দীপ।
'অতীশের বহু আগে তিব্বতের সঙ্গে বাংলার যোগ। বাংলার পালযুগের ইতিহাস পড়লেই অনেকটা জানা যায়। সেভেন্থ্ সেঞ্চুরিতে আমাদের এক রাজা ছিলেন, স্রোং সন গাম্পো, তাঁর আমলেই আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম আসে। তাঁকে আমরা চেনরেজির অবতার হিসেবে পূজা করি। অনেকে বলেন, বাংলায় সন-তারিখ বলা হয়, সেই সন কথাটাও আমাদের তিব্বতি রাজার নাম থেকে পাওয়া—'
'ওইসময় গোটা ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা খারাপ হলেও বাংলায় ভালো ছিল।' ইতিহাসে শিক্ষক অঞ্জনার প্রত্যুত্তর।

প্রথম মহীপাল কীভাবে পালসাম্রাজ্যকে রসাতল থেকে টেনে তোলেন, সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকেও, নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে ফেলে অঞ্জনা।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখেমুখে বাহবা দেখে আরও উৎসাহ পায় সে। ইতিহাস তার পড়ানোর বিষয়।

'আপনি কি ইতিহাস পড়ান, এক্কেবারে টিচারদের মতো বলছেন!' হাসতে হাসতে বলেন সন্ন্যাসী।
'ঠিক ধরেছেন ভন্তে!'

লামাকে জবাব দিয়ে হা-হা করে হাসে সন্দীপ। লজ্জা পায় অঞ্জনা।

‘খুব ভালো। তথাগত আপনার মঙ্গল করুন। তিব্বত তখন ভারতে ভোট নামে পরিচিত, তাঁর রাজত্বে ভোটদেশ থেকেও প্রচুর বৌদ্ধভিক্ষু বঙ্গদেশে এসেছিলেন। তারা এখানে অধ্যয়ন করেছেন, সংস্কৃত শিখেছেন, দেশে ফিরে প্রচুর অনুবাদ করেছেন। এর ফলে আমাদের দেশও বৌদ্ধসাহিত্যে খুবই রিচ।’ সন্ন্যাসী বলেন।

‘বলা হয়, মহীপালের রাজত্বে বাঙালি তার আত্মগৌরব ফিরে পেয়েছিল। স্বয়ং দীপংকর ছিলেন সেই আত্মগৌরবের উজ্জ্বল প্রতীক।’ ইতিহাস পড়ানোর ঢঙে আবার বলে অঞ্জনা।

‘কিন্তু বাঙালি কি দীপংকরকে মনে রেখেছে? তেমন কিছুই তো জানি না ওঁর সম্পর্কে!’ সন্দীপের গলায় আক্ষেপ।

‘আমাদের ভাষায় জোবো বা জোবোজে মানে প্রভু। জোবো ছেনপো মানে মহাপ্রভু। গত এক হাজার বছর ধরে আমরা যাঁকে জোবো ছেনপো বলে মেনে চলেছি তিনি অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। আমাদের দেশ আর মঙ্গোলিয়ায় তাঁকে সংক্ষেপে বলে অতীশ। বাঙালি ওঁকে মনে রেখেছে কিনা জানি না, আমরা রেখেছি। কেবল মনে রেখেছি বললে ভুল হবে, হৃদমাঝারে রেখেছি।’

‘বাহ্ দারুণ বললেন তো! হৃদমাঝারে রেখেছেন! ভন্তে আপনি তো দারুণ বাংলা বলেন!’ লামার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সন্দীপ।

‘বাংলা ও বাংলাভাষা আমার খুবই প্রিয়।’

‘বাংলা ঘুরেছেন তার মানে?’

‘প্রচুর ঘুরেছি। পূর্ব এবং পশ্চিম—দুই বাংলাই।’

‘আমরা পূর্ববঙ্গের, তবে আমাদের পূর্বপুরুষ বহুদিনই চলে এসেছিলেন কলকাতায়।’

‘বড়ুয়ারা চট্টগ্রামের বহু প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়। মহীপালের সুপুত্র নয়পালের সময়েই বৌদ্ধধর্ম ওখানে ছড়িয়ে পড়ে।’

‘ভন্তে, আমার বাবা বলেন, ভারতবর্ষ থেকে নয়, চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম এসেছিল আরাকান থেকে।’

‘হ্যাঁ সেই মতও আছে। হতেও পারে। পণ্ডিত বিহার নামে ওখানে একটা বিখ্যাত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ং ধর্মপাল।’ সন্ন্যাসী অঞ্জনার দিকে তাকান। ‘তখন ওই জায়গার নাম

ছিল রম্মদেশ। রম্মদেশ একটা সময় বৌদ্ধধর্মের বেশ বড় সেন্টার হয়ে উঠেছিল। পরে ওই জায়গার নাম হয়েছে চট্টগ্রাম।'

'হ্যাঁ, রম্মদেশ নামটা শুনেছি বাবার কাছে—আচ্ছা ভন্তে, একটা প্রশ্ন করব?'

'কী প্রশ্ন?'

'ধর্ম রক্ষা করবে মানুষ—রাজা-রাজড়াদের ভালোমন্দের ওপর ধর্মের ভালোমন্দ নির্ভর করবে কেন?' সন্দীপের প্রশ্ন জাগে।

'ঠিক বলেছেন, মানুষের মাঝেই ধর্ম থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাও দরকার। তাঁরা কার গলায় মালা দেবেন আর কার মাথা কাটবেন—সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রের একটা অভিমুখ তৈরি হয়। আজকের ভারত দেখে আশাকরি বুঝতে অসুবিধে হবে না।' মৃদু হেসে বলেন লামা।

'হুঁ!'

'রাষ্ট্রের ধর্মীয় অভিমুখ রাজার জন্য ভালো হতে পারে, কিন্তু ধর্মের জন্য ভালো নয়। বদনাম হয় সেই ধর্মের!' লামা বলেন।

মস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে সন্দীপ। সামান্য বিরতি, তারপর হঠাৎই বলে,

'আচ্ছা চিন কি আমাদের অরুণাচল প্রদেশ আর লাদাখ নিয়ে নিতে পারে?'

৪৩

আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। পার্ক স্ট্রিট। কলকাতা।

'স্যার লোকটাকে আমি দেখেছি।'

'কবে?'

'গত মাসে।'

‘রিয়েলি!’

‘ইয়েস স্যার!’ ‘

‘একে তুই পেলি কোথায়?’

‘কর্পোরেশনের একটা ইনফর্মেশন সাপ্লাই করেছিলাম একে।’

‘ইনফর্মেশন!’

‘ওই বাচ্চার নাম-ধাম—কবে জন্মেছে—’

‘কোন বাচ্চা?’

‘একজন নয় স্যার—অনেকগুলো!’

‘ফটোকপি আছে সেই কাগজের?’

‘হ্যাঁ স্যার। পিটার যা-সাপ্লাই করে, সবের কপি রাখে। ফোটোও আছে স্যার লোকটার। মোবাইলে।’

‘গোলাচ্ছিস নাতো অন্য কারোর সঙ্গে? ছবিটা আবার ভালো করে দেখে বল!’

‘পিটার এইসব ভুল করে না, স্যার!’

‘চলে আয়।’

‘সাড়ে বারোটা বাজে স্যার?’ ইতস্তত করে পিটার।

‘কেন তোর কি ভূতের ভয় আছে?’ হাসে রিয়াজ।

‘কাল সকালে গেলে হবে না স্যার?’

‘খুব দরকার পিটার! হাতের বোতলটা শেষ করে চলে আয়!’

‘কী যে বলেন স্যার! আসলে মা একা আছে—’

‘গাড়ি যাচ্ছে। আর ছবিটা পাঠা।’

‘কাগজটার ছবিও পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার—স্যার প্লিজ! প্লিজ স্যার!’

‘সে পাঠা, কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট কেস পিটার। তোকে আসতেই হবে! ছেড়ে দেব তাড়াতাড়ি, চলে আয়।’

‘ওকে স্যার!’

রণে ভঙ্গ দেয় পিটার। রাজি হয় রিয়াজের কথায়। বো ব্যারাকে, পিটারকে ডেরা থেকে তুলতে, বেরিয়ে যায় গাড়ি।

পুলিশের চর পিটারকে ছেড়ে রিয়াজ লোকটার ছবিটা দেখে আবার। কে এই লোকটা? মিউজিয়াম থেকে তিব্বতি গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি চুরি করছে বলে সন্দেহভাজন যে লোক, সেই লোকটাই একমাস আগে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে নথি জোগাড় করছে মুহুরি মারফৎ! কী ইনফর্মেশন নিয়েছিল লোকটা কর্পোরেশন থেকে?

ছবি পাঠায় পিটার। নথিও। দুটো ছবিকে মিলিয়ে দেখে রিয়াজের মনে হয় যথেষ্ট মিল আছে দুটো লোকের চেহারায়। কাগজটা দেখে খুব কিছু বুঝতে পারে না। পরপর বেশ কিছু নাম লেখা।

ফোন পকেটে ঢুকিয়ে লিফটে ওঠে। আবার যায় আটতলায়। ওই তলের কোনা কোনা দেখা হচ্ছে তীক্ষ্ণ নজরে। রিয়াজ এগিয়ে যায় গ্যালারির দিকে। আগেরবার আটতলার তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গ্যালারিতে এসে খেয়াল করেছিল বিশালাকার মুখোশগুলো। এবার অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে দেখল।

মাথায় ভেসে উঠল ছম নৃত্যের ভিডিও দৃশ্য। ধর্মপাল দেব-দেবীদের ক্রুদ্ধ মুখ। বাজছে বিরাট ট্রাম্পেট, শিঙা, শাঁখ, ঘণ্টা, করতাল। বিশাল মুখোশ ও রঙচঙে পোশাক পরিহিত তিব্বতি লামার দল নাচছে তালে তালে। হলঘরটাকে তিব্বতি গুম্ফার বিশাল চাতাল মনে হল।

চোখ বুজে নিজেকে সংহত করে রিয়াজ। শক্ত হয় চোয়াল। সিসি টিভির মনিটরে যাঁরা সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে বসে আছেন, তাঁদের ফোন করে খবর নেয়। তোলপাড় করে ফেলতে হবে এই বহুতল।

ফোন পকেটে ঢোকাতে-না-ঢোকাতে আবার বাজে। এক এএসআই জানান পিটার এসে গেছে। লিফটে নীচে নামে রিয়াজ।

পকেট থেকে বার করে কাগজটা এগিয়ে দেয় পিটার। কাগজটা নিয়ে চোখ বোলায় রিয়াজ। এ-ফোর কাগজে চার পাতার কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। পাশাপাশি নাম আর তারিখ লেখা। নামগুলো বিভিন্ন হলেও পাশের তারিখগুলো এক। ১৭ মে।

‘এটা কীসের লিস্ট?’
‘লোকটা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল একদিন, বলল ১৭ মে জন্মেছে এমন ছেলেদের একটা লিস্ট চাই যাদের বয়স সাত বছর।’
‘তারপর?’
‘আর কী, আমি যোগাড় করে দিলাম স্যার। লোকটার ছবিও তুলে রেখেছি।’

রিয়াজ সিসি ক্যামেরায় বন্দি লোকটার ছবি দেখায় পিটারকে। মনোযোগ দিয়ে দুটো ছবি দেখে পিটার। সময় নিয়েই দেখে। নিজের ফোন থেকে ছবি বার করে মিলিয়ে দেখে।

‘অনেক মিল আছে। একই লোক বলে মনে হচ্ছে স্যার!’
‘ভালো করে দেখ!’
‘প্রচুর মিল স্যার!’
‘সতেরোই মে-তে জন্মান সব বাচ্চার লিস্ট চাইল?’
‘সব বাচ্চা নয়—শুধু ছেলে—আর সালটা বলল—’
‘এই তারিখটাই কেন?’
‘জানি না স্যার।’

ওয়েব ব্রাউজারের সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে, মুখের কাছে ফোনটা এনে উচ্চারণ করে রিয়াজ—সেভেন্টিন্থ মে। উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট বছরও। ভয়েজ সার্চে মুহূর্তে তথ্যভাণ্ডার উজাড় করে দেয় ইন্টারনেট। ফলাফল দেখে ভ্রু-যুগল সামান্য কুঁচকে যায় রিয়াজের। সেই বছর দিনটা ছিল বুদ্ধজয়ন্তী। হঠাৎ বুদ্ধজয়ন্তীর দিন জন্মানো পুত্রসন্তানদের লিস্ট কেন দরকার পড়ল? তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম গ্যালারি থেকে তিব্বতি বৌদ্ধগুরুর মূর্তি উধাও! বুদ্ধ-সংযোগ আছেই। উদগ্রীব হয় রিয়াজ।

কাগজটার ওপর আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে রিয়াজ। তথাগত মণ্ডল। সুমন মিত্র। সুগত প্রধান। অমিতাভ ব্যানার্জি। যশ পারেখ। সৌগত রায়। মোঃ মতিয়ুর রহমান। দীপঙ্কর বসু। তিষ্য দাশগুপ্ত। প্রিয়দর্শী ভদ্র। সুমঙ্গল দাস। সিদ্ধার্থ আগরওয়াল। অর্হৎ বড়ুয়া। সুজাত চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি অসংখ্য পুরুষ নাম। পাশে সময় চিহ্নিত। শিরোনামে ইংরেজিতে লেখা '১৭ মে জন্মানো পুরুষ জাতকের নাম, জন্মসময় ও মা-বাবার নামের তালিকা'।

তালিকা দেখে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না রিয়াজ। বুদ্ধজয়ন্তীতে কলকাতায় জন্মানো ছেলেদের তালিকা কোন কাজে লাগবে লোকটার? বাচ্চাগুলোর সঙ্গে মূর্তিচুরির কোনও যোগ আছে? তাল খুঁজে পায় না রিয়াজ।

৪৪

১৩ অক্টোবর। দার্জিলিং মেল।

নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। প্রাচীন ইতিহাসের মাঝে পুনর্বার চিনকে নিয়ে সন্দীপের অনুপ্রবেশে থেমে যায় আলোচনা। যদিও স্তব্ধতা প্রশয় দেন না প্রাচীন লামা, তিনি হাসিমুখে সন্দীপের দিকে চেয়ে বলেন,

'রাজনীতিতে আপনার প্রচুর উৎসাহ দেখছি!'
'না, আসলে চিনের ব্যাপারটা খুব রহস্যময়, তাই বলছিলাম আরকী!'

কিছুটা অপ্রস্তুত সন্দীপ। অঞ্জনাও তাকায় তার দিকে। ইতিহাসচর্চায় বারংবার রাজনীতির প্রবেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পছন্দ হচ্ছে না ভেবে, অঞ্জনা স্বামীকে ঈষৎ ভর্ৎসনাও করে। যদিও

প্রাচীন সন্ন্যাসীর মুখ দেখে অনুধাবন করা যায় না, তাঁর পছন্দ বা অপছন্দ। স্বরেরও কোনও ওঠানামা নেই। ভঙ্গি প্রশান্ত।

‘এখনকার লড়াই হল অর্থনীতির লড়াই, সেটাই রাজনীতিকে কন্ট্রোল করে। চায়নার পাশেই ভারত এখন ইমার্জিং সুপার পাওয়ার, ফলে ভবিষ্যতের ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোর দখল নিতে চাইবে ওরা। জেনে রাখবেন, চায়না বহুদূর পর্যন্ত চিন্তা করে তবে সিদ্ধান্ত নেয়। ওদের ফারসাইটেডনেস অকল্পনীয়!’

কাঁধের ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করেন বৃদ্ধ। গলায় ঢালেন জল। অনেকক্ষণ কথা বলে তৃষ্ণার্ত তিনি। অঞ্জনা ছেলেকে নিয়ে শুরু করে ঘুমোনোর তোড়জোড়।

‘তাহলে লাদাখ আর অরুণাচল নিয়ে আমাদের যথেষ্ট ভয় আছে!’ সন্দীপের কৌতূহল অসীম।
‘ফাইভ ফিঙ্গারস্ কাকে বলে জানেন?’
‘ফাইভ ফিঙ্গারস্?’ অজানা বিষয় আবার প্রশ্নাকারে ফিরিয়ে দেয় সন্দীপ।
‘আমাদের তিব্বতকে যদি আপনি হাতের তালু ভাবেন—’

ডান হাতের তালু মেলে সন্ন্যাসী দেখান সন্দীপকে। তারপর হাত উল্টে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত বাঁহাতের তর্জনী দিয়ে চিহ্নিত করেন। হাঁ করে দেখে সন্দীপ।

‘চাইনিজ ফরেন পলিসি অনুযায়ী হাতের এই তালুটা হচ্ছে তিব্বত আর তিব্বতের পেরিফেরির মধ্যে এই ফাইভ ফিঙ্গারস হল লাদাখ, নেপাল, সিকিম, ভুটান এবং অরুণাচল প্রদেশ। এই কনসেপ্টটা কার জানেন?’

দু’দিকে মাথা নাড়ায় সন্দীপ।

‘স্বয়ং মাও-এর। হাতের তালু তিব্বত কব্জা করে ফেলেছে, এখন চায়না এই পাঁচ আঙুলকেও দখল করতে চাইবে, অন্তত মাও-এর থিয়োরি অনুযায়ী। মিস্টার বড়ুয়া, কেবল লাদাখ আর অরুণাচল নয়, ইণ্ডিয়ার সিকিমও চাইনিজদের টার্গেট!’

‘এ তো বিশাল ভয়ের ব্যাপার! আচ্ছা, কেন ওরা এই অঞ্চলগুলো টার্গেট করছে?’ শেষ হয় না সন্দীপের প্রশ্ন।

‘আহ্, এবার থামো! উনি ঘুমোবেন।’ বিরক্তি দেখায় অঞ্জনা।

‘না, না আমার ঘুমনোর দেরি আছে। আপনারা চাইলে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। শ্রীমান অর্হৎকে ঘুম পাড়িয়ে দিন, কাল আবার অনেকটা জার্নি আছে।’

‘আরে এখনও বর্ধমানও আসেনি, এখনই কীসের ঘুম!’ হেসে বলে সন্দীপ।

‘বর্ধমানের মিহিদানা খেয়ে তবে ঘুমোবেন নাকি?’ মৃদু হেসে বলেন সন্ন্যাসী।

‘আমি মিহিদানা খাব!’ অর্হতের কানে গেছে মিহিদানার কথা।

‘আচ্ছা ঠিক আছে, বর্ধমান আসুক।’

ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে সন্দীপ। তারপর সন্ন্যাসীর দিকে চায় হাসিমুখে। চোখে এখনও প্রশ্নের স্পর্শ। প্রাচীন লামা বুঝতে পারলেন সন্দীপ আরও শুনতে চায়।

সাড়ে এগারোটা অতিক্রান্ত। ট্রেন ছুটে চলেছে। পর্দা টেনে দিয়েছে অঞ্জনা। ঠাণ্ডা কামরার ভেতর চার প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রীর একজন অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটু আগে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেছে শিশু অর্হৎও। ছেলের পাশে বসে হাঁ করে সন্দীপ আর লামার কথা শুনছে অঞ্জনা। এবার তারও কথা বলতে সাধ জাগে। কথা নয়, প্রশ্ন।

‘আপনি কবে লামা হলেন?’

অঞ্জনার কথা শুনে হাসেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

‘সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই!’ জিভ কেটে অঞ্জনাকে বলে সন্দীপ।

‘আমার বলতে আপত্তি নেই! এত ছোটো বয়সে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে, আগের কথা কিছুই আর মনে নেই!’ সন্ন্যাসী বলেন। ঠোঁটের কোনায় হাসি।

‘কত ছোটো?’ অঞ্জনা জানতে চায়।

‘আমাদের তিব্বতে প্রথা আছে, শিশুর জন্মের ঠিক সাত বছরের মাথায় গণৎকাররা আসবেন, শিশুর জন্মকুণ্ডলী পড়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলে দেবেন। তোমাদের বাঙালিদের জন্মকুণ্ডলীকে কোষ্ঠী বলে। আগে সকলের বানান হোত, এখন হয় কিনা জানি না।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ কুষ্ঠী বলি আমরা। অর্হতের ঠাম্মা-দাদু নাতির জন্য বানিয়েছেন এক জ্যোতিষীকে দিয়ে।’ অঞ্জনা অতি-উৎসাহে বলে।

‘আমার বাপ-মাও আমার সাত বছরের জন্মদিনে ডেকে এনেছিলেন ভবিষ্যৎবক্তাদের। তাঁরা আমার জন্মকুণ্ডলী পড়ে শোনান শুরু করতেই জন্মদিনের আনন্দ অনুষ্ঠান নিমেষে শোকসভা হয়ে গেল।’

‘কেন?’ অঞ্জনার অবাক প্রশ্ন।

‘ভবিষ্যৎবক্তারা আমার দিকে হাত তুলে জানিয়ে দিলেন, এই শিশু ভিক্ষু লামা হতেই জন্মেছে!’

‘এমা!’ শিউরে ওঠে অঞ্জনা।

‘সঙ্গে সঙ্গে আমার হাসি-খেলা সব মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। সাত বছরের এক শিশুকে তার বাপ-মায়ের থেকে আলাদা করে দেওয়া হল।’

‘তারপর?’ ভেতরে ভেতরে আবার কেঁপে ওঠে অঞ্জনা।

‘তারপর আর কী! শিশুর কান্নাকে অগ্রাহ্য করেই তার বাপ-মা তাকে পরিয়ে দিল ভিক্ষুর চীবর। পাঠিয়ে দিল সঙ্ঘারামে। শুরু হয়ে গেল লামা হওয়ার নির্দিষ্ট শিক্ষা। সিনিয়র লামারা ভার নিলেন আমার শিক্ষার। বাবা-মা-বন্ধু-পরিজন সকলের সঙ্গে একমুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল সব সম্পর্ক।’

দার্জিলিং মেল ছুটছে পূর্ণগতিতে। অঞ্জনা ঘুমন্ত ছেলের কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। ফোনটা তুলে সময় দেখে। আর কিছুক্ষণ পরেই বর্ধমান জংশন।

টয়লেটের দিকে যায় সন্দীপ। ঘুমনোর তোড়জোড় শুরু করেন বৃদ্ধ লামা। মোড়ক খুলে চাদর বার করতে করতে বলেন,

‘আমার শিক্ষা শুরু হল, কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটা অপারেশন করল—লামা হতে গেলে এটা করতেই হয়।’
‘অপারেশন?’ অঞ্জনার বিস্মিত প্রশ্ন।
‘থার্ড আই কী জানা আছে?’
‘তৃতীয় চক্ষু! কপালে থাকে।’
‘হ্যাঁ। ওটা আমাদের জ্ঞানচক্ষু। আমার দু-চোখের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটা অপারেশন করে এই জ্ঞানচোখ খুলে দেওয়া হল। গুরুরা বলে দিলেন, এবার থেকে তুমি দিব্যদর্শনের অধিকারী হলে। মানুষের ভেতরটা পড়ে ফেলতে পারবে তুমি। যে-মানুষ যেমন, তুমি তাকে তেমনই দেখবে। সে নিজেকে তোমার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবে না।’
‘আপনার দিব্যদৃষ্টি আছে? আপনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান?’ অঞ্জনা ক্রমাগত বিস্মিত।

লামা হাসেন।

‘আমার ছেলের ভবিষ্যৎ একটু বলে দেবেন?’ মিনতির সুর অঞ্জনার গলায়।

বৃদ্ধ লামা আরও হাসেন। হাসতেই হাসতেই বললেন,

‘ও তো অর্হৎ, এরপর বোধিসত্ত্ব হয়ে এ ছেলে মানবজাতির মুখ উজ্জ্বল করবে।’

লামা কী বললেন বা বলতে চাইলেন পরিষ্কার বুঝতে পারল না অঞ্জনা। অর্হৎ বা বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে ওর তেমন কোনও ধারণাই নেই।

লামার হাসিটা যেন কেমন। চোখের দৃষ্টিও বড় বেশি তীক্ষ্ণ। শিরশির করে ওঠে অঞ্জনার সর্বাঙ্গ। অস্বস্তি হয়। টয়লেট থেকে সন্দীপ ফিরতেই অঞ্জনা যায়। শিরশিরানিটা যায় না।

১৩ অক্টোবর। আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। পার্ক স্ট্রিট। কলকাতা।

বাচ্চাদের নামের তালিকা হাতে নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চারপাশে তাকায় রিয়াজ। সোফায় পাশাপাশি বসে আছেন ডিরেক্টর আর চিফ কিউরেটর। থমথমে মুখ ডিরেক্টরের। চোখাচোখি হতেই চিফ কিউরেটর তনুময় পাল মুচকি হাসেন।

'লিস্টটা একটু দেখতে পারি?'

চিফ কিউরেটর তনুময় পাল উৎসাহ দেখান। তাঁর হাতে নামের তালিকাটা দেয় রিয়াজ।

চারপাতা তালিকা পুরোটাই উল্টেপাল্টে দেখেন তনুময়বাবু।

'বেশিরভাগ ছেলের নামের সঙ্গে একটা বুদ্ধ কানেকশন আছে খেয়াল করেছেন রিয়াজবাবু? তথাগত, সুগত, অমিতাভ, তিষ্য, সুমঙ্গল, সিদ্ধার্থ, অর্হৎ, সুজাত।'
'এগুলো কী সবই বুদ্ধের নাম?'
'সব নয়, তবে বুড্ঢিজমের সঙ্গে রিলেটেড সব নাম।'
'কেন এমন কো-ইনসিডেন্স! সকলের একই ধরনের নাম!' সবিস্ময় প্রশ্ন রিয়াজের।
'কো-ইনসিডেন্সের ব্যাপার নেই তো! বুদ্ধপূর্ণিমায় জন্মেছে বলেই বাপ-মায়েরা এমন নাম রেখেছেন।' মাথা নেড়ে বলেন চিফ কিউরেটর।
'হুঁ, আমাদের বাঙালিদের বাচ্চার আনকমন নাম-রাখা নিয়ে একটা ফ্যাসিনেশন আছে!' হাসে রিয়াজ।
'ওটা এখন অবসেশন হয়ে গেছে! তবে কেবল বুদ্ধপূর্ণিমা নয়, বাঙালি হিন্দু পঁচিশে ডিসেম্বর জন্মালেও ছেলের নাম রাখে যিশু, কিন্তু মিলাদ-উন-নবি বা ঈদের দিন কেউ

জন্মালে কখনও শুনেছেন ছেলের নাম রেখেছে মহম্মদ? নজরুলের জন্মদিনে জন্মালে কেউ নাম নজরুল রাখে?' বলেই হা-হা হাসিতে ফেটে পড়েন তনুময়বাবু।

রিয়াজও হাসে কিন্তু আলোচনার গতিমুখ বদল করতে সে অনিচ্ছুক। সামাজিক সমস্যা ও অসঙ্গতি নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে কিন্তু আপাতত এই রহস্যময় ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করা বেশি জরুরি।

'বুদ্ধজয়ন্তী-বর্ন বেবিজ লিস্ট সংগ্রহ করছে যে-লোক, সে-ই লোকই মিউজিয়াম থেকে গুরু পদ্মসম্ভবের দুষ্প্রাপ্য মূর্তি চুরি করছে! কেন?'

'তা আমি কী করে বলব!' ঠোঁট উল্টে বলেন তনুময় পাল।

'কী করতে চায় লোকটা?' যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে রিয়াজ।

'আরও একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় এই কাগজে আছে!' কাগজটির দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায় কিউরেটর।

'বলুন!'

'প্রতিটি ছেলেরই সাত বছর পূর্ণ হয়ে গেছে! ইনফ্যাক্ট ঠিক সাত হয়েছে এমন জাতকের তালিকাই চেয়েছে! জন্মের সালটা খেয়াল করুন!' তালিকা থেকে চোখ না-সরিয়েই বলেন কিউরেটর।

চমকায় রিয়াজ। কী বলতে চান তনুময় পাল? সাত বছরের জাতকের আলাদা কি বিশেষত্ব আছে?

'সাত বছরের জন্মদিন! কোনও স্পেশালিটি আছে স্যার?'

'তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে আছে। ওঁরা সপ্তম জন্মদিনকে খুব গুরুত্ব দেয়।' রিয়াজের দিকে মুখ তুলে বলেন তনুময়বাবু।

'প্লিজ ডিটেল!'

'সেদিন জ্যোতিষীরা এসে শিশুর কোষ্ঠী বিচার করে।'

'তারপর?'

'সেই ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ঠিক হয় শিশু ভবিষ্যতে কী করবে।'

‘এই লোকটিকে দেখে কি তিব্বতি মনে হচ্ছে?’ রিয়াজ ছবি মেলে ধরে কিউরেটরের সামনে।

‘অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে না।’

‘আমি এই দুটো জিনিসই লিঙ্ক করতে পারছি না!’

‘লিঙ্ক থাকবেই তার কি কোনও মানে আছে!’ জবাব তনুময় পালের।

‘না-ই থাকতে পারে, কিন্তু দুটো জায়গাতেই একই লোক আর বুদ্ধ কানেকশন!’ রিয়াজ বলে।

‘হুঁ। কেস মনে হচ্ছে জন্ডিস!’ তনুময় বলেন।

তারপর হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন রিয়াজের দিকে। তিনি এবার কিঞ্চিৎ বিমূঢ়। কিন্তু পুলিশকে হতবুদ্ধি হলে চলে না। রিয়াজ ফোন লাগায়। ঘটনা ও তদন্তের অগ্রগতি জানায় জয়েন্ট সিপি রজত রায়কে। বিশেষত পিটারের খবরটা বলে বিস্তারিত। সব শুনে রজতস্যার প্রত্যেকটি ছেলের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। তবে এই রাতে নয়, আগামিকাল। আগামিকাল প্রত্যেকের বাড়ি থেকে খবর নিতে হবে, তবে হইচই করে নয়, সতর্কতার সঙ্গে। অযথা আতঙ্ক তৈরি করলে পুলিশের বদনাম হবে।

জয়েন্ট সিপিস্যারের ফোন ছেড়ে রিয়াজ একটা চেয়ারে বসে চিন্তার জট ছাড়াতে চায়। ডেকে ওঠে পেট। খিদে পেয়েছে বেজায়। ঘড়ি দেখে। রাত ক্রমশ গভীর। টেবিলের ওপর রাখা জলের বোতল থেকে জল খায় এক ঢোক।

ছেলেগুলোর কি কোনও বিপদ হতে পারে? চিন্তা এসে আবার চেপে ধরার মুহূর্তেই ফরেনসিক অফিসার এসে কানে কানে কিছু বলেন। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে রিয়াজ।

‘আপনি নিশ্চিত?’

‘একশো শতাংশ! কোনও কৃত্রিম গন্ধ নয়। আসল গন্ধ।’

‘কী বলছেন! এটা হয় নাকি?’

‘তখন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিইনি। এখন নিশ্চিত হয়েই জানালাম।’

রিয়াজ ক্যাটালগ খুলে আবার চুরি-যাওয়া মুর্তিটা দেখে। হাঁ-করে চেয়ে থাকে বাঘের পিঠে নৃত্যরত গুরু রিম-পো-ছে'র দিকে। কী অদ্ভুত কথা বলছেন ফরেনসিক অফিসার! গ্যালারির সামনে বোটকা গন্ধটা বাঘের। বাঘের গায়ের গন্ধ। কোনও কৃত্রিম গন্ধ নয়। আসল গন্ধ!

৪৬

১৩ অক্টোবর। দার্জিলিং মেল।

বেশিরভাগ যাত্রীই ঘুমিয়ে পড়েছেন বা ঘুমোনোর তোড়জোড় করছেন। টয়লেট থেকে ফিরে অঞ্জনা দেখে সন্দীপ তখনও কথা বলে চলেছে বৃদ্ধ লামার সঙ্গে। লামার কথাগুলো প্রায়-দুর্বোধ্য তার কাছে। বৌদ্ধপরিবারে বিয়ে করার সূত্রে কিছু শব্দ পরিচিত কিন্তু গভীরে গিয়ে জানার আগ্রহ কখনও খুব বেশি দেখায়নি।

'সংস্কৃত স্থবির পালিতে হয়েছে থের। এই থেরবাদী বা স্থবিরবাদীদের চরম আদর্শ ছিল শূন্যতা। প্রজ্ঞার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে হবে, তারপর মহাকরুণার পথে থাকতে হবে এই জগতেই। তারপর সব বিশ্বজীবের মুক্তির জন্য অনন্ত কল্প ধরে কুশলধর্ম করে যেতে হবে। এটাই হল মহাযানীর পথ—এটা অর্হত্বে'র পথ নয়—বোধিসত্ত্বের পথ। অর্হৎকে বোধিসত্ত্ব হতে হবে।'

আবার একই কথা শুনে ভেতরে ভেতরে কেঁপে যায় অঞ্জনা। বোধিসত্ত্বের পথ কী? কী বলতে চান এই লামা?

'যদিও এই তত্ত্বগত ডিফারেন্স এখন আর তেমন নেই বলেই আমি মনে করি। থেরবাদীদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। অন্তত তিব্বতি মহাযানে নেই। কোনও বোধিসত্ত্ব, হীনযানী বলে কারোকে ছোটো করে না।'

'অর্হৎকে কেন বোধিসত্ত্ব হতে হবে?' না-বলে পারে না অঞ্জনা।

‘অর্হৎ হলেন আদর্শ মানুষ যিনি সব রকম জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত। অর্হতের সাধনা হল চরিত্রের সাধনা, কিন্তু এই সাধনা তাঁর একান্তই নিজের। কিন্তু তাঁকে এই অর্হত্বকে অতিক্রম করতে হবে। তাকে ক্ষুদ্রস্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর জনজীবনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।’

হাসেন লামা। তারপর অঞ্জনার দিকে পূর্ণদৃষ্টি দিয়ে বলেন, ‘আমি আশীর্বাদ করছি অর্হৎ যেন নিজেকে অতিক্রম করে বোধিসত্ত্ব হতে পারে।’

না-বুঝেই হাসে অঞ্জনা। সন্ন্যাসীর আশীর্বচনকে পুত্রের পক্ষে মঙ্গলসূচকই ধরে নেয় সে। তবু কোথাও যেন একটা কাঁটা বিঁধে থাকে তার অন্দরে।

‘বুদ্ধের ত্রিকায়ের কথা বলে মহাযান। পালিশাস্ত্র তথাগতের অস্তিত্বের দুটো দিক নিয়ে বলেছে—শাক্যসিংহ মানুষের দেহ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন—তথাগতের সেই মনুষ্যরূপ কায় হল রূপকায়। তাঁর সেই মানুষী কায় ছিল তাঁর তত্ত্বময় অস্তিত্বের বিগ্রহমাত্র। এই তত্ত্বময় অস্তিত্বকে বলা হল বুদ্ধের অরূপ-কায়।’

মন্দ্র স্বর। শান্ত ভঙ্গিমা। সবকিছুই যে বোধগম্য হচ্ছে এমন নয়, কিন্তু আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি শুনতে বাধ্য করছে অঞ্জনাকে।

সন্ন্যাসী রূপকায় ও অরূপ-কায় পেরিয়ে নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় আর ধর্মকায়, এই ত্রিকায়-এর কথা বলেন।

‘সম্ভোগকায় হল বুদ্ধের জ্যোতির্ময় আনন্দময় দেহ—সে দেহ ধারণ করে তিনি সব শিষ্যদের দেশনা দান করেছিলেন। দেশনা মানে উপদেশ। বুদ্ধের এই জ্যোতির্ময় ও আনন্দময় দেহ থেকেই জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য বোধিসত্ত্ব। এই বোধিসত্ত্বরাই দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে বুদ্ধের উপদেশ প্রচার করে চলেছেন।’

তারপর বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্রকায় ও সহজকায়ে প্রবেশ করেন বৃদ্ধ লামা। কিন্তু আর কিছুই কানে ঢোকে না অঞ্জনার। অসহায় বোধ করে। শান্ত গম্ভীর স্বর অথচ কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই সন্ন্যাসীর! সেই দৃষ্টির সামনে প্রায় নুয়ে পড়ে অঞ্জনা। সন্দীপের দিকে তাকায়। সন্দীপের তেমন কিছু হেলদোল নেই।

‘এটা রাখুন। সকালে শ্রীমান অর্হৎকে দেবেন।’

পোষাকের ভেতর থেকে কিছু একটা নিমেষে বের করলেন লামা। এগিয়ে দিলেন অঞ্জনার দিকে। সম্মোহিত অঞ্জনা প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বাড়ায় হাত। জিনিসটি হাতে নিয়েই চমকে যায় অঞ্জনা। মুখোশ।

‘নাগ-পো চেন-পো! মহাকাল! মহাকাল আমাদের রক্ষা করেন! তিনি ধর্মপাল!’

বৃদ্ধ লামার শান্ত অথচ মর্মভেদী স্বর নাকি মুখোশটির ভয়াবহতা অথবা দুইয়েরই অভিঘাত, অঞ্জনা ধপ করে বসে পড়ে আসনে। সন্দীপ আপার বার্থ থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে নেয় মুখোশটা। তারপর হুকে ঝুলিয়ে দেয়। ঝুলন্ত সেই মহাকালের মুখোশ ঈষৎ দোলে।

ভয়াবহ সেই মুখমণ্ডল সহ্য করতে পারে না অঞ্জনা। আতঙ্কিত সে, সন্দীপকে বলে মুখোশটি সরিয়ে রাখতে। সন্দীপ ট্রেতে শুইয়ে রাখে মহাকালের মুখ।

ইত্যবসরে অঞ্জনার চোখ যায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দিকে। স্মিতমুখ। তীক্ষ্ণধার দৃষ্টি। সেই অন্তর্ভেদী অবলোকন থেকে মুক্তি পেতে চোখ নামায় সে। গায়ে চাদর টেনে ছেলের পাশে শুয়ে পড়ে। ছেলেকেও টেনে নেয় বুকের কাছে।

১৪ অক্টোবর। দার্জিলিং মেল।

যে সকল উপভোগের বস্তু মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে, শাক্যবংশীয় রাজপুত্র তাতে লুব্ধ হলেন না, মানসিক শান্তিও লাভ করলেন না। বিষাক্ত শরাহত সিংহের মতো তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হলেন। মানসিক শান্তি লাভের আশায় একদিন, পিতার অনুমতি নিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন বনভূমির দিকে। নতুন সুবর্ণ লাগাম ও চঞ্চল ঘুঙুর পরিহিত, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত, রাজপুরীর সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্ব কন্থক-এর পিঠে আরোহণ করে যুবরাজ শুরু করলেন যাত্রা।

বনভূমিতে প্রবেশ করে একসময় যুবরাজ বৃক্ষশোভা দর্শনে মগ্ন হয়ে অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন বহুদূর। বনপ্রান্তে পৌঁছে তিনি দেখলেন কর্ষিত চাষের ভূমি চরাচরময়। হলাঘাতে কর্ষিত ভূমি থেকে কুশ, শিকড়, আগাছা প্রভৃতি উৎপাটিত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ভূমিজ কীট, পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ও অতি ক্ষুদ্র জীবসকল তীক্ষ্ণ হলের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে নিহত। এই দেখে আত্মীয়-বিয়োগের মতো শোক পেলেন যুবরাজ।

যাঁরা ভূমিতে কৃষিকাজ করছিলেন, প্রখর রোদে ও প্রচণ্ড তাপে তাঁরা ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত। অবশ। ঘামে ও ধূলায় তাঁরা মলিন ও বিবর্ণ। তাঁদের শরীরে যেন আর কোনও শক্তি অবশিষ্ট নেই। যুবরাজ তাঁদের দিকেও তাকিয়ে থাকলেন স্থির চোখে। তাঁদের দুর্দশায় তাঁর মন করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল।

অতঃপর শোকে মুহ্যমান যুবরাজ নেমে পড়লেন কন্থকের পিঠ থেকে। ব্যথিত চিত্তে নত মস্তকে বিচরণ করতে লাগলেন ইতস্তত। ভাবলেন, এই জগতে জন্মালে সকল জীবকেই মরতে হবে একদিন। এই জগত সুখকর স্থান নয়। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক জম্বুবৃক্ষের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন। মর্মরিত পত্রগুচ্ছ। যুবরাজ সেই তৃণ ও লতাপাতা আচ্ছাদিত ভূমিতে বসলেন পদ্মাসনে। গভীর চিন্তায় ধরলেন স্থৈর্যের পথ।

কিছুক্ষণ আসনে বসে তিনি লাভ করলেন মানসিক স্থৈর্য। তারপর বিষয়বাসনা ও মানসিক অশান্তি মুক্ত হয়ে ধ্যানের প্রথম স্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁর মাথায় চিন্তা এল, হায়, বড় দুঃখের বিষয় এই যে মানুষ এমনই নির্বোধ যে স্বয়ং জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুযুক্ত হয়েও সম ধর্মবিশিষ্ট অপরকে ঘৃণা করে!

জগতে জীবের এই সকল বিপত্তি সম্যকরূপে বুঝতে পেরে যুবরাজের মন থেকে সকল গর্ব, মোহ, বাসনা দূর হল। এমত অবস্থায় তিনি না-আনন্দিত হলেন, না-অনুতপ্ত হলেন, না-নিদ্রিত হলেন, না-তন্দ্রাচ্ছন্ন। কারও প্রতি অনুরক্ত হলেন না, না কারও প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন। তিনি সংশয়রহিত হলেন।

যখন মহাত্মার এই মানসিক অবস্থা, তখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন স্বর্গের এক দেবতা। দেবতারা চান শাক্যসিংহের বোধিসত্ত্বের পথ সুগম হোক। সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখে যুবরাজ জানতে চাইলেন তাঁর পরিচয়। সন্ন্যাসী উত্তরে বললেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, মৃত্যুভয়ে ভীত এক সন্ন্যাসী আমি। এই দুঃসহ জগত থেকে পরিত্রাণের আশায় আমি বাসনা-পরিবৃত সংসার ত্যাগ করে মুক্তিপথের সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। নশ্বর অনিত্য জগৎসংসার থেকে মুক্তির আশায় আমি সন্ধান করছি মঙ্গলদায়ী পথের। আমার কোনোরকম আসক্তি নেই। কারো সঙ্গে আমার সংশ্রব নেই। আমি পথে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে, পর্বত কন্দরে বা অন্য কোনও নির্জন স্থানে অবস্থান করি। আমি পরিবার-পরিজনত্যাগী, কামনা-বাসনাহীন এক পরিব্রাজক। ভিক্ষায় যা পাই কেবল তা-ই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার করি।
বলেই অতঃপর সেই সন্ন্যাসী সহসা অন্তর্হিত হলেন। সন্ন্যাসীর কথায় যুবরাজ আনন্দিত। তিনি স্থির করলেন গৃহত্যাগ করে তিনিও সন্ন্যাসী হবেন। যুবরাজ গাত্রোত্থান করে কন্থকের পিঠে আরোহণ করে আবার গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, নিতান্তই অনিচ্ছায়।

গৃহে ফিরে যুবরাজ পিতার নিকট উপস্থিত হলেন। অক্ষয়ধর্মের অনুরাগী, স্বর্ণশৃঙ্গের পর্বতের নায় বিশাল দেহ, গজশুণ্ডের ন্যায় বাহু, ঋষভের ন্যায় অক্ষিগোলক, চন্দ্রের ন্যায়

মুখশ্রী, মেঘগম্ভীর কণ্ঠস্বর সম্বলিত নরশ্রেষ্ঠ, রাজা শুদ্ধোদন তাঁর পিতা। তিনি দাঁড়ালেন পিতার সামনে। নতশিরে করজোড়ে রাজাকে প্রণাম করে বললেন, হে মহারাজ! মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আমি সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক! সন্তুষ্টচিত্তে আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। এই জগতে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

হস্তীর প্রবল ধাক্কায় বিশাল বৃক্ষও যেমন কম্পিত হয় সেইরকম যুবরাজের কথায় রাজা কম্পিত। তিনি পুত্রকে কমলকরে টেনে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে বললেন, হে বৎস, তুমি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। এখন তোমার ধর্মাচরণের যথার্থ সময় নয়। রাজ্যভার তোমায় অর্পণ করে আমারই এখন ধর্মাচরণ করার সময়। শোনো বৎস, নবীন বয়সে ধর্মাচরণ ক্ষতির কারণ হয়। কাঁচা বয়সে ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়সকল সজাগ থাকে। এইসময় মানুষ ধর্মাচরণে অসমর্থ হয়। বীর বিক্রমে রাজ্য পরিচালনা করাই এখন তোমার ধর্ম। প্রিয় বৎস, তুমি আমার প্রধান অবলম্বন, মাথা থেকে এইসব চিন্তা দূর কর। যৌবন সুখসম্ভোগের পর বানপ্রস্থে তপোবনে অবস্থান করাই মানব ধর্ম। তখন তা রমণীয় বোধ হয়।

পিতার নিকট এইরূপ উপদেশ শুনে যুবরাজ শাক্যসিংহ বললেন, হে রাজন, আপনি যদি আমার চারটি বিষয়ের দায়িত্ব নিতে পারেন, তাহলে আমার সঙ্কল্প প্রত্যাহার করার কথা ভাবব। এক, মরণে আমার জীবনের সমাপ্তি হবে না; দুই, জরা আমার রূপ যৌবন বিনাশ করবে না; তিন, রোগ আমার স্বাস্থ্য ও বল হরণ করবে না; চার, আমার বিষয় সম্পত্তি বিপদে-আপদে বিনষ্ট হবে না।

পুত্রের এইরকম বিস্ময়কর প্রার্থনা শুনে রাজা শুদ্ধোদন হতাশ কণ্ঠে বললেন, হে বৎস তুমি এইসব কী বলছ! সাধারণ মানুষের যা ভাবনা তার বিপরীতে চিন্তাভাবনা করলে মনুষ্যসমাজে সে হাস্যাস্পদ হয়।

অতঃপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে যুবরাজ বললে, হে রাজন, যদি আপনি এই চারটি বিষয়ের দায়িত্ব নিতে অপারগ হন, তাহলে আমাকে বাধা দেওয়া আপনাকে সাজে না। অগ্নিতে জ্বলন্ত গৃহ থেকে একজন নিষ্ক্রান্ত হতে চাইছে, তাকে কি কেউ বাধা দিতে পারে? জগতে বিচ্ছেদ স্বাভাবিক। বরং ধর্মের কারণে এই বিচ্ছেদ দুঃখের নয়।

রাজা শুদ্ধোদন যুবরাজকে তাঁর সঙ্কল্পে স্থির দেখে অন্য চিন্তা করলেন। তিনি আদেশ করলেন আর বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না যুবরাজকে। তিনি গৃহেই থাকবেন। যুবরাজের রক্ষণের ব্যবস্থা আরও বাড়ান হল, তার ভোগসুখের ব্যবস্থাও হল আরও উত্তম। মন্ত্রীগণ যুবরাজকে সঙ্কল্প ভুলে রাজকার্যে মনোযোগ দিতে পরামর্শ দিলেন। পিতা শুদ্ধোদন পুত্রস্নেহে আকুল হয়ে অশ্রুপাত করতে করতে পুত্রকে তার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন।

যুবরাজকে দেখে চঞ্চল হলেন রমণীগণ। আন্দোলিত কর্ণভূষণ স্পর্শ করল তাদের কপোল। ঘন ঘন নিশ্বাসে প্রকম্পিত হল তাদের পীনোন্নত পয়োধর। তাদের নয়ন চঞ্চলা অস্থির মৃগশিশুর ন্যায়। সুবর্ণোজ্জ্বল পর্বতের ন্যায় দীপ্তিমান, বারবনিতাদের মতো চিত্তবিভ্রমকারী মদনস্বরূপ যুবরাজ তাঁর দেহসৌষ্ঠবে, বচনে, পরশে সেই রমণীদের মনোহরণ করলেন। কিন্তু যুবরাজের মনোহরণ কেউ করতে পারল না।

প্রাসাদের সুবর্ণ দীপদণ্ডে জ্বলছে উজ্জ্বল দীপ। ধূপের সুমিষ্ট সুবাসে প্রাসাদকক্ষ আমোদিত। সেই কক্ষের রত্নখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে বিষণ্ন চিত্তে যুবরাজ উপবিষ্ট। সুমধুর মনোহারি গীতবাদ্য নৃত্যাদি সহযোগে অপ্সরাগণ বিনোদন দিতে চেষ্টা চালিয়ে গেলেন, কিন্তু যুবরাজের কোনও তাপ-উত্তাপ হল না। তিনি কিছুই উপভোগ করতে পারলেন না। এগুলি কোনও কিছুই তাঁকে আনন্দ দান করতে ব্যর্থ হল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুবরাজের অভিলাষ অতৃপ্তই থেকে যায়।

অতঃপর স্বর্গের দেবগণ যুবরাজের অভিলাষ জেনে নিয়ে তাঁদের অলৌকিক প্রভাবে একসময় রমণীগণকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন। রমণীগণ, দেবপ্রভাবে, যে যেভাবে রয়েছে, তারা সেইভাবে সেইস্থানে নিদ্রায় ঢলে পড়ল। যুবরাজ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন রমণীগণ হঠাৎ নৃত্য-গীত-সঙ্গীত থামিয়ে ক্লান্তিতে শয়ন করেছেন। তাদের আলুথালু বেশ। লজ্জাস্থান ঢাকতেও ভুলে গেছে তারা। অনেকেরই গোপন-অঙ্গ দৃশ্যমান।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুবরাজ এবার সঙ্কল্পে দৃঢ় হলেন। তিনি বুঝলেন, পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা রাজা শুদ্ধোদন একমাত্র পুত্রকে এবং রাজ সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে কোনওমতেই স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগের অনুমতি দেবেন না, বরং এইভাবে নির্লজ্জ নারীদের দ্বারা প্রলুব্ধ করে

বারবার বৃথা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এতে লাভ কিছুই হবে না, পিতাপুত্রের দুঃখই বর্দ্ধিত হবে।

সুতরাং এই প্রহসনের শেষ হওয়া দরকার। এবং এই মুহূর্তই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যুবরাজের মনে সেই রাত্রিকালেই গৃহত্যাগের ইচ্ছা প্রবলভাবে জাগরুক হল। নিদ্রিত রমণীগণকে ঘৃণাভরে একবার দেখে নিঃশব্দে তিনি সেই কক্ষ ত্যাগ করলেন।
ধীরে ধীরে নামলেন নীচে। এগোলেন প্রধান দ্বারের দিকে। কী মনে করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফিরলেন। গেলেন নিজ কক্ষের দিকে। নিজের ঘরে ঢুকে একবার তাকালেন নিদ্রিত যশোধরা ও পুত্র রাহুলের মুখপানে। তারপর বেরিয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে প্রবেশ করলেন বাইরে সারথি ছন্দকের ঘরে।

ছন্দককে জাগিয়ে বললেন, হে ছন্দক, অশ্বশালা থেকে শীঘ্র তুমি আমার প্রিয় অশ্ব কন্থককে নিয়ে এস, আমি এই মুহূর্তে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাব। আমি রাজামশাইকে আমার গৃহত্যাগের কথা আগেই বলেছি।

ছন্দক রাজার নির্দেশ জানে। রাজামশাই যুবরাজের বাহির গমন সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। কিন্তু তবু ছন্দক যুবরাজকে বাধা দিতে পারল না। কারণ দেবতারা প্রয়োগ করেছেন দৈব শক্তি।

স্বর্গের দেবতারা বোধিসত্ত্বের মনোভাব জেনে তাঁর সামনে আর কোনও বাধাবিঘ্ন আসার পথ রুদ্ধ করলেন। ছন্দক কোনও কথা না-বলে কন্থককে পরাল স্বর্ণময় লাগাম, পিঠে বিছিয়ে দিল সূক্ষ্ম বস্ত্রের চাদর। কন্থককে সাজিয়ে যুবরাজের সামনে উপস্থিত করল পরম নিষ্ঠায়।

কন্থক হল সবচেয়ে বেগবান অশ্ব। সবচেয়ে সতেজ। কন্থককে কখনও রথ টানতে দেওয়া হত না। এককালে স্বয়ং রাজা শুদ্ধোদন কন্থকের পিঠে চড়ে যুদ্ধে যেতেন। এখন এই অশ্ব কেবল যুবরাজের জন্য নির্দিষ্ট। অশ্বরক্ষক ছন্দক যুবরাজের সামনে কন্থককে উপস্থিত

করতেই যুবরাজ সস্নেহে তাকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর মধুর স্বরে বললেন, হে অশ্ববর এককালে রাজামশাই তোমার পিঠে চড়ে বহু যুদ্ধ জিতেছিলেন, আমিও যেন আজ তোমার পিঠে চেপে মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হতে পারি। হে অশ্ববর, জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রেষ্ঠ অমৃতপথ প্রাপ্তির আশায় আমি গৃহত্যাগ করছি। সুতরাং তুমি বেগবান হয়ে বীর বিক্রমে আমার সহায়ক হও।

যুবরাজ চড়ে বসলেন কন্থকের পিঠে, পিছনে বসলেন ছন্দক। রাজপ্রাসাদের অন্দরমহল থেকে, কারও নিদ্রায় ব্যাঘাত না-ঘটিয়ে, নীরবে প্রধান ফটকের দিকে এগোল কন্থক। নিঃশব্দে প্রাসাদের প্রধান ফটক, বাধাবন্ধহীন হয়ে গেল। পথের দুধারে প্রহরীরা ঘুমিয়ে কাদা। ফটকের পাহারাদাররাও নিদ্রায় অচেতন। আশ্চর্য, কন্থকের অশ্বখুরেরও কোনও আওয়াজ নেই!

প্রাসাদের প্রধান ফটকের যে খিল চারজন শক্তিমানকেও তুলতে কসরৎ করতে হয়, সেই খিল বিনা স্পর্শে উঠে গেল এবং কোনও বাধাবিপত্তি ছাড়াই প্রকাণ্ড ফটক দুভাগে ভাগ হয়ে উন্মুক্ত হয়ে যায়। কন্থক যুবরাজ ও ছন্দককে নিয়ে নিঃশব্দে রাজপ্রাসাদের উন্মুক্ত ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর জনহীন রাজপথ ধরে কন্থক যুবরাজের হাতের লাগামের ইশারায় প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলল।

নির্জন নিস্তব্ধ রাত। নগরীর সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কেউ জানলই না তাদেরই যুবরাজ তাদেরই মঙ্গল কামনায় কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ আর স্ত্রীপুত্রের প্রেমপ্রীতি মায়ামমতা পরিত্যাগ করে এই নিশীথে ছুটে চলেছেন কোনও এক অজানার সন্ধানে।

উজ্জ্বলদেহধারী দেবগণ বোধিসত্ত্বের যাত্রাপথ সুগম করতে পথে চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ আলো প্রদান করলেন। বোধিসত্ত্ব-কুমারের ইশারায় বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল কন্থক। দিনমণি প্রকাশিত হওয়ার আগেই বহু যোজন পথ অতিক্রম করতে হবে।

শাদা অশ্ব ছুটে চলেছে এক অলৌকিক আলোর মধ্য দিয়ে, তার গতিকে অতিক্রম করবে এমন সাধ্য কার! অঞ্জনা ঘোড়াটার পিছুপিছু ছোটে। তাকে যে ধরতেই হবে ঘোড়াটাকে! ঘোড়ার ওপরে যে তার অর্হৎ! কিন্তু পারে না। বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়াটা অন্তর্হিত হয়। ছুটতে ছুটতে পড়ে যায় অঞ্জনা।

তারপরেই ভেঙে যায় ঘুম। বুকের ভেতরে হাতুড়িপাত। পরিস্থিতি ঠাহর করতে যেটুকু কালক্ষেপণ, অঞ্জনা চমকে তাকায় পাশে নিদ্রিত ছেলের মুখের দিকে। তারই অনুবর্তনে, যেন দৃষ্টি যাবেই, সন্ন্যাসীর দিকেও। রাতেও বারবার ঘুম ভেঙে এমনই দৃষ্টিপাত ছিল তার।

কাচের জানালা ও পর্দা ভেদ করে বাইরে থেকে সামান্য আলো ঢুকে পড়তে চাইছে। ট্রেন ছুটছে নিজস্ব গতিতে। দূরপাল্লার এক্সপ্রেসের হিন্দোল ও আলো-আঁধারির অপার্থিবতা, কামরার ভেতরটা যেন ক্রমশ প্রহেলিকাময়।

ভেতরে একটা কাঁপুনি নিয়েই ছেলেকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে অঞ্জনা। আবার চোখ চলে যায় সন্ন্যাসীর দিকে। ধীর স্থির শান্ত শয়ন। কোথাও কোনও অতিশায়ন নেই। নেই অতিরেক। গভীর রাতেও ছিল না, এই প্রত্যূষালোকেও। ঘরসংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের তো এমনই দীপ্তি থাকে।

তাহলে গতকাল রাতে হঠাৎই অত ভয় পেল কেন সে? কেন বারংবার উনি অর্হৎকে আশীর্বাদ করছিলেন বোধিসত্ত্বের কথা বলে!

এখনই বা এই ভোররাতে কেন এমন স্বপ্ন দেখল?

শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে টালিগঞ্জের মুর অ্যাভিনিউ'র বৌদ্ধ মঠে প্রায়ই যায় অঞ্জনা। ছেলেকে নিয়েও গিয়েছে বহুবার। গত শীতে গিয়েছিল ধর্মগুরু ভাস্করজ্যোতি মহাস্থবির-এর বক্তৃতা শুনতে। সুললিত ভাষায় অপূর্ব ভঙ্গিতে যুবরাজ সিদ্ধার্থের মহা-বিনিষ্ক্রমণ শুনিয়েছিলেন মহাস্থবির।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের 'বিনিষ্ক্রমণ' নামক পঞ্চম সর্গ শুনে এক অলীক বোধ হয়েছিল অঞ্জনার। শুনতে শুনতে যেন চলে গিয়েছিল সেই রাতের কপিলাবস্তুতে। বাড়ি ফেরার পরেও রেশ ছিল তার। কিন্তু কখনও একবারের জন্যেও কপিলাবস্তুর যুবরাজের জায়গায় নিজের ছেলেকে কল্পনা করেনি অঞ্জনা! কখনও মনে হয়নি একদিন অর্হৎকেও হারিয়ে ফেলবে! তবে আজ কেন এমন স্বপ্ন দেখল সে!

ইত্যবসরে, বাধা কাটিয়ে আরও কিছু আলো ক্রমান্বয়ে ঢুকে পড়তে পেরেছে কামরার ভিতর। ধাতস্থ হয় অঞ্জনা। হালকা লাগে বুক। নিদ্রিত সন্ন্যাসীর সমাহিত শান্তিই যেন চাপা দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে কিছুটা মুক্তি দেয় অঞ্জনাকে। ভাবতে ভাবতে আবার আস্তে চোখ লেগে যায় তার।

কিছুক্ষণ পর উঠে পড়ে সন্দীপ। চাদরমুড়ি দিয়ে বসে আসনে। গাত্রোত্থান করেছেন সন্ন্যাসীও। তিনি টয়লেটের দিকে যেতেই হাত বাড়িয়ে সন্দীপ জানালার মস্ত পর্দা সামান্য সরায়। অপেক্ষমান আলো ঢুকে পড়ে দ্রুত। হাত বাড়িয়ে জলের বোতল নিতে গিয়ে চোখ পড়ে মুখোশে। জল খায় সন্দীপ। মহাকালের মুখোশটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

এদিকে কবীরও শয্যা ত্যাগ করে এগিয়েছেন টয়লেটের দিকে। দরজা বন্ধ। ট্রেনের দুলুনিতে পা কাঁপে, হ্যান্ডেল পাকড়ে অপেক্ষা করেন দরজা খোলার। খুট করে শব্দ, দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পরনের উজ্জ্বল লামার পোশাকে আরও উজ্জ্বল লাগছে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে। কবীরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসেন বৃদ্ধ। তীক্ষ্ণ চোখ। কবীরের খুব চেনা লাগে সন্ন্যাসীর মুখ। কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারেন না। চোখজোড়া খুবই চেনা।

সন্ন্যাসী এসে বসেন নিজের জায়গায়। বিছানা-বালিশ গুটিয়ে নিমেষে গোছগাছ করে ফেলেন নিজের জিনিসপত্র। কোনওদিকে দৃষ্টি নেই। শান্ত ভঙ্গিমা। জপমালা হাতে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষে একটি পত্রিকা নিয়ে মগ্ন হয়ে যান। টিবেট ক্রনিকল। গাম্ভীর্য দেখে কথা বলার সাহস হয় না সন্দীপের। কাল রাতে অত কথা বলছিলেন যে মানুষ, আজ সকালে যেন তাঁর অন্যরূপ।

মহাকালের মুখোশটা হাতে নিয়েই আপার বার্থে বসে থাকে সন্দীপ। ডানহাতের তর্জনী মুখোশের চোখের ছিদ্রের ভেতরে ঢোকায়। একবার ডান চোখ, তারপর বাম। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মহাকালের বিস্ফারিত দুই চোখ। তার ওপরে জ্বলন্ত তৃতীয় চক্ষু। মুখোশের সেই চোখে ছিদ্র নেই। ভয়াল তৃতীয় চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ।

ট্রেন আপন বেগে পাগলপারা।

।। দ্বিতীয় অধিকরণ ‘অর্থ’ সমাপ্ত।।

কাম

৪৯

১৪ অক্টোবর। সকাল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন।

সকাল সকাল নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে ঢুকে পড়ে দার্জিলিং মেল।

বৃদ্ধ লামা সন্দীপকে বলেন, 'তোমাদের গাড়ি ঠিক আছে?'
'নাহ, স্ট্যান্ড থেকে নিয়ে নেব।' সন্দীপ সহাস্য বলে।
'আচ্ছা চলি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বড়ুয়া। চলি অর্হৎবাবু, টা-টা! আচ্ছা, এক মিনিট!'

পোশাকের ভেতর থেকে বার করেন একটি লাল রঙের তসরের উত্তরীয়। আদর করে পরিয়ে দেন অর্হতের গলায়।

'তোমাকে বরণ করলাম। তথাগত তোমার মঙ্গল করুন।'

হাত দিয়ে লাল কাপড়টি ধরে দেখে অর্হৎ, তারপর হাসিমুখে চায় মায়ের মুখের দিকে। সন্দীপ হাসে। অঞ্জনা সামান্য বিহ্বল। চেয়ে থাকে সন্ন্যাসীর দিকে।

'অর্হৎ, এই কাপড়টাকে কী বলে তুমি জান? একে বলে খাদা। আচ্ছা, আমি এগোই, তোমরা এসো ধীরে ধীরে। নমো বুদ্ধায়!'
'নমো বুদ্ধায়!'

প্রত্যুত্তরে অর্হৎও বলে। সন্দীপও।

অর্হৎ হাত নেড়ে টা-টা করে। ট্রেন থেকে ওদের আগেই নেমে যান বৃদ্ধ লামা। তারপর ট্রলি ব্যাগটা টানতে টানতে এগিয়ে যান ধীরে। ঋজু। দৃপ্ত চলন। কিছুদূর এগিয়েই দেখতে পান দু'জন লোক হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। প্ল্যাকার্ডে লেখা, ওয়েলকাম কবীর খান। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির ঝিলিক। লোক দু'জনের পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যান বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

কামরা থেকে নামতে নামতেই চারপাশে সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় অঞ্জনা। নাক কোঁচকায়। একটা বোটকা গন্ধ। এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এই গন্ধটা কোত্থেকে এল? সন্দীপকে বলতেই হেসে উড়িয়ে দেয়। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ছেলেকে সামলে ট্রেন থেকে নামে অঞ্জনা। পেছনে ট্রলি ব্যাগ হাতে সন্দীপ, বাঁ হাতে মুখোশ।

বাবার হাত থেকে মুখোশটা নিয়ে মুখে পরে নেয় অর্হৎ। গলায় লাল খাদা, মুখে মুখোশ, অদ্ভুতদর্শন সেজে আনন্দ পায় সে। সন্দীপ মোবাইল-ক্যামেরায় তুলে নেয় ছবি। লাল খাদা ছেলের গলা থেকে খুলে ব্যাগে ভরে অঞ্জনা। মুখোশটা নেয় হাতে।

সিঁড়ি দিয়ে ওভারব্রিজে উঠেই ভালো হয়ে যায় মন। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝলক। রৌদ্রোজ্জ্বল। যেন ক্যালেন্ডারের পাতা। ছেলেকে দেখায় অঞ্জনা। সাত বছরের অর্হতের কাছে, চাকা-লাগান ট্রলি ব্যাগ, কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকেও আকর্ষণীয়। বাবার সঙ্গে সেই গাড়ি গড়গড়িয়ে সে টেনে নিয়ে যায়। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে পেছনে অঞ্জনা, তার ডানহাতে ঝুলছে মহাকালের মুখোশ।

প্ল্যাটফর্ম ও দীর্ঘ সিঁড়ি অতিক্রম করে বাইরে আসতেই ছেঁকে ধরেন গাড়িচালকের দল। দরদাম করে ভাড়া করা হয় ছোটো একটা গাড়ি। এগিয়ে এসে অপেক্ষাকৃত কম দর হাঁকেন এক চালক। অবাক সন্দীপ। পছন্দ হয় গাড়ি। মালপত্র দ্রুত ডিকিতে ভরেন চালক।

অর্হৎকে নিয়ে পেছনের আসনে বসে মা-বাবা। শহর কেটে গাড়ি এগিয়ে যায় পাহাড়ের দিকে।

৫০

১৪ অক্টোবর। কলকাতা।

কম্পন মোডে রাখা ফোনটা কাঁপে। ছড়ানো-ছেটানো বই আর ট্যাবের মাঝে একটু জায়গা করে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রিয়াজ। চোখ না-খুলেই হাতড়ায় ফোনের খোঁজে। বালিশের পাশ থেকে নেয় ফোন। কোনওরকমে চোখ খুলে স্ক্রিন দেখে। সেকশন থেকে ফোন।

‘বলো।’

‘কনসার্নড পিএসগুলো রিপোর্ট দিতে শুরু করেছে স্যার। অনেকেরই বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান আছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে অনেকেই বেরোবে ফ্যামিলির সঙ্গে। সমুদ্র। পাহাড়। আপাতত বাড়িতেই আছে। সেফ। দু’জন অবশ্য অলরেডি বেরিয়ে গেছে।’

‘কোথায়?’

‘একজন মুম্বই, আরেকজন কালিম্পং।’

‘কোন থানা?’

‘হেয়ার স্ট্রিট আর টালিগঞ্জ, স্যার।’

‘নাম?’

‘সুজাত চট্টোপাধ্যায় মা-বাবার সঙ্গে ষষ্ঠীর দিন গেছে দিল্লি। ফিরবে কালীপুজোর আগেরদিন। ফ্ল্যাটে তালা। পাশের ফ্ল্যাটের লোক ইনফর্মেশন দিয়েছে। এরিয়া হেয়ার স্ট্রিট থানা।’

‘বেড়াতে?’

‘রিলেটিভের বাড়ি আছে।’

‘আরেকজন?’

‘অর্হৎ বড়ুয়া। মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেছে কালিম্পং। গতকাল রাতের দার্জিলিং মেল ধরেছে। বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা আছে। টালিগঞ্জ থানা।’
‘বাকিরা কে কবে কোথায় যাবে আইটেনেরারি নিয়েছে?’
‘ইয়েস স্যার!’
‘প্যানিকড হয়নি তো বাড়ির লোক?’
‘না, স্যার। থানা থেকে বাড়ি বাড়ি রুটিন ভিজিট হচ্ছে, জনসংযোগ কর্মসূচী—এইসব বলে এন্ট্রি নিয়েছে। সব পিএস এখনও রিপোর্ট দেয়নি। দিয়ে দেবে এগারোটার মধ্যে।’
‘ওকে, আমি যাচ্ছি।’

ফোন ছেড়ে ঘড়ি দেখে। দশটা কুড়ি। ফোন করে ড্রাইভারকে। দশটা চল্লিশের মধ্যে গাড়ি নিয়ে আসতে নির্দেশ দেয়। মিউজিয়ামে প্রাথমিক তদন্ত সেরে ফিরেছে সোয়া পাঁচটায়। হালকা কুয়াশা-মাখা ভোরে, কোয়ার্টার্সে ঢুকে সটান বিছানায়। তার আগে মাখন মাখিয়ে দুটো আর জলে ডুবিয়ে দুটো, খেয়ে নিয়েছিল মোট চারটে থিন অ্যারারুট বিস্কুট।

রাত জাগলে ভোরের দিকে খুব খিদে পায়। মিউজিয়ামের ক্যান্টিনে গতরাতে সকলের জন্য রুটি-তড়কা বানাবার আদেশ করেন ডিরেক্টর। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ গোটা চারেক রুটি, ডিম-তড়কা দিয়ে খেয়ে ভরিয়েছিল পেট। কিন্তু ভোর সোয়া পাঁচটায় তারা কোথায়! পেটের ত্রিসীমানায় তাদের চিহ্নমাত্র নেই! খাবার টেবিলে বিস্কুটের একটা প্যাকেট আর ফ্রিজ খুলে মাখন ছাড়া পেল না কিছুই।

এখন আবার বেজায় খিদে পাচ্ছে। কিন্তু এখন আর সময় নেই, যা-হবে অফিস গিয়ে দেখা যাবে। বিছানা থেকে উঠে ঢুকে যায় বাথরুমে।

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান যথাসময়ে। স্নান সেরে ইউনিফর্ম পরতে যেটুকু সময়, কুড়ি মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে রিয়াজ বসে গাড়িতে।

মূর্তি চুরির কেসটা কোনদিকে যাবে কে জানে! অ্যান্টিক থেফট সেকশনে কাজে ঢুকে দেখেছে কিছু কেস জটিল থেকে জটিলতর দিকে চলে যায়। যাইহোক, এখন মন্টু ভট্টাচার্য আর চিফ সিকিউরিটি অফিসারকে কঠিন জেরার মুখে ফেলে আদায় করতে হবে তথ্য।

পিটারের জোগানো কর্পোরেশনের তালিকায় প্রত্যেকটি ছেলের নামের পাশে মা-বাবার নাম যেমন আছে, ঠিকানাও আছে। সেই ঠিকানা ধরে ধরে নির্দিষ্ট থানায় গতকাল রাতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিভিল ড্রেসে, পুলিশ সকাল থেকেই যেতে শুরু করেছে প্রত্যেকের বাড়ি। আপাতত বাচ্চাগুলোর নিরাপত্তার দিকে রাখতে হবে নজর।

সিগনালে দাঁড়ায় গাড়ি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। ঠেলায় সাজিয়ে, হলদে-সবুজ নধর সিঙ্গাপুরি কলা বেচছে একটি বাচ্চা ছেলে। রিয়াজ আঙুল দেখিয়ে চারটে কলা দিতে ইঙ্গিত করে। ছেলেটা জানালা গলিয়ে দিয়ে যায়। পয়সা নিয়ে এক গাল হাসে। রিয়াজও। সবুজ হয় সিগন্যাল। খোসা ছাড়িয়ে রিয়াজ কামড় মারে কলায়। একজোড়া এগিয়ে দেয় ড্রাইভারের দিকে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যায় অফিস। নিজের সেকশনে ঢুকে এক এএসআই-এর থেকে নেয় মিউজিয়ামের ফাইল। কর্পোরেশনের চার পাতার নামের তালিকা নেয় হাতে। বাচ্চাগুলোর আগামী পারিবারিক পরিকল্পনা দেখে। পুজোর ছুটি চলছে স্কুলে। বেশিরভাগই বেরোচ্ছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পর। তথাগত মণ্ডল, দীপঙ্কর বসু, তিষ্য দাশগুপ্ত, প্রিয়দর্শী ভদ্র, সুমঙ্গল দাস, সুমন মিত্র, সুগত প্রধান আর অমিতাভ ব্যানার্জি, পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাবে আগামী পরশু। যশ পারেখ আর সিদ্ধার্থ আগরওয়াল শহর ছাড়বে কালীপুজোর দু'দিন আগে। চা দিয়ে যায় এক ক্যান্টিন-কর্মী। কাপে চুমুক দিয়ে তালিকা ধরে ধরে অনুপুঙ্ক্ষ মেলায়। প্রতিটি থানার সংশ্লিষ্ট অফিসারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে। অতিরিক্ত আরও কী তথ্য লাগবে এবং কীভাবে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে জানিয়ে দেয়।

মিউজিয়ামের নিরাপত্তা আধিকারিক ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী মন্টু ভট্টাচার্যকে গারদে রাখা হয়নি। রাখা হয়েছে আলাদা একটি ঘরে। রজতস্যারের নির্দেশ এলে আজই গ্রেফতার হবে দু'জন। কাল সোমবার। আজ গ্রেফতার হলে কাল সকালে কোর্টে তোলা হবে পুলিশি হেফাজত চেয়ে। আপাতত অম্লমধুর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দু'জনের সঙ্গেই আবার কথা বলে রিয়াজ। পুনরাবৃত্তি। কিছুই জানেন না তাঁরা।

রজত স্যার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ভালোয় ভালোয় সব কথা বলে দিলে ভালো, নাহলে পরে মূর্তি চোরের সঙ্গে যোগসাজশ প্রমাণিত হলে, দু'জনের কপালেই বেজায় দুঃখ আছে। থম মেরে বসে আছেন প্রধান নিরাপত্তা অফিসার। মাঝে মাঝেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন মন্টু ভট্টাচার্য।

৫১

১৪ অক্টোবর। সেবক রোড।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সেবক রোডে সুবিধামতো জায়গায় গাড়ি থামাতে বলে সন্দীপ। প্রাতরাশ সেরে ফেলা দরকার। অর্হৎকে অঞ্জনা বিস্কুট আর জল খাইয়ে দিয়েছে। নুডলস-এর অর্ডার দেওয়া হয় দোকানে। সন্দীপ ড্রাইভারকেও নেমে আসতে বলে। গাড়ি রাস্তার পাশে নিরাপদে দাঁড় করিয়ে এসে, তিনি কেবল চা খান।

সন্দীপ-অঞ্জনা রঙিন প্লাসটিকের চেয়ারে বসলেও অর্হৎ বসে না, মা-বাবার সামনেই ঘুরে ঘুরে খেলা করে। ঠিক সেই সময়েই ঘটল ঘটনাটা। হঠাৎ রাস্তা থেকে ছিটকে একটা বাইক এসে ধাক্কা মারে দোকানে। প্লাস্টিকের চেয়ার-টেবিল ছিটকে যায়। সরাসরি তাদের গায়ে না-লাগলেও ধাক্কার অভিঘাতে সন্দীপ-অঞ্জনাও পড়ে যায়। হেলমেট-পরা দুই আরোহী বাইক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। খুব গতি না-থাকায় বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না কারোরই। অঞ্জনার হাত ধরে তোলে সন্দীপ। হতচকিত অঞ্জনাকে দেখে হাসে সন্দীপ।

প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে ধুলো ঝেড়ে অঞ্জনা ছেলের খোঁজ করে। চেয়ার-টেবিল যথাস্থানে রাখছে দোকানের কর্মচারী। চারিদিকে তাকায় অঞ্জনা। সবই যথাযথ, কেবল অর্হৎ কোথাও নেই। অঞ্জনা পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে। সন্দীপ হতবাক হয়ে রাস্তার এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। কিন্তু কোথাও অর্হতের চিহ্নমাত্র নেই। পথচলতি গাড়ি থেকে আরোহীরা উদভ্রান্ত দম্পতিকে দেখেন কিন্তু কেউ গাড়ি থামান না। আস্তে আস্তে চারপাশ থেকে দু-চারজন ভিড় করে।

আরোহী দু'জন মাটি থেকে বাইক তুলে দ্রুত ইঞ্জিন চালু করে। তারপর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কান্নায় ভেঙে-পড়া অঞ্জনাকে সামলাতে সামলাতে সন্দীপ কেবল এদিক-ওদিক চায়, কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। ভিড় থেকে কয়েকজন পুলিশকে ফোন করতে বলে।

গ্রীষ্মের ভরপুর ভ্রমণ-সিজন। থিকথিক করছে ভ্রমণপিপাসুর দল। কলকাতার সাত বছরের শিশু অর্হৎ বড়ুয়ার অন্তর্ধান ও তার মা-বাবার অসহায়তা টের পায় না কেউ। দ্রুত বেরিয়ে যায় এক-একটা গাড়ি। সন্দীপ ক্রমশ বিমূঢ়। ক্রন্দনরত অঞ্জনা হারিয়ে ফেলছে বাহ্যজ্ঞান।

সেবক রোড ফাঁড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে চলে আসেন তিনজন পুলিশ। উপস্থিত কেউ খবর দিয়েছে সম্ভবত। পাহাড়ে এই ধরনের ঘটনা বিরল। ভ্রমণ-বাণিজ্যে নির্ভরশীল বেশিরভাগ মানুষ। ফলত ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার দায় সংশ্লিষ্ট সকলের। প্রশাসনও জানে এই স্পর্শকাতরতা। পুলিশের দ্রুত আগমন সঙ্গত কারণেই।

চোখের সামনে সব ঝাপসা। অঞ্জনা কেবল দেখে, কুমার সিদ্ধার্থের ইশারায় কন্থক বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে। দিনমণি প্রকাশিত হওয়ার আগেই কুমারকে বহু যোজন পথ অতিক্রম করতে হবে। উজ্জ্বলদেহধারী দেবতাগণ বোধিসত্ত্বের যাত্রাপথ সুগম করতে পথে

চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ আলো প্রদান করছেন। শাদা অশ্ব ছুটে চলেছে এক অলৌকিক আলোর মধ্য দিয়ে, তার গতিকে অতিক্রম করবে এমন সাধ্য কার!

ঘোড়াটার পিছুপিছু ছোটে অঞ্জনা। তাকে যে ধরতেই হবে ঘোড়াটাকে। ঘোড়ার ওপরে যে তার নয়নের মণি, অর্হৎ! কিন্তু পারে না। বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়াটা অন্তর্হিত হয়। অপার্থিব এক কুহেলী ঢেকে দেয় চরাচর। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পুত্রশোকে উন্মাদিনী অঞ্জনা ছুটতে ছুটতে পড়ে যাওয়ার আগে শুনতে পায় একটি ডাক—মাআআআআআ!

কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে আসে কে ও? হাতে ধরা এক শিশু। এদিকেই আসছে। কে ডাকল তাকে মা বলে? ওই শিশু? মা ডাকেই তার কান্না সহসা স্তব্ধ। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকে অঞ্জনা।

ড্রাইভারের পাশে অর্হৎ। হাতে তার চিপসের প্যাকেট। সন্দীপ ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নেয় অর্হৎকে। এক কনস্টেবল তাঁর স্মার্ট ফোনে তুলে নেন ছবি। এত কাণ্ড হয়ে গেছে দেখে ক্ষমা চান ড্রাইভার। ড্রাইভারকে মৃদু বকাবকি করে চলে যান পুলিশের দল। হাঁফ ছাড়ে সকলে। পাতলা হয় ভিড়।

বাবার কোল থেকে নিস্পন্দ মায়ের দিকে দৌড়ে আসে অর্হৎ। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নীরবে ফুলে ফুলে কাঁদে অঞ্জনা।

আবার গাড়িতে উঠে পড়ে সকলে। দোকানের চেয়ার-টেবিলে বসে আর প্রাতরাশ সারা হয় না। খাবার মোড়কে বেঁধে নিয়ে নেয় সন্দীপ। গাড়িতে উঠে অঞ্জনার কানে কানে বলে,

‘মুখোশটা মিসিং!’

চমকে তাকায় অঞ্জনা। মুখোশ তো তার হাতেই ছিল! ট্রেন থেকে নেমে তার কাঁধে ব্যাগ ছিল আর ডানহাতে ছিল মুখোশ। গাড়িতে উঠেও নিজের হাতে রেখেছিল, মনে করতে

পারে সে।

কিন্তু তারপর খাবারের দোকানে বসে মহাকালের সেই মুখোশ কোথায় রেখেছিল কিছুতেই মনে করতে পারে না।

৫২

লালবাজার। কলকাতা।

আপাতত এবেলার মতো অফিসে কাজ শেষ। ঘড়ি দেখে। একটা দশ। আরেকবার মিউজিয়াম যাওয়া দরকার। তবে আগে খেতে হবে। ক্যান্টিনে যায় রিয়াজ। বেশ খিদে পেয়েছে। ভাত খায় পেট ভরে। আজ শুক্তো করেছে। শুক্তো দিয়েই খেয়ে নেয় এক থালা ভাত। তারপর কাতলা মাছের ঝোল দিয়ে আরও এক থালা। টম্যাটোর চাটনির বাটিতে চুমুক মেরেছে, কেঁপে ওঠে ফোন। টেবিল থেকে বাঁ-হাতে ফোন নিয়ে দেখে স্ক্রিনে লেখা—রজতস্যার কলিং!

'ইয়েস স্যার!'
'ভোরে ফিরেছ?'
'স্যার, সোয়া পাঁচটায়।'
'শুনেছি। এখন অফিসে?'
'ইয়েস স্যার!'
'পিটারের লিস্টে অর্হৎ বড়ুয়া নামে একটা ছেলে আছে, না?'
'ইয়েস স্যার! গতকাল রাতে মা-বাবার সঙ্গে দার্জিলিং মেল ধরেছে। ডেস্টিনেশন কালিম্পং। বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা আছে। টালিগঞ্জ থানা খোঁজ নিয়েছে স্যার।'
'সিপি'র ঘরে মিটিং দুটোয়। তুমি থাকবে। আমি পৌনে দুটো নাগাদ ঢুকব অফিসে। আমার ঘরে আসবে। আর্জেন্ট।'

‘ইয়েস স্যার!’
‘মিউজিয়ামের সব রিপোর্ট হাতে রাখবে। ম্যাটার সিরিয়াস দিকে টার্ন করছে। এসো বলব।’
‘ওকে স্যার!’

সিরিয়াস হতে চলেছে মিউজিয়ামের মূর্তি চুরির কেস! এর মধ্যে আবার অর্হৎ বড়ুয়ার নাম কীভাবে এল! সিপি’র ঘরে মিটিং হতেই পারে এই কেস নিয়ে কিন্তু রজতস্যার ফোনে যেভাবে বললেন, রিয়াজ বুঝতে পারে তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের পরেও সিরিয়াস কিছু নতুন তথ্য, নথি ও প্রতিবেদন যুক্ত হয়েছে এই কেসে। কেস ক্রমে জটিলতর হচ্ছে নিঃসন্দেহে। হাত উল্টে ঘড়ি দেখে। দেড়টা পেরিয়ে কাঁটা পঁয়ত্রিশের দিকে।

ক্যান্টিন থেকে ফিরে আবার ফাইলগুলো নিয়ে বসে। প্রতিটি বাচ্চার খবর পিএসগুলো কভার করেছে কি না, দেখে নেয়। তারপর পৌনে দুটো নাগাদ মগজে ও কাগজে সব রিপোর্ট নিয়ে, জয়েন্ট সিপি রজতস্যারের ঘরে ঢোকে। ঠোকে স্যালুট। বসতে বলেন রজত রায়। তারপর স্যার যা বললেন, না-চমকে উপায় নেই।

‘মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারি ফোন করেছিলেন সিপিকে। ওঁদের এক সক্রিয় মেম্বার সুরজিৎ বড়ুয়ার ছেলে-বউ-নাতি কালিম্পং বেড়াতে গিয়েছে। আজই নেমেছে এনজেপিতে। এগারোটার মধ্যেই পৌঁছেছে কালিম্পং, ফোনে কথা হয়েছে সকলের সঙ্গে। তারপর দেড়টা পর্যন্ত কোনও যোগাযোগ নেই। ফোন ঢুকছেই না। নট রিচেবল। বুদ্ধিস্ট পরিবার। সুরজিৎ বড়ুয়া ঘাবড়ে গিয়ে ফোন করেছে সোসাইটির সেক্রেটারিকে। সেক্রেটারি সোজা সিপি। সিপি আমায় বললেন। মিটিং আধঘণ্টা পিছিয়েছে। উনি অফিসে ঢুকবেন আড়াইটে নাগাদ। তখনই ওঁকে সব ব্রিফ করতে হবে। আমি মূর্তি চুরি থেকে পিটারের নামের লিস্টি, সবটা বলে রেখেছি।’
‘বেশিক্ষণ তো হয়নি, স্যার! নেটওয়ার্ক সমস্যা হতে পারে।’
‘হতে পারে। আরে ফোন-টোন হয়ে যোগাযোগ হয়ে গেলে তো আমরা বেঁচে গেলাম! মামলা খারিজ! কিন্তু অর্হৎ বড়ুয়ার নামটা লিস্টে—তাই উড়িয়ে দিতে পারছি না—তাছাড়া

বিগ ফিশ! ওকে, সিপি'র ঘরে আড়াইটেয় চলে এস।'
'ইয়েস স্যার!'

জয়েন্ট সিপি'র ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের সেকশনে যায় রিয়াজ। চেম্বারে ঢোকে। ঘড়িতে প্রায় দু'টো। মনে মনে ভেবে নেয় কেসের গতিপ্রকৃতি। কিউরেটর তনুময় পালের কথা মনে পড়ে। তালিকা দেখে উনি, প্রায় প্রতিটা নামে বুদ্ধের অনুষঙ্গ, চিহ্নিত করেছিলেন। তবে এখন যা বেরোল, আর অনুষঙ্গ নয়, অর্হৎ বড়ুয়া সরাসরি বৌদ্ধ। সপ্তম জন্মদিনও অতিক্রান্ত। সামনে কি অর্হৎ বড়ুয়ার কোনও বিপদ? এইটুকু বাচ্চা ছেলের বিপদ ঘটাবে কে?

ক্যান্টিনে ফোন করে চা আনায়। খায় পরপর দু'কাপ। গোড়া থেকে আবার দেখে সব কাগজ। স্বয়ং সিপি স্যার ডেকেছেন যখন প্রস্তুতিতে কোনও খামতি চলবে না।

আবার ঘড়ি দেখে রিয়াজ। কাঁটা আড়াইটে ছুঁইছুঁই। কাগজপত্র সব একটা ফোল্ডারে ঢুকিয়ে সিপি'র ঘরের দিকে এগোয়।

৫৩

১৪ অক্টোবর। ১০ নং জাতীয় সড়ক। দার্জিলিং।

চিপসের প্যাকেট খুলে আলুভাজা খাচ্ছে অর্হৎ। ঠোঁটের চারপাশে খাবারের গুঁড়ো। মোড়ক খুলে কাগজের প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে সন্দীপ। রুমাল দিয়ে ছেলের মুখ মুছিয়ে দেয় অঞ্জনা। সেবক পেরিয়ে মহানন্দা রেঞ্জের জঙ্গলকে পাশে রেখে সোজা এগিয়ে চলে গাড়ি। কালিম্পং-এর পথে তিস্তাকে গায়ে নিয়ে এগোন যায় অনেকটা সময়। করোনেশন ব্রিজ আর তিস্তাকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। মায়ের কোলে চেপে অর্হৎ তিস্তা দেখে।

কাগজের প্লেট থেকে ছেলেকে নুডলস খাইয়ে দেয় অঞ্জনা। সেবক রোড ছাড়িয়ে দশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরেন চালক।

খাওয়া সেরে ছোট্ট অর্হৎ গাড়ির দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়ে। তন্দ্রাচ্ছন্ন সন্দীপও। ঘুম নেই অঞ্জনার চোখে। এগিয়ে চলেছে গাড়ি গন্তব্যের দিকে। নীরবে গাড়ি চালিয়ে যান চালক। এবার পাহাড়ের পথে পাকে পাকে ওঠার পালা। অনুভূত হয় আবহাওয়ার পরিবর্তন।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ ড্রাইভার পেছন ফিরে বলেন,

‘দেখেন তো মেডাম, এইটার তালাশ করছিলেন?’

ড্রাইভারের বাঁ হাতে মুখোশ। মহাকালের মুখোশ। নাগ-পো চেন-পো। হাত বাড়িয়ে মুখোশটা নেয় অঞ্জনা। আনমনা হয়। ড্রাইভার কোথায় পেল মুখোশটা?

চোখ পড়ে রেয়ার-ভিউ মিররের দিকে। তার দিকে চেয়ে আছে ড্রাইভার। সেই শীতল ও স্থির দৃষ্টি কাঁপিয়ে দেয় তাকে। শিরশির করে ওঠে সর্বাঙ্গ। চোখ নামিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে অঞ্জনা।

ঘুম থেকে জেগে মায়ের হাত থেকে মুখোশটা নিয়ে পরার চেষ্টা করছে অর্হৎ। ছেলের হাস্যোজ্জ্বল মুখের পাশে ভয়াল সেই মুখোশ দেখে আতঙ্কে হিম হয় অঞ্জনা। পাকদণ্ডী বেয়ে গাড়ি যত ওপরের দিকে উঠছে, কমছে তাপমাত্রা।

মনে পড়ে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি। কেন রক্তবস্ত্র পরিয়ে অর্হৎকে বললেন, তোমায় বরণ করলাম! কেন বরণ করলেন? বাইরের ক্রমহ্রাসমান তাপমাত্রা নাকি বাতানুকূল গাড়ির আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা, কে জানে কী, ক্রমাগত শৈত্য আরও স্থবির করে অঞ্জনাকে।

১৪ অক্টোবর। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে কবীরকে নিয়ে গাড়ি ঢোকে শিলিগুড়ি শহরে। সকাল সকাল যানজট তেমন নেই রাস্তায়। ড্রাইভার শহরের রাস্তাই ধরেন। হিলকার্ট রোড ধরে গাড়ি এগিয়ে যায় বাগডোগরার দিকে।

কবীর খানকে নিয়ে, সোয়া ন'টার মধ্যেই, গাড়ি ঢুকে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায়। অপেক্ষায় ছিলেন অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাস। দিলখোলা অভ্যর্থনায় নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যান কবীরকে। আন্তরিক আতিথেয়তা কবীরের ভালো লাগে, যদিও একইসঙ্গে অনুভূত হয় একটা অস্বস্তিও। এই ধরনের আদর-আপ্যায়নে তিনি অনভ্যস্ত। স্নান-খাওয়া সেরে কবীরকে বিশ্রাম করতে বলে বিদায় নেন সরসিজবাবু। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ও ছাত্রকে নিয়ে আবার দেখা করতে আসবেন বিকেলে। তাঁকে হাসিমুখে বিদায় দেন কবীর।

চা-বিস্কুট দিয়ে যায় একটি ছেলে। টয়লেটে ঢুকে চালিয়ে দেয় গিজার। জলখাবারে কী খাবেন জিজ্ঞাসা করে। জলখাবার খাবেন না, ঠিক দু'ঘণ্টা পরে একবারে দু'টি ভাত খাবেন, জানিয়ে দেন কবীর। ছেলেটি চলে যায়। চা খেয়ে উষ্ণ জলে সেরে নেন স্নান। বেশ ঝরঝরে লাগে শরীর।

দূরপাল্লার ট্রেনে তাঁর মোটেই ঘুম হয় না। দুপুরের খাওয়ার আগে সামান্য ঘুমিয়ে নিতে চান। এসএমএস করে নিরাপদ পৌঁছ-সংবাদ দিয়ে দেন নিবেদিতা ও ধরণীকে। নীরব করেন ফোন। ব্যাগ থেকে বার করেন নিবেদিতার দেওয়া চকোলেট। মোড়ক খুলে একটুকরো ভেঙে মুখে দেন। ভালো লাগে স্বাদ। আরও একটু ভাঙেন। মুখগহ্বরে জিভের চাপে গলে যায় চকোলেট। বেসিনে গিয়ে ধুয়ে নেন মুখ। টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল ঢেলে খেয়ে নেন ঢকঢক করে।

তারপর দরজা বন্ধ করে টানটান হয়ে শুয়ে পড়েন বিছানায়। মাথায় জল পড়তেই নেমে এসেছে রাজ্যের ঘুম।

৫৪

১৪ অক্টোবর। লালবাজার। কলকাতা।

‘কালিম্পং-এর এসপিকে আমি ফোন করেছি। উনি দেখছেন ব্যাপারটা। জানাবেন আমাকে। তবে এখনও পর্যন্ত অ্যাক্সিডেন্টের কোনও খবর নেই। তবে চিন্তার কথা হল, যে হোটেলে ওঠার কথা ছিল, সেই হোটেলে ওঠেনি। নতুন জেলা, এভরিথিং ইজ গোইং গুড উইদ দ্য হলিডে সিজন ইন ফুল স্যুইং। ট্যুরিজমের ওপরই চলে, সো দে হ্যাভ টেকেন ইট সিরিয়াসলি! কিন্তু রজত, আমি ভাবছি এই যোগাযোগের কথাটা! গুরু পদ্মসম্ভবের সোনার মূর্তি চুরির সঙ্গে এই বাচ্চাদের কানেকশন!’ গম্ভীর মুখে বলেন পুলিশ কমিশনার।

‘স্যার, সুজাত চট্টোপাধ্যায় নামে এই তালিকারই আর একটা বাচ্চা এখন মা-বাবার সঙ্গে দিল্লিতে আছে। খবর নেওয়া হয়েছে। সেফ আছে। আর বাকিদের অনেকেই কাল-পরশু আউট-অফ-স্টেশন হবে, বেড়াতে যাবে—রিয়াজ নিজে এটা দেখছে—রিয়াজ, স্যারকে ব্রিফ কর।’

সিপিকে রিপোর্ট করে রিয়াজ। রজত স্যারের সঙ্গেই বহুক্ষণ কথা বলে রিয়াজের দিকে ফিরলেন সিপি স্যার। সুযোগ পেয়ে যাবতীয় তথ্য একের পর এক বলে যায় রিয়াজ। শেষে, তিব্বতি প্রথানুসারে বাচ্চার সাত বছরের জন্মদিনের তাৎপর্যটুকুও।

সিপি এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেন রিয়াজের দিকে।

‘সুরজিৎ বড়ুয়ার নাম্বার। কল হিম।’

রিয়াজ ফোন করে। দু-চার কথা বলার পর ফোন রাখে।

‘স্যার, এখনও কোনও যোগাযোগ নেই। ফোন আউট অফ রিচ। খুবই নার্ভাস হয়ে গেছেন ভদ্রলোক।’

ঘড়ি দেখে রজত। তিনটে বাজতে দশ। এগারোটা থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। প্রায় চার ঘণ্টা।

‘স্যার, রিয়াজ একবার বড়ুয়ার বাড়িতে যাক! এর মধ্যে যোগাযোগ হয়ে গেলে বা কালিম্পং পুলিশ যোগাযোগ করিয়ে দিলে ওয়েল অ্যান্ড গুড, নাহলে কেস গণ্ডগোল—বিস্তারিত তথ্য চাই।’ সিপিকে রজতের পরামর্শ।
‘হ্যাঁ, তাই কর। রিয়াজ, চলে যাও। টালিগঞ্জ থানাকে সঙ্গে নাও। কর্পোরেশনের লিস্টের কথা বড়ুয়াকে জানাবার দরকার নেই।’
‘ইয়েস স্যার!’
‘রজত, তুমি ডিসি সাউথকে ব্যাপারটা জানিয়ে রেখ। মিউজিয়ামের লোকদুটোকে গ্রিল কর! বিকেলের দিকে আমিও একটু কথা বলব।’
‘ওকে স্যার!’ রজত বলে।

স্যালুট ঠুকে সিপি’র ঘর থেকে বেরোয় রিয়াজ। সেকশনের দু’জন এএসআইকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে। জানিয়ে দেয় টালিগঞ্জ থানাকে। দেশপ্রাণ শাসমল রোডে চারু মার্কেটে বড়ুয়াদের বাড়ি। টালিগঞ্জ হেড পোস্ট অফিসের কাছে। লালবাজার থেকে অনেকটা পথ।

গাড়িতে উঠেই রিয়াজ ওয়েব ব্রাউজারের সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে লেখে—মহাবোধি সোসাইটি। মনোযোগ দিয়ে একে একে তথ্যসূত্রগুলো খুলে দেখতে শুরু করে। এক-আধ বছর নয়, একশো তিরিশ বছরের বৌদ্ধ সংগঠন। শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় অনাগরিক ধর্মপাল নামে এক বৌদ্ধ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। একই সময় ভারতেও তৈরি হয় মহাবোধি সোসাইটি। হেড অফিস কলকাতা। এদের মূল উদ্দেশ্য ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন আর বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলোর সংস্কার। ভাবনা জট পাকায়। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন মানে কী!

ঠিক কী করতে চান এঁরা? কোনও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ কি জুড়ে যাচ্ছে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে?

৫৫

চারু মার্কেট। টালিগঞ্জ। কলকাতা।

বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। টালিগঞ্জ থানার অফিসার অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে নিয়েই সুরজিৎ বড়ুয়ার বাড়ি ঢোকে রিয়াজ।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক খুবই উদ্বিগ্ন। ফোন করে চলেছেন অনর্গল। ফোন করতে করতেই গ্রিলের তালা খুলে ঢুকতে দেন রিয়াজদের। হাতের ইঙ্গিতে বলেন বসতে। অর্হতের ঠাকুমা শয্যা নিয়েছেন। ফোনে কথা শেষ করে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ় বলেন,

‘আমি কালিম্পং-এর এসপি অফিস, কালিম্পং থানা সব জায়গায় ফোন করেছি—কেউ কিছুই বলতে পারছে না—কালিম্পং-এ ওরা যে হোটেল বুক করেছিল, সেখানে ফোন করলাম, বলছে বুকিং আছে, আজই ফোরনুনে চেক ইন করার কথা। কিন্তু এখনও করেনি। প্রায় চারটে বাজতে চলল! অথচ কালিম্পং পৌঁছেই আমায় ফোন করেছিল, তখন এগারোটা বাজে! কিছুই তো বুঝতে পারছি না!’

উদভ্রান্ত সুরজিৎ বড়ুয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন সোফায়।

‘চিন্তা করবেন না, কালিম্পং পুলিশ খোঁজ করছে, আশাকরি যোগাযোগ হয়ে যাবে।’ শান্ত গলায় সুরজিৎবাবুকে আশ্বস্ত করতে চায় রিয়াজ।

‘কাল রাতে কতবার ফোন হল—শিয়ালদায় পৌঁছে—ট্রেন ছাড়ার পর—নাতি আমাদের ভীষণ আদরের বুঝতেই পারছেন—চোখে হারাই—তার সঙ্গেই বারবার কথা হয়েছে—ছেলে-বৌমা’র সঙ্গেও হয়েছে—আপনারা ভাববেন বেড়াতে গিয়ে লোকে বাড়িতে এত ফোন করবে কেন বা বাড়ি থেকে এত ফোন যাবে কেন! ঠিক, সবই ঠিক—আসলে নাতিটার জন্যই—’

গলা ধরে আসে সুরজিৎ বড়ুয়ার। উদ্বেগ অতিরিক্ত কথা বলিয়ে নেয়। সেই উদ্বিগ্ন মানুষটিকে কথা বলার সুযোগ দিলে তিনি কিছুটা হালকা হতে পারেন। মন দিয়ে তাঁর কথা শোনে রিয়াজ। নীরবে। স্মার্ট ফোনে ভিডিওগ্রাফি করে চলেছেন একজন এএসআই।

‘ট্রেনে ওদের সঙ্গী ছিলেন এক বয়স্ক লামা—তাঁকে দেখে আমার নাতি নম বুদ্ধায় বলতে তিনি নাকি খুব খুশি হয়েছেন—কত কথা হল! কিন্তু আজ ওরা কালিম্পং-এ পৌঁছেও হোটেলে চেক ইন করল না কেন, কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না! কোথায় চলে গেল ওরা!’
‘কোন হোটেলে বুকিং ছিল?’
‘হোটেল ক্লাউড নাইন।’
‘হয়ত অন্য কোনও হোটেলে উঠেছে—আপনি চিন্তা করবেন না মেশোমশাই।’ রিয়াজ আবার আশ্বস্ত করে ভদ্রলোককে।
‘সে উঠুক, তাতে ফোন করতে বাধা কোথায়!’
‘নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে—আরও কিছুক্ষণ দেখা যাক, তারপর না হয়—’
‘তারপর কী?’ রিয়াজের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলেন সুরজিৎবাবু।
‘তারপর মিসিং ডায়েরি করা যাবে।’

মিসিং ডায়েরি। শব্দ দুটো শুনেই সুরজিৎ বড়ুয়ার মুখমণ্ডল আরও বিবর্ণ। রিয়াজ মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দেয়, উচিত হয়নি এইসময়ে এমন কথা বলা।

‘বৌদ্ধরা কি একে অন্যকে দেখলে নমো বুদ্ধায় বলে?’ প্রসঙ্গান্তরে যেতে চায় রিয়াজ।

‘তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নমো বুদ্ধায়, আমাদের মহাবোধি সোসাইটির একটা স্লোগান বলতে পারেন। একজন থেরবাদী ভিক্ষু বা একজন গৃহস্থ বৌদ্ধ যেমন একে-অপরকে বলতে পারেন, একজন তিব্বতি লামাকেও বলতে পারেন। আমার নাতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ওই পোশাক চেনে, আমাকে দেখেছে নমো বুদ্ধায় বলতে, চীবর-পরা লামাকে দেখেই তাই বলেছে নমো বুদ্ধায়।’

‘তিব্বতি বুদ্ধিজমের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে?’

‘ভারতে বুডঢিজমের চর্চা ও প্রসারই আমাদের উদ্দেশ্য—সব ধরনের বুডঢিজমের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। বুডঢিজমে অনেক ভাগাভাগি। টিবেটান বুডঢিজমেও গোটা চারেক সেক্ট—সকলের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ আছে—হিজ হোলিনেজ দলাই লামা আমাদের চিফ পেট্রন।’

অন্যকথা ভাবতে বা বলতে পেরে, কিছুটা নিজেকে ফিরে পান সুরজিৎ বড়ুয়া। উৎকণ্ঠা পুরোটা না-কাটলেও নিজেকে সংহত করতে পেরেছেন প্রৌঢ়। পরিবর্তন লক্ষ করে রিয়াজ। কথা চালিয়ে যায় সে।

‘পদ্মসম্ভবকে আপনারা পুজো করেন?’

‘গুরু পদ্মসম্ভব তান্ত্রিক মহাগুরু। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম আসলে বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান মিলিয়ে একটা বহুযান বৌদ্ধধর্ম—এর অনেকটা জুড়ে আছে তন্ত্র—দেবদেবীও প্রচুর—ট্র্যাডিশনাল যে বৌদ্ধধর্ম অর্থাৎ থেরবাদ, সেখানে দেবদেবী নেই-ই বলতে গেলে—’

‘হীনযান-মহাযানে একটা ভাগ আছে জানি—’ কথার পরে কথা সাজায় রিয়াজ।

‘তা আছে বটে—তবে সেইরকম যুদ্ধং দেহী মনোভাব নেই—আমরা সকলের সঙ্গে একটা সমন্বয় করে চলার চেষ্টা করি—কেবল আমরা নয়, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা হয়—সব সেক্টের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ আছে—এই যেমন হিজ হোলিনেজ দলাই লামা, এমন নয় যে উনি হলুদ টুপি সেক্টের গুরু বলে, লাল টুপির সেক্ট তাঁকে মানে না! সবাই মানে।’

‘টুপি দিয়ে ভাগ হয়!’ অবাক প্রশ্ন রিয়াজের।

‘টুপি দিয়ে নয়, টুপির রং দিয়ে।’ সামান্য হাসির রেখা সুরজিৎ বড়ুয়ার মুখমণ্ডলে।

‘দলাই লামা কি হলুদ টুপি পরেন?’

‘গেলুগপা সেক্টের কোনও পবিত্র অনুষ্ঠান থাকলে পরেন বৈকি!’
‘আর লাল?’
‘তিব্বতের সবথেকে প্রাচীন সেক্ট—ঞিংমা—এই যে আপনি গুরু পদ্মসম্ভবের কথা বললেন, উনিই তৈরি করেছিলেন এই সেক্ট—এরা লাল টুপি পরে—কেবল লাল টুপি নয় এদের চীবরও লাল। দলাই লামার যেমন লালচে মেরুনের সঙ্গে হলুদ, খেয়াল করে দেখবেন—দাঁড়ান আপনাকে একটা ছবি দেখাই—’

স্মার্ট ফোনের পর্দায় ডান হাতের তর্জনীর ডগা ঘষে ঘষে উদ্দিষ্ট ছবি বার করতে চেষ্টা করেন সুরজিৎবাবু। ঘরের চারপাশে তাকায় রিয়াজ। গৃহসজ্জা ছিমছাম। রুচিশীল। সোফার ওপর দু-একটা খেলনা পড়ে আছে।

‘এই দেখুন!’

ফোনটা হাত বাড়িয়ে নেয় রিয়াজ। একটি বাচ্চা ছেলের ছবি। গলায় লাল স্কার্ফ, মুখে মুখোশ। পেছনে ট্রেন। বেশ ভয়ানক মুখোশ। গুপিবাঘার ভূতের রাজার মুখের সঙ্গে মিল আছে বটে তবে মুখটা খুব চেনা। অন্যত্র কোথায় এই মুখটা দেখেছে, মনে করতে পারে না রিয়াজ।

‘আপনার নাতি?
‘আজ সকালে এনজেপি স্টেশনের ছবি—আপনাকে বলছিলাম না, এক লামা কো-প্যাসেঞ্জারের কথা—উনি এই লাল খাদা আর মুখোশটা নাতিকে দিয়েছেন—’

স্মৃতির ঢেউ তটরেখায় আছড়ে পড়ে। মুখোশের মুখটা ফিরিয়ে দিয়েছে সেই ঢেউ। মনে পড়ে যায় মুহূর্তে। এই মুখ রিয়াজ গতকাল মিউজিয়ামে দেখেছে। ছবিটা তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে বড় করে দেখে। মহাকাল।

মহাকালের চেনা মুখ! ক্রমশ উত্তেজিত হয় রিয়াজ।

৫৬

নিজেকে সংযত করে সুরজিৎ বড়ুয়ার দিকে তাকায় রিয়াজ।

‘যেটা বলছিলাম, এই যে লাল খাদা—ধরেই নিতে হবে এই লামা ঞিংমাপা সেক্টের—সবথেকে প্রাচীন ধারা—ওদের রং লাল।’ সুরজিৎবাবু বলেন।
‘মুখোশটা লামা দিয়েছেন!’ আবার শুনতে চায় রিয়াজ।
‘হিন্দু ধর্মে যেমন শিব, তেমন টিবেটান বুডঢিজমেও মহাকাল আছেন—ইনি মহাকাল!’

আর কোনও কথা কানে ঢোকে না রিয়াজের। একটা বিচলন টের পায় শিরদণ্ড বরাবর।

‘এই ছবিটা আমাকে দেওয়া যাবে?’ ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলে রিয়াজ।
‘নিশ্চয়ই?’
‘ব্লু টুথ অন করুন।’
‘অতশত পারি না, আপনার নাম্বারটা বলুন, পাঠিয়ে দিচ্ছি।’
‘ওকে।’

নাম্বার আদানপ্রদান হয়। সুরজিৎ বড়ুয়া ছবিটা পাঠিয়ে দেন রিয়াজের ফোনে। রিয়াজ দ্রুত ফরোয়ার্ড করে ছবিটা। তারপর ফোন করে সেকশনে। ফোনটা ধরে বারান্দায় চলে আসে।

‘ইয়েস স্যার!’
‘যে ছবিটা পাঠালাম, মিউজিয়ামের মন্টু ভটচায্‌কে দেখাও! জিজ্ঞেস কর এই মুখোশটাই ও কাল গ্যালারিতে পড়ে থাকতে দেখেছিল কি না! ক্যুইক জানাও!’
‘ইয়েস স্যার!’

ফোন বন্ধ করে আবার ঘরে ঢোকে। সুরজিৎবাবুও আবার ব্যস্ত হয়েছেন ফোনে। ফোন কানে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন তিনি। ভেতরে তোলপাড় হয় রিয়াজের। দমবন্ধ করে অপেক্ষা করে কখন আসবে সহকর্মীর টেলিফোনের। ফোন ছেড়ে সুরজিৎ বড়ুয়া আবার বসে পড়েন সোফায়। যেন শরীরও ছেড়ে দিয়েছে তাঁর।

'এনি নিউজ স্যার?' রিয়াজ এগিয়ে যায়।
'কালিম্পং-এর সমস্ত হোটেল, হোম-স্টে সব খুঁজে ফেলেছে পুলিশ—লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ—স-ব—কিন্তু কোথাও এই নামে আজ এখনও পর্যন্ত কেউ চেক ইন করেনি—' মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন সুরজিৎবাবু।
'কালিম্পং-এ নেই!' অবাক হয় রিয়াজ।

ফোন বাজে রিয়াজের। সেকশনের এএসআই।

'হ্যাঁ বলো।
'ইয়েস স্যার, এই মুখোশটাই!'

ফোনটা কেটে আবার বারান্দায় আসে। ফোন করে রজত স্যারকে। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলে,

'স্যার, ইস্টার্ন রেলকে বলে গতকালের দার্জিলিং মেলের প্যাসেঞ্জার চার্ট আনাতে হবে!'
'নট ওনলি লিস্ট বাট সিসি ক্যামেরা ফুটেজ অফ শিয়ালদা স্টেশন অলসো!' রজত বলে।
'ইয়েস স্যার!'
'আমি আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি অফিসে এস।'
'ইয়েস স্যার!'

ছেলে-বৌমা-নাতির ট্রেন টিকিটের বিস্তারিত বিবরণ, যতটুকু জানেন সুরজিৎ বড়ুয়া, নিয়ে গাড়িতে ওঠে রিয়াজ। প্রবোধ দেয় বৃদ্ধকে কিন্তু রিয়াজ জানে মহাবিপদে পড়েছে তাঁর

আপনজন। তবু কপট সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। গাড়িতে উঠে আবার ওয়েব ব্রাউজারে খোঁজ চালায়, সার্চবারে লেখে—রেড হ্যাট সেক্ট অফ টিবেটান বুদ্ধিজম ইন কালিম্পং।

অসংখ্য তথ্যসূত্র ও ছবি, পিলপিল করে এসে দাঁড়িয়ে যায়। সারিবদ্ধ। একের পর এক যোগসূত্র খুলে দেখতে থাকে রিয়াজ। পর্দায় ভেসে ওঠে উষ্ণীষ পরিহিত লামার মুখ। সে-উষ্ণীষ দীর্ঘ। রক্তবর্ণ।

বহুদিন আগের সিকিম ভ্রমণের স্মৃতি ফিরে আসে। নীল আকাশের গায়ে প্যারাশ্যুটের মতো ভাসমান শাদা মেঘ। পাহাড়ের ঢালে গুম্ফা। রঙিন পতাকায় মোড়া দশদিক। শাদা স্তূপ। গুম্ফার গর্ভগৃহ থেকে ভেসে আসে ঘণ্টাধ্বনি। গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ। হঠাৎ-মুখোমুখি কোনও লামার হাতে জপমালা আর মণিচক্র।

লালটুপি লামার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে রিয়াজ।

৫৭

১৪ অক্টোবর। লালবাজার। কলকাতা।

শনিবার রাতের দার্জিলিং মেলের যাত্রী তালিকা মেল-বাহিত হয়ে চলে আসে পূর্ব রেলওয়ের অফিস থেকে। জিআরপি শিয়ালদার এসপি অফিস থেকে পাওয়া যায় সিসি টিভি ফুটেজ। স্টেশনে ঢোকা থেকে ট্রেনে ওঠা ইস্তক, বৃদ্ধ লামার পুরো গতিবিধিই চিহ্নিত করা হল সহজেই। ট্রেন ছাড়ার মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট আগে উনি পৌঁছেছেন স্টেশনে।

টিটি-পরীক্ষিত চূড়ান্ত যাত্রী তালিকা থেকে দাওয়া লামা নামক একজনের নাম পাওয়া যায় এ-ওয়ান টু-এসি কোচে। সিট নম্বর কুড়ি। আপার বার্থ। একই কোচে অঞ্জনা বড়ুয়া ও

সন্দীপ বড়ুয়ার আসন সংখ্যা যথাক্রমে উনচল্লিশ ও চল্লিশ। টিকিট পরীক্ষক, পরীক্ষা করে যিনি বর্দ্ধমানে নেমে যান, জানালেন কুড়ি নম্বর আপার বার্থের সঙ্গে, সাইত্রিশ নম্বর লোয়ার বার্থের অদলবদল হয়েছিল। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর অনুরোধে, নিজের লোয়ার বার্থ, সন্ন্যাসীকে ছেড়ে কুড়ি নম্বর আপার বার্থে চলে যান একজন যাত্রী।

এ-ওয়ান টু-এসি কোচের বার্থ-মানচিত্র মেলাতেই পরিষ্কার হয়ে যায়, অঞ্জনা-অর্হৎ-সন্দীপের মুখোমুখি বসেছিলেন দাওয়া লামা। কিন্তু কে এই দাওয়া লামা? পাওয়া গেল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের সিসি টিভি ফুটেজও। নিজের লাগেজ নিয়ে ধীর স্থির ভঙ্গিতে বেরিয়ে যাচ্ছেন স্টেশন ছেড়ে। একা। দুই স্টেশনের সিসি টিভির ফুটেজ থেকে সন্ন্যাসীর ছবি, মিউজিয়ামের সন্দেহভাজন আর পিটারের মক্কেলের ছবি পাশাপাশি রেখে মেলান হল, কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাকি দু'জনের, খুঁজে পাওয়া গেল না কোনও সাদৃশ্য। কম্পিউটার গ্রাফিক্সে সন্ন্যাসীর মুণ্ডিত মাথায় চুল পরিয়েও খুঁজে পাওয়া গেল না মিল।

কলকাতার সমস্ত থানায় পাঠান হল তিনটি ছবি। সমস্ত ইনফর্মারদের লাগান হল কাজে। পার্কস্ট্রিটের মিউজিয়াম থেকে শিয়ালদা স্টেশন, এই চার কিলোমিটার পথকে গুরুত্ব দেয় রিয়াজ। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডে যত হোটেল, গেস্টহাউজ, রেস্তোরাঁ, ছোটো-বড় দোকান আছে, ছবিগুলো নিয়ে ধরে ধরে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। ঠ্যালা বা রিক্সাচালক, ফুটপাতবাসীকেও দেখাতে হবে তিনটে ছবি। ছবি পাঠান হল ট্যাক্সি ও অ্যাপ-ক্যাব মালিকদের সমিতিতেও। অঞ্জনা ও সন্দীপের ফোন নাম্বার ট্র্যাক করতে বসে যায় সাইবার ক্রাইম সেকশন।

দাওয়া লামার ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হল দার্জিলিং ও কালিম্পং এসপি'র অফিসে। স্থানীয় কোনও গুম্ফার সন্ন্যাসী কি না, বলতে পারবে স্থানীয় পুলিশ।

'ডিজিসাহেব ফোন করেছিলেন—মহাবোধি সোসাইটি ওনাকেও জানিয়েছে—জানতে চাইলেন—আমি সবই রিপোর্ট করেছি। উনি সিকিম পুলিশকেও অ্যালার্ট করতে বলছেন। সিকিমের ডিজিকে উনি ফোন করে দেবেন।' বলেন সিপি।

‘ওকে স্যার, বাবা-মা-বাচ্চা আর লামার ছবি গ্যাংটকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’ রজত বলে।

‘হ্যাঁ পাঠিয়ে দাও।’

‘মহাবোধিকেও পাঠান দরকার স্যার, এই লামার খবর ওঁরা দিতে পারেন—’

‘ইয়েস, পাঠাও। তবে আসল লামা হবে ভাবছ কেন? নকল লামাও হতে পারে!’ হেসে বলেন সিপি।

‘তা বটে! আর একটা কথা আছে স্যার—’

‘বলো।’

‘মহাবোধি কেন এত অ্যাক্টিভ এই কেসে?’

‘ওদের অ্যাক্টিভ মেম্বার—’

‘মানছি, কিন্তু মাত্র তিন ঘণ্টা ফোন আসেনি বলে সোজা আপনাকে ফোন করে দিল! ডিজিসাহেবকে করল!’

‘অন্যকিছু ভাবছ?’ চিন্তিত মুখে বলেন কমিশনার।

‘পদ্মসম্ভবের মূর্তিচুরি, বুদ্ধজয়ন্তী-বর্ন বেবিজ লিস্ট, বুদ্ধিস্ট বড়ুয়া ফ্যামিলি, লামা, মহাবোধি—আপনি পরপর দেখুন স্যার—’

‘বুদ্ধ কানেকশন!’

‘সর্বত্র! প্রথম থেকেই এই কানেকশনটা পরিষ্কার!’

‘এনি এনমিটি?’

‘হতেই পারে! এত দ্রুত রিয়্যাক্ট করছে কেন?’

‘হুঁ, দেখা যাক।’

‘আর একটা কথা স্যার—’

‘বলো।’

‘মিডিয়াকেও আটকাতে হবে স্যার! খবরটা লিকড হলে কাজে অসুবিধে হবে।’ রজত বলে।

‘ডিজিসাহেব মহাবোধিকে বলেছেন, আমিও বলেছি, এখনই ওরা মিডিয়াকে কিছু জানাবে না—আপাতত গোপন রাখবে—কিন্তু কতক্ষণ!’

রবিবারের সন্ধ্যা। অফিসে নিজের ঘরে শহরের পুলিশ কমিশনার বসেছেন, জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) রজত রায় আর অ্যান্টিক থেফট সেকশনের ওসি রিয়াজ আলমের সঙ্গে। চারু মার্কেটে সুরজিৎ বড়ুয়ার বাড়ি থেকে ফিরে রিয়াজ বিস্তারিত রিপোর্ট করেছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। তারপর সে নিশ্চুপ বসে শুনে যায় সিপি স্যার ও জয়েন্ট-সিপি স্যারের কথোপকথন।

'আমি চাইছি রিয়াজ একবার কালিম্পং যাক—বাগডোগরা বা গ্যাংটকের লাস্ট ফ্লাইট চলে গেছে—আজকে রাতের দার্জিলিং বা পদাতিক মেল ধরতে পারে—কী বল রজত? নাহলে আগামিকাল সকালের ফ্লাইট।'
'কালই যাক—যদি আজ রাতের মধ্যে কোনও নিউজ আসে!'
'ওকে, তাই হোক। গেট রেডি রিয়াজ।'
'ইয়েস স্যার।' রিয়াজ বলে।
'সঙ্গে ফোর্স নেবে?' জানতে চায় রজত।
'এখন ইনভেস্টিগেশনের জন্য ও একাই যাক। দরকারে ফোর্স এখান থেকে জয়েন করবে।'
'এসটিএফ?'
'ইয়েস! ডিজিসাহেবকে প্রাইমারিলি বলে রেখেছি, স্যার কালিম্পং-এ যেতে হতে পারে, ফোর্স লাগবে। ওদের আইজি'র সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। কতজন লাগতে পারে, রজত?' রজতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা পুলিশ কমিশনারের।
'দশজন স্পেশাল কম্যান্ডো রেডি থাকুক। বাকি ফোর্স দার্জিলিং আর কালিম্পং পুলিশ প্রোভাইড করুক।' রজত খুব স্পষ্ট।
'ওকে। আমি বলে দিচ্ছি। রিয়াজ কিছু বলবে?'

মাথার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরেই প্রশ্ন ঘুরছে। গোটা দার্জিলিং পাহাড়টাই অচেনা। সম্পূর্ণ অজানা পাহাড়ি জায়গায় কীভাবে তদন্ত করবে সে? রিয়াজ বলে,

'স্যার, অজানা এলাকা—একজন অভিজ্ঞ লোকাল অফিসার লাগবে—'

‘সে তো তুমি পাবেই—এসপি খুব এফিসিয়েন্ট, দিয়ে দেবে—শর্মাকে তোমার কথা আমি বলেওছি—‘ রজত বলে।
‘দাঁড়াও শর্মাকে আমি ফোন করি—’

কালিম্পং-এর এসপি সুন্দর শর্মাকে ফোনে ধরলেন সিপি।

‘সুন্দর, দাওয়া লামার খোঁজ পেলে? ... পাওনি! কী মনে হচ্ছে তোমার, অ্যাবডাকশন? ... হুঁ ... হুঁ ... আরে সেটাই তো, মোটিভটা কী? শোনো রজত তো তোমায় সব বলেছে—মিউজিয়ামের মূর্তিচুরি থেকে সবটা শুনেছ—আমার এক অফিসার কাল যাচ্ছে তোমার ওখানে, ... হ্যাঁ রিয়াজ আলম ... হ্যাঁ ফার্স্ট ফ্লাইটেই ... হুঁ ... হুঁ ... ঠিক আছে, ভেরি গুড ব্রাদার! ওকে, বাই।’

ফোন রেখে গম্ভীর হয়ে যান সিপি। অপেক্ষায় রজত। রিয়াজও।

‘রজত, সুন্দর বলছে এমন ঘটনা ওখানে রেয়ারেস্ট অ্যামংগ রেয়ারস—খুব চেষ্টা করছে ওরা—সিকিম পুলিশকে ও পার্সোনালি জানিয়েছে—সুন্দর খুবই চিন্তিত কারণ ট্যুরিস্ট স্পটে এইসব হওয়া মানে ভয়ঙ্কর ক্ষতি—মিডিয়া টের পেলে এমন হল্লা করবে, ট্যুরিস্টরা ভয় পেয়ে যাবে—কার অ্যান্ড হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন খুব স্ট্রং—চাপে পড়ে যাবে ওরা। কেবল ওরা কেন, গোটা হোম ডিপার্টমেন্ট! যাইহোক, সুন্দর রিয়াজের সঙ্গে একজন সিনিয়র এএসআইকে দেবে—তাশি নামডোল—কালিম্পং-এর লোক—গোটা পাহাড় হাতের তালুর মতো চেনে—ফোন করে নিও, রিয়াজ—সুন্দর আমায় মেসেজ করবে ওঁর নাম্বার—’
‘ইয়েস স্যার!’
‘সকালে ফার্স্ট ফ্লাইট কখন, রিয়াজ?’
‘স্যার, ছটা কুড়ি।’
‘ওকে, চলে যাও। রজত প্লিজ অ্যারেঞ্জ দ্য টিকেট ফর হিম!’
‘ইয়েস স্যার!’ রজত মাথা নাড়ে।
‘সকালে নেমেই রিপোর্ট করবে শিলিগুড়ি কমিশনারেটে।’

‘ইয়েস স্যার!’
‘বেস্ট অফ লাক রিয়াজ!’
‘আইল ট্রাই মাই বেস্ট স্যার!’

সিপি’র ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের সেকশনে এসে বসে। সিপি স্যারের বার্তা ঢোকে ফোনে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের ফোন নাম্বার পাঠিয়েছেন স্যার। নাম্বারটা দিয়ে ইপিবিএক্স-কে বলে ধরতে। তারপর নিজের ফোনে মজুত করে সেই দশ সংখ্যা। নাম্বারের পাশে নাম লেখে, এএসআই তাশি নামডোল কালিম্পং।

৫৮

১৪ অক্টোবর। কালিম্পং।

‘আর কতদূর ভাই? কালিম্পং তো ঢুকে গেলাম!’
‘হোটেলের নামটা আর একবার বোলেন, সার!’
‘ক্লাউড নাইন।’
‘নয়া হোটেল?’
‘তা জানি না, অনলাইনে বুকড। আপনি চেনেন না? কেডি প্রধান রোড, ছোটা ভালুখোপ। ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালের কাছে।’
‘হ্যাঁ, এবার চিনেছি। লেকিন—’
‘কী লেকিন! কী হয়েছে!’
‘গাড়িটা গড়বড় করছে—টেনশনের বাত নেই—আমি ইন্তেজাম করে দিচ্ছি!’

সন্দীপ তাকায় অঞ্জনার দিকে। অঞ্জনার অভিব্যক্তিতে বিরক্তি। গোড়া থেকেই এই ড্রাইভারকে তার ভালো লাগছে না। না-বলে-কয়ে অর্হৎকে নিয়ে কোথায় চলে গেল! টেনশনেই মরে যাচ্ছিল সে! মহাকালের মুখোশটাই বা ওঁর কাছে কীভাবে গেল, সেও এক

ধাঁধা! এমনিতেই ট্রেনের বৃদ্ধ লামার আচরণ খুবই রহস্যময় মনে হয়েছে তার। উপরন্তু এই ড্রাইভার যোগ করছে আরও উৎকণ্ঠা। এখন আবার বলছে গাড়ি খারাপ! একে বিদায় করে হোটেলে ওঠার জন্য ব্যাকুল হয় অঞ্জনা।

'আমরা এখান থেকে গাড়ি ধরে নেব—এখানে নামিয়ে দিতে বল!' বিরক্ত অঞ্জনা সন্দীপকে বলে।
'আরে মেডাম, গাড়ি খারাব হতে পারে—প্লিজ গুসসা করবেন না!' হেসে বলেন ড্রাইভার।

তারপর, অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়, পথের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, 'এক মিনিট স্যার' বলে নেমে যান। অঞ্জনার ফোন বাজে। বাড়ির ফোন। শ্বশুরমশাই।

'হ্যাঁ বাবা, আমরা কালিম্পং ঢুকে গেছি। হোটেলের কাছে আছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, গোটা পথটাই তো ঘুমোল—হ্যাঁ এই তো জেগেছে—বাবু, দাদুনের সঙ্গে কথা বলো—' অঞ্জনা ফোন দেয় ছেলেকে।

কিছুক্ষণ গাড়ির ভেতরেই অপেক্ষা করার পর গাড়ি থেকে নামে সন্দীপ। ফোনে কথা শেষ করে নেমে যায় অর্হৎও। কয়েক মিনিটের মধ্যে আসে একটি এসইউভি। গাড়ি থেকে নেমে আসেন পুরনো ড্রাইভার। সন্দীপদের লাগেজ তাঁর গাড়ি থেকে বার করে নতুন গাড়িতে তুলে দেন। বিনীতভাবে জানান, নতুন চালক ওদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। সন্দীপ তাঁকে ভাড়া মিটিয়ে দেয়। নতুন চালককে আর কিছুই দিতে হবে না। অর্হৎকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে সন্দীপ ও অঞ্জনা। চলতে শুরু করে গাড়ি।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পরও যখন হোটেল ক্লাউড নাইন-এর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, সন্দীপ বলে,

'কী ব্যাপার ভাই, হোটেল কোথায়?'
'ঘাবড়াইয়ে মত, আ জায়গা!' শান্তস্বর চালকের।

‘আপনি গাড়ি থামান, আমি দেখছি—’ অত্যন্ত বিরক্তি দেখায় সন্দীপ।
‘হোটেলে ফোন কর তো, ওরা লোকেশন বলে দেবে?’ অঞ্জনা বলে সন্দীপকে।

হোটেল ক্লাউড নাইন-এ ফোন করতে যায় সন্দীপ, কিন্তু ফোন ঢোকে না। চালক দাঁড় করান গাড়ি।

‘নয়া হোটেল, একজ্যাক্ট লোকেশন মালুম নেহি—ফোন নাম্বারটা দিন—আমি ফোন লাগাচ্ছি —’

হোটেলের ফোন নাম্বার বলে সন্দীপ। চালক গাড়ি থেকে নেমে ফোন করেন। ফোন ঢোকে না। গাড়ি থেকে নামে সন্দীপও। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন ফোন ঢুকছে না, চালক ফোন করেন পরিচিত কোনও লোককে। কথা শেষ করে সন্দীপকে বলেন,

‘এই নামে কোনও হোটেল তো কালিম্পং-এ নাই দাদা! এ তো ফ্রড কেস লাগছে!’

অবাক হয় সন্দীপ। ইন্টারনেটে দেখে অনলাইনে টাকা জমা করে বুকিং করেছে সে। এমন কান্ড হবে তার কল্পনাতেও ছিল না। তারা নিয়মিত বেড়াতে যায়, সর্বত্রই এই পদ্ধতিতে হোটেল বুকিং করে, আজ পর্যন্ত ঠকেনি! হোটেলের পরিষেবার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে প্রশ্ন ছিল কয়েক জায়গায়, কিন্তু গোটা হোটেলটার অস্তিত্বই নেই, এমন ঘটনা এই প্রথম।

গাড়িতে ঢুকে সব জানায় অঞ্জনাকে। চালক বলেন,

‘এমন আমাদের এখানে হয় না দাদা—লেকিন চিন্তা করবেন না, আমি ভালো হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি! পছন্দ হলে থাকবেন!’

হতাশ অঞ্জনা ও সন্দীপ চুপ করে বসে থাকে। কথা বলার ইচ্ছেটুকুও হারিয়েছে তারা। অর্হৎ খেলা করে মুখোশটা নিয়ে। চালক চালু করেন ইঞ্জিন।

আরও বেশ কিছুদূর এগোনোর পর বাঁদিকে দেখা যায় তিস্তা। এই চালক কোথায় নিয়ে চলেছে তাদের? গাড়ির ভেতর একটা মিষ্টি গন্ধ টের পায় অঞ্জনা। সন্দীপের দিকে তাকায় চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে। সন্দীপের চোখে ক্লান্তি। তন্দ্রানুভূতি হয় তার নিজেরও। মুখোশটা হাতে ধরে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে অর্হৎ।

রেয়ার-ভিউ আয়নায় চালকের চোখ। যেন হাসছেন! সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে অঞ্জনাকে দেখেন। ড্রাইভারের মুখে মাস্ক। অঞ্জনা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে চালকের দিকে। কিন্তু মেলে রাখতে পারে না চোখ। অনুপ্রবেশ করে রাজ্যের ঘুম। মেঘের মতো।

৫৯

ঘুম ভাঙল নরম হাতের স্পর্শে। চোখ মেলে দেখে মুণ্ডিত মস্তক এক বালক, পরনে রক্তবর্ণ কৌপীন, তার কপালে হাত বোলাচ্ছে। কে এই বালক?

কে তুমি?
আমি লামা অর্হৎ!

চমকে জেগে ওঠে অঞ্জনা। পাখির কিচির-মিচির। এত পাখি কোথা থেকে এল? ধাতস্থ হয়ে ঠাহর করে চারপাশ। একটা সাজান-গোছান ঘর। খোলা জানালার ফ্রেমে যেন ক্যালেন্ডার। বরফাবৃত পর্বতশ্রেণি। দিনাবসানের সোনালী আলোয় তাদের নীরব স্নান। নিসর্গ এত আতঙ্ক তৈরি করতে পারে, আগে অনুভব করেনি অঞ্জনা।

বিশাল এক খাট। পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সন্দীপ। কিন্তু অর্হৎ কোথায়? বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে অঞ্জনা। দরজা বন্ধ। জানালার কাছে যায়। জনমানুষের কোনও চিহ্ন নেই। পাহাড়ের গা ঘেঁষে লম্বা লম্বা প্রাচীন গাছ। সরলবর্গীয় বৃক্ষ। অন্ধকার ফুঁড়ে যেন উঠে এসেছে। একটু দূরে পাহাড়ি বাঁশগাছের ঝাড়। তাদের চিকন পাতা আর তিরতির কাঁপুনির মাঝে উড়ছে অজস্র পাখি।

কিন্তু কোথাও অর্হৎ-এর কোনও চিহ্ন নেই।

বাবু-উ-উ-উ!

অঞ্জনার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার নিজের কাছেই ফিরে আসে। অসংখ্য পাখির কলরব মিশে যায় সেই আকুল আর্তনাদে। শেষ-বিকেলের আলোয় রঙিন বুনোফুলকে কেন্দ্র করে উড়ে বেড়ায় আহ্লাদী প্রজাপতি। পুত্রহারা মায়ের বিলাপ তার আহ্লাদে ফেলে না কোনও ছাপ। চিকন বাঁশপাতার কম্পনেও আনন্দের আয়োজন, নেই কোনও হাহাকার। তুষারাবৃত হিমালয় তার নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতা নিয়ে স্তব্ধ। সে স্তব্ধতায় মানুষের জন্য কোনও শোকগাথা নেই।

৬০

১৫ অক্টোবর। লাসা রেস্তোরাঁ। কালিম্পং।

অতীব সুস্বাদু চিকেন মোমো দিয়ে দুপুরের খাবার সারে রিয়াজ। সঙ্গী এএসআই তাশি নামডোল। তাশি'র পাতে সাম্পা। তিব্বতি খাবার। দৃশ্যত ছাতুর সঙ্গে মিল। পাশে ব্যঞ্জন হিসেবে এক প্লেট মাংস আর চা। পরপর দু'চামচ সাম্পা মুখে তুলে এক চুমুক চা খান তাশি। রিয়াজের দিকে তাকিয়ে হাসেন। মোমোতে কামড় বসিয়ে রিয়াজ বলে,

‘আপনি কি টিবেটান?’

‘টিবেটান অরিজিন। এখন ইন্ডিয়ান। বহু বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ সাউথ ইস্টার্ন টিবেটের ছেমদো থেকে ভূটান চলে এসেছিল। তারপর কালিম্পং। কালিম্পং-এ আছি আমরা প্রায় দেড়শ বছর।’

‘এটা কি ইয়াকের মাংস?’ মাংসের প্লেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলে রিয়াজ।

‘না স্যার, গরুর। বিফ।’

‘ইয়াকের মাংস খাওয়ার খুব ইচ্ছে আছে আমার।’ হেসে বলে রিয়াজ।

‘সহজে পাওয়া যায় না। আপনি দিন কয়েক থাকলে আমি চেষ্টা করব খাওয়াতে। এই চা-টা খান স্যার, অন্যরকম।’

হাত উঁচিয়ে ওয়েটারকে ডেকে আরও এক পাত্র চা দিতে বলেন তাশি।

‘এই বাটার টি টিবেটের ন্যাশানাল বেভরেজ। খেয়ে দেখুন স্যার, আপনারা যে চা খান, তার থেকে ডিফরেন্ট—’

‘বাটার টি?’

‘আমরা বলি পো-চা। চা পাতা, ইয়াকের দুধের বাটার, সামান্য দুধ আর নিমক দিয়ে বানান হয়। নো সুগার।’

টেবিলে চা দিয়ে যেতেই চামচ দিয়ে নাড়িয়ে চুমুক মারে রিয়াজ। নোনতা চা। অদ্ভুত একটা গন্ধ। এক চুমুক দিয়েই কাপ নামিয়ে রাখে। তাশি হাসেন।

‘সল্টি লাগল স্যার!’

‘এই বাটার কি ইয়াকের দুধের?’

‘না স্যার, খুব কস্টলি! এটা লোকাল গরুর দুধের বাটার। কেমন লাগল স্যার?’

রিয়াজ হাসে। কোনও উত্তর দেয় না।

‘প্রথম-প্রথম সল্টি লাগবে—পরপর দু-একদিন খান—পো-চা’র প্রেমে পড়ে যাবেন!’
‘সে না-হয় যাব, কিন্তু মিস্টার নামডোল, বড়ুয়া ফ্যামিলিকে রেস্কিউ করব কীভাবে! কোনও সূত্রই তো খুঁজে পাচ্ছি না! পুরো ভ্যানিশ! ড্রাইভারটাকে পেলেও হয়ত কোনও ক্লু পেতাম!’
‘ড্রাইভারকে পাওয়া যাবে স্যার! পালাবে কোথায়!’

খেতে এসেও মাথা থেকে বের করতে পারে না বড়ুয়া ফ্যামিলির অন্তর্দ্ধান রহস্য। বাগডোগরায় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ নেমে চলে যায় সোজা শিলিগুড়ি কমিশনারেট। তাশি নামডোল গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল বিমানবন্দরে। গতকালই শিশুসহ বড়ুয়া দম্পতির ছবি পাঠান হয়েছিল কমিশনারেটে। সেবক রোড ফাঁড়ির এক এএসআই আর দু’জন কনস্টেবল চিহ্নিত করতে পেরেছেন মা-বাবা-ছেলেকে। রিয়াজ পৌঁছতেই হাতে পায় বিস্তারিত প্রতিবেদন।

ভক্তিনগর থানায় গিয়ে কথা বলে সেই পুলিশকর্মীদের সঙ্গে। রবিবার সকালে, সেবক রোডের ধারে এক খাবারের দোকানে, বেশ খানিকক্ষণের জন্য শিশুটির অন্তর্দ্ধান, তৈরি করেছিল আতঙ্ক। কেবল বাচ্চাটির বাবা-মা নন, উপস্থিত জনতাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাদেরই একজন ফোন করে থানায়। ভ্রমণের ভরা-মরশুমে অপ্রত্যাশিত এই খবরে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল ভক্তিনগর থানা। দ্রুত সেবক রোড ফাঁড়ি থেকে ঘটনাস্থলে যান এক এএসআই আর দু’জন কনস্টেবল।

যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া যায় বাচ্চাটিকে। গাড়ির ড্রাইভার তাকে একটি দোকানে নিয়ে গিয়েছিল আলুর চিপস কিনে দিতে। ড্রাইভার আর গাড়ির ছবি তুলে রেখেছিলেন এক কনস্টেবল। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ড্রাইভার ও গাড়ির খোঁজ শুরু করেছে।

ছবিগুলো নিজের ফোনে নিয়ে নেয় রিয়াজ। তারপর শিলিগুড়িতে আর অপেক্ষা না-করে বেরিয়ে যায় কালিম্পং-এর উদ্দেশ্যে।

কালিম্পং-এ ঢুকেই রিয়াজ যায় হোটেল ক্লাউড নাইন-এ। রেজিস্টার দেখান ম্যানেজার। পুরো ভাড়া মিটিয়ে তিনদিনের বুকিং থাকা সত্ত্বেও পার্টি চেক-ইন করেনি গতকাল। নেট থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে কলকাতা থেকে কথা বলেছিলেন এক ভদ্রলোক। হোটেলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সঙ্গে সঙ্গে টাকা হস্তান্তর করে সংরক্ষিত হয়েছিল একটি দুই শয্যার ঘর। পরে গ্রাহকের নম্বরে ফোন করে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

সুরজিৎ বড়ুয়া'র ভাষ্য অনুযায়ী, এগারোটা নাগাদ তিনি যখন ফোন করে বৌমা ও নাতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন ওরা গাড়িতে, বৌমা অঞ্জনা তাঁকে বলেছে ওরা প্রায় হোটেলের কাছে পৌঁছে গেছে। ক্লাউড নাইন হোটেলের কর্মী ও আশেপাশের দোকানে ছবি দেখিয়ে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে রিয়াজ। কালিম্পং থানার ওসি, থানার সিভিক পুলিশ ভলান্টিয়ার্সদের নিযুক্ত করেন এই কাজে। কেবল ক্লাউড নাইন হোটেল বা সংলগ্ন অঞ্চল নয়, বড়ুয়া পরিবারের ছবি নিয়ে টাউনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন নগর-পুলিশের দল।

কালিম্পং টাউনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসান আছে, গতকালের ফুটেজ সে নিজে দেখতে চায় বলে আর্জি পাঠায় কালিম্পং থানার ওসি'র কাছে। দুপুর আড়াইটেয় থানায় সেই ফুটেজ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন ওসি। সেই ফাঁকে, মধাহ্নভোজন সারতে, তাশি'র সঙ্গে লাসা রেস্তোরাঁয় ঢোকে রিয়াজ।

'ক'টা থানা আপনাদের?'
'তিনটে স্যার। কালিম্পং, গরুবাথান আর জলঢাকা।'
'সবাই ইনফর্মড তো?'
'ইয়েস স্যার! আমাদের কালিম্পং জেলা পুলিশের এক্তিয়ারে তিনটে থানায় অল ইনফোজ ইনক্লুডিং ফোটোজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেন্ট অলসো টু রংপো, পেডং অ্যান্ড তিস্তা চেকপোস্ট। রিয়াং আর মেল্লি ফাঁড়িতেও পাঠান হয়েছে স্যার! তাছাড়া দার্জিলিং জেলা পুলিশ আর সিকিম পুলিশকেও দেওয়া হয়েছে অল ইনফোজ অ্যাণ্ড পিক্স। তদন্তে আছে শিলিগুড়ি কমিশনারেটও। সো ড্রাইভার আর গাড়ির খোঁজ মিলবেই, স্যার! ডোন্ট ওয়রি!'
'ওকে, চলুন।'

‘ইয়েস স্যার!’

সামান্য দূরেই থানা। হাঁটতে হাঁটতেই এগোয় রিয়াজ। পাশে তাশি। অক্টোবরের মাঝামাঝি, এই মেঘের দেশে, আরামদায়ক আবহাওয়া। গায়েই লাগে না রোদের তাত।

থানায় গিয়ে সিসি টিভি ফুটেজ নিয়ে বসে পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে। তিস্তা পেরিয়ে ঢুকতে হয় শহর। তিস্তা ব্রিজ আর ঋষি রোডে দু’বার, তিনটে সিসি ক্যামেরায় মোট তিনবার ধরা পড়েছে গাড়িটি। কিন্তু তারপর ক্যামেরা আর তাকে পায়নি। সম্ভবত টাউনেই আর ঢোকেনি সেই গাড়ি। কোথায় কোন ক্যামেরা মুখস্থ তাশি’র। ছোটা ভালুখোপ, কেডি প্রধান রোডে হোটেল ক্লাউড নাইন পৌঁছোতে গেলে আরও তিনটি সিসি ক্যামেরা পেরোতে হয়, কিন্তু কোনও ক্যামেরাতেই ধরা পড়েনি সেই গাড়ি। তার মানে, নির্দিষ্ট গন্তব্য আসার আগেই গাড়ি থেমেছে বা দিক পরিবর্তন করেছে। তাশিকে পাশে নিয়ে রিয়াজ কালিম্পং টাউনের ভূগোলের সঙ্গে গাড়ির গতিবিধি মিলিয়ে নেয়।

গাড়ির নম্বর শুরু হয়েছে ডব্লুবি-৭৪ দিয়ে, তার মানে শিলিগুড়ি রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে গাড়ির নিবন্ধীকরণ হয়েছে। আরটিও জানিয়ে দেন গাড়ির মালিক প্রীতম সিং নামে এক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী, বাড়ি বিধান রোড, হাকিম পাড়ায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের পিছনে।

শিলিগুড়ির নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে দেখা গেল প্রীতম সিং তাঁর দুটি গাড়ি বিক্রি করে গত মাসে সপরিবার লুধিয়ানা চলে গেছেন। কে বা কারা গাড়িদুটি কিনেছে, প্রীতম সিং-এর পরিচিত বন্ধুবান্ধব কেউই পারলেন না তথ্য দিতে। শিলিগুড়ি কমিশনারেট ফোনে খবর দেয় রিয়াজকে। রিয়াজ বোঝে, অতি ঘাগু দলবল এই কর্মকাণ্ডে জড়িত। যাইহোক, গাড়ি চিহ্নিত হয়েছে, এবার সেই চালককে পাওয়া গেলে তদন্ত অনেকটা এগিয়ে যাবে।

কিন্তু কোথায় সেই চালক?

১৫ অক্টোবর। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। শিলিগুড়ি।

স্বাগত ভাষণ শুরু করেন অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাস। আজকের সেমিনারের মধ্যমণি কবীর খান। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছেন অসংখ্য শ্রোতা। মূলত ছাত্র-ছাত্রী ও মাস্টারমশাইদের ভিড়ে মাঝারি প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে আনুষ্ঠানিক বরণ করার পর সরসিজ শুরু করেন তাঁর ভাষণ।

দর্শক-শ্রোতাদের কাছে, কবীর ও তাঁর কাজের প্রারম্ভিক পরিচয় দেওয়ার দায়িত্ব সরসিজ বিশ্বাসের কাঁধে। তিনি সুচারুভাবে সেই দায়িত্ব পালন করে পোডিয়ামে আহ্বান করলেন কবীরকে। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নিজের লিখিত বক্তব্য পাঠ করতে উঠলেন কবীর। দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা।

নমস্কার করার মুহূর্তেই লক্ষ করলেন দর্শকাসনের দ্বিতীয় সারির ডানদিকের কিনারায় বসে আছেন চেনামুখ। খুব চেনা সেই মুখ কিন্তু মনে করতে পারেন না তাঁর নির্দিষ্ট পরিচয়।

কয়েক সেকেণ্ডের বিহ্বলতা, স্মৃতির পর্দায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে চেনামুখের পরিচয়। চিত্রক চন্দ্র!

হর্ষধ্বনি থামিয়ে প্রেক্ষাগৃহ নিশ্চুপ। নিজেকে প্রস্তুত করেন কবীর। সামান্য বিরতি। মঞ্চে উপবিষ্ট সকলে মঞ্চ থেকে নেমে বসে গেছেন দর্শকাসনে। দর্শক-শ্রোতারা উন্মুখ প্রতীক্ষায়।

মঞ্চের পেছনে পর্দায় ফুটে ওঠে,

আজকের বিষয়
মানব সমাজে ঈশ্বরের জন্ম হল কীভাবে?
বক্তা: কবীর খান।

৬২

১৬ অক্টোবর। কলকাতা।

পকেটে কাঁপছে ফোন, ডেস্কটপের মনিটর থেকে চোখ না-সরিয়ে পকেটে হাত ঢোকায় ডিকে। ততক্ষণে থেমে যায় কাঁপন। মিসড কল। নিবেদিতা। টেবিলের ওপর রাখে ফোনটা। লক্ষ্মীপুজোর পরে আজই খুলল অফিস। খুব বেশি ফাইল নেই। ফাইল জমিয়ে রাখে না ডিকে। ইনবক্সের ফাইলগুলো পড়ে ফেলে দ্রুত। একটা ফাইলে স্ক্যানড ডক্যুমেন্টস আপলোড করে। তারপর ফরোয়ার্ড করে পরবর্তী অনুমোদনের জন্য। একটা ফাইল ছাড়তে কিঞ্চিৎ সময় লাগবে, তাই মজুত করে রাখে ড্রাফটে। তারপর চেয়ার ছাড়ে। চিহ্নিত ধূমপান এলাকায় গিয়ে ধরায় একটা সিগারেট। তারপর ফিরতি-কল করে নিবেদিতাকে।

‘খানদার সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?’ জানতে চায় নিবেদিতা।
‘গতকাল সেমিনারের পরে একটা এসএমএস করেছিলেন। সেমিনার খুব ভালো হয়েছে। আমি কল করে আর বিরক্ত করিনি। আজ রাতে কথা বলার ইচ্ছে আছে—’
‘আমি গতরাতে ফোন করেছিলাম—কথা হল বেশ খানিকক্ষণ—অথচ আর পাচ্ছি না—এখন চারটে বাজে—দু-তিনবার ট্রাই করলাম, লাইনই পাচ্ছি না—তাই ভাবলাম—’
‘আজ তো ওনার কালিম্পং যাওয়ার কথা—সরসিজ বিশ্বাস আর উনি যাবেন—নেটওয়ার্কে গণ্ডগোল হয়তো—’
‘কিন্তু সরসিজবাবু তো যাচ্ছেন না! খানদা একা যাচ্ছেন!’
‘সে কী! একা কেন?’ বিস্মিত ডিকে।

‘গতকাল রাতে আমায় তাই বললেন! সরসিজবাবুর কাজ পড়ে গেছে—উনি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন—খানদা একাই যাবেন!’
‘হুঁ—’

চিন্তিত হয় ডিকে। মনে পড়ে শিয়ালদা স্টেশনে কবীর খানের কথা। চিত্রক চন্দ্র নামে একজন অজানা-অচেনা লোক মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বাড়ি এসে তাঁর হাতে তুলে দেন বইয়ের মোড়কটি। কে মিথ্যে বলছেন? চিত্রক চন্দ্র না কি সরসিজ বিশ্বাস?

‘ওকে ডিকেবাবু, যোগাযোগ হলে আমায় একটু জানাবেন। আমিও ট্রাই করছি, কথা হলে জানিয়ে দেব।’

নিবেদিতার সঙ্গে কথা সেরে সিগারেটে পরপর দুটো মস্ত টান দেয়। তারপর ফোনে কবীর খানের নম্বর খুঁজে ফোন করে। না, ফোন ঢুকছে না। হয় ফোনটি বন্ধ অথবা নেটওয়র্ক সীমার বাইরে, জানিয়ে দেয় রেকর্ড-করা কণ্ঠস্বর।

কবীরদার সঙ্গে নিবেদিতার প্রায় পিতাপুত্রীর সম্পর্ক। ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক বিলু চট্টোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পর থেকে যা আরও গভীর হয়েছে। বিলু তো কেবল ভিকে গ্রুপের মালিক-সম্পাদক ছিলেন না, নিবেদিতার কাছে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। পথপ্রদর্শকও বটে। ডিকে জানে নিবেদিতা কবীরদা’র শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। বাড়িতে থাকতেই যিনি অভ্যস্ত, এত দূরে গিয়ে সেই মানুষটা কীভাবে দিনযাপন করছেন, সেই চিন্তাই উতলা করেছে তাকে।

লম্বা একটা শেষ টান মেরে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা পা দিয়ে পেষে ডিকে। তারপর আবার স্বস্থানে ফিরে, খুলে বসে ফাইল।

১৬ অক্টোবর। জোগচেন গুম্ফা। কালিম্পং।

প্রায় তিন ঘণ্টা টানা গাড়িতে বসে থাকা খুব কষ্টকর। পাহাড়ি পথে আরও কষ্ট। কিন্তু গাড়ি থেকে নামতেই মনটা ভালো হয়ে গেল। মেঘের পরে মেঘ নেমে এসেছে রাস্তায়, যেন অভ্যর্থনা করছে তাঁকে। পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট একটা গুম্ফা। আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীনই মনে হয়। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে মেঘ ঠেলে কবীর খান এগিয়ে যান গুম্ফার দিকে।

নৈঃশব্দ আর মেঘ, সেনাবাহিনীর মতো ঘিরে রেখেছে গোটা গুম্ফা। চারপাশে লাল চীবর পরিহিত, বিভিন্ন বয়সী, বেশ কিছু সন্ন্যাসী তাঁদের কাজে মগ্ন। লম্বা মইয়ে উঠে সম্ভবত বিদ্যুতের লাইন পরীক্ষা করছেন বিদ্যুৎকর্মী। কবীর মাথা তুলে তাকিয়ে দেখেন কারিগর পরীক্ষা করছেন বটে, তবে বিদ্যুতের লাইন নয়, সিসি ক্যামেরা। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দাঁড়ান গুম্ফার প্রশস্ত চাতালে। এদিক-ওদিক তাকান। ভঙ্গি ইতস্তত। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন অল্পবয়সী সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন,

‘স্যার আসুন, আজ আপনি আমাদের অতিথি, ড্রাইভারকে বলুন অপেক্ষা করতে হবে না, আমরাই আপনাকে পৌঁছে দেব।’

আপত্তির কারণ দেখেন না কবীর। আবার তোরণ পেরিয়ে এসে হাতের ইশারায় চালককে ডেকে তাঁকে চলে যেতে বলেন। চলে যান চালক।

তোরণ পেরিয়ে আবার তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে ফিরতেই তিনি হাতের ইঙ্গিতে পথ দেখিয়ে এগিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করলেন কবীর।

শিলিগুড়ি গেস্টহাউজ থেকে সরসিজবাবুই গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পাহাড়ে ওঠার মুখেই সেই গাড়ি গেল খারাপ হয়ে। চালকটি অতীব করিৎকর্মা। দ্রুত আরেকটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। সরসিজ বিশ্বাসকে পৌঁছ-সংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পকেট থেকে ফোন বার করেন, কিন্তু ফোন করার আগেই তরুণ সন্ন্যাসী হাতের ইশারায় বারণ করেন। সম্ভবত নীরব গুম্ফায় ফোনালাপে কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে। সন্ন্যাসীর কথা মেনে কবীর ফোন আবার ঢুকিয়ে নেন পকেটে। গাড়ি বদলের কথাটিও অধ্যাপক বিশ্বাসকে জানান হয়নি, ফোন কাজ করেনি গাড়ির ভিতরে। পরে অনুমতি নিয়ে ফোন করে দিতে হবে সরসিজবাবুকে। ভাবতে ভাবতে সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করেন কবীর।

সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন দোতলায়। তরুণ সন্ন্যাসী একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। দেওয়ালে বজ্রযানী দেব-দেবীদের ছবি। থাংকা। নমস্কার করে চলে গেলেন সন্ন্যাসী। সোফায় বসে চোখ গেল সামনের টেবিলে। টিবেট ক্রনিকল। পত্রিকার পাশে একটি ট্যাব। কবীর টিবেট ক্রনিকল তুলে পাতা ওল্টাতে শুরু করেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, দু-চার পাতা ওল্টানোর পরই ঘরে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ লামা। কবীর উঠে দাঁড়ালেন। লামা মৃদু হেসে কবীরকে বসতে অনুরোধ করলেন। কবীর বসতে লামাও বসলেন তাঁর উল্টোদিকের সোফায়। ঘরে আর কেউ নেই। লামার তীক্ষ্ণ চোখ, হাসি খুব চেনা লাগে কবীরের, কিন্তু কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারেন না।

‘কামসূত্র পড়েছেন?’ হেসে জিজ্ঞাসা করেন লামা।
‘একাধিক বার।’ জবাব কবীরের।
‘আর কী জানতে চান বলুন।’
‘বইটি কি এই গুম্ফাতেই পেলেন?’
‘হ্যাঁ, এই গুম্ফাতেই। গোন থাং-এ।’

কবীর তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ লামার দিকে। চোখে প্রশ্ন। বিস্তারে যান লামা।

‘চে-কোংদের পূজা হয় আমাদের মঠের সবথেকে পবিত্র ঘরে। সেই ঘরের নাম গোন থাং। ওই ঘরেই একদিন পেলাম পুরনো একটা বাক্সের মধ্যে।’

‘আপনি বাংলা পড়তে জানেন?’ প্রশ্ন কবীরের।

‘যেটুকু রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, বাংলাতেই পড়েছি।’

‘আপনি কি তিব্বতি?’

‘খাঁটি!’ হেসে বলেন লামা।

‘এই গুম্ফায় বাংলা ভাষায় লেখা উপন্যাস কীভাবে এল, কী মনে হয় আপনার?’

‘উপন্যাসটি পেয়ে আমিও অবাক হয়েছি! পড়ে আরও অবাক! বঙ্গদেশ ও ভোটদেশের কথা উপন্যাস জুড়ে!’

‘তিব্বতের সঙ্গে বঙ্গদেশের বহুদিনের সম্পর্ক—এই যে পটচিত্র—এও তো বাংলারই!’ দেওয়ালে ঝুলন্ত থাংকার দিকে ইঙ্গিত কবীরের।

‘শর-রি স্টাইল। বেঙ্গল স্টাইল অফ টিবেটান স্ক্রল পেইন্টিং। তিব্বতিতে শর মানে বঙ্গদেশ। এই থাংকা পালযুগের শিল্প। সারা ভারত থেকে এই শিল্প হারিয়ে গেছে কিন্তু তিব্বতে আছে।’ ব্যাখ্যা করেন লামা।

‘পুরো হারিয়ে গেছে বলা যাবে না, বাংলার পটশিল্পে এখনও তার রেশ কিছুটা আছে।’ বলেন কবীর।

‘তা বটে!’

‘এই কাহিনীগুলো শুনেছি ক্ষেমেন্দ্র’র বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা থেকে নেওয়া—বুদ্ধের জীবন —‘

‘ঠিকই শুনেছেন, তবে সব থাংকাই তথাগত’র জীবনকাহিনী নয়। তথাগত রিলেটেড সমস্ত বিষয় নিয়েই থাংকা হয়। বিশ্বের কোনও গুম্ফা থাংকা ছাড়া হয় না। কোনও তিব্বতি উৎসব থাংকা ছাড়া হয় না। থাংকা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।’

‘এটা কী মণ্ডল?’

কবীরের আঙুল দেওয়ালে একটি নির্দিষ্ট থাংকার দিকে।

চোখের পাতা মুদে ইতিবাচক মাথা নাড়েন লামা।

সোফা ছেড়ে উঠে কবীর এগিয়ে যান দেওয়ালের দিকে। মণ্ডল-অঙ্কিত থাংকার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দেখেন। তারপর আবার সোফায় এসে বসেন।

'মণ্ডল আর কমণ্ডলু—এই দুই শব্দ ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে গত তিরিশ বছর ধরে, ভবিষ্যতে আর কতদিন করবে কে জানে! মণ্ডল চিহ্নিত করছে জাত-পাত বা জাতপাতের রাজনীতি আর কমণ্ডলু ধর্মের রাজনীতি। এই মণ্ডল শব্দের বিরাট ব্যাপ্তি! বিশাল অর্থ! আপনারা তার কিছুটা ধরে রেখেছেন!' বলেন কবীর।
'প্লিজ এলাবরেট মিস্টার খান—একটু শুনতে চাই—'
'মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। ঝাঁক-জীবও বলা যায়। ঝাঁক-জীবের দলবদ্ধ থাকার কিছু নিজস্ব রূপ আছে। মানুষের ঝাঁকেরও আছে। মানুষের এই দলবদ্ধ থাকার রূপকে বলে মণ্ডল।'
'সংস্কৃতে মণ্ডল অর্থ চক্র। পরিধি।' সংযোজন লামার।
'জনগোষ্ঠীর লোকেরা কোনও জায়গায় গোল হয়ে বসলে বা সক্রিয় হলে যে-যৌথ জনসত্তাটিকে দেখতে পাওয়া যায়, তাকে মণ্ডল বলে। এই মণ্ডলের হেড যিনি তাঁকেও বলে মণ্ডল। কেবল মণ্ডল শব্দের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমাদের গ্রামসমাজের বর্তমান রূপ থেকে আদি রূপ, পুরো ইতিহাসটাই উঠে আসে। প্রায় প্রতি জাতিতেই মণ্ডল পদবীধারীরা আছেন। সমাজ তাদের আদি গৌরবকে ভোলেনি।'
'কেমন গৌরব?' কৌতূহলী লামা।
'সমাজ-সদস্যরা, শিবের উদ্দেশে উৎসর্গ করতেন উৎপাদনের যে অংশ, তা সংগ্রহ করতেন মণ্ডলেরা। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে, মণ্ডল পদবীধারী এমন দু'জন মুসলমানকে আমি চিনি যাঁদের প্রতিবেশী হিন্দুরাও নিজের গোয়ালের গাই বিয়োলে তার প্রথম দুধ বা মাচায় লাউ ফললে তার প্রথম লাউটি সেই মণ্ডল পরিবারে দিয়ে আসেন। এটি তাঁদের একটি ধর্মীয় প্রথা।'
'কেন?'
'এই প্রথম উৎপন্ন হল অগ্ররস আর এই অগ্ররসকে বলে মণ্ড। গাইয়ের প্রথম দুধ বা প্রথম লাউ, মণ্ডলকে না-দিলে সেই দুধ বা সেই লাউ খাওয়া অসিদ্ধ। ধর্মবিরোধী। এই মণ্ডলরা সমাজদেহের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৌদ্ধযুগের রামরাজত্বেও এঁদের গুরুত্ব ছিল,

ফলে হিন্দুযুগের সূচনালগ্নে রাম-বাল্মীকিদের সঙ্গে এঁদেরও ঝাড়েবংশে ম্লেচ্ছ, অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা করে দেওয়া হয়। তাই একালে বেশিরভাগ মণ্ডল-পদবীধারীকে, জাতপাতের যে পিরামিড, তার নিচের স্তরে দেখতে পাই।'

'আপনার দশাবতার তত্ত্ব আমি পড়েছি—মৎস্যাবতারের মাধ্যমেই সমাজে প্রথম পুঁজির প্রকাশ বলছেন আপনি—'

'তাই নাকি! নগদ-নারায়ণের ব্যাখ্যা আপনি পড়েছেন?' কিঞ্চিৎ অবাক হন কবীর।

'বিলক্ষণ! সমাজে পুঁজির বা নারায়ণের প্রথম আবির্ভাব ঘটল জ্ঞান-পুঁজি হিসেবে—খণ্ড-জ্ঞানের ওপর মানুষের ব্যক্তিমালিকানার আবির্ভাব হল—এবং এর রূপ হল মৎস্যাবতার।'

'আজকের ভাষায় যদি বলেন, ইনটেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি রাইট-ই পুঁজির প্রথম রূপ!' কিঞ্চিৎ প্রগলভ হয়েই বলেন কবীর।

কালিম্পং-এর এক গুম্ফার একজন বৃদ্ধ লামা তাঁর তত্ত্ব-ভুবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, এই তথ্যই উত্তেজিত করে কবীরকে।

'তবে আপনি কাল যা বললেন, এক জায়গায় একটু ধোঁয়াশা লেগেছে আমার—প্রথমে সমাজ জ্ঞানী-কর্মীতে বিভাজিত হতে শুরু করল—তারপর সমাজে অহংকার-এর জন্য জন্ম হল—তারপর ভগবান ও ঈশ্বর—কিন্তু কীভাবে হল এই ক্রনোলজিটা আরও একটু বুঝতে চাই!'

বেশ অবাক হন কবীর। গতকাল কি লামা সেমিনারে গিয়েছিলেন! কিন্তু লামা-পোশাক পরিহিত কারোকে তিনি দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে দেখেছেন কি না মনে করতে পারেন না।

৬৪

কবীরের চোখে-মুখে যুগপৎ প্রশ্ন ও বিস্ময় লক্ষ করে হাসেন লামা।

‘বক্তৃতা শুনতে গেলে উপস্থিত থাকতেই হবে তার কোনও মানে নেই! আপনার বক্তৃতা আমি শুনে ফেলেছি।’

আরও অবাক হন কবীর। বিহ্বলতা তাঁর মুখমণ্ডলে। বাঁ হাত তুলে টেবিলে রাখা ট্যাবের দিকে ইঙ্গিত করেন বৃদ্ধ লামা। তবুও কিছুই বোধগম্য হয় না কবীরের। দুর্বোধ্য ঠেকে। লামা এগিয়ে এসে ট্যাবটি হাতে তুলে নেন। আঙুল ঘষে নির্দিষ্ট ফাইলে গিয়ে টোকা মারেন, বেজে ওঠে কবীরের স্বর।

‘নমস্কার, সরসিজবাবু এত কথা আমাকে নিয়ে বললেন, আমি নিজেই জানতাম না আমার সম্পর্কে এত কথা! সত্যি বলতে কী, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, উনি আমাকে নিয়েই বলছেন, না কি অন্য কারোকে নিয়ে! [প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল] আজকের বিষয় ঈশ্বরে আমি আসব একটু পরে, তার আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা একটু বলি। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন হোমিনিড বা বাঁদর। একথা মেনে নিতে কারও আপত্তি নেই তো! [প্রেক্ষাগৃহে আবার হাসি]। বাঁদর থেকে আস্তে আস্তে তৈরি হওয়া আদিম সাম্যবাদী ভারতীয় সমাজগোষ্ঠীগুলির ধর্ম ছিল যৌথতা বা যুথবদ্ধতা। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার, এর পেছনে নলেজ বা জ্ঞান-এর কোনো ভূমিকা ছিল না। ছিল এক অখণ্ড চেতনা, বলা যেতে পারে, এর সবটাই ছিল ইন্টিউশন-এর সর্বোচ্চ রূপ। তখনও বৈদিক যুগের সূচনা হয়নি। এ হল সনাতন যুগ। এখানে ঈশ্বর নেই, পূজা নেই, রাষ্ট্র নেই, বুদ্ধিজীবী আর শ্রমজীবী নেই, পণ্য নেই, বিনিময় নেই।

আদিকালে সমগ্র সমাজের চেতনা এবং ঐ সমাজের যে কোনো একজন সদস্যের চেতনা সমান ছিল, একজন মানুষ যা জানত বুঝত, সমাজের প্রত্যেক সদস্যই তাই জানত বুঝত। প্রত্যেকের আক্কেল বা বুদ্ধি সমান। কারো কম বা কারো বেশি নয়। স্যাপিয়েন্স মানে বুদ্ধি বা আক্কেল। সকলে সমবুদ্ধিসম্পন্ন বলে তারা হোমো স্যাপিয়েন্স। তেমন মানুষকে সেকালে নর বলা হত না, বলা হত মহ বা মহান।

মহ কথাটির অর্থ হল, যে তার নিজের পরিধি বা সীমাকে ভেঙে দেয়। কেবল নিজের নয়, অন্যের সীমাও ভেঙে দেয় সে। ফলে একটা একাকারের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সামাজিকভাবে দেখলে, মহ একটি বোধ, আমরা-সবাই বোধ। বন্যপশুদের ঝাঁক থাকে, তারা দলবদ্ধভাবে বাঁচে, ঘোরাফেরা করে, কিন্তু আমরা-সবাই বোধ থাকে না। আদিম মানুষেরও ছিল না।

কিন্তু যেদিন তারা প্রথম আমরা-সবাই বোধ অর্জন করতে পারল, সেদিন ছিল মানব সভ্যতার আদি-উৎসবের দিন। আমরা-সবাই বোধ-এর চেয়ে বড় উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। হিন্দিসহ উত্তরভারতীয় ভাষাভাষী মানুষেরা এই মহ-বোধের উত্তরাধিকারে পেয়েছেন তাদের হম বা হমারা শব্দ। মহ-কে ওল্টালে হম হয়, মানে আমরা।

এই মহ-এর আধারকে বলে মহা। মহত্ত্বের এই মহৎ রূপটি চলমান হলে, তখন তা হয়ে যায় মহান। পুরাণ পাঠ করতে গেলে প্রথমেই তাই আসে মহানদের কথা। এবার প্রশ্ন, এই মহানদের সমাজে প্রত্যেকের বুদ্ধি সমান, কোনও কমবেশি নেই, তাহলে সমাজে কারা হত পরিচালক?

যারা উৎপাদন কর্মযজ্ঞে নতুন নতুন আবিষ্কারমূলক কাজ করতে পারত তারাই হত পরিচালক। যাদের উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। সেকালে এই নেতারা ছিল শিব-পদবাচ্য। কারণ তারা জ্ঞানের শিখা বহন করত। শি মানে শিখা আর ব হল বহন করা। এই শিব-পদবাচ্য পরিচালকদের বলা হত ব্রাহ্মণ, কারণ তাদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। এই শিবনেতারা কিন্তু এইজন্য কোনও আলাদা কৃতিত্ব দাবি করত না। আমি করেছি বা আমার জ্ঞান, এই ভাবনাটাই তখন সমাজে তৈরি হয়নি।

আমার লেখালেখির সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে এই ভাবনা নতুন নয়, আমি আবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি, রি-ক্যাপিচ্যুলেশন। যাঁরা আমার লেখা আগে পড়েননি, তাঁদের জন্য অবশ্য নতুন। আচ্ছা, ব্রহ্মজ্ঞান কী? ব্রহ্মজ্ঞান মানে সম্পর্কজ্ঞান। প্রকৃতির মধ্যে এমন অজস্র সম্পর্কসূত্র আছে। উদাহরণ দিলে আরও ভাল বোঝা যাবে,

যেমন, গাছ থেকে আপেল পড়ত, নিউটন দেখার আগেও পড়ত। কিন্তু এই ঘটনা যে মাধ্যাকর্ষণের জন্য ঘটে, সেই সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করলেন নিউটন। তাহলে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র হল ব্রহ্ম। যিনি এটি আবিষ্কার করলেন সেই নিউটন শিব বা ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রাহ্মণ।

এবার আসি দক্ষের কথায়। ছোটোবেলায় পুরাণের গল্প আমরা কমবেশি সকলেই পড়েছি বা শুনেছি। পুরাণের গল্প নিয়ে বহু যাত্রা-থিয়েটার হয়েছে, সিনেমাও হয়েছে। অন্য গল্প না-পড়লেও দক্ষযজ্ঞের গল্প আমরা নিশ্চয়ই জানি। এই যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বললাম, এই ব্রহ্মজ্ঞানকে যিনি ধারণ করেন তিনি ব্রহ্মা। কেবল শিব-পদবাচ্যদের দিয়ে সংসার চলে না। তিনি তো আগুন বা চাকা আবিষ্কার করে বেপাত্তা! চলে গেছেন অন্য আবিষ্কারের খোঁজে। এই শিব বা ব্রাহ্মণরা যা আবিষ্কার করলেন সেই জ্ঞান ধরে রাখতে হবে, বহন করতে হবে। আগুন কীভাবে জ্বালাতে হয়, সেই জ্ঞান সংরক্ষণ করতে হবে। উত্তরপ্রজন্মকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

জ্ঞান বহন করার জন্য চাই সেই জ্ঞানের প্রয়োগ ও তার নিরন্তর চর্চা। ফলে একই-কর্মের-পুনরাবৃত্তি চালু হল। এই একই-কর্মের-পুনরাবৃত্তি করার ফলে সমাজে কিছু মানুষ সেই বিষয়ে এক্সপার্ট হয়ে উঠল। এক্সপার্টকে আমরা বাংলায় কী বলি? দক্ষ বলি, তাই তো? কোনও বিষয়ে দক্ষতার জন্য সমাজে তাদের নাম হল দক্ষ।

তৈরি হল জ্ঞানবৃক্ষ যেখানে একই-কর্মের-পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান-কে ধরে রাখা হয় নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে। যেমন এই ইউনিভার্সিটি। বিভিন্ন বিভাগে দক্ষ মানুষরা তাঁদের দক্ষতার সাবজেক্টের চর্চা করেন, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেন সেই জ্ঞান। সরসিজবাবু ও তাঁর সহযোগী শিক্ষকরা এই কাজটাই করছেন দক্ষতার সঙ্গে। দক্ষদের তাঁরা দীক্ষা দেন। ট্রেনিং-এর শেষে দীক্ষান্ত ভাষণ হয়, কি হয় না? এই দক্ষদের মূল্য দিতে হয়, তাকে বলে দক্ষিণা। আমাদের এখনকার এই বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সিস্টেম, সেই সিস্টেমের একদম প্রাচীন রূপের কথা ভাবুন, পেয়ে যাবেন আদি জ্ঞানবৃক্ষ। এভাবেই সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম অ্যাকাডেমিক্সের যাত্রা শুরু।

কিন্তু এখানেই থেমে থাকল না সমাজ। এইবার আস্তে আস্তে কোন্দল শুরু হল সমাজে। কে হবে নেতা? শিব না দক্ষ? প্রাথমিকভাবে দক্ষরা আদি শিবকেই নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সমাজবৃক্ষগুলির নেতৃত্বে ছিল শিব আর শাখা-প্রশাখার দায়িত্বে দক্ষরা।

কিন্তু ততদিনে উৎপাদনের উপায় অর্থাৎ মিনস অফ প্রোডাকশনের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে গিয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য তো ছিলই। ফলে, ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত উপায়সমূহের মাধ্যমে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করলেই দেখা যাচ্ছে সমাজের প্রয়োজনই কেবল মিটছে না, উদ্বৃত্তও হতে শুরু করেছে। সারপ্লাস।

এমনকি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর মতো অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিশাল বিশাল নগর-সভ্যতা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলা গেল।

আর তখনই প্রথম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল আদি শিবের নেতৃত্ব। প্রশ্ন উঠল নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা উদ্ভাবনের আর দরকার কী? যা হয়েছে তাকে বহন করলেই তো দিব্য হয়ে যাচ্ছে!

ফলে শিবেদের পাশাপাশি দক্ষরাও সমাজের পরিচালকের স্তরে উঠে এল। এবং সমাজে আস্তে আস্তে দক্ষ পরিচালিত উৎপাদন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। একই কাজের পুনরাবৃত্তিতেই যাদের বিশ্বাস তাদের বলে মৌলবাদী। দক্ষরা একই-কর্মের-পুনরাবৃত্তি নীতিতে কট্টরভাবে বিশ্বাসী, তাই তারা মৌলবাদী। ফলে সমাজে মৌলবাদের জন্মও হল দক্ষ-দের হাত ধরে।'

৬৫

১৬ অক্টোবর। কালিম্পং।

বড়ুয়া পরিবারের ভাড়া গাড়ির ড্রাইভারের হদিশ করতে পারল না কেউ, না শিলিগুড়ি কমিশনারেট, না সিকিম পুলিশ। কালিম্পং টাউনের কোনা কোনা তল্লাসী করেও গাড়ির খোঁজ পেল না রিয়াজ ও তাশি নামডোল। রিয়াজ কলকাতায় ফিরতে চাইলেও সিপি'র আদেশে তাকে থেকে যেতে হল কালিম্পং। তিনদিন কেটে যাওয়ার পরেও বড়ুয়া পরিবার অন্তর্দ্ধান রহস্যের কোনও কুলকিনারা না-পেয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহাবোধি সোসাইটি। একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম ট্রাস্টি বোর্ড। চারদিন অতিক্রান্ত, গুরু পদ্মসম্ভবের মহামূল্যবান সোনার মূর্তি চুরিরও কোনও কিনারা হয়নি। মিউজিয়ামের কর্মী মন্টু ভট্টাচার্য ও প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিককে প্রবল জেরা করেও কোনও তথ্য বার করতে পারেনি কলকাতা পুলিশ। বেশ চাপে পড়ে গেছে গোটা লালবাজার।

কমিশনারের ঘর থেকে বেরিয়ে রজত নিজের ঘরে ঢোকে। সিপি'র ইচ্ছা জানিয়ে দেয় রিয়াজকে।

'স্যার, এখানে থেকে আর আমার লাভ আছে? শিলিগুড়ি কমিশনারেট আর জেলা পুলিশ দেখছে ব্যাপারটা।'
'কাল বিকেলে মহাবোধি পিসি করছে—বিরাট হইচই করবে মিডিয়া—ডিপার্টমেন্ট চাপে পড়ে যাবে, বুঝতে পারছ না! কেস কদ্দূর যাবে কেউ জানে না, সিআইডি না সিবিআই! আমরা অন্তত বলতে পারব স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য আমরা অফিসার পাঠিয়েছি! মহাবোধি খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল! তুমি ওখানে থেকে তদন্তের ওপর নজর রাখ!'
'ওকে স্যার!'

রজত স্যারের ফোন ছেড়ে আবার কাজে মন দেয় রিয়াজ। তাশি নামডোলকে নিয়ে আজ কালিম্পং-সিকিম সীমানার মেল্লি চেকপোস্ট সরেজমিন দেখতে বেরিয়েছে। সিকিম আর বাংলার সীমান্তে এই জনপদ। মস্ত এক সেতু, জওহরলাল নেহরু ব্রিজ, আলাদা করেছে দুই রাজ্যকে। গাড়ির ছবি, চালকের ছবি, বড়ুয়া পরিবারের ছবি হোটেল-বাজারে জনে-জনে দেখিয়ে সীমান্তবর্তী ছোট্ট অঞ্চলটি ঘুরে বেড়ায় রিয়াজ।

কিন্তু রিয়াজ পরিষ্কার বুঝতে পারছে, যেভাবে কেসটা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, এইভাবে হদিশ পাওয়া মুশকিল। গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তিচুরি ও অর্হৎ বড়ুয়া অপহরণ, এই দুইয়ে বিশেষ কোনও যোগসূত্র অবশ্যই লুকিয়ে আছে। সেই যোগসূত্র আবিষ্কার না-করতে পারলে, মূর্তি বা অর্হৎ, উদ্ধার করা অসম্ভব।

অর্হতের মা-বাবা লক্ষ্য নয়, ছোট্ট অর্হৎ-ই যে মূল নিশানা, এও বিলক্ষণ বুঝতে পারে রিয়াজ। কিন্তু কেন? এই কেন'র উত্তর না-পাওয়া অবধি সাফল্য অধরা। আজ রাতে রজত স্যারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ভাবনায় একটা এক্স-ফ্যাকটর চাই, যে পরশপাথর খুঁজে আনতে পারবে সেই যোগসূত্র। কিন্তু কোথায় পাব তারে?

৬৬

১৬ অক্টোবর। জোগচেন গুম্ফা। কালিম্পং।

বৃদ্ধ লামা স্মিতমুখ শ্রোতা। কবীরও। নিজের বক্তৃতা শুনছেন নিমীলিত চোখে। গুম্ফার একটি ঘরে দুই প্রবীণ মুখোমুখি। বাইরে ঠাণ্ডার বাড়বাড়ন্ত হলেও ঘরের অন্দর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। কবীরের যান্ত্রিক উচ্চারণে গমগম করে ঘর।

'একসময় দক্ষরা বলল, আমরাই যখন সব করছি, তখন উৎপাদন কর্মযজ্ঞের নেতৃত্বও আমরাই দেব। ব্যাস, সমাজে শুরু হয়ে গেল মতানৈক্য।

প্রশ্ন উঠে এল কে হবে সমাজের কাণ্ডারি? উদ্ভাবক না বিশেষজ্ঞ? স্রষ্টা না তার সৃষ্টিধর? পুরুষ না প্রকৃতি? শিব না দক্ষ? শুরু হল লড়াই। শিব-দক্ষের এই লড়াইয়ের ইতিহাস লেখা আছে গল্পের আকারে। পুরাণে যাকে আমরা বলি দক্ষযজ্ঞ। দক্ষের যজ্ঞায়োজন, শিবকে উপেক্ষা, সতীর দেহত্যাগ, সতীর দেহ নিয়ে শিবের তাণ্ডব ইত্যাদি।

দক্ষযজ্ঞের আগে সমাজে, মানুষে মানুষে যুদ্ধের কোনো ইতিহাস নেই। দক্ষযজ্ঞের পুরাণের গল্পটার সঙ্গে ইতিহাস মিলিয়ে নিলেই সব বোঝা যাবে।

দক্ষ তার কর্ম ও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করে। এই জ্ঞানই বেদ। দক্ষের ইন্টেলেকচ্যুয়াল অর্জনই বেদ। তাই দক্ষের আরেক নাম বেদী। এই বেদজীবীরাই একসময় তাদের মস্তিষ্কের মর্যাদা দাবি করে বসে। জ্ঞানকে যেহেতু সে রক্ষা করছে, সংরক্ষণ করছে, তার মধ্যে তৈরি হয় অহংকার, সে বলে ফেলে, এই জ্ঞান আমার! আর তখনই সমাজে বিভাজনের সূত্রপাত।

কিন্তু এই অহংকার যৌথসমাজের ধর্মবিরোধী। ফলত প্রচেষ্টা সফল হয় না। পণ্ড হল দক্ষযজ্ঞ। শিবপুরাণ মোতাবেক তখন শিব ক্ষিপ্ত হয়ে রুদ্রশিবে পরিণত হন। রুদ্র ঘোষণা করেন, জ্ঞানকে কর্ম থেকে পৃথক করে যে পাণ্ডিত্য দেখায়, আমি তাকে ধ্বংস করি।

বস্তুত মানুষের যৌথ শ্রমজাত সম্পদকে 'আমার' ভাবা অপরাধ। সামাজিক শ্রমলব্ধ সম্পদ ও জ্ঞান, উভয়েরই মালিক সমাজ, ব্যক্তিবিশেষ নয়। এটাই রুদ্রনীতি।

সনাতনী মহান মানুষেরা, জ্ঞান বা বেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিদার সেই বেদবাদীদের বিতাড়িত করে। বেদীরা পালায় এবং কালক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে এদেরই বলে বেদে বা বেদিয়া, আরবে এরা বেদুইন।

কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। পরবর্তীকালে রুদ্রশিব শেষমেশ পরাজিত হন, শেষ হাসি হাসে দক্ষ। জ্ঞান ও কর্মের বিভাজন ঘটে যায় কালক্রমে। রুদ্রের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই এই সমাজ ক্রমে ভেঙে যায় দুই শ্রেণীতে। জ্ঞানজীবী আর কর্মজীবী।

জ্ঞানী ও কর্মী-তে অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীতে সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য, বহুবছর ধরে বহুবার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সহজে ভাঙা যায়নি। একজন মানুষ আর একজন

মানুষের শ্রমফল আত্মসাৎ করে বাঁচবে, এমন কথা আদিম সাম্যবাদী মহান-দের পক্ষে ভাবা অসম্ভব ছিল। বুদ্ধিজীবীরা তাই করে, যারা গায়ে খাটে সেই কর্মজীবীদের খাটুনির ফসল খেয়ে বাঁচে। আজও সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।

যে-বিভাজন আগে কখনও ছিল না, তাই প্রতিষ্ঠিত হল। সনাতনপন্থার বিপরীতে সূত্রপাত হল বৈদিকপন্থার। ফলে আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান হারিয়ে একদিন ব্রহ্মদত্যিতে রূপান্তরিত হল। জ্ঞানের তেজ বা শিখা বহনকারী শিব থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে গেল কেবল টিকিধারী বামুন। উপবীত বা পৈতে হয়ে গেল তার লাইসেন্স।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে জ্ঞান আর কর্মের বিভাজন ঘটল? আদিম সাম্যবাদী সমাজে তো মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না? সবাই সমজ্ঞানসম্পন্ন ছিল। হোমো স্যাপিয়েন্স ছিল।

আমি বা আমার, এই ধারণা এল কীভাবে?'

নিজের বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিছুটা বিভোর হন কবীর। একজন কমবয়সী সন্ন্যাসী, প্রায় বালক, এসে টেবিলে চায়ের কাপ রাখতেই সম্বিতে ফেরেন। আঙুলের টোকায় অডিও থামান বৃদ্ধ লামা।

'বাটার টি। ইয়াকের দুধের মাখন দিয়ে বানান। খান, ভালো লাগবে।' হেসে বলেন লামা।

হাসিমুখে কবীর হাতে তুলে নেন চায়ের কাপ। ধন্যবাদ জানান বালক সন্ন্যাসীকে। বালক সন্ন্যাসীর গভীর দৃষ্টিপাত কবীরের দিকে।

'আর একটু এগোক বক্তব্য—তারপর আমার প্রশ্নগুলো করব। তুমি যাও তেনজিং!' লামা বলেন।

মাথা নীচু করে বৃদ্ধ লামাকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বালক সন্ন্যাসী। চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়েন কবীর। পকেট থেকে ফোন বার করে বলেন,

‘ফোনটা সকাল থেকেই কাজ করছে না, ফোন করতে পারছি না, কোনও কল ঢুকছেও না!’
‘এখানে জ্যামার আছে, ফোন কাজ করবে না!’ শান্তস্বরে বললেন লামা।

বিস্মিত কবীরের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসেন লামা।

‘ফোনটা টেবিলে রেখে দিন। চা খান।’ বলেই আবার চালু করেন অডিও। ফের বেজে ওঠে কবীরের কণ্ঠ।

‘আমি বা আমার-বোধের জন্মবৃত্তান্ত শুনতে হলে আগে শুনতে হবে মাছের জন্মকথা। অবাক লাগবে হয়ত, কিন্তু মৎস্যের কথা না-জানলে আমি বা আমার কথা জানা যাবে না। জলে যেমন মাছের জন্ম, আদিম যুগের সর্বপ্রকারের ব্যক্তিমালিকানাহীন জনসাধারণের ভিতরে তেমনি মৎস্যের জন্ম। এই মৎস্য হল একপ্রকার চেতনা বা ধারণা অর্থাৎ বোধ মাত্র। এই বোধটিকে বলে, আমার-স্য বা মৎ-স্য। এর অর্থ হল আমার-অর্জন। এই মৎস্যকেই মীন বা mine বলে। এই mine চেতনাই আদিম সাম্যবাদী সমাজের মহান মানুষদেরকে সর্বপ্রথম mean-minded করে দিয়ে পুরোপুরি নর বানিয়ে দিল।

এই মীন বা mine এর ভিতর আমি-আমি-গন্ধ থাকে বলে মৎস্য বা আমার-অর্জন চেতনাটি আমিষগন্ধী। একে জ্ঞানের ব্যক্তিমালিকানা বা আদি ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি রাইট বলা যেতে পারে। সবরকমের পুঁজিপাটা, পেটেন্ট, কপিরাইট, মালিকানা ইত্যাদির গোড়ায় রয়েছে এই বোধ—এটি আমার জ্ঞান বা এ-জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, অতএব এটি আমার ইত্যাদি। মানবসমাজে এই বোধের উদ্ভব না-হলে, মালিকানা, পুঁজি, পণ্য কোনও কিছুরই জন্ম হত না। শ্রমবিভাজন হত না, দেশে দেশে জাতিকে-জাতিকে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ত না।

মৎস্যাবতারের আবির্ভাব অবশ্য হঠাৎ একদিনে ঘটে যায়নি। আজ থেকে প্রায় ১২০০০ বছর আগে কৃষিকাজ আবিষ্কৃত হওয়ার পরই সমাজের গর্ভে এর বীজ বোনা হয়ে যায়। আর তখনই কৃষিকাজের পুনরাবৃত্তিমূলক মৌলবাদী স্বভাব মৎস্যাবতারকে 'আয়-আয়' বলে ডাকতে থাকে। অবশেষে একদিন ঘটে যায় সামাজিক বিগ-ব্যাং। মহাপ্রলয়।

আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এগুলোকে অনেকে বোকার মতো জগৎসৃষ্টি বা ইউনিভার্স সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন, ইদানিং এই মূর্খামি লক্ষ করেছি, এগুলো আদৌ ঠিক নয়। অনেকে আবার আমাদের প্রাচীন গৌরব, কিছু না-বুঝেই, অকারণ গ্লোরিফাই করতে গিয়ে নিজেকে তো হাস্যকর করেনই, আমাদের প্রাচীন গৌরবকেও খাটো করেন। যেমন, গণেশের মাথায় হাতির মুণ্ডু ছিল মানে আমরা প্লাস্টিক সার্জারি জানতাম বা পুষ্পক রথ আসলে এরোপ্লেনের পিতা ইত্যাদি আজগুবি ও হাস্যকর দাবি ইদানীং তুলছেন অনেকে (প্রেক্ষাগৃহে আবার সমবেত হাসি)—ডিসক্লেইমার দিয়ে রাখি, আমি যা বলছি এ হল মানবসমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কথা। সোশ্যাল সায়েন্সের কথা। এর সঙ্গে ইউনিভার্স সৃষ্টির কোনও সম্পর্ক নেই। মহাকাশ বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই।

বিশ্বের প্রায় সমস্ত লোককথায় যাকে মহাপ্লাবন বলে, নোয়ার গল্পে যেমন আছে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সেটি মৎস্যাবতারের কাহিনীতে রয়েছে। ওই ঘটনার মাধ্যমেই আদি যৌথ মানবসমাজ বিচূর্ণিভূত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষযজ্ঞেও একই কাহিনী। সতী আর কিছুই নয়, সতী হল জনসাধারণ। তাঁর দেহাংশের টুকরো বিভিন্ন পীঠে ছড়িয়ে পড়ল মানে পৃথক পৃথক মানবগোষ্ঠী পৃথক পৃথক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল।

এবার যদি আমরা মৎস্যপুরাণে কথিত মৎস্যাবতারের কথা একটু শুনেনি, আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে মৎস্য জন্মবৃত্তান্ত। কীভাবে মৎস্যের বাড়বাড়ন্ত শুরু হল। মৎস্য পুরাণে কী আছে, আসুন দেখা যাক।

হাত বাড়িয়ে অডিও বন্ধ করেন লামা। তারপর কবীরের দিকে তাকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলেন,

‘এখানে আমার কিছু প্রশ্ন আছে খানসাহেব, বলব?’
‘নিশ্চয়ই! বলুন!’
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে গুছিয়ে শুরু করলেন লামা। শুরু হয় কথোপকথন।
টাইগার লামা: আপনি বলছেন, আমার-অর্জন—এই বোধ বোঝাতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মৎস্য শব্দটি তৈরি করেছিলেন। কেন করেছিলেন?
কবীর খান: তৈরি করেছিলেন, এটি আমার বা এর ভিতরে আমার সত্তার অংশ রয়েছে—এই বোধকে বোঝাতে! এর সাদৃশ্যে বাহ্যলোকের যে ফিশ বা মাছ, পুকুরে-খালে-বিলে-সমুদ্রে পাওয়া যায়, তাকেও বোঝানো হয়ে যায়!
টাইগার লামা: এই ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিমালিকের জন্ম ইতিহাস কি লেখা হল মৎস্যাবতারের কাহিনিতে?
কবীর খান: কালে কালে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিমালিকের বাড়বৃদ্ধি হল, একদিন তারা গোটা মানবসভ্যতাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, তার পুরো ইতিহাসটাই লেখা হল মৎস্য-যুক্ত শব্দগুলোর সাহায্যে। মৎস্যগন্ধার গল্পে। মৎস্যাবতারের কাহিনীতে। মৎস্যপুরাণ-এ। ঠিকই বলেছেন আপনি।
টাইগার লামা: আর আমরা সেইসব শব্দার্থ ভুলে গিয়ে কেবল মনে রাখলাম মাছ অর্থটাকে, তাই তো?
কবীর খান: ঠিক তাই! ব্যক্তিমালিকানার ইতিহাস ওয়েস্টে নেই, আমরাই তাঁদের দিতে পারতাম, কিন্তু নিজেরাই ভুলে যাওয়ায় সেই সুযোগ মিলল না। আমরা যদি সেই অর্থ ওঁদের সাপ্লাই করতে পারতাম, মার্কসসাহেব অন্যরকমভাবে ভাবতে পারতেন। ব্যক্তিমালিকানার কীভাবে জন্ম হল, এই ইতিহাস যদি তিনি জানতে পারতেন, সমাজের পরবর্তী বিকাশের ব্যাপারে তাঁর ভাবনাচিন্তাই বদলে যেত! স্রেফ সেই ইতিহাসের অভাবে গোটা মার্কসবাদই থেকে গেল অসম্পূর্ণ!
মধ্যবর্তী নীরবতা। কেবল চা-পানের শব্দ। স্তব্ধতা ভেঙে কবীর আবার বলতে শুরু করেন।

কবীর খান: আজ আমরা এমন একটা সময়ে বাস করি, যেখানে ব্যক্তিমালিকানা নিয়ে স্পষ্ট দুটো ভাগ আছে। কেউ বলেন ব্যক্তিমালিকানাই সকল সামাজিক অহিতের মূল, মানুষের সকল দুর্দশার কারণ, যত নষ্টের গোড়া! আবার, অন্য দল মনে করেন ব্যক্তিমালিকানা আছে বলেই সমাজ টিকে রয়েছে, এগিয়ে চলেছে, ব্যক্তিমালিকানাই মানুষকে উদ্যোগী করে, নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি বা বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়! এইসব না-থাকলে, একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে সমাজ ধ্বংস হয়ে যেত! মৎস্য শব্দের অর্থ কিন্তু আমাদের জানাচ্ছে, দু'দলের বক্তব্যই ভুল।

টাইগার লামা: কীরকম?

কবীর খান: প্রকৃতির নিয়মকে আপনি লঙ্ঘন করতে পারেন না! ধরুন আপনি একটা মাটির কলসি বানালেন বা একটা নতুন সঙ্গীত রচনা করলেন বা একটি গল্প লিখলেন, এখন সেই কলসিতে বা সেই গানে বা গল্পে আপনার মেধা-শ্রম ঢুকে পড়ল। ঢুকল কি না?

টাইগার লামা: অবশ্যই ঢুকল!

কবীর খান: সেই মেধা-শ্রম যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, সে আপনারই অংশ। তাই তো? আপনার স্বত্ব। স্ব-ত্ব। সুতরাং কলসি, গান বা গল্পে আপনার অধিকার বা মালিকানার বোধ থাকবে। থাকবেই। তাই তো?

টাইগার লামা: হ্যাঁ, থাকবে!

কবীর খান: কলসির গায়ে আঁচড় পড়লে মনে হবে আপনার নিজের গায়ে কেউ আঁচড়ে দিল। আপনার গানের সুরে সামান্য ব্যত্যয় হলে আপনার পাগল-পাগল লাগবে বা আপনার গল্পের দুটো লাইন সম্পাদক কেটে দিলে মনে হবে আপনার শরীরের মাংসই যেন কেউ কেটে নিয়েছে। মনে হয় কি না?

টাইগার লামা: হয়! কিন্তু এই অনুভূতি কেন হয়?

কবীর খান: এই অনুভূতিই আপনার মৎস্য-বোধ। এই বোধ প্রকৃতির নিয়ম। এই অমোঘ নিয়মের কারণে সে-বোধ আপনি ছাড়তে চাইলেই ছাড়তে পারবেন না! আপনার যে মেধা-শ্রম কলসি বা গানে বা গল্পে নিষিক্ত হয়েছে আপনার সেই স্বত্ব আপনি অস্বীকার করবেন, পরমাপ্রকৃতি সে উপায় রাখেননি। আপনি একান্তই তার দান নিতে অস্বীকার করলে প্রকৃতি আপনার ওপর শোধ নেবে।

টাইগার লামা: সে কেমন প্রতিশোধ?

কবীর খান: আপনার স্বত্বের যে মূল্য, সেই মূল্যের মাপে আপনাকে মানসিকভাবে উপরে তুলে দেবে প্রকৃতি!

টাইগার লামা: তার মানে!

কবীর খান: আপনি চান বা না-চান, নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনি মানসিকভাবে ততখানি উপরে উঠে যাবেনই, যতখানি স্বত্ব আপনি দান করবেন বিনিময়ে কিছু না-নিয়ে। এমনকী কিছু না-নিয়ে দান করার গর্বে গর্বিত বা অহংকারীও হয়ে যেতে পারেন। কথায় বলে, বাঁ হাতের দানের খবর ডান হাত পাবে না! মানে দানের খবর মাঠে-ময়দানে বলে বেড়াতে নেই! কিন্তু এ ব্যাপারে পরমাপ্রকৃতি বড়ই নির্মম।

টাইগার লামা: তার মানে প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া প্রকৃতি ঘটাবেনই!

কবীর খান: কেউ আটকাতে পারবে না! আপনি যা দেবেন, তার পাই-পয়সা দাম প্রকৃতি চুকিয়ে দেবেই! যেভাবেই হোক, মালিকনা-স্বত্ব ভোগ করতেই হবে। মৎস্য-ভক্ষণ করতেই হবে। প্রকৃতিতে এর অন্যথা কখনও হবে না। কক্ষনো না!

টাইগার লামা: তার মানে ব্যক্তিমালিকানা আর মৎস্য এক বাস্তব সত্য!

কবীর খান: কেবল বাস্তব সত্যই নয়, একে অস্বীকার মানে প্রকৃতিকে অস্বীকার! ব্যক্তিমালিকানা-বিরোধী রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শনগুলি তাই কার্যত ভুয়া দর্শন!

টাইগার লামা: সেকি! মার্কসবাদ?

কবীর খান: প্রকৃতিকে অস্বীকার করার মধ্যেই এই থিয়োরির গলদ লুকিয়ে আছে—প্রয়োজনীয় সংশোধন ও মডিফাই করে নিলে শ্রেষ্ঠ দর্শন হবে!

টাইগার লামা: তাহলে কি ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে যাঁরা, তাঁরাই ঠিক!

কবীর খান: একদমই নয়! ব্যক্তিমালিকানাই সব, মৎস্যাবতারই একমাত্র অবতার, যাঁরা বলেন তাঁরাও অত্যন্ত ভুল কথা বলেন! ন্যাচারাল বিশ্বের ওপর মানুষ যে কৃত্রিম-বিশ্ব বানিয়েছে তাতে ন্যাচারাল বিশ্বেরও যোগদান আছে। অধিকার আছে। স্ব-ত্ব আছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের ওপর শুধুমাত্র মানুষের স্ব-ত্ব নেই, মালিকানা নেই, সবার মালিকানা স্বত্ব আছে! ভূমি-আকাশ-সমুদ্র-পাহাড়-নদী সকলের যোগদান আছে! মালিকানার অধিকার আছে!

টাইগার লামা: অ্যাবসোলিউট মালিক বলে কিছু হয় না, তাই তো?

কবীর খান: অবশ্যই! জ্ঞানীর জ্ঞানের ওপর অজ্ঞানীরও মালিকানার অধিকার আছে। থিয়োরি অফ রিলেটিভিটির ওপর ফিজিক্স না-জানা একজনেরও মালিকানার অধিকার আছে! আইনস্টাইনের একার অধিকার নয় বা ফিজিক্স বিশারদদের একার অধিকার নয়! ধনীর ধনের অপর নির্ধনেরও মালিকানার অধিকার আছে।

টাইগার লামা: আম্বানির ধনে একজন শ্রমিকেরও অধিকার আছে বলছেন!

কবীর খান: কেবল অধিকার বললে কম বলা হবে, বলতে হবে মালিকানার অধিকার আছে! মালিকানা শব্দটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ!'

টাইগার লামা: কতখানি অধিকার আছে?

কবীর খান: আছে ততখানি, যতখানি তাঁদের যোগদান! কেষ্টাবেটার যোগদান না-থাকলে রবিঠাকুরের পুরাতন ভৃত্য জন্মাতেই পারত না। সমাজ, সভ্যতা ও উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে যতই বাঘারু চলে যাক, বাঘারুর যোগদান না-থাকলে দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্তও তৈরি হত না! কেবল মানুষও নয়, কুকুর, বেড়াল, পাখি এমনকী একটা কেন্নো বা আরশোলারও ভূমিকা আছে। আকাশ, বাতাস, নদী-নালা, সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য, মরুভূমি—সকলের ভূমিকা আছে। ভূমি না-থাকলে আপনি শহর গড়তেন কোথায়? ভূমি, জল আর বাতাসের যোগদান না-নিয়ে একটা শহর গড়ে দেখান তো একবার! স্মার্ট সিটিতে কি এইসব নেই! অতএব, জ্ঞানীর বা ধনীর ব্যক্তিমালিকানাই সব—একথা যাঁরা বলেন, তাঁরাও অসত্য বলেন। এই বিশ্বব্যবস্থায় পুরুষের যতখানি অধিকার ঠিক ততটুকু অধিকার প্রকৃতিরও। সেই প্রকৃতি জড়, জীব যেই হোক না কেন!

৬৭

বালক সন্ন্যাসী তেনজিং এসে আবার দিয়ে যায় চা। যথাসম্ভব ধীর তার কার্যকলাপ, যেন কথোপকথন শুনতে সে আগ্রহী। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে লামা বলেন,

‘ঠিক আছে খানসাহেব, সমৃদ্ধ হলাম। এবার আবার আপনার বক্তৃতায় ফেরা যাক। মৎস্যাবতারের গল্পটা শুনি।’

ট্যাবের দিকে আবার হাত বাড়ান। ডান হাত উঁচিয়ে বাধা দেন কবীর। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলেন,

‘মৎস্য নিয়ে এবার সবচেয়ে মজার কথাটা আপনাকে বলি—ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ভোজনপ্রথায় মৎস্যের উত্তরাধিকার দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়!’
‘আমিষ-নিরামিষ বলতে চাইছেন?’ লামা উৎসুক।
‘সে তো আরও মজার! আমিষ-নিরামিষ বলে কোনো ধারণা পাশ্চাত্যের নেই, শব্দও নেই। ইংরেজিতে বলে ভেজিটেরিয়ান আর নন-ভেজিটেরিয়ান। ছোটো করে ভেজ আর নন-ভেজ। আমিষ-নিরামিষ কী বস্তু, তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, পারবেও না কোনোদিন। এ জিনিস একমাত্র এই উপমহাদেশেই আছে!’
‘ব্যক্তিমালিক যে মৎস্য, সেই একই মৎস্য কি মাছ বা ফিশ?’ জিজ্ঞাসা লামার।
‘এই দুই মৎস্যকে নিয়ে সাধারণ ভারতবাসী মহা সমস্যায় পড়েছিলেন। সনাতন সাম্যবাদী সভ্যতার বুক চিরে দক্ষ-যজ্ঞ হল, শিবতার নীতির জায়গায় দক্ষতার নীতি এল, বৈদিক যুগের প্রাক-সূচনা হল। ফলে যৌথসমাজের ভেতরেই ব্যক্তিমালিকানার জন্ম বা মৎস্যের জন্ম অনিবার্য হয়ে উঠল! মহর্ষিরা দেখলেন, ব্যক্তিমালিকানাকে যদি ঠেকানো না-যায়, তাঁদের সাধের সনাতন ব্যবস্থাটিই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই সমাজের পরিচালকেরা সিদ্ধান্ত নিলেন—ব্যক্তিগত মালিকানা ভোগ করা যাবে না অর্থাৎ মৎস্য ভক্ষণ করা যাবে না। অতএব মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ব্যক্তিমালিকানারূপ-মৎস্যকে ভোগ করা চলবে না, তার সাদৃশ্যে জলচরজীব-মৎস্যকেও ভোগ করা চলবে না। ভারতবর্ষ মানসিক ও দৈহিক দু’দিক থেকেই নিরামিষাশী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।
‘নিষিদ্ধ করলে সমাজ শুনবে কেন?’
‘ঠিক। শুনবে কেন সমাজ? একবার যখন শিবকে সরিয়ে দক্ষকে বসিয়েছ, বৈদিক সমাজের সূত্রপাত কার্যত হয়েই গিয়েছে। একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতিকে মাথায় তুলেছ, এবার তো এক-এক করে পরপর ঘটনাগুলি ঘটবেই! ফলে মহান মানুষ হয়ে যাবে

চাষিমানুষ, জেলেমানুষ, তাঁতিমানুষ, বদ্যিমানুষ, ইঞ্জিনিয়ারমানুষ ইত্যাদি। সব এক্সপার্টের দল। অখণ্ড হয়ে যাবে খণ্ড খণ্ড। অখণ্ড চেতনা বলেই আর কিছু থাকবে না! তাদের উৎপাদিত উৎপন্ন পণ্যে পরিণত হবে। কমোডিটি। বিনিময়ের সূচনা হবে। ব্যক্তিমালিক জন্মাবে। লোকে মৎস্য ভক্ষণ করবে। করবেই! পরপর অনিবার্য ঘটনাগুলো ঘটবেই!

'বরং নিষিদ্ধ করলে বিকৃতি বাড়ে!' লামা বলেন।

'ঠিক তাই হল! মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দুই মৎস্যভক্ষণই প্রাচীন ভারতে চলতে লাগল গোপনে। বৌদ্ধযুগের রামরাজত্বে কিছুটা সামাজিক স্বীকৃতি পেল কিন্তু তার পরে হিন্দুযুগে আবার নিন্দিত হয়ে গেল। এখন সে এক বিচিত্র রূপ নিয়েছে! ধরুন, 'আমার' 'আমার' করা, শুধুই নিজের কোলে ঝোল টানা, বহু বস্তুর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ভোগ করা, পুঁজিপতি হওয়া, সুদ নেওয়া, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি এগুলো সব মানসিক-মৎস্য ভক্ষণ। আর রুই-কাৎলা-ইলিশ ইত্যাদি জলচর জীবকে খাওয়া হল দৈহিক-মৎস্য ভক্ষণ। প্রায় দু-হাজার বছর পেরিয়ে বর্তমান ভারতবাসীরা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এক বকচ্ছপ অভ্যাস তৈরি করেছে!'

'বকচ্ছপ কেন?' হাসেন লামা।

'একদল হয়তো দৈহিক-মৎস্য ভক্ষণ করেই না, সাচ্চা নিরামিষাশী, কিন্তু মানসিক-মৎস্য ভক্ষণ-এ চব্বিশ ঘণ্টা ডুবে আছে! যেমন মাড়োয়ারি ব্যবসাদার বা কপালে তিলককাটা সুদখোর বা দু'বেলা ঠাকুর-ঠাকুর করা ঘুষখোর। আবার কাউকে দেখা যাচ্ছে, সে দৈহিক-মৎস্য ভক্ষণ করে, মাছমাংস যা পায় তাই খায়, কিন্তু কক্ষনো মানসিক-মৎস্য ভক্ষণ করে না! যেমন সুফীসন্ত বা আদিবাসী। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আদিবাসী মানুষ এই দলে পড়েন। গোটা গুজরাট নিরামিষ খায়, মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, কিন্তু মানসিক-মৎস্য খায়। ভরপুর ধনের সাধনা করে। বানিয়াবৃত্তি করে। আমরা বাঙালিরা প্রচুর মাছ খাই, পাতে অন্তত এক টুকরো মাছ ছাড়া আমাদের চলে না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি মানসিকভাবে নিরামিষ খাওয়ার। দিনরাত টাকা কামানোর কথা না-ভেবে সংস্কৃতির সাধনা করি! বাঙালি হয়ে নিজের গুণ নিজে গাইছি বটে, তবে এটা ঘটনা!'

কবীরের বলার ঢঙে হা-হা করে হাসেন লামা।

‘অবশ্য বাঙালি’র এই স্বভাবকে কিছু বাঙালি এখন গুণ হিসেবে দেখে না!’ হেসে বলেন কবীর।

‘উপমহাদেশের বেশিরভাগ মানুষই মানসিকভাবে নিরামিষাশী—গোটা ভারতবর্ষ আমি ঘুরেছি—এ আমার অভিজ্ঞতা খানসাহেব!’

‘একই অভিজ্ঞতা আমারও! আমি মনে করি এখানে ধর্মের ভূমিকা আছে!’

‘রিলিজিয়ন!’

‘হ্যাঁ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বহর দেখে অনেকেই ধর্মের বিরোধিতা করে, আমি ওই দলে নেই! ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মগুলোর মধ্যে অন্য জিনিস আছে। ধর্মবোধই মানুষের মনের মাটি এমনভাবে পরিশীলিত করে দিয়েছে, ভারতবর্ষের মানসিক-নিরামিষাশী চরিত্র এখনও তাই প্রায় অটুট।’ আত্মবিশ্বাস কবীরের কণ্ঠে।

‘আই ফুললি এগ্রি উইথ ইয়ু খানসাহেব!’ পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আবার বলেন, ‘এবার চালু করি? বাকিটা শুনে নিই?’

ইতিবাচক মাথা নেড়ে সায় দেন কবীর। লামা চালু করেন অডিও। ফের ঘরময় গমগম করে ওঠে কবীরের কণ্ঠস্বর।

‘আদিম মাতৃতান্ত্রিক যৌথ সমাজে মিন্স্ অফ প্রোডাকশন বা ভগ-এর মালিক ছিল মেয়েরা —তাই তারা ভগিনী—এই ভগিনীরাই আদি ভগবান যদিও তখন তাদের ভগবান বলা হত না। যাইহোক আসুন মৎস্য অবতারে। বিষ্ণুর প্রথম অবতারের গল্প।

মৎস্য-অবতার

একদিন রবিনন্দন মনু পিতৃ-তর্পণ করছিলেন। তাঁর হাতে জলের সঙ্গে এক শফরি এসে পড়ল। শফরী মানে পুঁটি মাছ। মনু দয়াপরবশ হয়ে শফরীকে তাঁর করক-এর মধ্যে রাখলেন। করক কী? করক হল বড়মুখ ঘটি। এক অহোরাত্রের মধ্যে শফরী বৃহৎ হয়ে উঠল। মনু তখন মৎস্যকে অলিঞ্জরে রাখলেন। অলিঞ্জর মানে জালা।

মৎস্য আরও বৃহৎ হয়ে উঠল। কূপে রাখলেন তাকে, সে কূপের থেকেও বড় হয়ে উঠল। পরে রাখলেন সরোবরে, তাতেও হল না। গঙ্গায় রাখলেন, হল না। সে ক্রমাগত বড় হতে লাগল। শেষে মৎস্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। মৎস্য সমুদ্র ব্যেপে উঠল। মৎস্যের ক্রমবর্ধমান বৃহৎ কলেবর দেখে মনু ভীত হলেন। মৎস্য-রূপী ভগবান তখন বললেন, অচিরকালে সশৈল-কাননা মেদিনী জলমগ্ন হবে। তুমি এক নৌকা নির্মাণ করবে। প্রলয় উপস্থিত হলে তুমি যাবতীয় জীবকে নিয়ে নৌকায় রক্ষা করবে। আমার শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করবে। পরে প্রলয়-অন্তে সর্বচরাচরের প্রজাপতি হবে।

মৎস্য যেমন বলেছিল, প্রলয় উপস্থিত হল। চরাচর দগ্ধ ও ভস্মীভূত, প্রভূত বারিবর্ষণ দ্বারা একার্ণব হল। মনু নৌকায় উঠে সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। এক ভুজঙ্গম ভাসছিল। মনু ভুজঙ্গ-রজ্জুর দ্বারা সর্বভূতকে আকর্ষণপূর্বক সেই নৌকায় তুললেন এবং নৌকাকে মৎস্য-শৃঙ্গে বন্ধন করলেন।

মৎস্য নৌকা টেনে সমুদ্রে ভাসতে লাগল। হিমালয়ের এক উন্নত শৃঙ্গের কাছে নৌকা এলে মনু সেই শৃঙ্গে নৌকা বাঁধলেন। এর পরে বৈবস্বত মনু স্থাবর জঙ্গম দেবাসুর মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ সৃষ্টি করলেন। এই প্রজাবর্গই হল নর। তারা আর মহান থাকল না। ‘আমাদের’ থেকে সমাজ প্রবেশ করল ‘আমি’ বা ‘আমার’-এ। এটাই অহংকার। এটাই মহাপ্রলয়!

এই মহাপ্রলয়ের শেষে বৈদিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে যায়। পূর্বতন সনাতন মাতৃতান্ত্রিক নগরকেন্দ্রিক সাম্যবাদী সভ্যতা ভেঙে পড়ে। আর তারপরেই ধীরে ধীরে সমাজে তথাকথিত শ্রেণিবিভাজন, শ্রমবিভাজন, পণ্য, উৎপাদন, বিনিময়, পুঁজি, বিনিয়োগ প্রভৃতির জন্ম হল।

পুরাণ অনুসারে নারায়ণ শুরুতে মৎস্যরূপে হাজির হয়েছিলেন। নারায়ণের দশাবতার আসলে আদি ক্যাপিটালের দশ দশা। অর্থাৎ আজ আমরা যাকে ক্যাপিটাল বা পুঁজি বলি, সবার আগে তার উদ্ভব হয়েছিল মৎস্যরূপে।

যৌথ সমাজ ভেঙে গেল। ভেঙে যাওয়ার পরপরই ভগিনীদের থেকে মিন্স অফ প্রোডাকশন আত্মসাৎ করে তৈরি হল ছোটো ছোটো ব্যক্তি মালিকদের উপদল। এরাই তখন হয়ে ওঠে ভগবান। যেমন ভগবান বশিষ্ঠ। ভগবান বিশ্বামিত্র। ভগবান ভৃগু। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ভগ-এর মালিক হয়েও মেয়েরা ভগবান হয়নি। পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ভগ-এর মালিকেরা ভগবান হয়েছে। পিতৃতন্ত্রের ইতিহাস পরে বলছি, কিন্তু এইভাবে ভগবান নামক ব্যক্তিমালিক তৈরি হল। ব্যক্তিমালিক না-এলে প্রোডাক্ট কখনও কমোডিটি হয় না।
মার্ক্স বলেছেন, উৎপন্ন উৎপাদিত হয়েই তার মালিকের খোঁজ করে, তারপর মালিককে সে বলে তোমার জিভটা আমাকে ধার দাও, আমি আমার দামের কথা বলব! তার মানে, উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত হতে হলে তার ব্যক্তিমালিক চাই। মালিকানা যুক্ত উৎপন্নকেই পণ্য বলে, মালিকানাহীন উৎপন্নকে নয়। পণ্য বা কমোডিটির যখন মালিক আছে, জগতের নেই কেন? জগতেরও একজন স্রষ্টা থাকা দরকার, সে বেওয়ারিশ হতে পারে না। প্রশ্ন ঘনিয়ে ওঠে সমাজের মনে। ফলত এইভাবে পণ্যের মালিক ভগবানের মতো জগতের নাথ ঈশ্বরের জন্মের ইঙ্গিত তৈরি হল মানুষের মনোভূমিতে। তারপর—’
অডিও বন্ধ করেন বৃদ্ধ লামা। নিজের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছেন কবীর। লামা অনেক আগেই লক্ষ করেছেন, তবুও বন্ধ করেননি অডিও। কিঞ্চিৎ কালক্ষেপ অনুমোদন করেছেন তিনি নিজেই। যখন নিশ্চিত হলেন কবীর খান তলিয়ে গেছেন গভীর ঘুমে, বন্ধ করেন অডিও।

টেবিল থেকে ট্যাবটা নিয়ে উঠে গেলেন লামা। ঘরে ঢুকল দু’জন লোক। পেছনে লাল চীবর পরিহিত আরও একজন। পাসাং লামা।

পড়ন্ত বেলায় জোগচেন গুম্ফা থেকে বেরিয়ে গেল একটি লাল এসইউভি। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাত্রা। পাকদণ্ডী পথে নীরবে গাড়ি চালিয়ে যান চালক।

দিনান্তের মরা আলো এসে সাধ্যমতো ধুয়ে দিচ্ছে তাঁর পথ।

১৬ অক্টোবর। কালিম্পং গেস্টহাউজ।

তদন্তের স্থবিরতা কীভাবে কাটবে ভাবতে ভাবতে অস্থির রিয়াজ। তবে এই ধাঁধা কেটে সমাধান বার করতে পারে একজনই! রাতে গেস্টহাউজের বারান্দায় বসে করব-কি-করব-না দোনোমনা করতে করতে ফোন করে বসে রজত স্যারকে। মাথায় যে ভাবনা এসেছে, খানিক ইতস্তত করে বলে ফেলে। শুনেই মুহূর্তের মধ্যে রজত খারিজ করে দেয় সেই প্রস্তাব।

'ধুত, যখন-তখন ডিকে-কে তলব করাটা ঠিক নয়।'
'স্যার, একটু ভেবে দেখবেন, উনি কিছু করলেও করতে পারেন।'
'ধৈর্য ধরো রিয়াজ। সিকিম পুলিশ, কালিম্পং জেলা পুলিশ আর শিলিগুড়ি কমিশনারেট অলআউট ঝাঁপিয়েছে—ডিজিসাহেব নিজে দেখছেন। ড্রাইভারকে পাওয়া গেলে একটা সুরাহা হবে, দেখা যাক। ওকে, গুড নাইট।'
'গুড নাইট স্যার!'

রিয়াজের ফোন ছেড়ে সিগারেট খেতে ব্যালকনিতে আসে রজত। আলোকিত শহর। আলোর ভয়ে অন্ধকারগুচ্ছ ল্যাজ-গোটান ভীতু কুকুরের মতো কম্পমান। বাতাসে ধোঁয়া ছেড়ে দূরে তাকায় রজত।

১৭ অক্টোবর। কলকাতা।

'রজতের সঙ্গে কথা বলব?'
'আপনার কী মনে হচ্ছে?'
'আজকের দিনটা যাক, তারপর—'

ডিকের জবাবের ওপর কোনও কথা বলে না নিবেদিতা। একটা সিগারেট ধরায়। লম্বা একটা টান মেরে বলে,

‘প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হতে চলল কোনও যোগাযোগ নেই! খানদা বাড়িতে থাকলে চিন্তার কিছু ছিল না, তিনচারদিন ফোনাফুনি হয়নি এমন দিনও গেছে, কিন্তু উনি আউট অফ স্টেশন! চিন্তাটা এখানেই। আরও একটা ব্যাপার আছে—’

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে ডিকে। আরও কিছুটা ধূম্রপান করে নিবেদিতা বলে,

‘আমার শিলিগুড়ির অফিস থেকে আজই এনবিইউ-তে লোক পাঠিয়েছিলাম—বাংলা ডিপার্টমেন্টের সরসিজবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল—ফোনে ধরিয়ে দিল আমাকে—কথা বললাম—সরসিজবাবু জানালেন উনিও ফোনে খানদাকে পাননি—আয়াম গেটিং নার্ভাস ডিকেবাবু!’

চারটে নাগাদ যখন নিবেদিতা ফোন করল, তখনই উৎকণ্ঠা খেয়াল করেছিল ডিকে। অফিস ছুটি কখন জানতে চায়। কথা বলতে চায় ডিকের সঙ্গে, জরুরি দরকার। তখনই ঠিক হয় সাড়ে ছ’টা নাগাদ তারা এসপ্ল্যানেডের একটা কফিশপে বসে কথা বলবে। সেই মোতাবেক ডিকে অফিস-ফেরত হাজির হয় কফিশপে। আগেই হাজির নিবেদিতা। মুহুর্মুহু ধূম্রপান করা দেখেই ডিকে টের পায় ঘন কালো মেঘের অস্তিত্ব।

‘গুম্ফার কোনও নাম আছে?’
‘জোগচেন গুম্ফা। সরসিজবাবুর থেকে নাম জেনে নিয়েছি।’
‘সকালে কখন বেরিয়েছিলেন?’
‘চান-খাওয়া করে দশটা নাগাদ।’
‘একা বাইরে বেরোলেন বেশ কয়েক বছর পরে—চিন্তা এখানেই—শরীরও ভালো নয় ওঁর —এতটা পাহাড়ি পথে যাওয়ার ধকল নেওয়া সোজা ব্যাপার নয়!’ চিন্তামুক্ত হতে পারে না নিবেদিতা।

গতকাল রাতে ডিকেও ফোন করার চেষ্টা করেছে বহুবার। কবীরদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে, কালিম্পং-এর লামার কাছে কামসূত্র নিয়ে অজানা তথ্য পেয়ে পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারেন, সম্ভাব্য অনেক কারণ আছে যোগাযোগহীনতার। হয়ত অতিরিক্ত চিন্তা করছে নিবেদিতা। মুখে কিছু বলে না। কফিতে চুমুক দেয় নিশ্চুপ।

শিয়ালদা স্টেশনে তাকে গাড়িতে পৌঁছে দেয় নিবেদিতা। নীরবে বিদায় নেয় দু'জনে। বারাসাত লোকালের ভিড়ে নিজেকে ঠেসে দাঁড় করিয়ে, ডিকে টের পায় উচাটন। কবীরদার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাব্য সব কারণ ছাপিয়ে ব্যাকুল হয় মন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে গিয়ে টানা দু'দিন কেন ফোন বন্ধ করে বসে আছেন কবীর খান!

উৎকণ্ঠা চারিয়ে যাচ্ছে একটা খটকার কারণেই, একটা নামই তৈরি করছে যাবতীয় ব্যাকুলতা। চিত্রক চন্দ্র। অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাস যে বইয়ের মোড়ক ক্যুরিয়ারে পাঠিয়েছিলেন কবীরদার বাড়ির ঠিকানায়, সেই বই ক্যুরিয়ারে না-এসে, জনৈক চিত্রক চন্দ্র মারফৎ এসে পৌঁছায় তাঁর কাছে! চিত্রক চন্দ্রের কথা নিবেদিতা জানে কি না জানা নেই, ডিকেও তোলেনি আজ কফিশপে। অযথা আরও উদ্বেগ বাড়াতে চায়নি সে।

রাতের খাওয়া সেরে টিভি খোলে। অন্য সময় মায়ের সিরিয়াল দেখায় বিঘ্ন ঘটায় না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-শিক্ষক রেণুকা কয়াল অবসর যাপন করেন দিনে বই পড়ে আর সন্ধ্যায় টিভি সিরিয়াল দেখে। দশটা নাগাদ মা-ছেলে একসঙ্গে খেতে বসে। সর্বক্ষণের কাজের লোক আরতিমাসিও। তারপর বিছানা করে মা-কে শুইয়ে এগারোটা নাগাদ খোলে টিভি। নিত্যদিনের রুটিন।

টিভি খুলেই চলে যায় খবরের চ্যানেলগুলোতে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সব চ্যানেল। আজ সব বাংলা চ্যানেলেই অপহরণের গল্প। কালিম্পং-এ বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ এক বাঙালি

দম্পতি। তাঁরা ধর্মে বৌদ্ধ, মহাবোধি সোসাইটির সদস্য, মহাবোধির সাধারণ সম্পাদক নিজে মুখোমুখি হয়েছেন সংবাদ মাধ্যমের। কলকাতা পুলিশ তথা রাজ্য পুলিশের কড়া নিন্দা করেছেন সম্পাদক।

চারদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোনও সুরাহা না-পেয়ে, তাঁরা সংবাদ মাধ্যমকে জানাতে বাধ্য হলেন। পার্কস্ট্রিটের থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়ামে দুষ্প্রাপ্য মূর্তি চুরি হয়েছে, সেখানেও কলকাতা পুলিশের ব্যাপক নিন্দা। খবর হয় দেশের অন্যান্য হিন্দি ও ইংরেজি খবরের চ্যানেলেও।

৬৯

রজতের কথা মনে পড়ে ডিকের। শহরের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম হিসেবে রজত নিশ্চয়ই যথেষ্ট চাপে! এবার যদি কবীরদার হঠাৎ-অন্তর্ধান নিয়ে ওকে জানাতে হয়, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হবে। তবে অবাক করার মতো ঘটনা, টালিগঞ্জের বড়ুয়া পরিবারও অদৃশ্য হয়েছে কালিম্পং-এই। শেষ ফোন তারা কালিম্পং থেকেই চারদিন আগে করেছিল! আরও খানিকটা উৎকণ্ঠা বাড়ে। এক গ্লাস জল খায় ডিকে। টিভিটা বন্ধ করে। টেবিল থেকে ফোনটা তুলে কল করে রজতকে।

‘টিভি দেখলাম—তুই নিশ্চয়ই খুব প্রেসারে?’
‘আর বলিস না শালা! জোড়াফলা পুরো!’
‘কোনও পাত্তা নেই বড়ুয়াদের?’
‘কালিম্পং-এ পৌঁছেই হাওয়া—গোটা কালিম্পং ঢুঁড়ে ফেলা হয়েছে—নেই! ভালোই হল ফোন করলি, তোকে আমি কল করতাম!’
‘কেন?’
‘হেল্প লাগবে!’

‘এদিকে তো অন্য কেস—তোকে জানাতেই হত!’

‘আবার কী হল!’

‘কবীরদার পাত্তা নেই!’

‘কবীর খান?’

‘হ্যাঁ!’

‘পাত্তা নেই মানে!’

‘সোমবার এনবিইউতে একটা সেমিনার ছিল, সেটা সেরে মঙ্গলবার সকালে যান কালিম্পং—তারপর থেকে এখন পর্যন্ত, বুধবার শেষ হতে চলল, যোগাযোগ নেই!’

‘এটাও কালিম্পং!’ তাজ্জব বনে রজত।

‘যত কেলো কালিম্পং-এ! জটায়ু সিরিজ!’ ডিকে বলে।

হাসে দুই বন্ধুই। রজত ঘটনার বিস্তারিত জানায় ডিকেকে। মিউজিয়াম-পর্ব থেকে কর্পোরেশনের নামের তালিকা হয়ে লামা-পর্ব, যাবতীয় ঘটনা পরম্পরা শুনে চমকে যায় ডিকে।

‘কবীরদাও তো দার্জিলিং মেলের ওই কোচেই ছিলেন! তুলে দিতে গিয়েছিলাম শিয়ালদায়—লোকের মুখে কার-বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে শুনে তোকে মেসেজ করলাম—মনে আছে?’

‘হ্যাঁ!’

‘ওই লামাকে আমি দেখেওছি—একদম ইলেভেন্থ আওয়ারে ট্রেনে উঠেছেন—আমি কামরা থেকে নেমে আসছি—উনি উঠছেন—লাগেজ ওঠাতে সাহায্য করতে গেলাম—বয়স হয়েছে কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত—আমায় বললেন, থ্যাঙ্ক ইয়ু মাই সন! তথাগত আপনার মঙ্গল করুন!’

‘বোঝো! দাঁড়া, একমিনিট!’

সামান্য বিরতি নিয়ে রজত আবার ফেরে।

‘হ্যাঁ, এই তো—সেদিনের যাত্রী তালিকা আছে আমার কাছে—এ-ওয়ান, টুএসি—লোয়ার বার্থ নাম্বার পঁচিশ—কবীর খান—কিন্তু কিছুই তো বুঝছি না ডিকে—এর মানে কী! এই মিসিং লিস্টে যদি এবার কবীর খান যুক্ত হন, কী করব আমরা!’

তারপর রজতের স্বভাব অনুযায়ী দু-চারটে চারঅক্ষর-ছয়অক্ষরের বাংলা শব্দ, ফোনবাহিত হয়ে কানে ঢোকে ডিকের। সে জানে চাপে পড়লে তার এই বাল্যবন্ধু চাপমুক্ত হতে প্রয়োগ করে খাঁটি বাংলা খিস্তি। হাসে ডিকে। কামসূত্র উপন্যাস ও চিত্রক চন্দ্র পর্বও শুনিয়ে দেয় রজতকে।

‘মূর্তি চুরির কেসটা দেখছে রিয়াজ—মনে আছে রিয়াজকে—রিয়াজ আলম—’ জানায় রজত।
‘সেই সল্টলেকের দাবাড়ু মিস্টার ডেথ কেস?’
‘হ্যাঁ।’
‘দারুণ ছেলে! কেসটা প্রায় ও একাই সলভ করে ফেলেছিল!’ উচ্ছ্বাস ডিকের।
‘রিয়াজ তো তোর ফ্যান! ওকে আমি ওই কেসের পর বিধাননগর কমিশনারেট থেকে লালবাজারে নিয়ে এসেছিলাম—এখন অ্যান্টিক থেফট সেকশনের ওসি—এই মুহূর্তে রিয়াজ কালিম্পং-এ—কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে গেছে—গতকাল রাতেই আমাকে ফোনে বলছে, আমরা আটকে গেছি স্যার, ডিকেস্যারকে একবার বলুন!’
‘কথা বলব ওর সঙ্গে?’ জানতে চায় ডিকে।
‘বল না! ভালো হয় তা’লে! ও তোকে ইনপুট দেবে।’ কিছুটা আশ্বস্ত রজত।
‘নম্বর দে।’
‘পাঠাচ্ছি—আর কাল তুই একবার আয় আমার অফিসে—অফিস ফেরত—’ রজত বলে।
‘ওকে, সোয়া ছ’টা নাগাদ যাচ্ছি!’

রজতের ফোন ছেড়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে চুপচাপ। নিমেষে ঘটনাস্রোতের তোড় এসে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল! পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনার অনুক্রম সাজায় মনে মনে।

কামসূত্র উপন্যাসে মূর্তির কথা আছে। ভোটদেশীয় গুরুর থেকে পাওয়া মূর্তি বৃন্দা দেয় দীপনকে! তারপর সাবধানও করে তাকে, মূর্তি যেন নিজের কাছে না-রাখে, কোনও সঙ্ঘারামে দিয়ে দেয়! কিন্তু সেই মূর্তিই মারণমূর্তি ধারণ করে! কেবল মূর্তিই নয়, দীপংকরের কামসূত্র টীকা-ধারক পুঁথিও টেনে আনে ঘাতক!

উপন্যাসের বাইরে, বাস্তবেও কি, ঘটতে চলেছে একই ঘটনা?

৭০

১৭ অক্টোবর। কালিম্পং।

কালিম্পং টাউন থেকে প্রায় ছত্রিশ কিলোমিটার দূরে রংপো পুলিশ চেকপোস্টে আজ গিয়েছিল রিয়াজ। রংপোও মেল্লির মতো বাংলা-সিকিম সীমান্ত জনপদ। ছবি দেখিয়ে আবার জনে-জনে জিজ্ঞাসা আর চেকপোস্টের পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথন, সব সেরে কালিম্পং ফিরেছে বিকেলে। লাসা রেস্তোরাঁয় বাটার টি আর নুডলস খেয়ে গেস্টহাউসে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙে ফোন বাজার শব্দে। তাশি নামডোল।

‘স্যার, মিডিয়ায় এসে গেছে খবরটা—পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে ধোবিপাট ধুলাই দিচ্ছে স্যার! টিভিতে দেখাচ্ছে—’

তাশির ফোন ছেড়ে টিভি খোলে। ঘড়িতে প্রায় ন’টা। বাংলা-ইংরেজি চ্যানেল পাল্টে পাল্টে খবর দেখে। ইদানীং মিডিয়ার যা কাজ তাই করছে ওরা, নিউজের সঙ্গে ভিউজ মিশিয়ে, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা গুলে, ট্রুথের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পোস্টট্রুথ ছিটিয়ে পরিবেশন করছে গরম গরম। বন্ধ করে টিভি।

দরজায় আলতো করাঘাত। সময় হয়েছে রাতের খাবার দেবার। উঠে গিয়ে দরজা খোলে। একটি ছেলে এসে রাতের খাবার রেখে যায় টেবিলে। দরজা বন্ধ করে টয়লেটের দিকে এগোয় রিয়াজ। একটা লাথি ছোড়ে শূন্যে। মাথা গরম হয়ে গেছে টিভিতে খবর দেখে।

টয়লেট থেকে বেরিয়েই শোনে ফোন বাজছে। তাশি। আবার ফোন করছে কেন লোকটা!

'কী হল, আবার ফোন করছেন কেন?' গলায় কিছুটা ঝাঁঝ রিয়াজের।
'সরি স্যার, একটু কথা ছিল—ইম্পর্ট্যান্ট বাত—যাব আপনার রুমে?'
নিজেকে সংযত করে রিয়াজ। বলে, 'আসুন।'

দরজার ছিটকিনি খুলে রাখে। সোফায় বসে টেবিলে রাখা খাবারের পাত্রের ঢাকা খোলে। স্যালাড, আলুভাজা, গরম গরম রুটি আর মুরগির মাংস। খেতে খেতে তাশি নামডোলের কথা ভাবে। আজব লোক! আজ যখন কথায় কথায় মিউজিয়ামের আটতলার গ্যালারিতে বাঘের গায়ের গন্ধের কথা বলল, চমকে উঠলেন তাশি। হাঁ করে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ রিয়াজের দিকে। তারপর থেকেই সারাদিন লোকটা কেমন অন্যমনস্ক।

'কী ব্যাপার, বাঘের গন্ধ শুনে চমকালেন কেন মিস্টার নামডোল?' রিয়াজের প্রশ্নের উত্তরও এড়িয়ে যান প্রৌঢ় পুলিশকর্মী। এখন এসে আবার কী 'ইম্পর্ট্যান্ট বাত' বলবেন কে জানে! রজত স্যার সেদিন রাতে বাঘের গন্ধ শুনে এমন প্রতিক্রিয়া দেখালেন, এই কেসের আলোচনায় খুব সযত্নে 'বাঘের গন্ধ' তথ্যটি এড়িয়ে যায় রিয়াজ। আজ গল্প করতে করতে তাশিকে বলে ফেলেছে। যাইহোক, তিনদিনেই কিছুটা ক্লান্তি আর একঘেয়েমি ঘিরে ফেলেছে তাকে। ক্রমশ পাকিয়ে ওঠা জট থেকে কোনও সূত্র খুঁজে না-পাওয়াই হয়ত এই হতাশার কারণ।

খাওয়া শেষ করে আবার বিছানায় গিয়ে বসে। তাশি আসবেন বলে একটু দ্রুতই শেষ করেছে খাওয়া, কিন্তু তার পাত্তা নেই। আঙুলের ছোঁয়ায় ফোনে চালু করে অরিজিৎ সিং-এর হিন্দি ছবির গান। ঘড়িতে ন'টা বেজে চল্লিশ।

তাশি নামডোল আসেন দশটা দশ নাগাদ। ঘরে ঢুকেই বন্ধ করে দেন দরজা। রিয়াজ গানের অডিও বন্ধ করতে গেলে হাতের ইঙ্গিতে বন্ধ করতে নিষেধ করেন। অবাক হয় রিয়াজ। কী বলতে চান তাশি? ঘরে অন্য কেউ না-থাকা সত্ত্বেও এত গোপনীয়তা কেন? তাঁর স্বর ঘরের বাইরে যাতে না-যায়, গান চালু রাখতে অনুরোধ করেন রিয়াজকে! হাঁ করে তাশি'র দিকে তাকিয়ে থাকে রিয়াজ। অপেক্ষা।

সোফায় বসে নীচু গলায় তাশি যা বললেন, শুনতে শুনতে আরও অবাক হয় রিয়াজ। উত্তেজিতও। তাশি'র ভাষ্য অনুযায়ী, এই পাহাড়ে একজনই আছেন যিনি স্থান ত্যাগ করার পর, সেখানে বাঘের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়!

'মানে! কে তিনি?'
'তার আসল নাম খুব কম লোকই জানে স্যার! তিনি একজন লামা কিন্তু রিভলিউশনারি! যোদ্ধা!'
'রিভলিউশনারি! বিপ্লবী! লামা আবার কেন বিপ্লবী হবেন!'
'তিব্বতের ফ্রিডমের জন্য উনি লড়াই করে চলেছেন! সাধারণ লামা উনি নন স্যার!'
'আপনি দেখেছেন তাঁকে?'
'না স্যার! খুব কম লোকই উনাকে দেখেছে!'
'কিন্তু উনি কলকাতায় গিয়ে মিউজিয়াম থেকে মূর্তি চুরি করবেন কেন? অর্হৎ বড়ুয়াসহ ওর বাবা-মাকেই বা কিডন্যাপ করবেন কেন?'

তাশি নামডোল সেই যোদ্ধা লামার কথা বলে যান। তাশি'র কথা শুনতে শুনতে উত্তেজনায় উঠে বসে রিয়াজ।

'আমি খুব বেশি কিছু জানি না স্যার—উনার কথা ডিটেলে জানতে হলে আমাদের লাভা যেতে হবে।'
'লাভা!'

‘লাভা মনাস্ট্রির রিঞ্চেন লামা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন স্যার!’
‘রিঞ্চেন লামা!’
‘কালিম্পং-এ এসেই একজন লামা’র কথা আপনি বলেছেন, ছবিও দেখিয়েছেন, কিন্তু আমার মাথাতেই আসেনি উনার কথা! আজ আপনি বাঘের গন্ধের কথাটা বলতেই আমি চমকে গেলাম! কিন্তু উনি কোনও ক্রাইমে যুক্ত হতে পারেন না স্যার! গোটা হিমালয়ে যত বুদ্ধিস্ট আছে স্যার, সবাই উনাকে পূজা করে!’
‘নাম কী?’
‘বলতে পারব না স্যার, এইটুকুর বাইরে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না স্যার!’
‘লাভা যাব কাল!’
‘ওকে স্যার!’

ঘর থেকে বেরোবার আগে তাশি ফিসিফিসিয়ে বলেন, ‘এই ইনফর্মেশন আপনি আমার থেকে পাননি স্যার!’

রিয়াজ লক্ষ করে, তাশির মুখটা ভয়ে আর ভক্তিতে পাংশু।

৭১

তাশিকে বিদায় দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রিয়াজ। পাহাড়ি শহরে রাত দ্রুত নামে। ঠাণ্ডা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালি হয় পথঘাট। এত সকাল-সকাল ঘুম আসে না তার। হাতে নেয় ট্যাব। পছন্দের ওটিটি প্ল্যাটফর্মের আইকনে দেয় টোকা।

চলতি সিরিজের আটটা এপিসোডই না-দেখা। যথেষ্ট ও জুতসই সময়ের অভাব। অতীব আকর্ষণীয় সিরিজটি নাম কিনেছে দর্শকমহলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনাও দেখেছে। ফলত তার আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। আজ গোটা চারেক পর্ব দেখার বাসনায় গুছিয়ে বসে।

ট্যাবটিকে বিছানাতেই বহাল করে বালিশ ও বই সহযোগে। পিঠে আর কোলে বালিশ ও কুশন নিয়ে আরামে শুরু করে সিরিজ-দর্শন।

কিন্তু, মন বসে না কিছুতেই। বন্ধ করে ছবি। তাশি'র কথাগুলো ফিরে ফিরে আসে। দার্জিলিং মেলের এ-ওয়ান টুএসি কোচের শনিবারের যাত্রী, দাওয়া লামাই কি তাশি বর্ণিত বিপ্লবী লামা? ছবি সাময়িক বন্ধ করে ফোনে দাওয়া লামার ছবি বার করে দেখে। তর্জনী ও বুড়ো আঙুল টেনে বড় করে ছবি। সৌম্য। শান্ত। ইনি কী করে একজন যোদ্ধা হন!

সাতপাঁচ ভাবনা যায় না মাথা থেকে। তবুও আঙুলের টোকায় আবার শুরু করে চলচ্চিত্র। বেজে ওঠে ফোন। অচেনা নাম্বার। ধরবে কি না ভাবে, ইতস্তত করে। ছবি পজ করে ফোন ধরে।

'হ্যালো?'
'রিয়াজ, আমি ডিকে।'

মুহূর্তে হতবাক হয় রিয়াজ। ডিকে মানে কি ধরণী কয়াল? রজত স্যারের বন্ধু? কিন্তু উনি কীভাবে ওর নম্বর পাবেন? আর কেনই বা ওকে ফোন করবেন এই রাতে?

'ডিকে!' বিস্ময় ও বিভ্রান্তি রিয়াজের।
'রজত রায়ের বন্ধু, চিনতে পারছ? সল্টলেকের সেই ইউথ্যানাসিয়া কেস, মনে পড়ছে?'
'ওহ্ ডিকেস্যার আপনি, আনএক্সপেক্টেড কল স্যার! বুঝতে পারিনি, সরি স্যার!'
'স্যার নয়, দাদা। তোমার সঙ্গে কথা আছে। রজত সব বলেছে আমায়।'
'খুবই জটিল কেস স্যার—'
'তোমার স্যার রজত, আমি নই! আমি দাদা। সব শুনেছি। তোমার থেকে আবার পরপর ঘটনা ডিটেলে শুনব—এখন বলবে, নাকি কাল?'
'এখনই বলব স্যার—দাদা—সব বলব আপনাকে। আপনি রেকর্ড করুন স্যার, সুবিধে হবে।'

‘ওকে, বলো।’

ডিকের অপ্রত্যাশিত ফোনে আপ্লুত হয় রিয়াজ। জট থেকে সুতো খোঁজার কাজে যে মানুষটিকে চাইছিল মনেপ্রাণে, সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে হঠাৎ পেয়ে নিজেকেও ফিরে পায় সে। গত শনিবার রাতে পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণ আর লালবাজারে মিউজিয়ামের ফোন কল থেকে শুরু করে গড়গড়িয়ে বলে যায় ঘটনাক্রম। মনোযোগী শ্রোতা ডিকে।

আগাগোড়া সবটা বলে দম নেয় রিয়াজ। শেষে যোগ করে বিপ্লবী লামার কথাও।

‘টিবেটান রেবেল! ইন্টারেস্টিং!’ মজা পায় ডিকে।
‘আজই তাশি নামডোল বললেন আমায়।’
‘মিসিং লিস্টে আরেকটা নামও অ্যাড হতে পারে রিয়াজ—’
‘আবার কে দাদা?’
‘কবীর খান—উনিও গত আটচল্লিশ ঘণ্টা যোগাযোগের বাইরে!’
‘কবীর খান!’ বিস্ময় রিয়াজের।

কবীর-পর্ব বিস্তারিত জানায় ডিকে। কবীর খান কালিম্পং এসেছেন শুনে অবাক হয় রিয়াজ।

‘কোন গুম্ফা দাদা?’
‘জোগচেন গুম্ফা।’
‘আমি এক্ষুনি খোঁজ নিচ্ছি! ওনার কোনও ছবি আছে দাদা?’
‘পাঠাচ্ছি।’

রিয়াজকে ছেড়ে ডিকে ফোনের গ্যালারিতে যায়। কবীর খানের ছবি তার স্মার্টফোনে তোলা আছে বিস্তর। বাছাই করে দুটো ছবি পাঠিয়ে দেয় রিয়াজকে।

তারপর সদ্য রেকর্ড-করা রিয়াজের বিস্তৃত বিবরণ, কানে হেডফোন সহযোগে, আবার শুনতে শুরু করে। কবীরদা বিপন্ন, কেবল এই আশঙ্কাটুকুই অধিকতর মনোযোগী করে ডিকেকে।

রাত এগারোটা চল্লিশ। নিস্তব্ধ কালিম্পং টাউন। এলাকার দখল নিয়েছে শৈত্য। শীত ও নৈঃশব্দকে উপেক্ষা করেই কালিম্পং থানা থেকে একটি জিপ রওনা হয় জোগচেন গুম্ফার দিকে।

জিপে রিয়াজ, তাশি নামডোল ও কালিম্পং থানার অফিসার-ইন-চার্জ।

৭২

১৮ অক্টোবর। কলকাতা।

আধবেলার একটা ছুটি নিয়ে বেলা দু'টো নাগাদ অফিস থেকে বেরোয় ডিকে। সংরক্ষণ করে একটা অ্যাপ-ক্যাব। গন্তব্য বৈষ্ণবঘাটা। কবীর খানের বাসস্থান। নিবেদিতাও যাবে। চাবি নিয়ে উপস্থিত থাকবে টুম্পাও। কবীর খানের কোনও সংবাদ টুম্পাও পায়নি। টুম্পাকে ফোন করে জেনেছে নিবেদিতা।

গতকাল রাত সোয়া বারোটা নাগাদ কালিম্পং থেকে রিয়াজের ফোন আসার পরই দুশ্চিন্তা বাড়ে। জোগচেন গুম্ফায় কবীর খান নেই। গুম্ফার লামা ও অন্যান্যরা কেউই ছবি দেখে কিছু বলতে পারেননি। আদৌ তিনি গুম্ফায় এসেছিলেন কি না, তা-ও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি কেউ।

অতরাতে নিবেদিতার উৎকণ্ঠা না-বাড়িয়ে আজ সকালে জানায় সেই খবর। সমস্ত ঘটনা শুনে নিবেদিতা থ। পিতৃসম মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ না-হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছিল তার, বিপদ-আপদের শঙ্কায় কু ডাকছিল মন, কিন্তু অজানা আশঙ্কা বাস্তবায়িত হয়ে, সত্যি সত্যিই চরম বিপদ হবে তাঁর, ভাবেনি সে। ডিকের খবর ও অনুমান সত্যি হলে এমন বিপদ কেবল অভাবনীয় নয়, অকল্পনীয়। তিব্বতি তন্ত্রগুরুর সোনার প্রাচীন মূর্তি চুরি আর গোটা একটা বৌদ্ধ পরিবারের অন্তর্দ্ধান রহস্যের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে কবীর খানের হঠাৎ-নিরুদ্দেশ!

কবীরের ঘর খুলে, তাঁর লেখার খাতা, নোটস্ দেখতে হবে, নিবেদিতাকে জানায় ডিকে। কী নিয়ে ইদানীং ভাবছিলেন, কিছুটা ডিকের জানা। কবীর যতটুকু বলতেন বা 'অন্যপ্রশ্ন' ওয়েবম্যাগের লেখাটা পড়ে যতটা জানতে পেরেছে, তার বাইরেও বিস্তৃত কবীরের সাম্প্রতিক ভাবনা। জানতে গেলে অবশ্যই তাঁর লেখার খাতা খোলা দরকার। কম্পিউটারও। সহমত হয় নিবেদিতা। কবীরের সাম্প্রতিক ভাবনা ও লেখালেখির সঙ্গে সম্ভবত এই অন্তর্ধান সম্পর্কযুক্ত, নিবেদিতাকে বোঝাতে সক্ষম হয় ডিকে। টুম্পাকে বলে ঘর খোলাবার ব্যবস্থা করে আজ বিকেলে।

গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠে। জানালা দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকায় ডিকে। ধূ ধূ জলরাশি। ফোন বাজে। রিয়াজ।

'ডিকেদা, লাভা মনাস্ট্রির রিঞ্চেন লামা কোনও হেল্প করছেন না! এই বিষয়ে কোনও কথা বলতেই রাজি নন!'
'তোমরা পুলিশ পরিচয় দিয়েছিলে?'
'হ্যাঁ, তাশি ছিল—উপায় নেই—বলতেই হয়েছে—'
'সম্ভবত ওই কারণেই কিছু বলছেন না—পুলিশকে ওঁরা কিছু বলবেন না! এখন কি কালিম্পং ফিরছ?'
'হ্যাঁ। সন্ধ্যায় তাশি আরেকজনের সঙ্গে মিট করাবে লাসা রেস্টোরেন্টে—টিবেট আনবাউন্ড মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত সেই লোক—কালিম্পং-এর এক লোকাল সাংবাদিক—'

‘হুঁ—ঠিক আছে, কথা বল—রাতে ফোন করব—বাই।’
‘বাই!’

রিয়াজের ফোন ছেড়ে ওয়েব ব্রাউজারে খোঁজ চালায় ডিকে—টিবেট আনবাউন্ড মুভমেন্ট। আধঘণ্টায় যতগুলো খবরসূত্র খুলে পড়া যায়, পড়ে ফেলে। কয়েকটা লিঙ্ক মজুত করে ফোনে, পরে পড়বার উদ্দেশ্যে।

গতকাল রাতে, রিয়াজের সঙ্গে রেকর্ড-করা কথোপকথন শোনা শেষ, ল্যাপটপ খুলে পড়তে শুরু করেছে ‘অন্যপ্রশ্ন’ ওয়েবম্যাগে কবীর খানের পুজোর লেখা, সেই সময়ই আসে গুম্ফা-ফেরত রিয়াজের ফোন। খবর শুনে চিন্তিত ডিকে, ফোন ছেড়ে, আরও গভীরে ঢুকে যায় কবীরের লেখায়। কবীর খান যদি সত্যিই কোনও বিপদে পড়েন, তাহলে অবশ্যই সেই বিপদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁর সাম্প্রতিক কাজকর্মের। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ ডিকে। কবীরের সাম্প্রতিক কাজের হদিশ না-পেলে কবীরের হদিশও মেলা ভার!

৭৩

১৮ অক্টোবর। বৈষ্ণবঘাটা। কলকাতা।

আগেই পৌঁছে গেছে নিবেদিতা ও টুম্পা। ঘর খুলে ডিকের অপেক্ষা করছে তারা। নিবেদিতার সঙ্গে এসেছে তার স্বামী গৌরাঙ্গ।

‘কেমন আছেন ডিকেবাবু, বহুদিন পরে দেখা!’ সহাস্য সম্ভাষণ গৌরাঙ্গ’র।
‘কবীরদা আর ভালো থাকতে দিচ্ছেন কই! আবার একটা ঝামেলায় জড়িয়েছেন মনে হচ্ছে!’
‘আবার কি নীলকণ্ঠ? এসএস?’ গৌরাঙ্গ’র ভয়ার্ত প্রশ্ন।

‘জানি না।’ মৃদু হেসে জবাব ডিকের।

বিছানার ওপর স্তূপাকৃতি বই। খাতা। ডিকে একটি খাতা তোলে। পাতার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা কলমটি দৃশ্যমান। খোলে কলম-রাখা উদ্দিষ্ট পাতাটি।

ভগবান > মৎস্য > অহংকার > কমোডিটি > ঈশ্বর >

কলম-চিহ্নিত পাতায় পাঁচটি শব্দ লেখা। তিরচিহ্ন দেখে বোঝা যায় শব্দগুলি সাজান হয়েছে নির্দিষ্ট অনুক্রমে। কিছুটা আন্দাজ করতে পারে ডিকে। ভগবান ও ঈশ্বর শব্দদ্বয় ইতিপূর্বে আলোচিত। গোটা খাতাটায় পাতা খুলে-খুলে চোখ বোলায়। দ্বিতীয় খাতাও।

বিছানার ওপর পড়ে থাকা কাগজের মোড়কের দিকে হাত বাড়ায় নিবেদিতা। ভেতরে কামসূত্র। সরসিজ বিশ্বাস প্রেরিত, কালিম্পং গুম্ফায় প্রাপ্ত, বাংলা উপন্যাস। মোড়কের ভেতরে ঢোকাতে গিয়ে নজর পড়ে লেখাটি। কাগজের খামের একদিকে, পরিষ্কার হাতের লেখায়, নীল কালিতে বাংলায় লেখা—

যদি তোমাদের মন বদলে যায়, যদি তোমরা বিশ্বাসঘাতক হও, তাহলে এইসব দেবতারা তা পরিষ্কার দেখতে পাবেন ও তোমাদের এই রকম শাস্তি দেবেন। জুঃ-এম-পদ-নি-মো।

কিছুই না-বুঝে মোড়কটা এগিয়ে দেয় ডিকের দিকে। আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে লেখাটির দিকে। মোড়কটা হাতে নিয়ে ডিকে দু-বার পড়ে লেখাটি। অর্থ উদ্ধার করতে পারে না। এই খামটিই হাতে-হাতে পৌঁছে দিয়েছিল রহস্যময় চিত্রক চন্দ্র, যার পরিচয় এখনও অজানা। ফোন-ক্যামেরায় লেখাটির ছবি তুলে নেয়। তারপর খোলে কবীরদার ডেস্কটপ।

খাটের একপ্রান্তে বসে নিবেদিতা। কপালে হাত। মাথা নীচু। উৎকণ্ঠায় তার মাথা বেবাক ফাঁকা। চেয়ারে বসে আছে গৌরাঙ্গ। টুম্পা রান্নাঘরের দিকে এগোয়, জিজ্ঞাসা করে চা করবে কি না, তাকে বারণ করে নিবেদিতা। চা খাওয়ার মন নেই, আগে খানদার খবর

চাই। তিনি নিরাপদে আছেন, কেবল এইটুকু শুনলেই শান্তি পাবে সে। মোড়কটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে লেখাটি দেখে গৌরাঙ্গ।

ডেস্কটপে একটি ফাইল আছে 'কামসূত্র' নামে। ক্লিক করে ভেতরে ঢোকে ডিকে। এখানেও বিভিন্ন শব্দ লেখা আছে পরপর। কেবল শব্দ নয়, অর্থও আছে।

রত > সুরত > রতি > আরতি > কামদেব > মদন > মদনভস্ম > রতিবিলাপ

'নিবেদিতা, আপনার মেল আইডিটা বলুন।'

ই-মেলের ঠিকানাটি বলে নিবেদিতা।

'অনেক লেখা, এখন তো পড়া যাবে না। আমার আইডি থেকে আপনার আইডিতে ফাইলটা পাঠিয়ে রাখলাম। আপনার কাছেও রইল, আমারও। সময় মতো পড়ে নিতে পারবেন।'
'ধুর, এখন আমার এসব পড়ার মন নেই। খানদা'র খবর চাই! প্রায় তিনদিন হতে চলল!' বিরক্তি দেখায় নিবেদিতা।
'সিওর নই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এগুলো না-জানলে কবীরদার কাছে আমরা পৌঁছোতে পারব না। আরেকটা কথা এই দুটো খাতা আমি নেব—আপনার আপত্তি নেই তো!'
'দরকার থাকলে নিন। আপত্তি করব কেন!'
'এখন নিয়ে যাই, পরে কবীরদার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব, অনধিকার প্রবেশ ও চর্চার জন্য।'
'ডিকেবাবু চর্চা করবেন, তা অনধিকার হতেই পারে না।' মৃদু হেসে বলে গৌরাঙ্গ।
'প্রবেশটা অবশ্যই অনধিকার!' হেসে জবাব ডিকের।

সকলে বাইরে বেরোয়। দরজায় তালা দিয়ে নিবেদিতা চাবি দেয় টুম্পাকে। টুম্পা হাত নেড়ে হাসিমুখে চলে যায়। গাড়িতে ওঠে নিবেদিতা ও গৌরাঙ্গ। ওদের অনুরোধে ডিকেও

উঠে পড়ে। কাছেই হাইল্যান্ড পার্কে ওদের ফ্ল্যাট। চা-পানের আমন্ত্রণ জানায় যুগল। কিন্তু ওদের ফ্ল্যাটে আজ যাওয়া যাবে না, রজতের সঙ্গে ওঁর অফিসে দেখা করার কথা সোয়া ছ'টায়।

নিবেদিতা ও গৌরাঙ্গ নিকটবর্তী শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনে নামিয়ে দেয় তাকে। ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে ডিকে সিঁড়ি ভেঙে উঠে যায় স্টেশনে।

৭৪

১৮ অক্টোবর। লালবাজার। কলকাতা।

আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে যায় লালবাজার। অফিসেই ছিল রজত। গতকাল রাতে ফোনে কথোপকথনের পর যা-যা ঘটেছে বিস্তারিত জানায় ডিকে।

'শুনেছি সব। রিয়াজ রিপোর্ট করেছে। কবীর খান আবার এখানে জড়াল কী করে!'

'জড়ান হয়েছে মনে হচ্ছে!'

'উনি বোঝেননি!'

'আমাদের কাউকে আগে জানাননি কালিম্পং যাত্রার কথা—একদম ইলেভেন্থ আওয়ারে এসে বলছেন চিত্রক চন্দ্রের কথা—ইনফ্যাক্ট আমিও বলেছি ওঁকে, কালিম্পং গুম্ফায় গিয়ে লামার সঙ্গে দেখা করলে ভালো হয়—তাছাড়া চিত্রক চন্দ্র—শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমায় বলছেন ওই গণ্ডগোলের কথা—'

'ওই প্রফেসরও জড়িত, আমি নিশ্চিত!'

'সরসিজ বিশ্বাস!'

'শিলিগুড়ি কমিশনারেটকে বলছি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে! তুই মিউজিয়ামের দু'জনের সঙ্গে কথা বলবি? কোর্ট ওদের পুলিশ কাস্টডি দিয়েছে!'

'লাভ আছে কথা বলে? তোদের জেরাতেই মুখ খুলছে না!'

‘থোবড়াগুলো দেখ অন্তত!’

ইন্টারকমে কথা বলে রজত। একজন পুলিশকর্মী আসেন। ডিকে যায় তাঁর সঙ্গে লকআপে। মন্টু ভট্টাচার্য আর জাদুঘরের নিরাপত্তা আধিকারিকের সঙ্গে মামুলি দু-চারটে কথা বলে। বিধ্বস্ত দু’জনেই। রজতের চেম্বারে ফিরতেই একটা এ-ফোর কাগজ বাড়িয়ে দেয় রজত। অবাক হয় ডিকে।

‘কবীর খানের একটা মিসিং ডায়েরি করতে হবে—একটা ইনফর্মেশন আপাতত দিয়ে রাখ —’
‘ওহ্ আচ্ছা! আমিই করব?’ প্রশ্ন ডিকের।
‘কে করবে? নিয়ার-কিন তো কেউ নেই! তুই আর নিবেদিতা ছাড়া ওনার কাছের লোক আর কে আছে?’
‘নিবেদিতা অতি কাছের—মেয়ের মতো—উনি লিখলে ভালো হত—’
‘তাকে এখন কোথায় পাব? তুই লেখ!’
‘ওকে, লিখে দিচ্ছি।’

ডিকের লেখার মাঝেই রজত বলে,

‘নিবেদিতার বরটা এখনও সেই হাবোলই আছে?’

লিখতে লিখতে চোখ না-তুলেই হাসে ডিকে।

‘তুমি হেসো না বাঁড়া, তোমার নজর যে ওর বৌয়ের দিকে আমি জানি! বর হাবোল, তোমার সুবিধে!’

লেখা থামিয়ে হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ে ডিকে।

‘পরস্ত্রীর দিকে আমি নজর দিই না!’ হাসতে হাসতেই বলে।
‘দোষ দিচ্ছি না তোকে! নিজস্ত্রী না-থাকলে পরস্ত্রীর দিকে তাকাতেই হবে, সিম্পল!’
‘ধুত!’ লেখায় আবার মন দেয় ডিকে।
‘শালা ওই মেয়ের অমন বর!’
‘না-না, গৌরাঙ্গ খুব ভালো মানুষ!’
‘ভালো মানুষদেরই তো হাবোল বলে!’

বেল বাজায় রজত। সেন্ট্রি আসেন। দুটো কালো কফি আনতে বলে তাঁকে।

‘ডিকে, এমনিতেই মূর্তিচুরি আর কিডন্যাপিং-এর লিঙ্ক খুঁজে পাচ্ছি না, কবীর খানও যদি এই গ্যাং-এর পাল্লায় পড়েন, বিরাট গাড্ডায় পড়ব তো রে! মিডিয়া কাঁউমাঁউ শুরু করে দিয়েছে অলরেডি!’ গম্ভীর হয় রজত।
‘মিউজিয়ামে একবার ঢুঁ মারব—’
‘যা, আমি গাড়ি বলে দিচ্ছি।’
‘গাড়ি লাগবে না। ক্যাব ডেকে নিচ্ছি। টিবেটান বুদ্ধিজমের গ্যালারিটা একবার দেখব।’
‘ডিরেক্টরকে ফোন করে দিচ্ছি—কথা বলতে চাইলে বলতে পারিস।’
‘ঠিক আছে।’

কফি খেয়ে বেরিয়ে যায় ডিকে। অ্যাপ-ক্যাব পার্কস্ট্রিটের আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়ামের ফটকের সামনে যখন থামে, ঘড়িতে সাতটা বাজতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। সাড়ে সাতটায় দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ হয় এই জাদুঘর।

৭৫

১৮ অক্টোবর। সন্ধে। লাসা রেস্তোরাঁ। কালিম্পং।

অফিসের কাজ সেরে আটটার আগে আসতে পারবেন না স্থানীয় পত্রিকা ‘হিল পয়েন্ট’-এর সাংবাদিক। সোয়া সাতটা নাগাদ রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে রিয়াজ ও তাশি নামডোল। তিনদিনেই এই রেস্তোরাঁর প্রেমে পড়ে গেছে রিয়াজ। মাখন চায়েরও। তাশির কথা ফলেছে। কমবয়েসী এক ওয়েটারও টের পেয়েছে পো-চা’য় মজেছে সে। বলতেও হয় না, টেবিলে গিয়ে বসতেই বাটার টি নিয়ে হাজির হয়। ছেলেটির হাসি খুব মিষ্টি। নামটাও। রাবতেন। চায়ে চুমুক দিয়েই রিয়াজ বলে,

‘মিস্টার নামডোল, আমার ইয়াকের মাংস কোথায়?’
‘বলে রেখেছি স্যার, হয়ে যাবে।’
‘বাটার টি ভালো লাগছে—’
‘জানতাম লাগবে—রাবতেনও জেনে গেছে—এবার একদিন সাম্পা ট্রাই করুন স্যার—’ হাসে তাশি।
‘ও তো বার্লি, খুব আলাদা কিছু নয়—ইয়াকের মাংস তো আর কোথাও পাব না!’
‘আজ ভেড়া খাবেন স্যার?’
‘এই পত্রকারের নাম কী?’
‘সোনম শেরিং লেপচা।’
‘ইনি লেপচা?’
‘কালিম্পংকে বলা যেতে পারে ল্যান্ড অফ লেপচাজ। জায়গাটার নামও লেপচা ভাষায় স্যার —কালেনপুন। লেপচা ভাষার তিনটে সিলেবল দিয়ে কালেনপুন তৈরি। কা মানে আমাদের, লেন মানে টু অ্যাসেম্বল—জড়ো হওয়া, আর পুন হচ্ছে ছোটো পাহাড়।’
‘ছোটো পাহাড়ে আমাদের সমাবেশ!’ হেসে বলে রিয়াজ।
‘ইয়েস স্যার! কিন্তু ব্রিটিশরা কালেনপুন উচ্চারণ করতে না-পেরে বিকৃত করে ফেলল—কালেনপুন হয়ে গেল কালিম্পং।’
‘এদের কি টিবেটান অরিজিন?
‘সিকিমের প্রাচীন ট্রাইবাল রেস এরা। খুব পিসফুল। কালচার্ড। অরিজিন যদি বলেন স্যার, মঙ্গোলিয়া আর টিবেটই এদের অরিজিন।’
‘টিবেটানরা মূলত পিসফুল রেস, তাই তো?’

‘হ্যাঁ স্যার, না-হলে চায়না এত দিন ধরে রাজত্ব করতে পারে! দাদাগিরি চালিয়ে যেতে পারে!’

‘নট ওনলি পিসফুল, ওয়াইজ অলসো! নেটে বুদ্ধিস্ট স্ক্রিপচারস নিয়ে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম—’

‘আপনাকে একটা গল্প বলি স্যার—টিবেটান ফোকটেল—টিবেটানরা আসলে এক বাঁদর আর এক ভয়ানক রাক্ষসীর সন্তান।’

‘বাঁদর আর রাক্ষসী!’ হাসে রিয়াজ।

‘বহুদিন আগে একটি বাঁদর গুহায় বসে ধ্যান করত তিব্বতে। সেই বাঁদর ছিল চেনরেজির অবতার। শান্তিপূর্ণ। ধ্যানপরায়ণ। চিন্তাশীল।’

‘চেনরেজি?’ অচেনা শব্দে আটকায় রিয়াজ।

‘অবলোকিতেশ্বর! আমাদের ভাষায় চেনরেজি। রাক্ষসীটা স্বভাবে ঠিক তার উল্টো। লোভ লালসা যৌনতাড়নায় একেবার ভরপুর। তার একবার মনে খুব দুঃখ হল কারণ সে একা। তার কোনও সঙ্গী নেই। মনের দুঃখে সে তারস্বরে কাঁদতে লাগল সঙ্গীর আশায়। তারা কান্না শুনে বাঁদরের মনে খুব করুণা হোল। সে গেল রাক্ষসীর কাছে। রাক্ষসী খুশি সঙ্গী পেয়ে। তার কান্না থামল। তাদের মিলনে ছয়টি বাচ্চা জন্মাল রাক্ষসীর গর্ভে। তাদের কারোরই কিন্তু লেজ নেই। তারা ঝুঁকেও চলে না বাঁদরের মতো। তারাই টিবেটানদের পূর্বপুরুষ। আমরা মনে করি, বাঁদর আর রাক্ষসীর দোষগুণে আমরা ডিভাইডেড। শান্ত ধ্যানী মননশীল হয়েছি আমরা বাঁদরের জন্য। আর লোভ লালসাসহ সব নেগেটিভিটি রাক্ষসীর।’

গল্প বলে হাসে তাশি। হাসি-ঠাট্টায় বয়ে যায় সময়। ফোন বাজে তাশির। সোনম লেপচা। নিজস্ব ভাষায় সামান্য কথোপকথন। হাঁ করে চেয়ে থাকে রিয়াজ।

‘আসবে তো?’ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন রিয়াজের।

‘দশ মিনিটের মধ্যে ঢুকছে স্যার!’

সোনম শেরিং লেপচা ঢুকলেন আটটা পঁচিশে। রাতের খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁয় তখন ভিড়। তাদের সংরক্ষিত টেবিলে নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে বসেন সোনম। পরিচয় বিনিময় হয়। হাসিও।

‘নমস্তে স্যার, কী জানতে চান বলুন!’
‘এক লামা, টিবেটান গেরিলা, যার গায়ে বাঘের গন্ধ পাওয়া যায়—’
‘বাঘের গন্ধ!’ চমকান সোনম।
‘মনে করুন উনি এখানে বসে আছেন, এখান থেকে বেরোলেই এই জায়গায় একটা বোটকা গন্ধ পাওয়া যাবে—বাঘের গায়ের গন্ধ!’

কিছুক্ষণ রিয়াজের মুখের দিকে চেয়ে হা-হা করে হেসে ওঠেন সোনম। অপ্রস্তুত রিয়াজ।

‘এমন কিছু আমি শুনিনি স্যার!’ সোনমের কণ্ঠে কৌতুক।
‘ওকে লিভ ইট, কোনও রিভলিউশনারি লামা সম্পর্কে জানা আছে আপনার?’

আবার হাসেন সোনম। ভেতরে ভেতরে কিছুটা বিরক্ত হয় রিয়াজ। প্রকাশ করে না।

‘রিভলিউশনারি লামা বলতে আপনি কী বুঝাচ্ছেন? যিনি টিবেটের ফ্রিডমের জন্য লড়ছেন?’
‘হুঁ।’ চোখের পাতা ক্ষণিকের জন্য বন্ধ করে মাথা নাড়ে রিয়াজ।
‘ওয়ার্ল্ডে এমন কোনও লামা নেই যিনি টিবেটের ফ্রিডম চান না! সব লামা রিভলিউশনারি লামা!’

বিরতি। সোনমের কথায় নীরবতা নেমে আসে তাদের টেবিলে। অন্যান্য টেবিল থেকে সংলগ্ন চামচ-পেয়ালা-পিরিচের শব্দ ভেসে আসে। সোনমের আরও প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে রিয়াজ। তার পকেটে স্মার্টফোনের রেকর্ডার চালু। নীচু শব্দে একটা

ইংরেজি গান বাজছে রেস্তোরাঁয়। ইলেকট্রিক গিটারের মূর্চ্ছনা আর কোরাসের ধুয়োয় সামান্য আনমনা হয় সে। ফেরত আসে সোনমের কণ্ঠস্বরে।

‘শুনুন স্যার, আপনি যে কথাটা বললেন, রিভলিউশনারি লামা, এই কথার বিরাট ইম্লিকেশনস! এর বিশাল হিস্টরি আছে স্যার! সেইসব আপনি জানেন কী না জানি না স্যার, বাট ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট ফার্স্ট!’

‘সিরিজ অফ ক্রাইমস ঘটেছে সোনম—সেখানে এক লামাকে পাওয়া যাচ্ছে—এখন আমরা দেখতে চাইছি লামা কোনোভাবে এই ক্রাইমগুলোর সঙ্গে জড়িত কিনা!’ আলোচনায় তাশির অনুপ্রবেশ।

‘দাওয়া লামা! চেনেন এঁকে?’

ফোনের গ্যালারি থেকে রিয়াজ, লামার ছবি মেলে ধরে সোনমের সামনে। গভীর পর্যবেক্ষণ। সোনম তাকান লামার ছবির দিকে, সোনমের দিকে রিয়াজ। ছবি দেখে চোখ তুলে সরাসরি রিয়াজকে বলেন,

‘ক্রাইম-টাইম আমি জানি না স্যার! আমি একজন জার্নালিস্ট আর একজন অ্যাভিড অ্যাক্টিভিস্ট অফ টিবেট আনবাউণ্ড!’ তারপর তাশির দিকে তাকিয়ে, ‘নাথিং মোর তাশি, ইউ নো দ্যাট! এঁকে আমি চিনি না।’

‘ওকে, সোনম আমি হিস্টরিটাই শুনতে চাই!’ রিয়াজ সোনমকে আলোচনায় রাখতে চায়।

রিয়াজের কথা শুনে হাসেন সোনম। ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে চেয়ারে ঝোলান। মুখের বাষ্প দিয়ে মোছেন চশমার কাঁচ। তারপর হেসে বলেন,

‘আয়াম হাংরি—খেতে খেতে কথা হোক স্যার!’

‘নিশ্চইয়! তাশি প্লিজ অর্ডার!’ রিয়াজ বলে।

হাত উঁচিয়ে ওয়েটারকে ইঙ্গিত করেন তাশি। সোনম খাবেন থুকপা। রিয়াজ নুডলস আর ভেড়ার মাংস। তাশি ভেড়ার মাংসের সঙ্গে নেবে ওঁর প্রিয় সাম্পা।

‘সিসিপি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট করে সবসময়। আন্তর্জাতিক আইনকানুন ও রীতিনীতির কোনও তোয়াক্কা করে না, এ আর নতুন কথা নয় স্যার! বিশ্বের সবাই জানে! এই ভায়োলেশনের যে ইতিহাস, তার একটা টার্নিং পয়েন্ট আছে। নাইনটিন ফিফটি নাইন।’

‘টিবেটান আপরাইজিং!’ রিয়াজ বলে।

‘এই আপরাইজিং-এরও একটা হিস্টরি আছে স্যার! শিনজিয়াং-এ এখন যা হচ্ছে, গত সেঞ্চুরির পাঁচের দশকে ঠিক এটাই হয়েছিল টিবেটে। শিনজিয়াং-এ এখন হচ্ছে উইঘুর আর কাঝাখ মুসলিমদের সঙ্গে, আর টিবেটে হয়েছিল বুদ্ধিস্ট টিবেটানদের সঙ্গে! সিসিপি’র কাছে নিজস্ব ইডিওলজিক্যাল ইন্টারেস্টই সব! আন্তর্জাতিক ইমেজে-টিমেজ তার পরে। বরাবর! যখনই আন্তর্জাতিক স্তরে সমালোচনা শুরু হয় সিসিপি’র ফার্স্ট রিয়্যাকশন হল ফেক নিউজ প্রোপাগান্ডা শুরু করা। ফেক নিউজ বা পোস্ট ট্রুথ ইত্যাদির কথা এখন আমরা ইণ্ডিয়ায় শুনছি, চাইনিজ কম্যুনিস্ট পার্টি এইসবে বহু আগে থেকে অভ্যস্ত!’

বলে যান সোনম শেরিং লেপচা। খাবার দিয়ে যান ওয়েটার। খেতে খেতেই বলে যান সোনম। মুখে খাবার নিয়ে রিয়াজ আর তাশিও মনোযোগী শ্রোতা।

৭৬

১৮ অক্টোবর। আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। পার্কস্ট্রিট। কলকাতা।

আটতলার একাংশ সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য খোলা, ‘তান্ত্রিক বুদ্ধিজম’ গ্যালারি আপাতত বন্ধ। ডিকে দেখা করে ডিরেক্টরের সঙ্গে। রজতের ফোনের কারণেই অতিরিক্ত খাতির করেন তিনি। সাড়ে সাতটায় মিউজিয়াম দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে নিজেই ডিকেকে গোটা গ্যালারি ঘুরিয়ে দেখাবেন, বিনীত প্রতিশ্রুতি দেন ডিরেক্টর। বিনিময় করেন

ফোন নাম্বার। ডিকে প্রধান কিউরেটর তনুময় পালের সঙ্গে দেখা করতে চায়, রিয়াজের মুখে শুনেছে ভদ্রলোক পণ্ডিত। তনুময় পালকে তলব করে আনেন ডিরেক্টর নিজের ঘরে। আলাপ করিয়ে দেন ডিকের সঙ্গে।

'তনুময়বাবু নমস্কার, জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রজত রায়ের অনুরোধে এই কেসে মাথা ঘামাচ্ছি—'
'আপনিও লালবাজার?' কিউরেটরের সরাসরি প্রশ্ন।
'আমি পুলিশ নই—সরকারি চাকরি করি। রজত আমার বন্ধু, সেইসূত্রে—'
'জয়েন্ট সিপির বন্ধু, স্রেফ এই যোগ্যতায় আপনি একটা ক্রিমিনাল কেসের তদন্তে ঢুকে পড়তে পারেন? সো স্ট্রেঞ্জ!' মুখে এক চিলতে হাসি নিয়ে বলেন তনুময় পাল।
'আহ্ তনুময়, ছাড়ো ওসব! পুলিশি ঝামেলা আর ভাল্লাগছে না! যা জিজ্ঞেস করছেন বলে দাও!' বিরক্ত ডিরেক্টর।
'উনি পুলিশ না-হয়েও তদন্তে ঢুকে পড়েছেন বলে অবাক হয়ে বলে ফেললাম! সরি দাদা! রজত রায়কে আবার ফোন করে কমপ্লেন করবেন না যেন! উনি আমাদের মিউজিয়ামে জাস্ট টেরর তৈরি করেছেন—কখন কাকে উঠিয়ে লকআপে ভরে দেবেন! আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের কনস্টিপেশন ছিল—এখন আর নেই—এখন স্মু-উ-উ-উ-থ! কেন জানেন? রজত রায়ের ভয়ে!' খ্যাক খ্যাক করে হাসেন কিউরেটর।
'আহ্ তনুময়, ডোন্ট টক রাবিশ!' ডিরেক্টরের মুখ লাল।

ডিকে জরিপ করে প্রধান কিউরেটরকে। ডিরেক্টর বিনয়ী হলেও তনুময় পালের মধ্যে সেইসব ছিঁটেফোঁটাও নেই। ওঁর বাক্যে শ্লেষ। ব্যঙ্গ। ডিকে বোঝে এর পেছনে আছে ক্রোধ। সেই রাগের উৎস অবশ্যই রজতের কড়া মনোভাব। রজতের কর্মপদ্ধতি খুব সরাসরি ও তীক্ষ্ণ। অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজনের যাবতীয় প্রতিরোধ শুরুতেই গুঁড়িয়ে দিতে চায় ও। সব সময় যে সফল হয়, তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আসে সাফল্য। ফলত রজত এই পদ্ধতিতেই আস্থাবান। তনুময় পালের আক্রমণের জবাব দেওয়া দরকার, বিরতি ভেঙে মুখ খোলে ডিকে।

‘আপনি একদম ঠিক বলেছেন তনুময়বাবু! এটা আমার সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা! তবে নিজের ইচ্ছেয় নয়, কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপির অনুরোধে ঢুকেছি। আপনি কোনও লিখিত অর্ডার বা প্রমাণ চাইলে দিতে পারব না। ফলত, আপনি আমাকে কোনও কিছু জানাতে বাধ্য নন। তব জয়েন্ট সিপি রজত রায় যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তার প্রমাণস্বরূপ রজত রায়কে একটা ফোন করি, ওনার মুখেই শুনে নিন।’

ডিকে ফোন বার করতেই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন ডিরেক্টর। তিনি তটস্থ।

‘না, না, রজত রায় আমাকে ফোন করেছেন—আপনার কী প্রশ্ন আছে বলুন! তনুময়, প্লিজ রেসপন্ড!’
‘আমি পরে আরেকদিন আসব, আজ মিউজিয়াম দেখব।’ বলে ডিকে।

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। ডিরেক্টরের সঙ্গে লিফটে ওঠে। সঙ্গে তনুময় পালও।

গোটা গ্যালারি প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ খুঁটিয়ে দেখে মিউজিয়াম থেকে বেরোয়। পার্কস্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে মল্লিকবাজার ক্রসিং অবধি হেঁটে বাস ধরে। শিয়ালদাগামী সেই বাস তাকে দ্রুত পৌঁছে দেয় স্টেশনে। পৌঁছে দেখে বারাসাত লোকাল দাঁড়িয়ে, যেন তার অপেক্ষায়।

বাড়ি ফিরতে দেরি হবে, মা-কে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল আগেই। ভিড় বারাসাত লোকালে দাঁড়িয়ে টের পায় ভেতরের দহন। তনুময় পালের কথাগুলো বিঁধে আছে কাঁটার মতো। খুব মিথ্যে কিছু বলেননি ভদ্রলোক, সত্যিই সে কোন অধিকারে ফৌজদারি মামলায় মাথা গলায়! কবীরদার নিরুদ্দেশ নিয়ে তার ব্যক্তিগত উদ্বেগ থাকতে পারে, কিন্তু মূর্তিচুরি বা অপহরণ নিয়ে তার কথা বলা অবশ্যই অনধিকার চর্চা! বাড়ি ফিরে রজতকে ফোন করে সব জানাবে ঠিক করে, কিন্তু পরক্ষণেই বদল করে সিদ্ধান্ত। এইসব কথা বলেছে শুনলে, তনুময় পালের দফারফা করে দেবে রজত। উচিত-প্রশ্ন তুলে বেচারা কিউরেটর চক্ষুশূল হবে পুলিশের।

বিরাটিতে নেমে যান প্রচুর লোক। কিছুটা ফাঁকা হয় কামরা। দরজার কাছে এগিয়ে আসে ডিকে। আকাশে ডুমো ডুমো মেঘ ঘুরঘুর করছে চাঁদের আশেপাশে। পূর্ণিমা পার-করা বাসি চাঁদ। ক্রমশ অনুজ্জ্বল। নিষ্প্রভ। জ্যোৎস্নাখেকো মেঘের দল নিঃশেষ করছে তাকে। চুপিসাড়ে। কৃষ্ণপক্ষের সেই মালিন্য পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় ট্রেন।

'মিসিং ডায়েরি করে দিয়েছি লালবাজারে।' নিবেদিতাকে পাঠিয়ে দেয় সংক্ষিপ্ত ফোন-বার্তা।

কবীরদার মুখটা মনে পড়ে। কথোপকথন। অন্তরঙ্গতা হেতু আত্মীয়তাবোধ। মনখারাপ হয় সজীব মানুষটার জন্য।

শব্দের পিছুপিছু কোথায় হারিয়ে গেলেন তিনি?

৭৭

১৮ অক্টোবর। নিউ ব্যারাকপুর।

রাতের খাওয়া সেরে, ডিকে একটা সিগারেট ধরায়। ল্যাপটপ খুলে বসে কবীর খানের লেখার সামনে।

রত > সুরত > রতি > আরতি > কামদেব > মদন > মদনভস্ম > রতিবিলাপ

এগুলোর মানে কী? বিভ্রান্ত হয় ডিকে। বইয়ের র‍্যাক থেকে নামায় পৌরাণিক অভিধান। সূচী দেখে নির্দিষ্ট পাতায় যায়। কামদেব। তারপর মদন ও মদনভস্ম অংশে চোখ বোলায়। পড়া শুরু করতে-না-করতেই সংক্ষিপ্ত শব্দে জেগে ওঠে ফোন। বার্তা। রিয়াজ।

‘দাদা, জার্নালিস্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। রেকর্ড করেছি। অডিও ফাইলটা পাঠালাম।’ সংক্ষিপ্ত বার্তা রিয়াজের। অডিও ফাইল না-খুলে ডিকে পৌরাণিক অভিধান থেকে আবিষ্কার করতে চায় মদনকে।

মদন

একদা ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে বিভিন্ন মানসপুত্রদের সৃষ্টি করতেন। পুত্রদের সৃষ্টি করতে করতেই একদিন এক পরমাসুন্দরী নারীকে সৃষ্টি করলেন তিনি। সেই নারীর নাম সন্ধ্যা। সন্ধ্যাকে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা ভাবলেন এই নারীকে কে গ্রহণ করবেন। তখন ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে এক সুন্দর মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন।

সেই মানসপুত্রের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গেলেন সকলে। এই পুরুষ কম্বুগ্রীব, মীনকেতু ও মকরবাহন। তাঁর নাসিকা সুচারু। উরু, কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত। কেশ নীল ও কুঞ্চিত। বক্ষ সুবিশাল। চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখ আরক্তবর্ণ। গাত্রে বকুলের সুবাস। মকর এঁর বাহন। পুষ্পময় পঞ্চশর শোভিত।

এই সুন্দর পুরুষ ব্রহ্মাকে বললেন, আমার কাজ কী? ব্রহ্মা হাসলেন। প্রত্যুত্তরে বললেন, বৎস্য তোমার কাজ প্রচুর। তুমি এই অপরূপ সুন্দর দেহপট নিয়ে এই পুষ্পময় পঞ্চশর সহযোগে স্ত্রী-পুরুষকে মোহিত করবে। দেব, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ, পশু সকলেই তোমার বশবর্তী হবে। তুমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে সৃষ্টিলীলায় সহায়তা করবে। তুমি পুষ্পবাণ দিয়ে সকলের মনে মত্ততা ও আনন্দ সৃষ্টি করবে।

সুন্দর পুরুষটি বললেন, আমাকে আমার নাম দেওয়া হোক! আমার স্ত্রীও নির্দেশ করা হোক। ব্রহ্মা বললেন, তুমি দেবতাদের চিত্ত মথিত করেছ, এই জন্য তোমার নাম মন্মথ। তুমি অসাধারণ কামরূপী, সেইজন্য তোমার নাম কাম। সমস্ত লোককে তুমি মত্ত করবে, তাই তোমার নাম মদন। তুমি মহাদেবের দর্প চূর্ণ করবে তাই তোমার নাম কন্দর্প। তুমি অভিরূপ অর্থাৎ সুন্দর। স্বর্গ মর্ত্য পাতালে তুমি অবস্থান করবে।

এতসব প্রশস্তি শুনে সুন্দর পুরুষ মদন তার পুষ্পময় পঞ্চশরের শক্তিপরীক্ষা চাইলেন।

প্রশ্ন উঠবে, কীসের পরীক্ষা?

ব্রহ্মা তো বলেই দায়িত্ব শেষ করলেন, তাঁর বর সত্যি কিনা যাচাই করতে হবে না! তিনি প্রথমে ব্রহ্মার ওপরেই পুষ্পশরের প্রয়োগ করতে চান। রাজী হলেন ব্রহ্মা। মদন প্রয়োগ করলেন তাঁর পঞ্চ পুষ্পশর। সন্ধ্যার সামনে মদন ব্রহ্মাকে পঞ্চশরে ঘায়েল করতেই ব্রহ্মা সন্ধ্যার প্রতি কামমোহিত হলেন। কামের তাড়নায় তিনি ভুলেই গেলেন সন্ধ্যা তাঁর আত্মজা। তিনিই সৃষ্টি করেছেন তাঁকে। এই সন্ধ্যাই শতরূপা বা সরস্বতী।

মদনভস্ম

নিজ কন্যার প্রতি ব্রহ্মার কামাতুর ভাব দেখে মহাদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, পুত্রবধূ ও কন্যা, এরা মাতৃতুল্য, এদের প্রতি কামাসক্ত হওয়া পাপ। ব্রহ্মা পাপ করেছেন। তিনি বেদের নিয়ামক, তিনি এটা করতে পারেন না। মহাদেবের তিরস্কারে বেশ অপমানিত বোধ করলেন ব্রহ্মা। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল মদনের ওপর। তাঁর অপমানের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন মদনকে। অভিশাপ দিলেন, মহাদেবের অগ্নিবাণে মদন একদিন ভস্মীভূত হবেন। অভিশাপ শুনে মদন ব্রহ্মার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইলেন। অভিশাপমুক্তিও চাইলেন। ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে তখন বললেন, ভস্ম হওয়ার পর মহাদেবের আগ্রহেই তাঁর আবার পুনর্জন্ম হবে। বিবাহের সময় মহাদের আবার মদনের শরীর দান করবেন।

এরপর দক্ষ মদনকে তাঁর কন্যা রতিকে বিবাহ করতে বললেন। মদন রতিকে বিবাহ করলেন। এদিকে হিমালয়ের কন্যা উমা শঙ্করের প্রতি প্রণয়পাশে আবদ্ধ। শঙ্করকে ছাড়া তিনি অন্য কারোকেই বিবাহ করবেন না বলে পণ করেছেন। কিন্তু বলবেন কী করে, স্বয়ং শঙ্কর তো ধ্যানমগ্ন। তাঁর ধ্যান কে ভঙ্গ করবে? এত সাহস কার আছে? দেবতাদের

প্ররোচনায় মদন পা দিলেন সেই ফাঁদে। তিনি পঞ্চশর প্রয়োগ করলেন শঙ্করের উদ্দেশে। শরের আঘাতে ভাঙল ধ্যান। অসময়ে ধ্যানভঙ্গ হতেই ক্রুদ্ধ হলেন মহাদেব। তাঁর নয়নের অগ্নিবাণে ভস্মীভূত হলেন মদন। স্বামীর মৃত্যুতে বিলাপ শুরু করলেন রতি।

কামের পুরাণকথা পড়ে ডিকে আবার ফেরে কবীরে।

পরমাপ্রকৃতি জীবের জন্ম দিলেন বটে কিন্তু তাকে পূর্ণতা দিলেন না, পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছা দিয়ে ছেড়ে দিলেন। ব্যস, জীব এবার ছুটে মরে। নিজেকে পূর্ণ করার জন্য যা-যা দরকার, সেইসব আয়ত্ত করতে, দখল করতে। জীবমাত্রেরই এই যে পূর্ণতার ইচ্ছা, একে বলে কাম।

অর্থববেদে আছে, কাম যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই কাম। কিন্তু এই কাম জাগতিক কাম। ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছা কেবল নয়, আছে সব মানুষের ইচ্ছা বা সামাজিক কামও। মানুষ তখন কর্মে রত হত আবেগে। প্রেমে। কর্মপ্রেমই তখন কাম বা মদন। কর্মরত হওয়াকে তখন বলা হত রতি। সেই কর্মপ্রেমকে ভস্মীভূত করতে হল, কিন্তু কেন করতে হল? কর্মফল থেকে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। ফলে মদনভস্ম অবশ্যম্ভাবী। কর্মের প্রতি কর্মীজনগণের প্রেম আর থাকল না, জারি থাকল ক্লান্তিকর রতিবিলাপ।

বারবার পড়ে ডিকে। পৌরাণিক গল্পকে, কবীর যেভাবে মানুষের ইতিহাস ও সমাজের নিরিখে অন্য মাত্রা দেন, একাধিক বার না-পড়ে উপায় নেই।

ডিকের মনোযোগ চুরমার করে বেজে ওঠে ফোন। অচেনা নাম্বার। এত রাতে অচেনা নাম্বার? সঙ্গে সঙ্গে না-ধরে, কিছুক্ষণ বাজতে দিয়ে, ফোন ধরে ডিকে।

৭৮

‘ডিকে বলছি—’

‘ডিকেবাবু, আমি তনুময় পাল, চিফ কিউরেটর অফ ইন্টারন্যাশানাল থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। ডিরেক্টরসাহেবের থেকে আপনার নাম্বারটা নিলাম।’

নিতান্ত অনিচ্ছায় ফোনকল ধরে কিছুটা চমকেই যায় ডিকে। মিউজিয়ামের প্রধান কিউরেটর স্পষ্টবাদী তনুময় পাল আবার আজই কেন ফোন করছেন!

‘সরি দাদা, তখন আজেবাজে কথা বলে ফেলেছি, ডিরেক্টরসাহেব খুব রাগ করছেন!’ কিউরেটরের কণ্ঠে অনুশোচনা।

‘না-না, আপনি তো ঠিকই বলেছেন! ভুল তো আমারই!’

‘আরে ছি-ছি দাদা, এমন বলবেন না! আসলে জয়েন্ট সিপি এত রুড আচরণ করছেন আমাদের সঙ্গে, আমরা খুবই মর্মাহত। ওই ক্ষোভটাই আমার কথায় ছিল, ডোন্ট মাইণ্ড দাদা!’

‘আরে না-না, ঠিক আছে!’ ডিকে অপ্রস্তুত।

‘আপনার কী প্রশ্ন আছে প্লিজ বলুন!’

হাসে ডিকে। ‘আপনার সঙ্গে কথা বলে অ্যান্টিক থেফটের ওসি রিয়াজ আলমের খুব ভালো লেগেছে, রিয়াজ আমার ভাইয়ের মতো, ওই আপনার কথা বলল—‘

‘আচ্ছা-আচ্ছা। বলুন না আপনি কী জানতে চান!’ অমায়িক তনুময় পাল।

‘আমার কোয়েরি মূলত অ্যাকাডেমিক। তবে অন্য প্রশ্নও আছে।’

‘বলুন, জানলে নিশ্চয়ই বলব।’

‘তিব্বতি রেবেলদের সঙ্গে এই মূর্তিচুরি আর কিডন্যাপিং-এর কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে?’

‘তিব্বতি রেবেল! তারা আবার কোত্থেকে এল!’

‘আসেনি। আসতে পারে কি—সেটাই জানতে চাইছি।’

‘তা তো বলতে পারব না ডিকেবাবু! কোনও ধারণা নেই!’

রিয়াজের শংসাপত্র ছিলই, আজ গ্যালারি পরিদর্শনের সময় বুঝেছে তনুময় পাল পণ্ডিত। নিজস্ব বিষয়ে প্রখর জ্ঞান। একজন অ্যাকাডেমিক মানুষকে প্রশ্ন করতে হবে তাঁর বিষয়ে ঢুকেই। দ্রুত নিজেকে গুছিয়ে নেয় ডিকে।

‘তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে লামাদের একটা বড় ভূমিকা আছে শুনেছি—’
‘সে তো থাকবেই ডিকেবাবু! টিবেটে সন্ন্যাসী বা পুরোহিতরা তো কেবল ধর্মীয় যাজক নন, এঁরা সোশ্যাল ফ্যাব্রিকের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। সমাজের ভাল-মন্দ দেখেন তাঁরা, মানুষ সুপরামর্শ নিতে আসে তাঁদের কাছে। নিয়মিত চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দেন, ওষুধ দেন!’
‘ধর্মগুরুদের এই প্রভাব খুব আনকমন নয়, অনেক সমাজেই আছে!’
‘টিবেটে ধর্ম বিষয়টা বোঝার ব্যাপার আছে।’ কয়েক সেকেন্ডের বিরতি, যেন প্রস্তুত করছেন নিজেকে, তনুময় বলেন, ‘টিবেটান পরিবার খুব বড় হয়। এক-দুজন ছেলেমেয়েকে বাপ-মায়েরা গুম্ফায় পড়তে পাঠিয়ে দেন। ফলত সমাজে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা বেশি। মানুষের সঙ্গে ধর্মের বন্ডিং খুব গভীর। মাও তিব্বতের এই ধর্মীয় বন্ডিং-টা খুব ভালো জানতেন। তিনি তাই শুরুতেই ধর্মে আঘাত করলেন। চাইনিজ বাহিনী এসে আঘাত করল লামাদের সম্মানে। তাঁদের নামে কুৎসা করল, দুর্নীতির অভিযোগ করল, নারীঘটিত বদনাম করল, পরে গ্রেফতার করল। ভেঙে দিল গুম্ফার পর গুম্ফা। যে-দেশে প্রতি ঘরেই একজন করে লামা বা নান, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের রেজিস্ট্যান্স থাকবে না, হয় কখনও! গুম্ফাগুলোর ভূমিকা থাকবেই!’
‘সেই ভূমিকাটা কেমন? ওটাই জানতে চাইছি!’
‘লিবারেশন থিয়োলজির কথা শুনেছেন?’ পালটা প্রশ্ন করেন তনুময় পাল।
‘ল্যাটিন অ্যামেরিকা?’
‘ইয়েসস! ল্যাটিন অ্যামেরিকান ক্যাথলিক খ্রিস্টান যাজকরা শোষণ, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকে মান্যতা দিয়েছিলেন বহুবছর আগে—তাঁরা বাইবেলের একটা র‍্যাডিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন হাজির করেছিলেন—’ উত্তেজনা তনুময়ের স্বরে।

‘ল্যাটিন অ্যামেরিকায় বহু দেশে সশস্ত্র আন্দোলনে ক্যাথলিক চার্চের বিরাট ভূমিকা আছে শুনেছি—’

‘ক্যাথলিক ক্লার্জিরাই তো হোতা! আসলে ভয়াবহ শোষণ আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই-করা ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র মানুষের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না! সোশ্যাল জাস্টিস এনে দেবে অস্ত্রই! গ্রামে গ্রামে চার্চগুলোই হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহের আঁতুড়ঘর!’ গলা চড়ে যায় কিউরেটরের।

‘লিবারেশন থিয়োলজি কি বৌদ্ধরা মানে?’ প্রশ্ন ডিকের।

‘মহাযান-এ তো ওইটাই পথ! নিজের মুক্তি নয়, একজন মহাযানী বোধিসত্ত্বের কাছে সকলের মুক্তি অনেক অনেক বেশি ডিজায়ার্ড!’

‘সে-পথ তো সশস্ত্র নয়, অহিংস।’ বলে ডিকে।

‘একজন কলম্বিয়ান ক্যাথলিক যাজক, নাম ক্যামিলো টোরেজ, গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন—পরে মারাও যান লড়াইয়ের ময়দানে—বলেছিলেন, আজ যদি জিজাজ বেঁচে থাকতেন, উনিও একজন গেরিলা বিপ্লবী হতেন!’ হেসে বলেন তনুময়।

‘বুদ্ধ বেঁচে থাকলে উনিও কি তাই হতেন?’

ডিকের কথায় হা-হা করে হাসেন তনুময় পাল। ডিকেও।

‘হাসছি বটে, তবে টিবেটানদের অবস্থা খুব খারাপ—দেশের বাইরে নির্বাসিত হয়ে আছে একদল আর দেশে যারা আছে তারা নিজভূমে পরবাসী!’ হাসি থামিয়ে বলেন তনুময় পাল।

ফোন বাহিত হয়ে কিউরেটরের দীর্ঘশ্বাসের শব্দও কানে আসে ডিকের।

‘ইন্ডিয়ায় কি এরা তেমন সক্রিয়, জানা আছে আপনার?’

‘এই কেসে এদের কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন জানি না, তবে একটা সক্রিয়তা তো আছেই, যদিও সক্রিয় হয়ে কোনও লাভ নেই!’

‘কেন!’

‘ডেভিড ভার্সাস গোলিয়াথের গল্প! কোনও সক্রিয়তা দেখিয়েই আপনি চায়নার একটি কেশও ছিন্ন করতে পারবেন না!’

‘হুঁ, তা বটে! তনুময়বাবু ধন্যবাদ, আপনার নাম্বার সেভ করছি, আপনিও করুন, দরকারে ফোন করব।’

‘অবশ্যই! গুডনাইট!’

‘গুডনাইট!’

‘হ্যালো তনুময়বাবু—’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন!’

‘আরে একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম—একটা বাক্য বলছি, দেখুন তো কিছু বুঝতে পারেন কি না!’

‘বাক্য? আচ্ছা, বলুন।’

‘যদি তোমাদের মন বদলে যায়, যদি তোমরা বিশ্বাসঘাতক হও, তাহলে এইসব দেবতারা তা পরিষ্কার দেখতে পাবেন ও তোমাদের এই রকম শাস্তি দেবেন। জুঃ-এম-পদ-নি-মো।’

‘আবার বলুন!’

আবার বলে ডিকে।

‘নাহ্ দাদা, বুঝতে পারছি না! চেনা কথা নয়! এটা কোথায় পেলেন?’

‘পরে বলব! আগে বলুন, জুঃ-এম-পদ-নি-মো, এটা কি টিবেটান ল্যাঙ্গুয়েজ?

‘জানি না দাদা! নেটে একবার সার্চ মারুন না!’

‘মেরেছি, কিছু নেই! আপনার চেনা কেউ আছে টিবেটান জানে?’

‘আছে। কাল আপনাকে জানাব।’

‘খুব আর্জেন্ট, যদি একটু তাড়াতাড়ি—’

‘সকালেই জানিয়ে দেব। আচ্ছা লেখাটা কি আমায় মেসেজ করা যাবে?’

‘করে দিচ্ছি। আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। শুভরাত্রি!’

‘শুভরাত্রি!’

তনুময়কে বিদায় দিয়ে ফোনের গ্যালারিতে যায়। খামে চিত্রিত অক্ষরগুলোর ছবি তুলে এনেছিল কবীর খানের বাড়ি থেকে, দ্রুত সেই ছবি পাঠিয়ে দেয় তনুময় পালের ফোনে। তারপর ফোনের পর্দায় আঙুলের ছোঁয়ায় পৌঁছে যায় রিয়াজের পাঠান অডিও ফাইলে। হাত বাড়ায় ইয়ারফোনের দিকে।

খুব স্পষ্ট নয় আওয়াজ। মাঝে মাঝে যান্ত্রিক গোলযোগের অনুপ্রবেশে অস্পষ্ট হচ্ছে কণ্ঠস্বর। গানও বাজছে রেস্তোরাঁয়। ডিকে ইয়ারফোন কানে গুঁজে বন্ধ করে চোখ।

৭৯

সোনম লেপচা বলে যাচ্ছেন অনেক কথা। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে রিয়াজ। অন্য একটি লোকও কথা বলছেন মাঝেমধ্যে। ইনি নিশ্চয়ই তাশি নামডোল, অনুমান করে ডিকে। সোনম বেশ সপ্রতিভ, সাংবাদিকরা যেমন হন। তিনিই বলছেন বেশি। চোখ বুজে সোনমের কথা শুনে যায় ডিকে।

‘পঞ্চাশের আগে চায়না কখনও টিবেট শাসন করেনি। ফেক হিস্ট্রি প্রচার করে চায়না প্রকৃত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চায়।’
‘ফেক হিস্ট্রি!’ প্রশ্ন রিয়াজের।
‘যেমন ধরুন, ওরাই নাকি তিব্বতের রক্ষাকর্তা! ওরা আসার আগে টিবেটে ফিউডাল সিস্টেম ছিল! এগুলো হচ্ছে ওদের প্রোপ্যাগান্ডা! কিন্তু আসল কথা হল, টিবেটের ওপর চায়নার দীর্ঘদিনের লোভ। কেন জানেন? টিবেট হল ন্যাচারাল রিসোর্সে ভরপুর একটা দেশ! আরও একটা কারণ আছে! ইন্ডিয়ার সঙ্গে আছে স্ট্র্যাটেজিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ বাউন্ডারি। পঞ্চাশে চল্লিশ হাজার পিএলএ দখল নেয় টিবেট। সাধারণ টিবেটানরা কেউই এই অন্যায় দখলদারী মেনে নেয়নি। নেবে কী করে! তারা প্রতিবাদ করেছে, প্রতিরোধ করেছে, ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে! ভয়ঙ্করভাবে সেইসব প্রতিরোধ দমন করেছে পিএলএ! মাও

কেবল গুম্ফা ধ্বংস করেছে, হাজার হাজার পুঁথি নষ্ট করেছে, তাই নয়, প্রায় ওয়ান মিলিয়ন সাধারণ টিবেটানকে খুন করেছে! এগুলো ক্ষমার অযোগ্য! চিনের ব্রুটালিটির সঙ্গে কোনও অত্যাচারের তুলনা হয় না দাদা!'

'এখনও তাই!' অবাক রিয়াজ।

'টিবেটে এখন অফিশিয়াল ভাষা ম্যান্ডারিন। টিবেটান ভাষা দ্বিতীয় ভাষা। বহু টিবেটান শিশু মাতৃভাষা না-জেনেই বড় হচ্ছে। জানেন, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার উপায় নেই! প্রতিটা গুম্ফায় ভয়ঙ্করভাবে নজরদারী চলে। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকেন সন্ন্যাসীরা। বহু লামাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এমনকী হিজ হোলিনেস দলাই লামার ছবি সঙ্গে রাখলেও বিপদ, ধরা পড়লে তার জেল অবধারিত। ভাবতে পারেন?'

'টিবেট আনবাউন্ড কী করে?

'টিবেটে কী ঘটছে আমরা সেই সত্য প্রকাশ করতে দায়বদ্ধ, সেই সত্য প্রকাশ করে আমরা স্বাধীন টিবেটের জন্য সারা বিশ্বে সমর্থন আদায় করছি। ভবিষ্যতেও করব!'

ডিকে বন্ধ করে অডিও। একজন অ্যাক্টিভিস্ট যেভাবে গড়গড় করে নিজেদের কথা বলেন, ঠিক সেইভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সোনম লেপচা। এইসব কথা পরপর সাজান আছে ওঁদের সংস্থার ওয়েবসাইটে। কথাগুলো মিথ্যে নয় কিন্তু পুরনো। নতুন কোনও তথ্য নেই। নাহ্, পাহাড়ের লোকদের থেকে লামার বিষয়ে যথাযথ তথ্য পাওয়া মনে হচ্ছে কঠিন হবে! নিতে হবে অন্য পথ।

কানে বাজছে একটা গান। রেস্তোরাঁয় বাজছিল। রিয়াজদের কথোপকথনের মাঝে ভেসে আসা সেই গান গুনগুন করে ডিকে। পরিচিত গান। ইন্টারনেটে খুঁজে নিয়ে গানটা চালায়।

গানের সূত্রটা পাঠিয়ে দেয় রিয়াজকে। সঙ্গে একটা বার্তা। 'যে রেস্তোরাঁয় বাজছে লেনার্ড কোহেনের ডেমোক্রেসি, সেই রেস্তোরাঁর নাম লাসা! সূক্ষ্ম একটা রাজনৈতিক যোগ কেমন তৈরি হয়ে যাচ্ছে বিখ্যাত গানটির সূত্রে, টের পেয়েছ? এই লাসা রেস্তোরাঁর ওপর নজরদারী চাই। এলাকার থানা বা জেলা পুলিশ দিয়ে হবে না। এ ব্যাপারে তাশিকেও

এখন কিছু জানিও না। কাল কথা হবে। আর হ্যাঁ, তাশি নামডোলকে ছাড়া কালিম্পং-এ একা ঘোরা কি সম্ভব তোমার পক্ষে?'

বছর দু'য়েক আগে গ্র্যান্ড হোটেলের পোর্টিকোয় বিদেশি বইয়ের দোকান থেকে একটা বই কিনেছিল ডিকে, কিছুটা পড়েওছিল, তাক থেকে টেনে বার করে সেই বই। এক চিনা ঐতিহাসিক প্রচুর গবেষণা করে লিখেছেন, উনষাটের মার্চে লাসায় ঠিক কী ঘটেছিল।

তিব্বতের মৃত্যুযন্ত্রণা সেই বইয়ের পাতায় পাতায়। বইয়ের তাক থেকে বেছে বেছে নামায় আরও খান দুই বই। নিষিদ্ধ দেশ ও নিষিদ্ধ নগরীর উপাখ্যান লেখা আছে বইগুলিতে। এই উপাখ্যান আরেকবার না-ঘাঁটলে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনও সূত্র! স্পর্শ করা যাবে না, সাড়ে এগারো হাজার ফুট উচ্চতার শহর লাসার নীলিমা ও নৈরাজ্য! ইতিহাস না-জানলে জানা যাবে না, কীভাবে কাঁদে মেঘহীন দেশের মানুষ!

ষোল হাজার ফুট উচ্চতার জলবায়ু যেমন ভয়ানক হতে পারে, উত্তর তিব্বতের জলবায়ু তেমনই। চরম ঠাণ্ডা। শাদা বরফের কার্পেটে মোড়া চরাচর। বছরভর শীতল বায়ুর কামড়। শীতে তাপমান নামে মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বরফের কার্পেট সরলে, তাপমান যখন অপেক্ষাকৃত কম, তখন ওরা সেইসময়কে আহ্লাদ করে বলে গ্রীষ্ম। নির্বাসনের আগে দলাই লামা সহচর নিয়ে শোভাযাত্রা করে প্রাসাদ বদল করতেন। পোতালা থেকে তিনি যেতেন নরবুলিংখা প্রাসাদে। তাঁর গ্রীষ্মকালীন পোদ্রাং।
আসলে গ্রীষ্ম বলে প্রায় কিছু নেই। নেই বৃষ্টিও। উপত্যকায় যেটুকু সবুজ, তিব্বতি ছাগল আর ভেড়ার পাল এসে খুঁটে খায়। চরে চমরী গাই। আকাশে গাভীর মতো চরে না মেঘ। গোটা তিব্বতই হিমালয়ের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। হিমালয়ে ঢাক্কা খেয়ে থতমত মৌসুমী বায়ু সব বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয় গাঙ্গেয় অববাহিকায়। কিছুই পায় না তিব্বত। চাষবাস হয় না বললেই চলে। পশুপালনই জীবিকা। বার হাজার ফুটের নীচে মধ্য তিব্বত উপত্যকায় আবহাওয়া তুলনামূলক ভালো। বৃষ্টি কিছু হয়। কাঁচের মতো স্বচ্ছ নীল আকাশে মেঘেরা দলবদ্ধ হয় অবরে-সবরে। নিষিদ্ধ নগরী লাসা এখানেই।

মাথায় টুপি, কানে মাকড়ি, একদা-রঙিন অধুনা-বিবর্ণ পোশাকে পশুপালকের দল সবুজ উপত্যকায় যায় তাদের ইয়াক, পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া নিয়ে। দূরে দূরে ছোটো ছোটো গ্রাম। পাহাড়ের টং-এ গুম্ফা। পতপত করে ওড়ে রঙিন লুংদার। বাতাসে ছড়িয়ে দেয় তাদের রঙ। তারই কিছুটা গায়ে মেখে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে তিব্বতি জীবন। বৌদ্ধ লামারাই নিয়ন্ত্রণ করেন সমাজ। বিশাল বিশাল কুকুরগুলোর লোমশ শরীরে বাফাদারি। প্রকৃতির মতো। প্রকৃতি ও পুরুষ, সবাই মিলে রক্ষা করে তাদের দেশ।
কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি। পিএলএ-কে আটকাতে পারেনি কেউ। না বরফের চাদর, না লোমশ কুকুর, না রঙিন লুংদার, না গুম্ফার স্তব্ধতা। লামার কণ্ঠনিঃসৃত গম্ভীর ওঁ মণিপদ্মে হুঁ পরিণত হয়েছে অসহায় আর্তনাদে।
পাতা উল্টে উল্টে বরফের দেশের কথা দেখে ডিকে। তবে এগুলো পরে দেখবে, আগে কবীরদার লেখা টুঁড়ে তুলে আনতে হবে সূত্র। সম্পর্কসূত্র। কেন কবীর খানকে দরকার তিব্বতি বিপ্লবীদের?

আবার খোলে কবীরদার লেখা ফাইল। কাম। কামদেব। মদন। মদনভস্ম। রতিবিলাপ।

পড়তে গিয়ে রেস্তোরাঁয়-বাজা গানটা চারিয়ে যাচ্ছে মাথায়। লেনার্ড কোহেন গাইছেন,

সে আসছে বাতাসের ফাঁক গলে, সে আসছে তিয়েন-আন-মেন চত্বর থেকে, সে আসছে সমস্ত বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাত ধরে, আশ্রয়হীনের উত্তাপ থেকে, সে আসছে...

সে আসছে ফ্রম দ্য অ্যাশেজ অফ দ্য গে, ডেমোক্রেসি ইজ কামিং টু দ্য ইউএসএ...

৮০

১৯ অক্টোবর। শুক্রবার। শিলিগুড়ি।

সূর্য উঠতে ঢের দেরি। চারপাশে প্রাক-সূর্যোদয়ের ঘোলাটে আলো। ওই ভোরে পাহাড় থেকে কুয়াশা মেখে নেমে আসে একটা অ্যাম্বুলেন্স। শালুগাড়া পেরিয়ে চেকপোস্টের দিকে এগিয়ে যায় গাড়ি। সাধারণ গতি, হুটারও নিশ্চল। ভোরের ফাঁকা রাস্তায় গন্তব্যের দিকে ধাবমান। চেকপোস্ট পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে একে একে পেরিয়ে যায় দার্জিলিং মোড়ের তেনজিং নোরগের মূর্তি, মাটিগাড়া, মেডিকেল মোড়। গতিপথ দেখেই মালুম অ্যাম্বুলেন্সের গন্তব্য শুশ্রুত নগর। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পোর্টিকোয় এসে থামে গাড়িটি। নিরাপত্তা ঢিলেঢালা। নির্দিষ্ট জায়গায় নেই নিরাপত্তা রক্ষী। হনুমান টুপি পরিহিত চালক তার আসন থেকে নেমে নিমেষে মিলিয়ে যান কুয়াশায়।

অ্যাম্বুলেন্সটি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় টনক নড়ে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মীদের। গুটিগুটি এগিয়ে আসেন নিরাপত্তা রক্ষী। চালকের আসন ফাঁকা। চালক গেল কোথায়? সঙ্গেও কেউ নেই! ভয় পেয়ে যায় দু'একজন। পেছনের দরজা খুলতে সাহস করেন না কেউ। কিন্তু ব্যস্ত হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে দীর্ঘক্ষণ একটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। মিলবে না প্রশাসনিক অনুমোদন। অতিরিক্ত গড়িমসি না-করে নিরাপত্তা রক্ষী হাতলে হ্যাঁচকা টান মেরে খুলে ফেলেন অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের দরজা। দুটো স্ট্রেচারে শায়িত দুটি শরীর। নারী-পুরুষ। বুকের উঠানামা দেখে বোঝা যায় জীবনের স্পন্দন। চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায় হাসপাতালে।

জরুরি বিভাগে উপস্থিত ডাক্তার পরীক্ষা করেন অচৈতন্য দুটি শরীর। চালু করেন স্যালাইন। আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেলে না কোনও অনিয়ম। সিনিয়র ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেন, মাদকের প্রভাবে চৈতন্য লোপ। সাময়িক। প্রয়োগ করেন উপযুক্ত ওষুধ। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে দু'জনের।

চৈতন্যে ফিরেই মহিলা কেবল 'বাবু, বাবু' বলে চিৎকার করে চলেন আর মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠেন ডুকরে। পুরুষটি স্থবির। তাঁকে বারংবার জিজ্ঞাসা করে পাওয়া যায় কিছু

তথ্য। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। জানা যায় তাঁদের নাম-ধাম। কলকাতার বাসিন্দা। সন্দীপ বড়ুয়া ও অঞ্জনা বড়ুয়া।

৮১

১৯ অক্টোবর। নিউ ব্যারাকপুর।

অ্যালার্ম বাজে ফোনে। ঘুম ভেঙে জেগে গিয়ে বন্ধ করে শব্দসংকেত। চালু করে ইন্টারনেট। যেন গেট খোলার অপেক্ষা, ফটক খুলতেই হইহই করে বাচ্চারা যেমন ঢুকে পড়ে ইশকুলে, অপেক্ষমান বার্তারা মুহূর্তে সশব্দ ঢুকে পড়ে ফোনে। নিবেদিতার বার্তা দেখে চমকায়। বিছানা ছাড়ে দ্রুত।

‘কবীরদার খোঁজে চললাম। কলকাতায় বসে থেকে লাভ নেই!’

দু’বার করে পড়ে নিবেদিতার বার্তা। এর মানে কী, কোথায় চলল?

ফোন করে নিবেদিতাকে।

‘আপনি কোথায় এখন?’
‘এইমাত্র বাগডোগরা চেক আউট করলাম, এবার যাব এনবিইউতে।’
‘সরসিজ বিশ্বাস!’
‘উনি ইনভাইট করে খানদাকে নিয়ে গিয়েছেন—কালিম্পং মনাস্ট্রির কথাও উনি বলেছেন—ওঁর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।’

নিশ্চুপ ডিকে। নিবেদিতা থামে না।

‘তারপর শিলিগুড়ি কমিশনারেট। তদন্তের গতিপ্রকৃতি দেখব, গা-ছাড়া ব্যাপার দেখলে কাল থেকে মিডিয়ায় লাগাতার লিখব, বলব! কালিম্পংও যাব!’
‘কালিম্পং-এ এই মুহূর্তে কলকাতা পুলিশের রিয়াজ আলম রয়েছে—খুব ভালো অফিসার—ওর সঙ্গে—’
‘গোটা পাহাড় ঢুঁড়ে ফেলব আমি খানদাকে খুঁজতে! কলকাতায় বসে বসে তত্ত্বের পাঁচালি পড়ে লাভ নেই! ওকে, এখন রাখি, কী হল জানাব আপনাকে।’

ফোন রেখে খানিক চুপচাপ বসে থাকে ডিকে। লম্বা একটা শ্বাস ফেলে। নিবেদিতা হঠাৎ এতটা উত্তেজিত হয়ে গেল কেন! সব কথা শুনতেও চাইল না! ডিকের ওপরও একটা চাপা ক্ষোভ আছে বলে মনে হল! অস্বস্তি তৈরি হয় ভেতরে। ‘তত্ত্বের পাঁচালি’র খোঁচা বিঁধেছে ভালোই। ফোন করে গৌরাঙ্গকে।

‘হ্যাঁ বলুন ডিকেবাবু, খবর পেয়েছেন?’
‘হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন কেন নিবেদিতা?’
‘নিবু কেমন ইমোশনাল আর সেনসিটিভ আপনি তো জানেন ডিকেবাবু! তাছাড়া খানদাকে ও কী চোখে দেখে তাও আপনি জানেন! কাল আপনাকে মেট্রো স্টেশনে নামিয়েই আমায় ডিসিশন জানাল। অফিসে ফোন করে ফার্স্ট ফ্লাইটের টিকিট ম্যানেজও করে ফেলল! রাতে আপনাকে জানাতে চাইলাম, বারণ করল, বলল, ডিকেবাবুকে মেসেজ করে দেব!’
‘দেখুন গৌরাঙ্গ, জার্নালিস্ট হিসবে উনি প্রো-অ্যাকটিভ হতেই পারেন, কিন্তু এটা ইমোশনাল কেস নয়—জটিল খুবই জটিল! কেবল জটিলও নয়, যে কোনও মুহূর্তে খুবই ভয়ঙ্কর দিকে টার্ন নিতে পারে!’
‘এসব নিবুকে বোঝানোর ক্ষমতা কারও নেই! ভগবান ভরসা!’ অসহায় গৌরাঙ্গ।

অফিসে যাওয়ার পথে ফোন আসে তনুময় পালের। ছ’টা নাগাদ মিউজিয়ামে যেতে বললেন। একজন তিব্বত বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাবেন।

১৯ অক্টোবর। সকাল। লাসা রেস্তোরাঁ। কালিম্পং।

চার-পাঁচদিন হয়ে গেল কালিম্পং-এ, একদিনও সূর্যোদয় দেখা হয়ে ওঠেনি। অ্যালার্ম দিয়ে আজ উঠে পড়েছিল সাড়ে পাঁচটায়। অতিথিশালার জানালা দিয়েই দৃশ্যমান কাঞ্চনজঙ্ঘা। মুগ্ধ হয়ে যায় রিয়াজ। দক্ষ শিল্পীর মারকাটারি আলোকসম্পাত। দরজা খুলে দাঁড়ায় ঝুলবারান্দায়।

সামনে গিরিখাতে বয়ে চলেছে তিস্তা। বর্ষার তিস্তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল ফারাক। তখন ঘোলা জলের তিস্তা, এখন শান্ত সবুজ। ঘন সবুজ পাহাড় থেকে চুঁইয়ে নামছে কুয়াশা। তাদের শরীরেও যেন সবুজ রঙ মাখিয়ে দিয়েছে জংলী পাহাড়। সবুজ কুয়াশা টপকে চোখ যায় দূরে। দিগন্তে শায়িত তথাগত'র শরীর। সদ্য-জাগ্রত সূর্যের আলো মায়াময়। সফেদ বরফ সেই বর্ণালির স্পর্শে উল্লসিত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আলোয় আলোয় শ্রদ্ধাঞ্জলি। কুম্ভকর্ণ। কর্বু উত্তর। কর্বু দক্ষিণ। কাঞ্চনজঙ্ঘা। পাণ্ডিম। ঝলমল করছে শায়িত বুদ্ধের পাঁচ উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ।

রেস্তোরাঁয় বসে নেট ঘেঁটে দেখে নেয় স্লিপিং বুদ্ধ'র প্রধান শৃঙ্গগুলোর নাম। তাশি নামডোলকে ছাড়াই আজ প্রাতরাশে এসেছে রিয়াজ। গত চারদিনে লাসায় জলখাবার খেতে মাত্র একদিনই এসেছিল। গেস্ট হাউজের ক্যান্টিনেই খেয়ে নিয়েছিল সকালের খাবার। তবে তাশিকে ছাড়া লাসায় এই প্রথম ঢুকল সে। তাশিকে এড়িয়ে কালিম্পং ঘুরতে বলেছে ডিকেদা। ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাশি থাকলে প্রকৃত তথ্য পেতে অসুবিধা হবে। এর কারণ তাশি পুলিশ। পুলিশকে কোনও তথ্য দেবে না পাহাড়ের মানুষ।

বিপ্লবী লামার পেছনে বিপুল জনসমর্থন আছে বোঝাই যাচ্ছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে, দক্ষিণে, কোনের দিকের টেবিলে চলে যায় রিয়াজ। ভিড় এড়াতে একটু সকাল সকালই এসেছে।

লোকজন প্রায় নেই। তাদের আসতে এখনও প্রায় আধঘণ্টাখানেক দেরি। রিয়াজ চেয়ারে গিয়ে বসতেই এগিয়ে আসে রাবতেন।

‘স্যার, আজ একা এলেন! তাশি স্যার নেই!’
‘তাশি কাজে ব্যস্ত, পরে আসবে। রাবতেন, তোমার বাড়ি কি এখানেই?’
‘না স্যার, সিকিমে। রাভাংলা।’
‘এখান একা থাক?’
‘আখু’র সাথে থাকি।’
‘আখু?’
‘আঙ্কল—আঙ্কলের সাথে থাকি।’ হাসে রাবতেন।
‘তোমরা বুদ্ধিস্ট?’
‘ইয়েস স্যার, আমরা বুদ্ধিস্ট। রোলাং মনাস্ট্রিতে আমার দাদা পড়াশোনা করে—ও লামা হবে।’
‘আচ্ছা এমন কোনও লামার কথা জান, যার গায়ে বাঘের গন্ধ?’

রিয়াজ লক্ষ করে, প্রশ্নটা শুনেই রাবতেনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। দ্রুত চলে যায় টেবিলের সামনে থেকে। কিছুক্ষণ পরে অন্য একজন এসে বাটার টি রেখে যায় তার সামনে। আলতো চোখে রাবতেনের গতিবিধি নজর করে রিয়াজ। বেশ কিছুক্ষণ সে অদৃশ্য। সম্ভবত রান্নাঘরে ছিল। বেরোয়নি। দু-একজন করে খদ্দের প্রাতরাশের উদ্দেশ্যে টেবিলে এসে বসতেই আবার বেরোয় সে। অর্ডার নেয়, পেয়ালা-পিরিচ, থালা-বাটি সাজায়। জল দেয়। কিন্তু কিছুতেই রিয়াজ-মুখো হয় না। কিঞ্চিৎ অবাক হলেও রিয়াজ বোঝে, রাবতেন কিছু জানে।

অন্য ওয়েটার এসে খাবারের অর্ডার নেয়। খাবার দিয়েও যায়। কিন্তু কিছুতেই এদিকপানে হয় না রাবতেন। চুপচাপ খেয়ে যায় রিয়াজ। খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে এসে বসে চেয়ারে, বিল নিয়ে এগিয়ে আসে রাবতেন। চোখে ইশারা। বিলের নীচে এক টুকরো কাগজ। টাকাটা প্লেটে রেখে রিয়াজ সন্তর্পণে তুলে নেয় কাগজের টুকরোটা। রাখে

বুকপকেটে। চলে যায় রাবতেন। কাউন্টারে দাম মিটিয়ে আবার এসে দিয়ে যায় অবশিষ্ট পয়সা। বকশিস মিটিয়ে উঠে পড়ে রিয়াজ।

বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করে। কালিম্পং থানায় একবার যাওয়া দরকার। কিছুদূর এগিয়ে পকেট থেকে বার করে কাগজের টুকরোটা। দুটো শব্দ লেখা আছে রোমান হরফে। পড়ে অবাক হয়। কাগজটা আবার ঢুকিয়ে রাখে বুকপকেটে। এই দুই শব্দ লিখে কী বলতে চায় রাবতেন। এটাই কি সেই লামার নাম? কিন্তু এমন নাম কেন? লামাদের কি এমন নাম হয়? না কি নিকনেম, এই নামেই তিনি পরিচিত পাহাড়ে?

হাজার প্রশ্নের ঝাঁক ঘিরে ধরে রিয়াজকে। এই নামটা স্থানীয় কোনও লোককে জানান উচিত হবে কি? তাশি? না, জানান যাবে না তাশিকেও। ডিকেদাকে জানান দরকার। তাঁর কথা মতোই সে আজ একা এসেছে লাসা রেস্তোরাঁয়। রাবতেনের গোপনীয়তা দেখেই বোঝা গেছে ডিকেদার কথা ঠিক। সহজে এই লামার সম্পর্কে পাহাড় থেকে কিছু জানা যাবে না।

রিয়াজ এগিয়ে যায় থানার দিকে। অজান্তেই বেড়ে যায় তার হাঁটার গতিবেগ। ফোন বাজে পকেটে। তাশি।

‘হ্যালো, মিস্টার নামডোল বলুন?’
‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বড়ুয়া হ্যাভ বিন ফাউন্ড!’
‘কোথায়?’ উত্তেজিত রিয়াজ।
‘নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে অ্যাম্ব্যুলেন্সে করে কেউ ফেলে গেছে—বেহুঁশ ছিল—এখন জ্ঞান ফিরেছে!’
‘অর্হৎ বড়ুয়া?’
‘বাচ্চাটা নেই স্যার!’
‘গেট রেডি তাশি, যেতে হবে! আমি আসছি!’
‘ইয়েস স্যার!’

রিয়াজ দৌড়োয় থানার দিকে। ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা।

৮৩

১৯ অক্টোবর। কলকাতা।

অফিসে পৌঁছে ডিকে কাজে-বসেছে-কী-বসেনি, রজতের ফোন। অঞ্জনা ও সন্দীপ বড়ুয়ার খবরটা দেয়। অর্হৎ বড়ুয়া এখনও নিখোঁজ।

'আরও একটা খবর আছে! দিল্লির হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে কাল রাতে এসেছে—পাহাড়ের একটা টিবেটান গেরিলা গ্রুপের লামাকে কলকাতায় দেখা গেছে—তের তারিখ দার্জিলিং মেলে চেপেছেন—চোদ্দোয় নেমেছেন এনজেপিতে—সেদিনই পাহাড়ে উঠেছেন—কোথায় গেছেন খবর এখনও পাওয়া যায়নি—এই লামা অ্যান্টি-চায়না অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে জড়িত —ডিজিসাহেব জানালেন—রাজ্যপুলিশকে দিল্লি অ্যালার্ট করেছে।'

'দাওয়া লামা?'

'না, অদ্ভুত নাম!'

'কী?'

'টাইগার লামা!'

'তাহলে দাওয়া লামা আর টাইগার লামা একই লোক!'

'তাই হওয়া উচিত! তের তারিখের দার্জিলিং মেলে আর কোনও লামা ছিল না!' রজত বলে।

'মিউজিয়ামে স্টাফ দেখল মহাকালের মুখোশ, সেই মুখোশ দার্জিলিং মেলে দাওয়া লামা দিল অর্হৎ বড়ুয়াকে, দিল্লি বলছে তের তারিখের দার্জিলিং মেলে ছিল টাইগার লামা, সেই লামা একজন টিবেটান রেবেল!' স্বগতোক্তির ঢঙে সংযোগসূত্র খোঁজে ডিকে।

'একই মুখোশ নাও হতে পারে, তবে দুটোই মহাকালের মুখোশ!'

‘একই মুখোশ হলে লিঙ্কটা থাকে, নাহলে নয়। এদিকে কালিম্পং-এও লামা!’
‘সবই কি একজন লামা, দাওয়া বা টাইগার!’ রজত কিছুটা বিভ্রান্ত।
‘টিবেটান রেবেল বুঝতে পারলাম কিন্তু বাচ্চাটাকে কিডন্যাপ করল কেন?’ বিভ্রান্ত ডিকেও।
‘মূর্তি চুরি, বাচ্চা চুরি, গবেষক চুরি—লামার কাজকম্মো তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! কী চায়! তুই বিকেলে আয় একবার লালবাজার। শুনলাম মহাবোধি আজ বিকেলে বাচ্চাটার বাবা-মাকে নিয়ে পিসি করবে শিলিগুড়ি প্রেস ক্লাবে! সিবিআই প্রোব চাইবে মোস্ট প্রোবাবলি!’

রজতের ফোন ছেড়ে কাজে বসে ডিকে। মাথাকে আপাতত অপহরণ মুক্ত করতে চাইলেও পারে না, নাছোড় ফেরিওয়ালার মতো বারে বারে হানা দেয় অদ্ভুত নামের তিব্বতি সন্ন্যাসী। টাইগার লামা। ততোধিক অদ্ভুত তাঁর কাজ। তাঁর চিন-বিরোধী হওয়ার সঙ্গত যুক্তি আছে কিন্তু মিউজিয়াম থেকে একটি মূর্তিচুরি, সাত বছরের এক শিশু ও এক প্রৌঢ়কে অপহরণের যুক্তি কী? নিজেকে ক্রমাগত বিভ্রান্তির মধ্যে না-জড়িয়ে কাজ মন দেয় ডিকে।

৮৪

১৯ অক্টোবর। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ। শিলিগুড়ি।

হাসপাতালে একই কেবিনে রাখা হয়েছে দু’জনকে। ঘরের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। চিকিৎসক ও নার্স ছাড়া কারোরই ঢোকার অনুমতি নেই। অঞ্জনা ও সন্দীপ এখন অনেক সুস্থ। অঞ্জনার কান্না যদিও থামেনি। তাকেই অতিরিক্ত নজরে রেখেছেন চিকিৎসকরা।

এগারোটা কুড়ি নাগাদ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অফিসে পৌঁছে যায় রিয়াজ। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সঙ্গে পৌনে বারোটা নাগাদ যায় মেডিক্যাল কলেজ।

কেবিনের দরজা বন্ধ করে একজন চিকিৎসক ও নার্সের উপস্থিতিতে তারা শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ। ভিডিওগ্রাফি করেন একজন পুলিশকর্মী।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠা ইস্তক পরের দিন এনজেপি স্টেশন পর্যন্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেয় সন্দীপ। কান্না থামিয়ে মাঝে মাঝে নিজের অভিজ্ঞতা বলে অঞ্জনা। অঞ্জনার কথাগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ হয়ে ওঠে রিয়াজের কাছে।

'লামার চোখগুলো ভয়ঙ্কর—যেন ভেতরটা পড়ে নিচ্ছে—বারবার আমার ছেলেকে বলছে, অর্হৎ নয়, বোধিসত্ত্ব হতে হবে—বোধিসত্ত্ব হতে হবে—বহু মানুষের মঙ্গলের জন্য এগিয়ে আসতে হবে, নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে—কেন এমন বলছে বুঝতেই পারছিলাম না—প্রথমদিকে ওর সঙ্গে কথা বলে বেশ ভাল্লাগছিল—কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা কেটে গেল—ভয় করতে লাগল—কু ডাকছিল মনটা—আমি নিশ্চিত এই কিডন্যাপিং-এর পেছনে ওর হাত আছে—'
'কোনও গন্ধ পেয়েছিলেন কামরায়—বোটকা গন্ধ?' নিশ্চিত সূত্র পেতে চায় রিয়াজ।

গন্ধের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে অঞ্জনা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ লামা কামরা থেকে নেমে যাওয়ার পর একটা গন্ধ পেয়েছিলাম—আমি সন্দীপকে বললামও!' তারপর সন্দীপের দিকে ফিরে, 'কী গো মনে আছে তোমার?'

হ্যাঁ-বাচক মাথা নাড়ে সন্দীপ।

'শিলিগুড়িতে কাজ সেরে উনি সিকিম যাবেন বললেন?' আরও একবার শুনতে চান অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।
'চোদ্দ তারিখ রবিবার ধর্মচক্র প্রবর্তন দিবস—উনি গ্যাংটকের রুমটেক মনাস্ট্রি যাবেন।' সন্দীপ বলে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রজতকে রিপোর্ট করে রিয়াজ।

৮৫

১৯ অক্টোবর। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

'আপনি উপন্যাসটার খোঁজ পেলেন কীভাবে?'

'জুনের মাঝামাঝি আমার কাছে একটা ফোন আসে—কালিম্পং-এর এক গুম্ফায় দু'টো পুরানা খাতা পাওয়া গেছে—বাংলায় লেখা কাহানি। আমি পাত্তা দিইনি—'

'ফোন কে করলেন, ওই লামা?'

'বলছি—আমি পাত্তা দিইনি—পরে আবার একদিন ফোন—জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সরসিজ বিশ্বাস, বাংলার অধ্যাপক? আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? বললেন, আমি কালিম্পং-এর জোগচেন গুম্ফার লামা। নিজের পরিচয় দিয়ে আবার বললেন, আমাদের মনাস্ট্রি থেকেই একজন আগে ফোন করেছিল আপনাকে—আপনি ধ্যান দেননি —উনি আবার বাংলা কাহানির কথা বললেন—'

'বাংলায় বললেন?'

'একটু হিন্দি টান আছে—তবে মোটামুটি পরিষ্কার বাংলা—লামা বলাতে আমি তখন সিরিয়াসলি নিলাম বিষয়টা—ওই জুনেই গেলাম কালিম্পং—'

'খাতা দু'টো নিয়ে এলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এসবি কি শরদিন্দু?'

'হতে পারে। মুম্বইতে ওঁর ছেলে থাকেন—তাঁকে খাতার পাতা স্ক্যান করে মেল করেছি—এখনও কিছু জানাননি।' সরসিজ বলেন।

'দেখান যাবে?'

'কী?'

'খাতা?'

‘ডিটিপি করে আবার ফেরত দিয়ে দিতে হয়েছে—’
‘যাহ্!’ হতাশ নিবেদিতা।

ভেতর থেকে চা নিয়ে আসেন এক মহিলা। মৃদু হাসেন। অতিথির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন সরসিজ।

‘আমার স্ত্রী বনানী।’ তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে, ‘ইনি নিবেদিতা বাল্মীকি—জার্নালিস্ট—ভোরের কাগজ-এর অ্যাসিট্যান্ট এডিটর—তোমায় বলেছিলাম এঁর কথা—কবীর খান কালিম্পং-এ মিসিং—খোঁজ নিতে এসেছেন—’ নিবেদিতার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, ‘আমরা কিন্তু থানায় একটা মিসিং ডায়েরি করে দিয়েছি গত পরশু—নিন চা খান।’

হাতজোড় করে নমস্কার করেন বনানী। প্রতি-নমস্কার করে নিবেদিতা। ফিরিয়ে দেয় হাসিও। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বলে,

‘কলকাতাতেও ডায়েরি করা হয়েছে—’
‘উনি গুম্ফায় না-গিয়ে কোথায় গেলেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না!’ চিন্তার ছাপ সরসিজের কণ্ঠে।
‘কোন গাড়িতে গিয়েছিলেন উনি?’
‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম!’
‘ড্রাইভার কী বলছেন?’
‘সেই গাড়ি খারাপ হয়ে যায়—ড্রাইভার ওঁকে অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে—সেই ড্রাইভার গুম্ফার সামনে নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—কবীরবাবুই ড্রাইভারকে বলেছেন চলে যেতে—ফেরার ব্যবস্থা উনি নিজেই করে নেবেন—’
‘কবীর খান ড্রাইভারকে চলে যেতে বলেছেন!’
‘ড্রাইভার তো তাই বলল! শুনে আমি কবীরবাবুকে ফোন করি, ফোন কিছুতেই ঢুকল না—নট রিচেবল!’

থম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকে নিবেদিতা। তারপর চায়ের পেয়ালায় ছোট্ট চুমুক। ধীরে ধীরে বলে,

‘আপনি লেখাটা ক্যুরিয়র করলেন, ক্যুরিয়র কোম্পানি পৌঁছে না-দিয়ে মাঝখান থেকে কোনও এক চিত্রক চন্দ্র গিয়ে হাতে-হাতে দিয়ে এল সেই লেখা—খানদার সঙ্গে গপ্পো-টপ্পোও করল—আপনাকে ফোন করে জানালেন খানদা, আপনি বললেন চিত্রক চন্দ্র নামে ইউনিভার্সিটিতে কেউ নেই, আপনি চেনেনও না এমন নামের কারোকে—’

বিহ্বল সরসিজ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক নিবেদিতার, তারপর আবার বলে,

‘খানদা’র কালিম্পং যাওয়ার কথা আপনার সঙ্গে—কিন্তু আপনি গেলেন না! গাড়ি ঠিক করে দিলেন—সেই গাড়ি মাঝপথে বদলে গেল—ড্রাইভার দাঁড়িয়ে থেকে ওঁকে আবার নিয়ে আসার কথা—কিন্তু ড্রাইভার দাঁড়াল না—সরসিজবাবু, কবীর খানকে আমি দাদা বলি, কিন্তু উনি আমার পিতৃতুল্য—আমি এখানে কেবল সাংবাদিক হয়ে আসিনি, বলতে পারেন নিখোঁজ বাবার খোঁজে তাঁর মেয়ে এসেছে—আপনিই ভরসা—যদি কোনও এক্সট্রা ইনফর্মেশন জানেন, আমাকে জানাবেন প্লিজ!’

নিবেদিতার কাটাকাটা কথায় বেশ ঘাবড়ে যান সরসিজ বিশ্বাস। কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে। ওঁর স্ত্রী বনানী কিছুটা গলা তুলে বলেন,

‘একি, আপনি ওনাকে দোষারোপ করছেন নাকি!’
‘না, তা করছি না, গোটা ঘটনায় সরসিজবাবুর একটা ভূমিকা আছে, সে ইচ্ছাকৃত না কি অনিচ্ছাকৃত আমি জানি না—আমি কেবল মনে করিয়ে দিলাম।’ ঠান্ডা স্বরে আবার কেটেকেটে উচ্চারণ নিবেদিতার।
‘ইচ্ছাকৃত!’ কঁকিয়ে ওঠেন সরসিজ।

‘আচ্ছা আর একটা কথা সরসিজবাবু, উপন্যাসটা পড়ে আপনার কেন মনে হল কবীর খানকে লেখাটা পড়ান দরকার?’

‘কবীর খানের কাজের সঙ্গে আমি কিছুটা পরিচিত—পড়েই মনে হল ওঁর কাজের সঙ্গে উপন্যাসের খুব মিল!’ কাচুমাঁচু মুখেই প্রত্যুত্তর দেন সরসিজ।

‘সে তো খানদা’র রিসেন্ট কাজ—আনপাবলিশড! সেই কাজের খবর আপনি জানলেন কী করে?’

‘রি-রিসেন্ট কাজ নয়, বাৎস্যায়নের কামসূত্র নিয়ে উনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা প-পত্রিকায়—৪৯ বায়ু—’ আমতা-আমতা করেন অধ্যাপক।

নিবেদিতার আক্রমণ সটান। ফলত নির্দয়।

আক্রমণের মুখে পড়ে বেশ কিছুটা লণ্ডভণ্ড হয় যান সরসিজ। আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি যুগিয়ে উঠতে পারেন না তিনি। স্ত্রী বনানীও বিমূঢ়।

‘ওকে, আমি এবার উঠি, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে যাব একবার, বাই!’

পুলিশ কমিশনারেটের কথা শুনে চমকে যান বনানী। দৃশ্যত ভীত দম্পতিকে ছেড়ে কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে আসে নিবেদিতা। সে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুলে নেন সরসিজ। উদ্দিষ্ট নাম্বার খুঁজে কল করেন।

‘আমায় সন্দেহ করছে! মেট্রোপলিটান পুলিশ আমার কোয়ার্টার্সে এলে মানসম্মান যাবে! আটকাও!’

১৯ অক্টোবর। শিলিগুড়ি।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অফিসে আবার ফিরে আসে রিয়াজ। একটু ফুরসত ও সুযোগ পেতেই এসি'র ঘর থেকে বেরিয়ে ডেকে নেয় তাশিকে।

'কী ব্যাপার মিস্টার নামডোল, হঠাৎ ডাউন হয়ে গেলেন কেন?'

আজ সকালে লাসা রেস্তোরাঁ থেকে দ্রুত দৌড়ে থানায় গিয়ে, গাড়ি নিয়েই বেরিয়ে যায় তারা। শিলিগুড়ির হাসপাতালে গিয়ে অঞ্জনা ও সন্দীপ বড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলার তাগিদ তৈরি করে বাড়তি উত্তেজনা। নতুন কোনও সূত্র বা দৃষ্টিকোণ মিলতে পারে বড়ুয়া দম্পতির সৌজন্যে। গাড়িতে বসেই রিয়াজ লাসা রেস্তোরাঁর ওয়েটার রাবতেনের দেওয়া কাগজটা দেখায় পাশে বসা তাশিকে। নামটা দেখে কেবল চমকেই যান না তাশি, মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে যান। গোটা রাস্তায় তেমন আর কথাই বলেন না। ঘাঁটায় না রিয়াজ। কথা না-বলে বাকি রাস্তা কাটিয়ে দেয় ইন্টারনেটে।

'আমাকে এই কেস থেকে ছেড়ে দিন স্যার!'
'সেকি মিস্টার নামডোল, কেন? এনি প্রবলেম!'
'এক্সিউজ মি স্যার, বলতে পারব না! তবে এইটুকু আপনাকে বলতে পারি, এই কেসে থাকলে আমি আর কালিম্পং-এ থাকতে পারব না!'

অবাক হয় রিয়াজ। কে এই লামা, যাঁর নাম শুনে ভয়ে ও ভক্তিতে সকলে তটস্থ! তাশিকে একা থাকতে দিয়ে, করিডরের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা অংশে এসে, ফোন করে ডিকেকে।

'বলো রিয়াজ?'
'ডিকেদা, লোকটার নাম টাইগার লামা!'

লাসা রেস্তোরাঁর ওয়েটার রাবতেনের তথ্যপ্রদান, তাশি নামডোলের বিপন্নতা ও বড়ুয়া দম্পতিকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বিস্তারিত জানায়। রজতের থেকে প্রাপ্ত টাইগার লামা সম্পর্কিত দিল্লির তথ্য কিছুই জানায় না ডিকে রিয়াজকে। সরকারি গোপন তথ্য অন্য কারোকে জানাবার অধিকার তার নেই। জানাতে চাইলে রজত জানাবে।

‘গুড জব রিয়াজ! আস্তে আস্তে জট খুলছে। ওকে, টেক কেয়ার!’

ডিকের ফোন ছেড়ে আবার এসি’র ঘরে দিকে এগোতেই একজন সেন্ট্রি এসে খবর দেন, তাকে তলব করেছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের সিপি। লম্বা পা ফেলে রিয়াজ এগোয় সিপি’র ঘরের দিকে।

‘রিয়াজ, বোসো, মিট হার! ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন—জার্নালিস্ট—নিবেদিতা বাল্মীকি—অ্যানাদার মিসিং পার্সন কবীর খানের পরিচিত।’ তারপর নিবেদিতাকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘রিয়াজ আলম। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ফ্রম লালবাজার। উনি আপনাকে হেল্প করবেন।’

কমিশনারের ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ে ভদ্রমহিলাকে। শাদা ফুলহাতা শার্ট, থ্রি কোয়ার্টার করে গোটান। নীল জিনস। চোখে চশমা, পিঠে ব্যাকপ্যাক। ভদ্রমহিলাকে হালকা জরিপ করে রিয়াজ।

নিবেদিতা তার দিকে তাকিয়ে বলে, ‘হ্যালো!’ প্রত্যুত্তরে সে-ও বলে, ‘হ্যালো, চলুন।’
‘কোথাও একটু বসে যতটুকু জানানোর জানিয়ে দিন, রিয়াজ। ক্যান্টিনে চলে যান, চা খেতে খেতে—’ হেসে বলেন সিপি।
‘ওকে, স্যার!’

স্যালুট করে বেরিয়ে যায় রিয়াজ। পেছনে নিবেদিতা।

ক্যান্টিনে গিয়ে চেয়ারে বসে ব্যাকপ্যাকটা আরেকটা চেয়ারে রাখে নিবেদিতা। চায়ের অর্ডার দিয়ে রিয়াজও বসে।

‘বলুন কী জানতে চান?’ সরাসরি প্রসঙ্গে আসে রিয়াজ।
‘ভালোই হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে—ডিকেবাবু বলেছিলেন আপনি কালিম্পং-এ আছেন —শিলিগুড়িতেই পেয়ে যাব ভাবিনি!’ হেসে বলে নিবেদিতা।

অবাক হয় রিয়াজ। নিবেদিতা হেসে সবটা খুলে বলে। টেবিলে চা দিয়ে যায় একজন। ব্যাগ থেকে নিজের কার্ড বার করে নিবেদিতা। পেছনে ছোট্ট সই করে কার্ড দেয় রিয়াজকে। নিবেদিতার ডান হাতের অনামিকায় দারুণ একটা আংটি নজর এড়ায় না রিয়াজের। সম্ভবত হিরের। কার্ডে চোখ বুলিয়ে ওয়ালেটে রাখে। কার্ডের পেছনে নজর কাড়ে ছোট্ট ইনিশিয়াল—এনবি।

‘আপনি আর কিছু খাবেন ম্যাডাম?’ জানতে চায় রিয়াজ।
‘নো থ্যাংকস! সরসিজ বিশ্বাসকে আমি স্কট ফ্রি ছাড়তে রাজি নই! আপনারাও দেখুন!’ কিছুক্ষণ থেমে আবার বলেন, ‘কবীর খানকে উনিই নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে এখানে—কালিম্পং-এও উনিই পাঠিয়েছেন!’

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কাপটা রাখে। কথা বলতে বলতেই দ্রুত হাতে বার্তা পাঠায় ডিকেকে। ‘নিবেদিতা বাল্মীকি হ্যাজ মেট মি ইন শিলিগুড়ি কমিশনারেট।’

‘মূর্তিচুরি আর বাচ্চা-চুরির লিঙ্ক করতে পারছি না ম্যাডাম, আবার এর মধ্যে কবীর খান মিসিং, জটিল ধাঁধা তৈরি হয়ে যাচ্ছে একের পর এক! দেখা যাক!’ হেসে বলে রিয়াজ।
‘পুলিশকে অনেক বেশি অ্যাকটিভ হতে হবে! একজন ড্রাইভারকে খুঁজে পেতে এত সময় লাগছে!’

মহিলা আক্রমণাত্মক। সাংবাদিকসুলভ। সিপিসাহেবের কথা কানে বাজে, '... যতটুকু জানানোর জানিয়ে দিন, রিয়াজ!' পরিচিতির সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত তথ্য জানার চেষ্টা করবেন নিশ্চিত, মনে মনে সাবধান হয় রিয়াজ।

জবাব আসে ডিকের। 'ডোন্ট শেয়ার অল ইনফোজ! উনি কবীরদার খুব ক্লোজ। আমার পরিচিত। রজতও চেনে। ভোরের কাগজের অ্যাসিট্যান্ট এডিটর। হেল্প চাইলে হেল্প কোরো বাট হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার!' কথা বলতে বলতেই বার্তা দেখে নেয় রিয়াজ।

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে চলে যায় নিবেদিতা। বিকেলে কালিম্পং ফিরবে রিয়াজ, সেই গাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে রাজি হয় নিবেদিতা। বিকেলে বড়ুয়া দম্পতিসহ মহাবোধির সাংবাদিক সম্মেলন সেরে সে অপেক্ষা করবে শিলিগুড়ি প্রেসক্লাবে, রিয়াজ প্রেসক্লাব থেকে তাকে গাড়িতে নিয়ে নেবে।

৮৭

১৯ অক্টোবর। কলকাতা।

যদি তোমাদের মন বদলে যায়, যদি তোমরা বিশ্বাসঘাতক হও, তাহলে এইসব দেবতারা তা পরিষ্কার দেখতে পাবেন ও তোমাদের এই রকম শাস্তি দেবেন। জুঃ-এম-পদ-নি-মো।

ফোনের পর্দায় লেখাটা দেখতে দেখতে হাসেন পেমা দোলমা। টালিগঞ্জের বাদামতলায় তিব্বতি আয়ুর্বেদ ইন্সটিটিউটের একজন প্রথিতযশা আমচি তিনি। হাসিমুখী পেমাকে হাসিমুখেই নিরীক্ষণ করে ডিকে।

সন্ধে ছ'টা নাগাদ, অফিস-ফেরত, মিউজিয়ামে পৌঁছোতেই তাড়াহুড়ো করেন অপেক্ষমান কিউরেটর তনুময় পাল। যেতে হবে টালিগঞ্জ। পেমা দোলমা এক তিব্বতি আমচি।

তনুময়ের গাড়িতে যেতে যেতেই কথা হয়।

‘আমচি কী?’
‘তিব্বতি কবিরাজ বলতে পারেন। তিব্বতে এক অতি প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি আছে—সওয়া রিগপা—’
‘সওয়া রিগপা!’ অচেনা শব্দবন্ধ উচ্চারণ করে ডিকে।
‘এ আসলে এক প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি—বুডঢিজম তো আর ভারত থেকে দেশে দেশে একলা ছড়ায়নি, ধর্মের সাথে সাথে বাণিজ্য থেকে ভারতীয় আয়ুর্বেদ, সব ছড়িয়ে পড়েছিল—অরুণাচল থেকে সিকিম, দার্জিলিং পাহাড় হয়ে হিমাচল, লাদাখ—চিন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া এই পুরো ট্রান্স হিমালয়ান অঞ্চলের ট্র্যাডিশনাল চিকিৎসা পদ্ধতি হচ্ছে সওয়া রিগপা—এমনকি রাশিয়াতেও এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা চলে!’
‘আপনি পেমা দোলমার পেশেন্ট নাকি?’

ডিকের প্রশ্নে হা-হা করে হাসেন তনুময় পাল।

‘পেমা ডোলমা এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার একজন নামকরা আমচিই নন, ভদ্রমহিলা টিবেট নিয়ে জানেনও বিস্তর। নিজে টিবেটান, কেবল প্রাচীন নয়, বর্তমান টিবেট নিয়েও খোঁজ রাখেন। পড়াশোনা করেন—’
‘সওয়া রিগপায় আকুপাংচার আছে?’ ডিকে অনুসন্ধিৎসু।
‘আছে। হাতের নাড়ি টিপে, ইউরিন দেখে আর পেশেন্টকে প্রশ্ন করে করে তার সম্পর্কে জেনে চিকিৎসা হয়—আকুপাংচারও হয়—প্রাচীন কিন্তু এত ওয়েল ডকুমেন্টেড চিকিৎসাশাস্ত্র খুব কম আছে—সংস্কৃতে লেখা ছিল একসময়—পরে টিবেটান ভাষায় পাওয়া যায় এই শাস্ত্র—সওয়া রিগপা নামটাও ভোটভাষা—’

কামসূত্র উপন্যাসের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে ডিকের। ভোটদস্যুর ছুরিকায় আহত দীপনকে নাড়ি টিপে ভেষজ লেপন দিচ্ছে বৃন্দা। সে ভোটদেশীয় তান্ত্রিকের সাধনসঙ্গিনী ছিল, হয়ত ভোটদেশীয় আয়ুর্বেদই প্রয়োগ করেছিল।

‘তাও তো এই চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুটা টিকে আছে আমাদের দেশে—আমাদের বহুশাস্ত্রই আর আমাদের দেশে নেই, অন্যদেশের মানুষ রক্ষা করছে—’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ডিকে।

তারপর নিশ্চুপ বয়ে যায় কিছুটা সময়। কেউই কোনও কথা বলে না। গাড়ির জানালা দিয়ে সন্ধের ব্যস্ত কলকাতা দেখে ডিকে। এক্সাইড মোড়ের সিগনালে থমকায় গাড়ি। তনুময় পালের মাথা ঝুঁকে চিবুক ক্রমশ নিম্নমুখী। ঝিমোচ্ছেন। সবুজ হয় আলো। চলতে শুরু করে গাড়ি। ফোন তুলে সময় দেখে ডিকে। প্রায় সাড়ে ছ’টা। এলগিন পেরিয়ে ভবানীপুরের দিকে এগোয়। যানজট রাস্তায়। সব ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে এখনও মিনিট দশেক লাগবে আমচি পেমা দোলমার দেখা পেতে।

তিব্বতি আয়ুর্বেদ ইন্সটিটিউটে যখন গাড়ি পৌঁছাল, ঘড়িতে প্রায় পৌনে সাতটা।

লেখাটা বেশ কিছুক্ষণ দেখে ফোনটা ডিকেকে ফিরিয়ে দিলেন পেমা দোলমা।

‘ওম মণি পদ্মে হুম—শুনেছেন?’
‘তিব্বতি বৌদ্ধদের বীজমন্ত্র!’ ডিকের উৎসাহী উত্তর।
‘ঠিক। পোন গ্রন্থে একে বিকৃত করে জুঃ-এম-পদ-নি-মো লেখা হয়েছিল।’ পেমা জানান।
‘ওঁ মণি পদ্মে হুঁ, এর বিকৃতরূপ জুঃ-এম-পদ-নি-মো?’ বুঝে নিতে চায় ডিকে।

হ্যাঁ-বাচক মাথা নেড়ে হাসেন পেমা দোলমা।

‘বিকৃত কেন?’ আবার প্রশ্ন ডিকের।
‘আমাদের দেশে বুদ্ধিজম খুব সহজে ঢুকতে পারেনি! সবচেয়ে বড় বাধা ছিল পোন ধর্ম!’
‘পোন কি ধর্ম?’ তনুময় পাল প্রশ্ন তোলেন।
‘পোন-কে ঠিক রিলিজিয়ন বলা যাবে না—মিস্টার পাল ঠিকই বলেছেন—একটা আচার বলা যায়—কাস্টম—ভূত-প্রেত-জাদু-তন্ত্র-পশুবলি-নরবলি সব নিয়ে হল পোন। পোনপাদের

যখন জোর করে বৌদ্ধ ধর্মে নিয়ে আসার চেষ্টা হল, তারা প্রতিরোধ করল, কিন্তু খুব সুবিধা করতে পারল না—তখন এরা তথাগত'র পবিত্র বচনমালাকে বিকৃত করল। যাইহোক, এই পুরো সেনটেন্সে একটা মজা আছে—আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, হঠাৎ এই খোঁজ কেন মিস্টার পাল?'

'আরে আর বলবেন না মিসেস ডোলমা, পরপর কতগুলো ঘটনা ঘটে গেছে—'

ছোটো করে ঘটনার বর্ণনা দেন তনুময় পাল। সবটা শুনে মুহূর্তে বদলে যায় পেমা দোলমার আচরণ। পেশেন্ট আছে, মিটিং আছে ইত্যাদি নানান ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে তিনি নিজের ঘর ছেড়ে উঠে যান। দ্রুত ঢুকে যান আয়ুর্বেদিক ইন্সটিটিউটের অন্দরে। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর, পেমা দোলমার প্রত্যাবর্তনের আশা ত্যাগ করে, হতভম্ব তনুময় পালকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ডিকে।

'কী ব্যাপার বলুন তো মিস্টার কয়াল, এমন কাণ্ড করলেন কেন মহিলা!'

তনুময় পাল কেবল বিহ্বল নন, লজ্জিতও বটে। ডিকেকে তিনিই নিয়ে এসেছেন পেমা দোলমার কাছে সমস্যার সমাধানে।

'টিবেটান বা টিবেটান অরিজিনের কেউই এই নিয়ে মুখ খুলবে না—আমাদের উদ্দেশ্য গোপন করা দরকার ছিল—ভুল করেছি—ভুল!' পস্তায় ডিকে। বিড়বিড় করে, 'পাহাড়ে এই বাধা পাচ্ছে রিয়াজ—লাভার রিঞ্চেন লামা বলেনি—কালিম্পং-এর লোকাল জার্নালিস্ট সোনম শেরিং লেপচা ওপর-ওপর বলে কাটিয়ে দিয়েছে—লাসা রেস্তোরাঁর ওয়েটার রাবতেন ভয় পেয়েছে—উফ, আমিই রিয়াজকে সাবধান করলাম অথচ নিজে সাবধান হলাম না! ধুস!'

তনুময় পাল কিছুটা বুঝে, বেশিটা না-বুঝে বোকার মতো হাসেন।

'আর একজন আছেন—বাঙালি—নো টিবেটান সেন্টিমেন্ট—'

‘কে?’

‘ডাঃ তারকনাথ সাহা!’

‘উফ্ আবার আমচি!’

‘আরে ডক্টরেট, আমচি নন। বিশ্বভারতীর ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডো-টিবেটান স্টাডিজের প্রাক্তন প্রফেসর—আমার চেনা—খুব মজার মানুষ—নিয়ে যাব একদিন আপনাকে। কাছাকাছি বলে পেমা দোলমার কাছে এসেছিলাম—নাহলে স্যারই এই বিষয়ে অথরিটি!’

‘তারক সাহা! মনে পড়েছে! বহুদিন আগে বৌদ্ধধর্ম ও উপনিষদ নিয়ে একটা বক্তৃতা শুনেছিলাম ওঁর—গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে। থাকেন কোথায়?’

‘দূর আছে—সোনারপুর, মিশন পল্লী। রিটায়ার করে ওখানে বাড়ি করেছেন।’

‘চলুন!’

‘এখন?’

‘হ্যাঁ!’

‘ক্ষেপেছেন মশাই—কাল বা পরশু—আজ হবে না!’

‘হাতে সময় নেই তনুময়বাবু, এখনই যেতে হবে—দেরি হলে কিছু একটা ঘটে যাবে!’

‘আজ অনেক রাত হয়ে যাবে!’

‘আপনার বাড়ি কোথায়?’

‘বেহালা!’

‘এখন বাজে সাতটা কুড়ি—কতক্ষণ আর লাগবে, চলুন!’

কিউরেটর তনুময় পালকে রাজি করিয়ে উঠে পড়ে গাড়িতে। আনোয়ার শাহ রোড ধরে গাড়ি এগিয়ে চলে যাদবপুর থানার দিকে। তনুময় ফোন করে দেন তারকনাথ সাহাকে। ডিকে মাকে।

‘আসলে বিকেল হলেই মন বলে, বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল!’ চোখ মটকে হেসে বলেন তনুময়।

‘আজ না-হয় একটু দেরি হবে—রাত পড়ে আছে। জলও।’

তুমুল হাসি তনুময়ের। ‘ভালো বলেছেন। আপনার বাড়ি কোথায় ডিকেবাবু?’

‘নিউ ব্যারাকপুর।’
‘ওমা, সে তো ফার নর্থ!’
‘তাহলে ভাবুন, আমার ফিরতে কত রাত হবে!’
‘আপনি সোনারপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে নেবেন, চাইলে নিউ গড়িয়া থেকে মেট্রোও আছে, সুবিধে হবে।’
‘হুঁ, ঠিক বলেছেন। তাই করব!’

যাদবপুর থানা পেরিয়ে গাড়ি ধরে জীবনানন্দ সেতুর পথ। সেই পথ ধরে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস। বাইপাস ধরে কামালগাজির দিকে এগোয় গাড়ি। তনুময় পাল মাথা ও চিবুক নিয়ে আবার ঝিমুনি অবস্থানে। ড্রাইভার কমবয়েসী একটি ছেলে। চুপচাপ হুকুম তামিল করে চলেছে। তার মসৃণ চালনা দেখে মনে হচ্ছে পথ তার পরিচিত। তনুময় পালের যাতায়াত আছে এই পথে।

জানালার বাইরে তাকায় ডিকে। রাস্তার দু’পাশ আলোয় আলোয় উজ্জ্বল। সচকিত করে বার্তা ঢোকে ফোনে। রিয়াজ। ‘নিবেদিতা বাল্মীকি আমাদের গাড়িতেই কালিম্পং এলেন। জেলা পুলিশের গেস্ট হাউজে ব্যবস্থা করে দিতে চাইলাম, উনি হোটেলে উঠলেন। হোটেল চেরি অর্চ্যার্ড।’ দ্রুত প্রত্যুত্তর টাইপ করে ডিকে। ‘লিভ হার এলোন। তবে চোখে চোখে রেখ। খুব ডেয়ারডেভিল, বিপদে যেন না পড়েন!’

কামাল গাজি মোড় দিয়ে বাঁদিকে সোনারপুরের দিকে ঢোকে গাড়ি। তখনও ঝিমোচ্ছেন তনুময় পাল। ডিকে মাথায় পরপর সাজিয়ে ফেলে জিজ্ঞাস্য। কেবল ধর্মীয় নয়, এই ঘটনায় জড়িয়ে যাচ্ছে তিব্বতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

দিল্লির স্বরাষ্ট্র দফতরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী টাইগার লামা চিন-বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা-হরণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামী কর্মসূচী তিনি নিতেই পারেন, কিন্তু সেই কর্মসূচীর সঙ্গে গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তিচুরি, অর্হৎ বড়ুয়ার

অপহরণ বা কবীর খানের নিখোঁজ হওয়ার যোগ কোথায়! সেই যোগসূত্র উদ্ধার করতে ডিকে হন্যে।

৮৮

১৯ অক্টোবর। মিশনপল্লী। সোনারপুর।

‘এই কথাগুলো পোনপা-দের কথা! পোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল পশুবলি। রাজার প্রতি কর্মচারীরা কতটা অনুগত, তা প্রমাণ করতে প্রতি বছর রাজকর্মচারীদের শপথ নিতে হত। সেই উপলক্ষ্যে হত অনুষ্ঠান। কুকুর, বাঁদর, ভেড়াসহ প্রচুর জীবজন্তুকে নিয়ে ভরিয়ে ফেলা হত অনুষ্ঠানস্থাল। তারপর শুরু হত অদ্ভুত প্রথা!’

তারকনাথ সাহা ফোনের পর্দায় লেখাটা একবার দেখে নিয়ে বলতে শুরু করেছেন। ফোনের রেকর্ডার চালু। অনুমতি নিয়েই রেকর্ডার চালু করেছে ডিকে। বসার ঘরের বড় সোফায় বসে আছেন তনুময় পাল ও ডিকে। মাঝে একটি কাঁচের টেবিল। পাশে একক ছোটো সোফায় বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলে বসে আছেন লুঙ্গি ও ফতুয়া পরিহিত তারকনাথ সাহা। তার পেছনের দেওয়ালে ঝুলছে একটা থাংকা।

‘প্রথমেই সব পশুদের পা ভেঙে দেওয়া হত! তারপর বলি দেওয়া হত! এই কথাগুলো কোথায় পেলেন? এ একপ্রকার সাবধানবাণী!’
‘সাবধানবাণী?’ চিন্তিত মুখে বলে ডিকে।

এই সাবধানবাণী কেন লেখা আছে বইয়ের মোড়কে? কে লিখল? চিত্রক মিত্র? সরসিজ বিশ্বাস যদি সত্যিই ক্যুরিয়ার করে থাকেন তাহলে মোড়কের ওপরে ঠিকানা বা ক্যুরিয়ার কোম্পানির স্টিকার ছাড়া আর কিছু থাকার কথা নয়। যদিও কবীর খানের বাড়িতে প্রাপ্ত মোড়কের ওপর এই বাক্যটি ছাড়া আর কিছুই লেখা ছিল না। এমনকী ঠিকানাও নয়।

ডিকে উঠে যায় থাংকার কাছে। মন দিয়ে দেখে তিব্বতি কারুকাজ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন তারকনাথ।

‘ওটাকে বলে থাংকা, জানেন তো! টিবেটান স্ক্রোল পেইন্টিং। আমার ছাত্র দাওয়া নরবু উপহার দিয়েছিল।’
‘দাওয়া কি খুব কমন টিবেটান নাম, স্যার?’ জানতে চায় ডিকে।
‘খুব কমন। দাওয়া মানে চাঁদ।’

সোফায় ফিরে আসে ডিকে। প্রশ্নেও।

‘স্যার, তিব্বতি বুদ্ধিজমে তন্ত্র-মন্ত্রই ডমিনেট করে?’ প্রশ্ন ডিকের।
‘রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বত ঘুরে এসে বলেছেন—ওখানে দেখলাম ওষুধ দেওয়া, ভবিষ্যৎ গণনা করা আর তন্ত্র-মন্ত্র প্রয়োগ করা—এই ত্রিবিধ বিদ্যার খুব কদর, যারা এই বিষয়ে পারদর্শী সমাজে তাদের খুব সম্মান। পোন-এর সঙ্গে আপোষ না-করলে বৌদ্ধধর্ম ওখানে ঢুকতে পারত না—এই কাজটা করলেন গুরু পদ্মসম্ভব! তিনি পোনকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করলেন! ফলত তিব্বতের বৌদ্ধধর্মে তন্ত্র-মন্ত্র-জাদু সবই আছে!’

এক পরিচারিকা এসে চা দিয়ে যান। সঙ্গে মুড়ি তেলেভাজা। বেগুনি ও পেঁয়াজি। ডিকে খেতে শুরু করে দ্রুত। বেজায় খিদেও পেয়েছে। তনুময় পাল তেলেভাজা তুলতে ইতস্তত করাতে তারকনাথ হেসে বলেন,

‘সব বাড়িতে ভাজা, খেয়ে নাও তনুময়। তুমি যখন ফোন করলে, আমিই বলে ভাজালাম। আচ্ছা, রেকর্ড হচ্ছে তো ঠিকঠাক?’
‘হচ্ছে, আপনি বলুন স্যার!’ ডিকে আশ্বস্ত করেন।
‘আপনার নামটা যেন কী বললেন?’
‘ধরণী। ধরণী কয়াল।’

‘বাব্বা! অনেকটা জেমস বন্ডের মতো বললেন!’

তারকনাথের কথায় হা-হা করে হেসে ওঠেন তনুময়। ডিকেও। তারকনাথ ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি নিয়ে আবার শুরু করেন। তার আগে চায়ে চুমুক দিয়ে ভিজিয়ে নেন জিভ।

‘আচ্ছা স্যার, শুনেছি গুরু পদ্মসম্ভব হিমালয়ের অজস্র হ্রদ, পাহাড়, গুহা, জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গেছেন অজস্র মন্ত্র। জ্ঞানের গুপ্তভাণ্ডার সেইগুলি। গুপ্তজ্ঞান। লুকিয়ে-রাখা এই গুপ্তজ্ঞানকে বলে তের-মা।’ ডিকে আলোচনার অন্যসূত্র খুঁজতে চায়।
‘এগুলো ঞিংমা-পা’রা প্রচার করে ওদের সেক্ট কত প্রাচীন তা প্রমাণ করতে! এই গুপ্তজ্ঞান কেবল ফিজিক্যালি আবিষ্কার হয় তা নয়, তাঁরা নিজেরা তাঁদের মনের ভেতরও আবিষ্কার করতে পারেন—এগুলোকে বলে মাইন্ড তেরমা।’
‘মাইন্ড তেরমা!’ চমকায় ডিকে।
‘আপনার মাথায় এমন কিছু আইডিয়া বা জ্ঞানের প্রকাশ হল, ঞিংমা স্কুলের ভাবনার সঙ্গে সে-সব মিলে গেল, তখন সেগুলোও তের-মা হিসেবে গণ্য হবে!’
‘সেগুলো যে তের-মা কারা ঠিক করবেন?’
‘ঞিংমা পুরোহিতরা!’

টাইগার লামাও তো একজন ঞিংমা পুরোহিত! তিনিও কি কবীর খানের ভাবনাকে মাইন্ড তের-মা হিসেবে চিহ্নিত করছেন! ধন্দে পড়ে ডিকে।

‘এই সেক্টগুলোর নিজেদের মধ্যে কি কোনও দ্বন্দ্ব আছে?’ আবার প্রশ্নে ফেরে ডিকে।
‘দ্বন্দ্ব থাকলেও একটা বিষয়ে একমত এঁরা সবাই!’ জবাব তারকনাথের।
‘কী?’
‘ফ্রিডম অফ টিবেট!’

৮৯

স্বাধীন তিব্বতের দাবি বা স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে বিশ্বের সকল তিব্বতিই যে সহমত হবেন, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই! কেবল তিব্বতের প্রসঙ্গে নয়, এই গ্রহের সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই মানুষের পরাধীনতার বিপক্ষে। কিন্তু তার সঙ্গে সংঘটিত ঘটনাগুলোর যোগসূত্র কোথায়? এই একটা প্রশ্নের জবাব পেতেই এত আয়োজন।

'আচ্ছা স্যার, দীপংকর কি কামসূত্রের কোনও অনুবাদ করেছিলেন?'

'বাৎস্যায়নের?'

'হুঁ।'

'শুনিনি। বহু সংস্কৃত কাজের তিব্বতি অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু কামসূত্রের কথা কোথাও পাইনি।'

'বাৎস্যায়নের অরিজিনাল কামসূত্র একসময় ভারত থেকে হারিয়ে যায়, দীপংকর সম্ভবত সামিয়ে মহাবিহারে গিয়ে এর তিব্বতি অনুবাদ পান এবং অবাক হন। কারণ এমন কামসূত্র তিনি ভারতে পড়েননি!'

'গত চল্লিশ বছর ধরে ইন্ডো-টিবেটান স্টাডিজের সঙ্গে আছি—কখনও এমন কিছু শুনিনি—আপনি এই তথ্য পেলেন কোথায়?'

'ফিকশন! কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই!'

'তাই বলুন, গপ্পো! ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম!' হাসেন তারকনাথ।

'একটা হাইপোথেটিক্যাল জিজ্ঞাসা আছে স্যার, কামসূত্রের যদি অন্য কোনও টীকা এখন আবিষ্কৃত হয় আর সেই টীকার বাংলা অনুবাদক যদি হন দীপংকর, তাহলে তার ইমপ্লিকেশন কী হবে?'

'টীকা কেমন তার ওপর নির্ভর করছে।'

'আমরা কামসূত্রকে এখন সাধারণ এক সেক্সোলজির বই ভাবি বা বড়জোর আরেকটু বড় করে এসটেথিক্সের সূত্র ভাবি—কামসূত্র আসলে তা নয়!'

‘এক মেমসাহেবের লেখা পড়েছিলাম, মনে পড়ছে—ইন্ডোলজিস্ট—উনি বলছেন, মনুস্মৃতিতে পুরুষকে স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করতে বলা হচ্ছে স্ত্রীর উর্বরকালে, অর্থাৎ সেক্স কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য, অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না! কিন্তু বাৎস্যায়ন কেবল কাম বা আনন্দ চরিতার্থতার জন্যই সেক্স করতে বলছেন!’ বলেন তারকনাথ।

‘সন্তান উৎপাদনের কথা সম্পূর্ন ভুলে গিয়ে প্লেজারকেই প্রধান হিসেবে দেখছেন!’ ডিকে বলে।

‘এমনকী দুজন পুরুষের মধ্যেকার যৌনজীবন নিয়েও বাৎস্যায়ন নন-জাজমেন্টাল। অভাবনীয়! অথচ দু’হাজার বছর পেরিয়েও আজ আমরা সমকামিতা নিয়ে জাজমেন্টাল! কামসূত্রকে এখনও লড়তে হয় নব্য হিন্দুত্বের সঙ্গে যাদের সেক্স নিয়ে দ্বিধা আছে, শুচিবাই আছে! উনিশ শতকের ভিক্টোরিয়ানদের সঙ্গেই এর একমাত্র তুলনা চলে। এটা তিন সত্যি যে ব্রিটিশরাই আমাদের দেশে এই শুচিবাই, এই কনজারভেটিজম এনেছিল। এখন তারই লেগাসি চলছে। রিয়েল কামসূত্র হল এমন এক টেক্সট যা মূলত আর্ট অফ লিভিং। আদৌ কোনও সেক্সুয়াল হ্যান্ডবুক নয়। মেমসাহেব এমনই লিখেছিলেন!’

‘তা তো বটেই স্যার, কিন্তু এক্ষেত্রে লেখক আরও এগিয়ে ভেবেছেন! কেবল আর্ট অফ লিভিং নয়, আরও র‍্যাডিক্যাল ব্যাখ্যা! সম্পূর্ণ নতুন কথা!’

‘কামসূত্র ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে খুবই চর্চিত—তেমন র‍্যাডিক্যাল টীকা হলে অবশ্যই চর্চা হবে দুনিয়া জুড়ে!’

‘তাহলে এর একটা মেটেরিয়াল মূল্যও থাকবে!’

‘থাকা উচিত। কিন্তু র‍্যাডিক্যাল ব্যাখ্যাটা কী আগে শুনি!’

দ্রুত নিজেকে প্রস্তুত করে বলতে শুরু করে ডিকে। কথোপকথনে যান তারকনাথ। তন্ময় হয়ে শোনেন কিউরেটর তনুময় পাল।

ডিকে : অতীতের বহু কামকলা-শাস্ত্রের একটা অ্যান্থলজি করেছিলেন বাৎস্যায়ন—থার্ড সেঞ্চুরিতে—পাটলিপুত্রে লেখা। এই কামসূত্রের সবথেকে বিখ্যাত টীকাকার হলেন যশোধর। ওঁর টীকার নাম জয়মঙ্গল।

তারকনাথ : নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরির শেষদিকে কামসূত্রের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন স্যার রিচার্ড বার্টন। পাক্কা ভিক্টোরিয়ান!

ডিকে : রিচার্ড বার্টন এই কামসূত্রের অনুবাদ করেননি স্যার!

তারকনাথ : তাহলে? উনি কীসের অনুবাদ করেছিলেন?

ডিকে : কামসূত্রের বহু সংস্করণ আছে। কোনওটির নাম রতিরহস্য, কোনওটির নাম কোকশাস্ত্র বা অনঙ্গরঙ্গ। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের অনেক পরে এগুলোর রচনা। তদ্দিনে কামসূত্রের মূল সূত্র হারিয়ে গেছে, প্রত্যেকটা লেখা তখন পাতি সেক্সোলজির সংস্করণ! রিচার্ড বার্টন সম্ভবত অনঙ্গরঙ্গের অনুবাদ করেছিলেন। ইউরোপ-আমেরিকা ওঁর মারফৎ জানল কামসূত্র স্রেফ যৌনকর্মের হ্যান্ডবুক!

তারকনাথ : সেক্সোলজির বাইরে অতিরিক্ত কী আছে কামসূত্রে, সেইটে বলুন ভাই।

ডিকে : মদনভস্মের গল্প বলতে হবে স্যার! অবশ্য তার আগে মদনের গল্প শুনতে হবে। বলব?

তারকনাথ : মদন! মানে কামদেব বলতে চাইছেন?'

ডিকে : হ্যাঁ। মদন নামটা একসময় বাঙালির খুব প্রিয় ছিল। পুত্র সন্তানের নাম মা-বাপেরা মদন রাখতেন। এখন সেকেলে হয়ে গেছে।

তারকনাথ : কেবল সেকেলে নয়, এখন মদন নাম হলে সে হাসির পাত্র!

ডিকে : নিজেরাই নিজেদের হাসির পাত্র করেছি! ইতিহাস বিস্মরণ খুব ভয়ানক! যাইহোক, আগে মদনের গল্পটা বলি। যদি লেখাটা পড়ে শোনাই, আপত্তি নেই তো স্যার?

তারকনাথ : পড়ুন, পড়ুন!

স্মার্টফোন খুলে ডিকে পড়তে শুরু করে কবীরের লেখা। পুরাণ-কথিত কামদেব ও মদনের গল্প। তন্ময় তনুময় ও তারকনাথ সাহা।

মার্চ। ১৯৫৯। লাসা। তিব্বত।

দলাই লামার বাসস্থানের নাম পোদ্রাং। পোতালা প্রাসাদই তাঁর পোদ্রাং। এক হাজার কক্ষ বিশিষ্ট, তের তলা এই বিশাল প্রাসাদ সতের শতক থেকে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের চূড়ায়। পোতালা প্রাসাদের রঙ শাদা-লাল। লাল অংশ ধর্মীয় অংশ। গুম্ফা। শাদা অংশ প্রশাসনিক ভবন।

দলাই লামা পোতালা ছেড়ে সদ্য গেছেন গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ নরবুলিংখায়। নরবুলিংখা, পোতালা প্রাসাদ থেকে পশ্চিমে চার কিলোমিটার দূরে। প্রতিবছরই গ্রীষ্মে শোভাযাত্রা করে এক প্রাসাদ থেকে আরেক প্রাসাদে যান তিনি।

মার্চের শুরুতে, হঠাৎই লাসার চাইনিজ আর্মির কম্যান্ড্যার তাঁদের ছাউনিতে চৈনিক নৃত্যানুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানালেন দলাই লামাকে। রেডিও বেজিং ঘোষণা করল তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণের খবর। তামাম তিব্বতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল প্রিয় নেতার চিনা শিবিরের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সংবাদ।

তিব্বতিরা ধরে নিল এই পরিকল্পনা আসলে তাঁদের প্রিয় নেতা দলাই লামাকে অপহরণের ছক! অপহরণের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মতো।

১০ মার্চ। মঙ্গলবার। ভোর থেকে বিদ্রোহী জনগণ ফেটে পড়ল। লাসায় মানুষের ঢল। সকাল ন'টার মধ্যেই তিরিশ হাজার মানুষের জমায়েত। নরবুলিংখা প্রাসাদের সামনে তারা ব্যারিকেড করে দাঁড়াল যাতে না-যেতে পারেন দলাই লামা চিনা সেনার ছাউনিতে।

দশ মার্চ থেকে বিশ, এগার দিন ধরে লাসায় বিপুল উত্তেজনা। চৈনিক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এমনভাবে নিজেদের সাজাল, যেন কেবল একটা আদেশের অপেক্ষা, মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে সমস্ত ঐতিহাসিক ভবন, প্রাসাদ এবং গুম্ফা।

দ্রোহকাল। উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান। চেয়ারম্যান মাও পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই চিন আগে আক্রমণ করবে না। এদিকে লাসায় ক্রমাগত বাড়ছে বিদ্রোহী জনতার সংখ্যা। স্বদেশকে রক্ষা করতে খেম প্রদেশের খেম্পা বিদ্রোহীরা তাদের পাহাড়ের গোপন ডেরা থেকে নেমে আসে শহরে।

বাড়ি ফিরে রজত ল্যাপটপ খুলে পড়ায় মগ্ন। দিল্লি থেকে ই-মেল বাহিত হয়ে এসেছে তিব্বতি বিদ্রোহীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য। আইবি ও র-এর তথ্যের যৌথ সংকলন। ১০ মার্চ ১৯৫৯ থেকে দিন ধরে-ধরে সবিস্তার প্রতিবেদন পাঠিয়েছে তাঁরা।

পিএলএ আতঙ্কিত বিদ্রোহীদের রুদ্রমূর্তি দেখে। ১৭ মার্চ বিকেল চারটেয় চাইনিজ পিএলএ মর্টার ছুঁড়ল নরবুলিঙ্কা প্রাসাদের কাছে। আর নয়, অনুগামীদের পরামর্শে দলাই লামা প্রিয় তিব্বত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। ত্রিচীবর ছেড়ে পরলেন সৈন্যের পোশাক। খুলে ফেললেন চশমা যাতে সহজে চিনতে না-পারে পিএলএ। ছদ্মবেশ নিয়ে সেদিন রাতেই বেরিয়ে পড়লেন ভারতের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে বৃদ্ধা মা, বোন, ছোটো ভাই, কয়েক জন অনুগামী আর জনা কুড়ি সরকারি অফিসার। সেই যাত্রা শুরু হোল কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও-বা ঘোড়ার পিঠে। আর ছিল ক'টা খচ্চর। যাদের পিঠে চাপানো ছিল এক মাসের জল, খাবারদাবারসহ দরকারি রসদ। গন্তব্য জানা কিন্তু পথ অজানা।

তাছাড়া পথের কোন কোন এলাকায় ঘাপটি মেরে আছে লাল ফৌজ, ভয় ছিল তারও। হিমালয়ের দুর্গম পথে তাঁকে ঘিরে ছিল তিব্বতি কম্যান্ডোরা, যারা মূলত খেম্পা। খেম প্রদেশের যোদ্ধা জনজাতি। চিনা বাহিনীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কেবল রাতেই হাঁটতেন তাঁরা। হাঁটতে হাঁটতে পথে পড়ল বিশাল সাংপো। ব্রহ্মপুত্র নদ। এ-পার ও-পারের ব্যবধান দেড় হাজার ফুট। ইয়াকের চামড়া দিয়ে বানান ছোট্টো নৌকা কু-দ্রুতে চেপে তাঁরা পেরোলেন ব্রহ্মপুত্র। তারপর আবার দুর্গম হিমালয়।

নেতার পলায়নের খবরের পর, লাসায় যা হল, ইতিহাসে তাকে বলে লাসার যুদ্ধ। ব্যাটল অফ লাসা। মাত্র দিনকয়েক ছিল এই যুদ্ধের আয়ু। পিএলএ নির্বিচারে গুঁড়িয়ে দিল প্রাচীন

ভবন, ঐতিহ্যময় প্রাসাদ আর পবিত্র গুম্ফা। হত্যা করল অসংখ্য সাধারণ নাগরিক থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও লামাকে। পাহাড়ের গুপ্ত ডেরা থেকে নেমে আসা বিদ্রোহীদেরও।

ভারতের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চান দলাই লামা। বার্তা পেয়েই ভারত সরকার দলাই লামাকে কেবল স্বাগতই জানাল না, তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বও নিল।

৩১ মার্চ দলাই লামা পা রাখলেন ভারতের মাটিতে। ভারতবর্ষ। স্বয়ং তথাগত'র ভূমি।

তারপর আসামের তেজপুর থেকে এলেন শিলিগুড়ি। দেখা করতে এল ভাইপো-ভাইঝি, দাদা গেলো থেন্ডুপের ছেলেমেয়ে। তারা পড়ে দার্জিলিং-এর স্কুলে। এলেন সিকিমের রাজা। তারপর দলাই লামা গেলেন বিহারের বুদ্ধগয়া। বুদ্ধের বোধিপ্রাপ্তির স্থান। সেখান থেকে সোজা মুসৌরির বিড়লা হাউজ। লাসা থেকে ১৫০০ মাইলের লম্বা যাত্রা শেষ।

জানা-অজানা তথ্যের সমারোহে সমৃদ্ধ প্রতিবেদন। ভারতের ভেতরে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি আইবি। আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে 'র'—রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং। গভীর মনোযোগ দিয়ে বিস্তৃত প্রতিবেদন পড়ে রজত। চিনের তিব্বত অধিগ্রহণ, তিব্বতি বিদ্রোহ, ভারতের ভূমিকা, সিয়া'র ভূমিকা—এইসব কমবেশি তার জানা। কিন্তু যা জানা নেই বা যাকে জানা নেই, তাকেই আবিষ্কার করতে হবে এই প্রতিবেদন থেকে।

কে এই টাইগার লামা?

৯১

১৯ অক্টোবর। মিশনপল্লী। সোনারপুর।

মদন ও মদনভস্মের পুরাণকথা শুনিয়ে থামে ডিকে। কেন মদনকে ভস্ম করতে হল আর তারপর শুরু হল রতিবিলাপ, ব্যাখ্যায় যায়।

ডিকে : এই মদনভস্ম ইতিহাসের খুব গুরুত্বপুর্ণ বাঁক।
তারকনাথ : এইগুলো তো মাইথোলজি! ইতিহাস এখানে এল কীভাবে?
ডিকে : এতক্ষণ পুরাণ পড়লাম, এবার এইগুলোকে ইতিহাস আর সোশ্যাল সায়েন্সের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখব, পড়ি স্যার?
তারকনাথ : নিশ্চয়ই!

কামদেব বা মদন

মদন বা কামদেব হল এমন এক সত্তা, যে-সত্তা নিজে প্রমত্ত এবং অন্যকে মত্ত করে! এই মদনই আমাদের জীবনকে ঘিরে রয়েছে। জড়িয়ে-মড়িয়ে রয়েছে। আসল শব্দ হল মদ—মদ থেকে এসেছে মদন। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মদ হল শারীরিক মদ, তা নিয়ে সুরারসিকদের আগ্রহ থাকতে পারে, আমাদের আগ্রহ আপাতত মানসিক মদে। আমরা বলি, মদে মত্ত হওয়া—এই মদে মত্ত হওয়াই মানসিক মদ! এই মদ অনেক রকমের হতে পারে। যেমন, ঐশ্বর্যমদ, বিদ্যামদ, যৌবনমদ ইত্যাদি। চোখের সামনেই আমরা এদের দেখতে পাই। কেউ বুদ্ধিজীবী, তিনি ইন্টেলেকশনের মদে মত্ত; কেউ চলচ্চিত্রের নক্ষত্র বা ক্রিকেটার বা ফুটবলার, তিনি যৌবন মদে মত্ত; কেউ শিল্পপতি, তিনি টাকার মদে! যদিও বর্তমান গ্লোবালাইজড বিশ্ব পুরোটাই প্রায় ধনমদে মত্ত! টাকা—টাকা—টাকা! ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্য! আরও একটা বিপজ্জনক মদ আছে! ধর্মমদ! একটা গল্প শোনাই—বিলিতি মদ নিয়ে একটা মার্কেট রিসার্চ হচ্ছে—এক মদ্যপের সামনে, একটি ধর্মপুস্তক আর এক বোতল মদ রাখা হল, বলা হল যেকোনও একটি বেছে নিন! মদ্যপ স্মার্টলি মদের বোতলটি তুলে নিলেন। আবার প্রশ্ন, কেন আপনি মদের বোতল বেছে নিলেন? মদ্যপ উত্তরে বললেন, আমি পাঁড় মাতাল হতে চাই না তাই মদের বোতলটা বেছেছি!

‘এক্সেলেন্ট!’ হা-হা করে হাসেন তারকনাথ।

‘মানসিক মদ এমন জিনিস তাকে বেশি গাঁজালে মাদকতা তৈরি হয়! আর গাঁজালে তো ফেনা হবেই! আর মজার ব্যাপার হল, এই মাদকতাকে ইংরেজিতে বলে ফেনাটিসিজম!

এবার কামের কথায় আসি। আমার ছিল দু’বস্তা ধান, আপনার একটা গরু। আমরা বিনিময় করলাম। শাস্ত্রমতে, এই বিনিময় আমি আপনি করিনি। কে করেছে তবে? আপনার ছিল ধানের প্রতি কামনা, আমার কামনা ছিল গরুর প্রতি। কাম ছিল আমার অন্তরে, কাম ছিল আপনার অন্তরেও। অর্থাৎ কাম আমার আপনার দুজনের অন্তরে উপস্থিত থেকে ওই লেনদেন ঘটিয়েছে। ঋগবেদ-এ তাই বলে—‘কে দিয়েছে? কে নিয়েছে? কামই দিয়েছে, কামই নিয়েছে!’ বিনিময়যোগ্য ওই বস্তুগুলো আমাদের মনে কাম-উদিত করে বলে তারা কামোদিতি বা কমোডিটি পদবাচ্য।’

‘হাইট অফ ইমাজিনেশন! ব্যঙ্গ তনুময়ের কণ্ঠে।
‘হায়েস্ট লেভেল অফ ইনটিউশন বলতে পারেন!’ চকিতে প্রত্যুত্তর ডিকের।
‘কী বলছেন মশাই! কাম-উদিত থেকে কমোডিটি!’ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতায় প্রায়-চিৎকার করে উঠলেন তারকনাথ সাহা।
‘কবীর খানের ভাষাতাত্ত্বিক ভাবনা পড়লে এমন জিনিস অনেক পাবেন স্যার!’ ডিকে বলে।
‘কবীর খান!’ ভ্রু কুঁচকে বলেন তারকনাথ।

ছোট্ট টিপ্পনি কেটে কিউরেটর তনুময় পাল ফের নীরব শ্রোতা। খানিক বিরতি নিয়ে ডিকে আবার পড়তে শুরু করে।

উদিত কামকে না হয় চেনা গেল, কিন্তু রতি কই?

রতি

তার জন্য আপনার সঙ্গে আমাদের কর্মে রত হতে হবে। বস্তুত কাম আর কর্মে কোনও প্রভেদ নেই বলেই ভারতের বেশীরভাগ প্রাদেশিক ভাষায় কর্মের প্রতিশব্দই কাম। কর্ম-উন্মাদনাই মদন এবং কর্ম-সম্পাদনাই রতি। যাঁরা জীবনে অন্তত একবারও কোনও নতুন পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য কিছু লোকলস্কর বন্ধুবান্ধব নিয়ে কর্ম-উন্মাদনায় মত্ত ও রত হয়েছেন, এ-ব্যাপার তাঁরা অতি আয়াসে বুঝবেন আশাকরি।

পুরাণে আছে শিব রতির স্বামী কামদেব মদনকে ভস্ম করেছিলেন। এই কাহিনীর একটা ইনার মিনিং আছে—এ বুঝতে চাইলে আগে রত, সুরত, রতি, আরতি, মদন ইত্যাদি শব্দগুলির অদৃশ্য অর্থ বুঝতে হবে। প্রাচীন ভারতে পণ্য উৎপাদনের জন্য মদনভস্মের প্রয়োজন হয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠবে, পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে মদন বা মদনভস্মের কী সম্পর্ক? পুরুষ ও প্রকৃতি যখন লীলা করেন তখন ওই লীলার দুটো অংশ থাকে—প্রেমাবেগ আর প্রেমকর্ম। প্রেমাবেগ হল মদন আর প্রেমকর্ম হল রতি। মদনকে কামও বলে। রতিকে আমরা আসক্তি বা প্রীতি অর্থেও বুঝি। ইনি যৌন আকাঙ্ক্ষার দেবী। কামদেবের স্ত্রী এবং দক্ষের কন্যা। কিন্তু এই দৃশ্য অর্থের বাইরে এর একটা অদৃশ্য অর্থও আছে যা আমরা মনে রাখি না। কী সেই অদৃশ্য অর্থ? যে কোনও কাজে রত থাকাকে বলে রতি। কর্মযজ্ঞের মধ্যে কর্মরত থাকাই রতি। সুরত মানে শুধু যৌন মিলন নয়, যেকোনো কাজে ভালোভাবে রত হওয়াই সুরত। আরতি মানে চলমান সুরতি, কর্মে রত কর্মী। পূজায় যে আরতি করা হয় তা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কর্মে রত হওয়ারই সিম্বল। রতি মদনের স্ত্রী। কর্মে নিরত কর্মীদের রতি বলা যায়। মদন মানে আগেই বললাম, যা কর্মে প্ররোচিত করে, মত্ততা দেয়। এই মত্ততাকেই ভস্মীভূত করা হয়েছিল? সেটাই মদনভস্ম? কিন্তু কেন এই মত্ততাকেই ভস্ম করা হয়েছিল?

মদনভস্ম

প্রোডাক্ট আর কমোডিটি কি এক জিনিস? সমাজে যা উৎপন্ন হয় তাই প্রোডাক্ট কিন্তু এই উৎপন্ন কখনওই পণ্য নয়! কমোডিটি নয়! যখন বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু তৈরি হয় তাকে পণ্য বা কমোডিটি বলে। মার্ক্স বলছেন, তৈরি হওয়ার পরই এই কমোডিটি তার

মালিককে খোঁজে। কেন খোঁজে? দামটা বলবে কে? কমোডিটি তো নিজে কথা বলতে পারে না! সে মালিকের জিভটা ধার নেয়! দ্য ওনার মাস্ট, দেয়ারফোর, লেন্ড দেম হিজ টাং! আমার কথা নয়, মার্ক্সের! আর শ্রমিক যদি তখন উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অধিকার দাবি করে বা সেগুলোকে কামনা করে তাহলে সেই প্রোডাক্ট কীভাবে পণ্যে পরিণত হবে? হতে পারবে না। কারণ পণ্য হতে গেলে তার মালিক চাই! ব্যক্তিমালিক চাই! শ্রমিকরা মালিক হলে তা কখনওই পণ্য হবে না! তাই প্রাচীন ভারতে পণ্য উৎপাদনের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর্মীর ভালোবাসা বা মদনকে ভস্ম করার দরকার হয়েছিল।

কী করে আমাদের কর্ম-উন্মাদনা ভস্ম করবেন? খুব সহজ। সব পরিচালকই করে থাকেন। আপনি শুরুতেই ঘোষণা করবেন—তোমরা আসবে-যাবে-খাটবে, পয়সা নেবে, চলে যাবে, আর কিছু তোমাদের ভাবতে হবে না! তাই ভাগবত গীতায় ঘোষণা করে দিতে হয়েছিল—মা ফলেষু কদাচন। ফলের আশা কোর না। কাজ করে যাও। রবীন্দ্রনাথ এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন—কর্ম থেকে ফলাকাঙ্ক্ষা উপড়ে নিলে কর্মের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়। আপনি কেবল সেইটুকু করবেন যা আপনাকে করতে বলা হবে। ব্যস! দেখবেন মদনভস্ম হয়ে গেছে। বেঁচে থাকবে কেবল রতিবিলাপ।

মাইথোলজিতে মদনভস্মের পরে আছে রতিবিলাপ। মদনভস্মের পর মদনের স্ত্রী রতি কাঁদতে শুরু করল! এর অর্থ কী?

রতিবিলাপ

কর্মী জনগণ এরপর আসবে, খাটবে, মজুরি নেবে, চলে যাবে। পরিচালকের প্রতি, তার পরিকল্পনার প্রতি, তাদের প্রেমভাব নেই, এক ধরনের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। উৎপাদিত ফসলের প্রতি তার দাবীর কথা বলার কোনও উপায়ই নেই তার হাতে। মদনভস্ম করে তার গোড়া মেরে দেওয়া হয়েছে।

মদনভস্মের পর শুরু হল নিষ্কাম রতি। শ্রমিকেরা উৎপন্ন দ্রব্যে অধিকার না-পেলে তাদের কাজ নিষ্কাম রতিতে পরিণত হয়। নিষ্কাম রতি প্রেমহীন দাম্পত্যের সঙ্গে তুলনীয়। আমি যা সৃষ্টি করছি, তা আমার নয়! ব্যাপারটি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক। এই যে মত্ততা বা আসক্তি বা প্রেম, তার নাড়ি কেটে দিতে হবে, তবেই উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যে পরিণত হবে!

বেশ্যা বা জিগোলো সংসর্গ যাঁরা করেছেন তাঁরা হয়তো কিছুটা বুঝবেন। বেশ্যাগমন না-করলেও, চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইমস অনেকেই আমরা দেখেছি। শ্রমিক যন্ত্রের মতো উৎপাদন করে চলেছে—সে যেন মানুষ নয়, রোবট! নিষ্কাম রতি কী, ভালো বোঝা যায় ওই ছবি দেখলে!

তেমন টেকনোলজিই তো আসছে আগামীদিনে! আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স! মানুষ প্রায় থাকবেই না উৎপাদন প্রক্রিয়ায়! বড় পুঁজি এই মদনকে ভয় পায়! কেন পায়? নিষ্কাম রতি যদি আবার সকাম হয়! মদন যদি আবার ফিরে আসে! শ্রমিক যদি আবার মত্ত হয়, নিজের উৎপাদনের ভাগ চায়!

তাই তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ কর! লেবার ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দাও! ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি কর! কর্ম-উন্মাদনা ফিরিয়ে আনা চলবে না কিছুতেই! উৎপাদনের ভাগ দাবি করার আকাঙ্ক্ষা বা সাহসই যাতে শ্রমিকের তৈরি না-হয়, রাষ্ট্র ও কর্পোরেট তার ব্যবস্থা করবে।

৯২

‘তাহলে কী বোঝা গেল? কামসূত্রে কাম নেই! কাম আছে, তবে সেই কাম সেক্স নয়! রতি ও মদন কামসূত্রে গ্রথিত। কামসূত্র মানে কাজের সূত্র। বইটি প্রকৃতপক্ষে একটি ম্যানেজমেন্টের বই, যদিও কিছুই না-বুঝে অধিকাংশ আধুনিক পাঠক এটিকে যৌনতা

বিষয়ক বই বলেই মনে করেন। অলমিতি বিস্তরেণ! আপাতত এইটুকুই। কাজ চলছে। শেষ হোক, বাকিটা তারপর।' হেসে বলে ডিকে।

'না, শেষ নয়, প্রশ্ন আছে, এই যে আমি-আপনি প্রেমে মত্ত হয়ে কাম-চরিতার্থ করলাম, এর ফসলের মালিক কে হবে?'

'ঠিক জায়গায় ধরেছেন স্যার, এর জন্য আগেভাগেই তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি বা কনট্রাক্ট হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমরা তো জানি যাকে ক্যারি আউট করতে হয় তাকে কনট্রাক্ট বলে। ক্যারি-আউট করা মানে বিশেষভাবে বহন করা—'

'বিবাহ!' হেসে বলেন অধ্যাপক সাহা।

'এখানে একটা মজার জিনিস আছে স্যার! বিবাহের আগে আপনাকে দেখে নিতে হবে কন্যা কামকলা কী কী জানে?' হেসে বলে ডিকেও।

'৬৪ কলা?' অধ্যাপক তারক সাহা'র প্রশ্ন।

'মজাটা দেখুন, কামশাস্ত্রমতে আপনাকে দেখতে হবে কন্যা যন্ত্রমাতৃকা জানে কি না, দেশভাষাবিজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ জানে কি না, ধাতুবাদ জানে কি না, বাস্তুবিদ্যা, তক্ষকর্ম্ম, তক্ষণকর্ম্ম ইত্যাদি জানে কিনা।'

'যন্ত্রমাতৃকা জানা মানে কী?' অবাক তনুময় অবশেষে সবাক।

'রথ, শকট, ঘানিযন্ত্র, আখপেষাই যন্ত্র, রণতরী, রক্ষীতরী, ব্যোমযান, পুষ্পক আগ্নেয় রথ, বানরধ্বজরথ, ইত্যাদির নির্মাণবিধি বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জানা! বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ জানা বলতে গাছের রোপণ, পুষ্টি আর চিকিৎসা করতে জানা অর্থাৎ এগ্রিকালচারাল সায়েন্স জানা! আর ধাতুবাদ মানে মাটি, পাথর, রত্ন ও ধাতু প্রভৃতির পাতন, ঢালাই, শোধন, মিশ্রণ ইত্যাদি জানা অর্থাৎ মেটালার্জি ও মাইনিং জানা! বাস্তুবিদ্যা হল বাড়িনির্মাণবিদ্যা বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং! তক্ষকর্ম হল বয়নকৌশল, কার্পাস থেকে সুতো কাটা ইত্যাদি আর তক্ষণ হল কার্পেন্টার বা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ।' ফোনের পর্দায় চোখ রেখে প্রায় মুখস্থ বলে ডিকে। তারপর চোখ তুলে পালা করে তনুময় ও তারকনাথের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাহলে শাস্ত্রানুসারে আপনাকে বিবাহের আগে দেখে নিতে হবে, যে কন্যার সঙ্গে আপনার বিবাহ হবে তারা এই ৬৪ কলা জানে কি না! কী বিপজ্জনক ভাবুন! এই কামসূত্র অনুসারে সত্যিই যদি এ যুগের বিয়ের পাত্রী খুঁজতে হয়, তাহলে তো পাত্রীই

পাওয়া যাবে না। কেননা তাহলে তো ছুতোরের কাজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পর্য্যন্ত সবই জানতে হবে পাত্রীকে। স্যার এবার বলুন, তা কি কখনও সম্ভব?'

'না!'

'আমাদের যেসব আধুনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যিকরা বাৎসায়নের কামশাস্ত্রকে কেবলমাত্র সেক্সোলজি'র বই ভাবতে অতি ব্যাকুল, তাঁরা একবারও কেন যে এই প্রশ্ন তোলেন না? অথচ প্রশ্নটি তুললেই পরিষ্কার হয়ে যায়, কন্যা শব্দটি কর্মী-জনগণকে বোঝাচ্ছে আর এই কামসূত্র মূলত কাজকামের সূত্র। সেক্স-টেক্স ওপরের মোড়ক—মোড়ক খুললে অন্য জিনিস বেরোবে!'

'এক্সেলেন্ট! সত্যিই তো, কামসূত্র ক্রমশ খোলস খুলে অন্য কামসূত্র হয়ে যাচ্ছে! আচ্ছা একটা কথা, এটাই কি অতীশের ব্যাখ্যা?' উৎসুক তারকনাথ।

'না স্যার, সে ব্যাখ্যা কোথায়! অন্তত আজ আর নেই!'

'তাহলে কে লিখেছেন এমন ব্যাখ্যা?' তারকনাথ জানতে চান।

'কবীর খান!'

'কবীর খান!' পুনরুচ্চারণ তারকনাথের। 'নামটা শোনা, কিছু পড়া হয়নি!'

'আপনি মাইন্ড তেরমার কথা বলছিলেন না, স্যার? যদি বলি অতীশের সেই হারিয়ে-যাওয়া ব্যাখ্যাই মাইণ্ড তেরমা হয়ে বহু বছর বাদে কবীরের মাথায় দেখা দিয়েছে—'

'ওহ মাই গড! কী বলছেন?'

'আমি বলছি না স্যার, তিব্বতি লামারা তেমনই ভাবছেন, আই গেজ!'

অবাক চেয়ে থাকেন তারকনাথ। নিশ্চুপ তনুময়ও।

'আর ঠিক সে-ই কারণেই কবীর খান কিডন্যাপড!' আবার বলে ডিকে।

'কিডন্যাপড!'

বিস্মিত তারকনাথ। বেবাক তনুময় ঘড়ি দেখেন।

আরও কিছুক্ষণ কথা হয় অধ্যাপকের সঙ্গে। তাঁর বাড়ি থেকে তনুময়ের সঙ্গে ডিকে যখন বেরোয়, ঘড়িতে প্রায় সাড়ে ন'টা।

সোনারপুরে রেল স্টেশনে ডিকেকে নামিয়ে বিদায় নেন তনুময়।

শহরছাড়া ট্রেনগুলোতে পা-রাখার জায়গা নেই। শহরমুখী ট্রেন এখন ফাঁকা। ফাঁকা লোকাল ট্রেনে উঠে জানালার ধারে গিয়ে বসে ডিকে। অন্ধকার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। ডিকে জটের মধ্যে থেকে খেই ধরতে চায়, প্রাণপণ। একটা শব্দ মাথায় ঘাই মারছে। মা-কে একটা ফোন করে।

'কতদূর খোকন?' মায়ের খোঁজ।
'একটা শব্দের মানে একটু বলো তো—'
'কী শব্দ?'
'চিত্রক।'
'চিত্রক মানে বাঘ। চিতাবাঘও বলে। গায়ে ডোরাকাটা চিত্র, তাই চিত্রক।' রেণুকা জবাব দেন ছেলেকে।
'ঠিক আছে। তুমি খেয়ে নিও, আমার দেরি হবে।'

খেই যেন খুঁজে পায় ডিকে।

চিত্রক মানে বাঘ। টাইগার। অধ্যাপক তারকনাথ সাহা জানালেন দাওয়া মানে চাঁদ। চন্দ্র। চিত্রক চন্দ্র। দাওয়া লামাই যে টাইগার লামা, আর সন্দেহের অবকাশ নেই। নিজের নকল নামের সূত্র ছেড়ে গেছেন, যেন কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই!

তাহলে কি কবীর খানের বাড়িতে টাইগার লামা নিজেই এসেছিলেন! চিন-বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত বলে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে যাঁর নাম লিপিবদ্ধ, সেই তিব্বতি

লামা কবীর খানের বাড়ি অবধি পৌঁছে গেলেন! ডিকে বোঝে বিরাট এক ফাঁদ পাতা হয়েছিল কবীর খানকে কালিম্পং অবধি নিয়ে যাওয়ার জন্য।

যাদবপুর পেরিয়ে ঢাকুরিয়ার দিকে ছোটে ট্রেন। হাওয়া এসে জুড়িয়ে দেয় শরীর। জানালা দিয়ে আলো-আঁধারময় বাইরে চেয়ে থাকে।

৯৩

১৯ অক্টোবর। কলকাতা।

ঘটনাক্রমে চোখ বুলিয়ে রজত প্রবেশ করে বিশেষ অংশে। খবরের বিভিন্ন উৎস ও বেশ কিছু ডি-ক্লাসিফায়েড ফাইল থেকে নতুন তথ্য বিশ্লেষণসহ পেশ হয়েছে এই বিশেষ অংশে। মনোযোগী হয় রজত।

বর্তমানে চিন বিভিন্ন স্তরে উইঘুর ও কাঝাখ মুসলিমসহ এথনিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যা আচরণ করছে তার ইতিহাস লুকিয়ে আছে সিসিপি'র তিব্বত-পর্বে। তারা তাদের মতাদর্শগত নীতি রূপায়ণে কোনও আপোষ করে না। যা চিনের স্বার্থের পক্ষে, তাই তারা করবে। কোনও বাধা সামনে এলে গুঁড়িয়ে দেবে। আন্তর্জাতিক চাপ বা প্রতিক্রিয়াকে চিন থোড়াই কেয়ার করে! অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে সংগঠিতভাবে মিথ্যা প্রচার করলে, প্রোপাগান্ডা ছড়ালে, তা অনেক বেশি কার্যকরী হয় একটা যুদ্ধের থেকে। যুদ্ধে অনেক ক্ষতি, অনেক খরচ।

গত শতকের পাঁচের দশকে বিশ্বে না-ছিল ইন্টারনেট, না-ছিল সোশ্যাল মিডিয়া। তাসত্ত্বেও চিন সফলভাবে সারা বিশ্বকে বোঝাতে পেরেছিল কীভাবে প্রতিক্রিয়াশীল দলাই লামার সরকারের হাত থেকে তারা তিব্বতের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করেছিল। অথচ ঘটনা ঠিক উল্টোটাই ঘটেছিল!

সিনিসাইজেশন। অ-চৈনিককে চৈনিকীকরণ করার নাম সিনিসাইজেশন। মাও প্রথমে এথনিক তিব্বত নামে পরিচিত আমদো ও খেম-এ শুরু করলেন এই প্রক্রিয়া। শুরু হল শতাব্দী প্রাচীন সামাজিক কাঠামোকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া।

পার্টি আর পিএলএ—দুই ধারাল অস্ত্র ফালা ফালা করে দিল তিব্বতি কৌম। গ্রামের মোড়ল আর গুম্ফার লামারা প্রথম নিশানা। তাঁরাই চালান তিব্বতি গ্রামসমাজ। একের পর এক গ্রেফতার হলেন তাঁরা, কেউ হারিয়ে গেলেন চিরকালের মতো। বৌদ্ধ গুম্ফাগুলোয় ঝুলল তালা। কামান দেগে উড়িয়েও দেওয়া হল বেশকিছু বৌদ্ধমন্দির।

ঐতিহাসিকরা দীর্ঘদিন মনে করতেন, এথনিক তিব্বতে এই অত্যাচার ব্যুমেরাং হয়েছিল মাও-রে বিপক্ষে। বিদ্রোহ তৈরি হয়েছিল ওই অঞ্চলে। হাজার হাজার তিব্বতি যোগ দিয়েছিল গুপ্ত সংগঠনে। কিন্তু বর্তমানে কিছু গোপন নথি ডি-ক্লাসিফ্যায়েড হয়েছে। এই নথিগুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই ধারণার ঠিক বিপরীত চিত্র। মাও অত্যন্ত সচেতনভাবে চেয়েছিলেন দখলীকৃত অঞ্চলে একটা অসন্তোষ বা বিদ্রোহ তৈরি হোক! ২৪ জুন ১৯৫৮, মাও একটি গোপন নথিতে লিখছেন, সিসিপি তিব্বতের বিদ্রোহীদের সাহায্য করুক। যত বেশি হিংসাত্মক হবে সেই দ্রোহ, তত ভালো!

সিসিপি'র কাছে একটা গ্রহণযোগ্য কারণ তৈরি হবে তিব্বত অধিগ্রহণের, লেজিটিমাইজ করা যাবে দখল আর আন্তর্জাতিক স্তরে বলা যাবে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ থেকে লাসার জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য পাঠান হয়েছে পিএলএ।

১০ জানুয়ারি ১৯৫৯-এ দলাই লামার কিডন্যাপিং-এর খবরও ছিল একটা স্ট্র্যাটেজি এবং সেই স্ট্র্যাটেজি সফল হয়েছিল। আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল খবর। বিদ্রোহীরা নেমে এসেছিল পাহাড় থেকে। মাও ঠিক এটাই চাইছিলেন। কনফুসিয়াসের এক প্রাচীন চীনা কৌশলে ছিল তাঁর বিশ্বাস।

কী সেই কৌশল?

ইঁদুরকে প্রথমে গর্ত থেকে বের করে আনতে হবে, তারপর হত্যা। লাসায় কেবল সাধারণ মানুষ নয়, বৌদ্ধমন্দিরের সন্ন্যাসী এমনকী লামাদের হাতেও উঠে আসে অস্ত্র। কেমন অস্ত্র? প্রায় দু'শ বছর আগের রাইফেল আর কামান। এই তামাদি অস্ত্র নিয়ে তারা মুখোমুখি হল প্রবল শক্তিধর পিএলএ'র। ফলত যা-হওয়ার হল তাই! ইঁদুরকে মারা হল পিষে, থেঁৎলে দেওয়া হল তার শরীর!

লাসা আক্রমণের আগে মাও পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন এথনিক তিব্বতের বৌদ্ধ বাধা নির্মমভাবে গুড়িয়ে দিতে। এই ধ্বংসযজ্ঞ যতটা দর্শনীয় হয়, তত ভালো। আমেরিকা প্রবাসী এক চাইনিজ ঐতিহাসিক তাঁর এক সাম্প্রতিক বইয়ে বহু ডি-ক্ল্যাসিফায়েড ফাইলের উল্লেখ করে এমনই দাবি করেছেন।

স্পেক্টাকুলারলি ব্রুটাল! নয়নাভিরাম নিষ্ঠুরতা। শব্দবন্ধ নজর কাড়ে রজতের।

রাতের খাওয়া সেরে আবার ল্যাপটপ খুলেছে রজত। পড়তে পড়তে ক্রমশ ঢুকে পড়ে ভারত-তিব্বত-চিন অক্ষরেখায়। সেই অক্ষরেখায় এক ছোট্ট পাহাড়ি শহর তার অতীত ইতিহাস নিয়ে, হয়ে ওঠে গুরুত্বপুর্ণ। দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রের পুরনো সংস্করণের বিভিন্ন প্রতিবেদন জুড়ে কেবল সেই পাহাড়ি জনপদ।

দার্জিলিং পাহাড়ের ছবির মতো শৈলশহর। কালিম্পং।

৯৪

তিব্বত সীমান্ত থেকে কালিম্পং-এর দূরত্ব শ'খানেক কিলোমিটারও নয়। অথচ তিব্বতের ঠিক উল্টো আবহাওয়া এখানে। হিমালয় পেরিয়ে মেঘ তিব্বত যেতে পারে না অথচ হিমালয়ের এপারে কালিম্পং যেন মেঘেদের শহর। তিব্বত ও চিনা বংশোদ্ভূত প্রচুর মানুষের বাস। মেঘের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকেন তাঁরা। কালিম্পং থেকেই প্রকাশিত টিবেটান মিরর। তিব্বতে প্রচারিত সবথেকে প্রভাবশালী ও দীর্ঘস্থায়ী সংবাদপত্র। বর্তমান দলাই লামা তার আত্মজীবনী মাই ল্যান্ড মাই পিপল-এ লিখেছেন, লাসায় তার মাস্টারমশাইরা টিবেটান মিরর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবর পড়ে শোনাতেন।

কিন্তু মেঘের শহর ঘিরে ক্রমশ জমে ওঠে সন্দেহের মেঘ। এই সুন্দর শৈলশহরের নীচের তলায় নাকি গুপ্তচরদের ডেরা! স্বয়ং চেয়ারম্যান মাও বললেন, ভারতে কালিম্পং নামে একটা জায়গা আছে। গুপ্তচরদের আখড়া! মার্কিন আর ব্রিটিশ চরেরা এখানে চিন-বিরোধী কার্যকলাপ চালায়! চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ডেইলিতেও কালিম্পং-এর

উল্লেখ! অভিযোগের মাত্রা এতটাই, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় চিনের অভিযোগের জবাব দিতে হয়েছিল।
র-এর রিপোর্টে খবরের কাগজের প্রতিবেদনের ছবির সঙ্গে বিভিন্ন বইয়ের পাতার ছবিও সংযুক্ত হয়েছে। হাইপারলিঙ্ক দিয়ে তথ্যের উৎসও উল্লেখিত। কয়েকটা লিঙ্ক খুলে পড়েও ফেলে রজত। একাধিক বার গিয়েছে এই শৈলশহরে, কালিম্পং-এর কথা পড়ে নতুন করে যেন আবিষ্কার করে শহরটাকে। খুঁটিয়ে পড়ে রজত।

দলাই লামা ভারতে পা রাখার ঠিক আগের দিন, চিন সংক্রান্ত প্রশ্নে মাননীয় স্পিকারের উদ্দেশে বলেন প্রধানমন্ত্রী। কেবল একদিন নয়, দু'দিন পরে আবার, বিষয় সেই কালিম্পং! এক এক করে চিনের অভিযোগগুলি শোনান। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের বিরুদ্ধে নাকি উস্কানিমূলক লিফলেট ও প্যামফ্লেট প্রকাশিত হচ্ছে কালিম্পং থেকে। কালিম্পং-এর টিবেট মিরর নামে একটি কাগজ নাকি নিয়মিত চিন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ও শত্রুতাপূর্ণ মতামত প্রচার করে। কেবল তাই নয়, তিব্বতের বিভিন্ন এজেন্ট আর নাশকতাকারীদের হাতে অস্ত্র আসে এই কালিম্পং থেকেই।

লোকসভায় দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু খণ্ডন করেন চিনের প্রায় সমস্ত গুরুতর অভিযোগ। যাঁরা আপত্তিকর লিফলেট ছাপাচ্ছিলেন তাঁদের সতর্ক করা হয়। সতর্ক করা হয় টিবেটান মিরর প্রেসকেও। কিন্তু কারও বিরুদ্ধেই কোনও আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে কালিম্পং-এর ওপর গুপ্তচরগিরির তকমা তিনি খণ্ডন করেননি। বরং স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কালিম্পং-এর লাল-নীল-সাদা-গোলাপী গুপ্তচরদের সক্রিয়তা।

ল্যাপটপ থেকে যখন মাথা তোলে রজত, ঘড়িতে রাত একটা পঁচিশ। শাটডাউন করে। মেয়ে-বৌ ঘুমে কাদা।

বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। ফোন খোলে। ডিকে অনলাইন। বার্তা পাঠায়।

'কালিম্পং-এর হিস্ট্রি দেখে তাজ্জব হচ্ছি ডিকে! পুরো স্পাই হাব!'

‘সে তো ফিফটিজে! এখন কী আছে!’
‘তুই জানিস!’
‘কিছুটা!’
‘রেমন্যান্টস এখনও আছে ডিকে—পাঠাচ্ছি, পড়ে দেখ!’
‘পাঠা।’

ফোন পাঞ্জাবির পকেটে রাখে রজত। সদ্য-পড়া লোকসভায় নেহরুর ভাষণ মনে পড়ে। বিদগ্ধ। রসাত্মক।

‘স্যার, কালিম্পং-কে বলা হয় গুপ্তচরদের ডেরা। হরেককিসিমের গুপ্তচর, কোনও এক দেশের নয়, অসংখ্য দেশের। এশিয়া, ইওরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ। কম্যুনিস্ট গুপ্তচর, অ্যান্টি-কম্যুনিস্ট গুপ্তচর, লাল গুপ্তচর, সাদা গুপ্তচর, নীল গুপ্তচর, গোলাপী গুপ্তচরসহ নানান গুপ্তচর। গত বেশ কয়েক বছর ধরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে। নিঃসন্দেহে কালিম্পং এস্পিওনাজ ও কাউন্টার এস্পিওনাজের একটা ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্পাই, কাউন্টার স্পাই-রা জটিল এক দাবাখেলায় মত্ত ওখানে। যে লেখক এই ধরনের ফিকশন লেখায় দক্ষ, তিনি নিঃসন্দেহে কালিম্পংকে বেছে নিতে পারেন তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে।’

সিগারেটের ধোঁয়া ধীরে মিশে যায় অন্ধকারে। দুশ্চিন্তাও। আশঙ্কার জায়গা ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে। প্রতিবেদনের শেষে একটি ইঙ্গিত আছে যা উদ্বেগজনক। তিব্বতি বিদ্রোহীরা নিজেদের সংহত করছে ভারতীয় ভূখণ্ডে, এই খবরে যতটা শঙ্কা আছে, তার থেকে অনেক বড় বিপদ আছে অন্যত্র। বিদ্রোহীদের নাকি উসকে দিচ্ছে একটি গোষ্ঠী এবং তারা ভারতীয়। প্রতিবেদনে তাদের নাম-ধাম নেই কিন্তু তাদের গতিবিধির যতটুকু ইশারা আছে, যথেষ্ট বিপজ্জনক।

কারা তারা? তিব্বতি বিদ্রোহীদের উত্তেজিত করে কী ফায়দা কোনও ভারতীয় সংগঠনের?

কৃষ্ণপক্ষের আকাশ। শহরে হাজির কার্তিকের কুয়াশা। রাস্তার সোডিয়াম ভেপারের এলোমেলো হলুদ আলোয় মিশে যাচ্ছে তারা। জলরঙা আবছা শহরের দিকে তাকিয়ে ফুরফুর করে ধোঁয়া ছাড়ে রজত।

৯৫

২০ অক্টোবর। শনিবার। কালিম্পং।

তোরণ পেরোবার সময়ই চোখজোড়া খুঁজে নেয় তাদের। দু-দুটি সিসি ক্যামেরা দু'দিক থেকে ওৎ পেতে আছে, যাবতীয় গতিবিধি মজুত করার গুরুদায়িত্ব তাদের চোখে। পায়ে পায়ে এগোয়। চওড়া চাতাল পেরিয়ে উপাসনাগৃহ। জুতোজোড়া বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকতেই শীতল মেঝের স্পর্শ পায় পা। স্তব্ধতার সঙ্গে মিশে যায় হিম।

চারপাশে তাকায় নিবেদিতা। নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে বৌদ্ধ দেবমণ্ডল স্থিত। কিন্তু সে আজ গুম্ফা দেখতে আসেনি। এই জোগচেন গুম্ফায় আসবেন বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালা থেকে বেরিয়েছিলেন কবীর খান, কিন্তু পুলিশের কাছে কবীর খানের ছবি দেখে, গুম্ফা পরিচালকবর্গ এমন কারো গুম্ফায় প্রবেশের কথাই অস্বীকার করেছেন।

পুব দিকের কোণে দরজা দেখে এগিয়ে যায়। দরজা দিয়ে বেরোতেই চোখে পড়ে সিঁড়ি। পায়ে পায়ে উঠে যায় দোতলায়। পরপর কয়েকটি ঘর। সামনের একটি ঘরের দরজা খোলা। মুখ বাড়ায়। একজন লামা নিবিষ্ট মনে কিছু পড়ছেন। চৌকাঠে পা দিতেই তাকান লামা। শান্ত চাহনি। মুখে স্মিত হাসি।

'একটু কথা বলতে চাই!'
'বলুন?'
'কলকাতা থেকে আসছি—প্লিজ হেল্প মি!'

‘হ্যাঁ বলুন, হাও ক্যান উই হেল্প ইউ?’
‘গত সোমবার, পনেরই অক্টোবর, আমার এক আত্মীয় এই গুম্ফায় এসেছিলেন—তারপর থেকে তিনি মিসিং—’
‘এর মধ্যে একদিন রাতে পুলিশ এসেছিল একজনের খোঁজে—একটা ছবি দিয়ে গেছে—আপনিও মোস্ট প্রোবাবলি তাঁর খোঁজেই এসেছেন—আপনার পরিচয়?’
‘নিবেদিতা বাল্মীকি—’
‘ম্যাডাম, প্রচুর ট্যুরিস্ট আসেন রোজ এই গুম্ফায়, কীভাবে একজনকে আইডেন্টিফাই করব বলুন!’
‘আপনাদের তো সিসি টিভি কভারেজ আছে, পুরনো ফুটেজ দেখলেই বোঝা যাবে—’
‘আচ্ছা আসুন আমার সঙ্গে।’

লামা আন্তরিকতার সঙ্গে নিবেদিতাকে নিয়ে যান নিরাপত্তা কক্ষে। বেশ কয়েকটি টিভি মনিটর সক্রিয়। দু’জন কর্মী বসে আছেন। লামা ঘরে ঢুকতেই সসম্ভ্রম উঠে দাঁড়ান তাঁরা। নিজেদের ভাষায় কথোপকথন হয়। লামা নিবেদিতার দিকে ফিরে বলেন,

‘আপনি কত তারিখের ফুটেজ দেখতে চাইছেন ম্যাডাম?’
‘পনের!’
‘সরি ম্যাডাম, গত চোদ্দো ও পনের অক্টোবর আমাদের সিসি নেটওয়ার্কে রিপেয়ারিং চলছিল—কোনও ফুটেজ নেই—’

কোনও কথা না-বলে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে নিবেদিতা। পিছু ডাকেন লামা।

‘ম্যাডাম!’

পিছন ফিরে নিবেদিতা তাকায় লামার দিকে। চোখে নির্ল্লিতি।

‘আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যান—কোনও খবর পেলে জানিয়ে দেব—’ স্মিতমুখ লামা।

লামার আন্তরিক আগ্রহে ফোন নাম্বার দেয় নিবেদিতা। তারপর আবার নীরব প্রস্থান।

অপস্রিয়মাণ নিবেদিতাকে চোখে রেখে ফোন করেন লামা। অনুচ্চ কথোপকথন নিজস্ব ভাষায়। সম্ভবত কোনও নির্দেশের সমর্থনে দু'বার মাথা নেড়ে কিছু বলেন তিনি। শরীরী ভাষায় আনুগত্য। ফোন ছেড়ে আবার ফোন করেন। এবার তাঁর শরীরের ভাষায় বিপরীত অভিমুখ। নির্দেশ দেওয়ার পালা তাঁর। গাঢ় নীল লং কুর্তির ওপর ধূসর স্রাগ, শাদা পালাজো, পিঠে ব্যাকপ্যাক। নির্দেশপ্রাপকের চোখ নিবেদিতাকে খুঁজে নেয় গুম্ফার ফটকের কাছে।

গুম্ফা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করে নিবেদিতা। এবার ঢুঁ মারতে হবে জেলাপুলিশ অফিস আর কালিম্পং থানায়। ঘড়ি দেখে। সাড়ে এগারোটা। গতকাল রাতেই পৌঁছেছে কালিম্পং। জেলাপুলিশ দফতরে নিশ্চয়ই দেখা হবে রিয়াজ আলমের সঙ্গে। ভালো অফিসার। অনুভূতিশীল। কিন্তু খানদাকে কি খুঁজে পাবে রিয়াজ আলম? সেই দক্ষতা কি ওঁর আছে? মাথায় বিভ্রান্তি নিয়েই হাঁটে নিবেদিতা। প্রশ্ন জট পাকায় অন্দরে।

ঠিক চোদ্দ ও পনের অক্টোবরই গুম্ফার যান্ত্রিক নজরদারী ব্যবস্থা খারাপ হল! আশ্চর্য!

অনুসরণকারীও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সওয়ার হয় মোটরবাইকে।

৯৬

২০ অক্টোবর। কলকাতা।

শনিবার। অফিস নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতেই অফিসে মেল করে ডিকে। আগামী সপ্তাহে ছুটির দরকার। অনলাইনে দরখাস্তও করে দেয়। তারপর ফোন

করে রজতকে। আমচি পেমা দোলমা আর অধ্যাপক তারকনাথ সাহা'র সঙ্গে গতকালের মোলাকাত সংবাদ জানায়। জানায় কিউরেটর তনুময় পালের সহৃদয় সাহায্যের কথাও। খোলসা করে চিত্রক চন্দ্রের পরিচয়।

'টাইগার লামা'র হিস্ট্রি যা আছে পাঠিয়ে দে আমাকে!'
'কাল রাতেই তো পাঠিয়ে দিলাম! আজ আরও কিছু দেব।'
'ওহ্, দেখা হয়নি! আজ দেখব। আর একটা কাজ করতে হবে তোকে!'
'বল?'
'কালকের একটা বাগডোগরার টিকিট লাগবে।'
'কালই যাবি?'
'দেরি হয়ে যাবে নাহলে, লাভা মনাস্ট্রির রিঞ্চেন লামার সঙ্গে মোলাকাত করতেই হবে—'
'জেলা পুলিশকে বলে দিচ্ছি—যদিও রিয়াজদের রিফিউজ করেছে ওই লামা—'
'না, পুলিশ গেলে হবে না! তুই টিকিটটা জোগাড় করে দে!'
'হয়ে যাবে!'
'পয়সা আমি দেব!'
'সাবধান ডিকে!'
'কেন, সাবধান হব কেন!'
'টাইগার লামা কতটা ডেঞ্জারাস জানি না, তবে নিবেদিতা তোর পক্ষে বিপজ্জনক! নিবেদিতা এখন কালিম্পং-এ! রিয়াজ বলল।'

বলেই হাসতে থাকে রজত। ডিকেও। হাসতে হাসতেই বন্ধুসুলভ চটুল শব্দ বিনিময়।

'ভদ্রমহিলা কী চান বোঝা মুশকিল! আমাকে আবার খোঁচা মারল—কলকাতায় বসে তত্ত্বের পাঁচালি পড়ে কবীরদাকে উদ্ধার করা যাবে না!'
'জোকস অ্যাপার্ট, কালিম্পং-এ যাচ্ছিস যা—তবে কোনও ঝুঁকি নিবি না!' রজতের স্বরে সাবধানবাণী।
'সিবিআইকে দেবে কেসটা?' জানতে চায় ডিকে।

‘আনলাইকলি!’

‘কেন?’

‘পলিটিক্যাল কারণ আছে, আই গেজ!’

‘পলিটিক্যাল!’

‘শত্রুর শত্রু আমার মিত্র—চিন এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ার শত্রু—এবার একে একে মিলিয়ে নে—’

‘হুঁ। কিন্তু এর মধ্যে একটা বাচ্চা আর একজন বয়স্ক মানুষের জীবন জড়িয়ে গেছে! কী ডেভেলপমেন্ট হল জানাস!’ চিন্তিত গলা ডিকের।

‘আর একটা কথা, যতই আঁতলামি করুক আর সাহায্য করুক এই কিউরেটর তনুময় পাল, ব্যাটাকে আমি সন্দেহের বাইরে রাখছি না—হি নোজ ভেরি ওয়েল দ্য অ্যাকচুয়াল প্রাইস অফ আ কিউরিও—অ্যান্টিক মাল সম্পর্কে ওর থেকে বেশি কেউ জানে না—ওক্‌কে, ফ্লাইটের খবর আজ বিকেলে জানিয়ে দেব। আশা করছি সকালের ফার্স্ট ফ্লাইট পেয়ে যাবি!’

ফোন টেবিলে রেখে ডিকে ফ্লাস্ক থেকে পেয়ালায় ঢালে আরও এক কাপ লাল চা। আলতো চুমুক দিয়ে ভাবে, কোন অজানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে গেলেন কবীরদা! বাচ্চাটাও! অর্হৎ বড়ুয়ার বয়স মাত্র সাত! এদের বোড়ে বানিয়ে কে বা কারা ঘুঁটি সাজাচ্ছে চতুরঙ্গে?

রজতের মেল ঢোকে ফোনে। সে ভাণ্ডার না-খুলে রিয়াজের পাঠান ভিডিওটা খোলে। গতকালই রিয়াজ ড্রাইভে যুক্ত করে মেল করে দিয়েছিল। অঞ্জনা ও সন্দীপ বড়ুয়ার জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও।

খুব লম্বা জিজ্ঞাসাবাদ নয়। সম্ভবত অসুস্থতার কারণেই অতিরিক্ত কথা বলার অনুমতি দেননি চিকিৎসক। আগুপিছু করে অঞ্জনা ও সন্দীপের প্রতিটি কথা বারবার শোনে। বর্ষীয়ান লামাকে বড়ুয়া দম্পতি কীভাবে দেখেছে, শুনে নিতে চায় অনুপুঙ্খ।

বেশ কয়েকবার ভিডিওটা দেখার পর একটা সিগারেট ধরায়। পরপর জিজ্ঞাসা তৈরি হয় মাথায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগোয় বইয়ের র‍্যাকের কাছে। আরতিমাসি এসে দিয়ে যান জলখাবার। রুটি, আলুরদম আর দুটো কাঁচাগোল্লা।

নির্দিষ্ট তাক থেকে নামায় বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত একটা বই। কিছু অস্বচ্ছ ধারণা স্পষ্ট করতে হবে, বিশেষত দুটো বিষয়—অর্হৎ ও বোধিসত্ত্ব। বৃদ্ধ লামা কেন বারবার বোধিসত্ত্ব শব্দটি উচ্চারণ করছেন? তারক সাহাকে একবার ফোন করেই জেনে নেওয়া যায়। তাকায় ঘড়ির দিকে। বৃদ্ধ অধ্যাপককে ফোন করবে-কি-করবে না ভাবতে ভাবতেই চেয়ারে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাতে শুরু করে। বাঁ হাতে ধরা সিগারেট থেকে বিনবিন করে বেরোতে থাকে ধোঁয়া। বই বন্ধ করে টেবিলে রাখে। হাত বাড়ায় ফোনের দিকে।

‘হ্যালো!’
‘স্যার আমি ধরণী, পাঁচ মিনিট কথা বলা যাবে?’
‘আরে হ্যাঁ, বলুন, অত কুণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই—আমি এখন বেকার লোক!’ হাসেন অধ্যাপক তারকনাথ সাহা।
‘দুটো জিনিস একটু ক্লিয়ার করতে চাই—’
‘দুটো কেন, দু’গণ্ডা বলতে পারেন।’ হাসেন তারক সাহা।
‘আপাতত দুটো হলেই চলবে!’ হাসি ফেরায় ডিকে।
‘বলুন আপনার ডাবল ডাউট!’
‘অর্হৎ আর বোধিসত্ত্ব।’
‘আচ্ছা!’ সামান্য ছেদ নিয়ে অধ্যাপক সাহা বলেন, ‘এটা নিশ্চয়ই জানেন, বৌদ্ধধর্মের দুটো মূল বিভাগ—’ ‘হীনযান আর মহাযান?’
‘ইয়েস! হীনযান মূলত বুদ্ধের বচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহাযান দার্শনিক ভিত্তির ওপর। আচ্ছা, একটু গোড়া থেকে বলি?’
‘নিশ্চয়ই স্যার!’ বিগলিত হয় ডিকে।
‘বুদ্ধ মারা যাওয়ার প্রায় একশ’ বছর পর বিহারের বৈশালীতে ভিক্ষুদের এক মহাসভা হয়। এই সভায় ভিক্ষুদের মত ও পথ নিয়ে খুবই বাক-বিতণ্ডা হয়। ভিক্ষুরা দু’ভাগে ভাগ

হয়ে যায়। একদলকে বলা হয় স্থবিরবাদী বা থেরবাদী আর অন্যদলকে বলে মহাসাংঘিক। এরাই পরে হীনযানী আর মহাযানী হয়। হীনযানে নিজের মুক্তিই মূল, ওটাই আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির কোনও স্থান নেই। জগতের সকল প্রাণির মুক্তি আগে, তারপর নিজের। তবে হীনযান অভিধাটি ট্র্যাডিশনাল বৌদ্ধদের উদ্দেশে বলা। খুবই উদ্দেশ্যমূলক।'

'কারা বলল?'

'মহাযানীরাই প্রাচীনপন্থীদের এই নামে ডাকা শুরু করেন। এখানে একটু বিস্তারিত জানা দরকার—এই হীনযানীদের মধ্যে যারা ছিল শ্রাবক, তাদের উদ্দেশ্য হল অর্হত্ব।'

'এই অর্হত্ব কী?' ডিকে প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে।

'ট্র্যাডিশনাল বুদ্ধিস্টদের একটা দল সংসারের সব বাধা-বন্ধন ছিন্ন করে জীবন্মুক্ত হতে চান। তার জন্য তাঁরা কী করেন? এক্কেবারে মিলিটারি শৃঙ্খলায় আচার-বিচার পালন করেন। এঁদের মতে নির্বাণে উপনীত হওয়ার চারটে সোপান। এগুলো সাধনার এক-একটা স্তর। এই স্তরগুলো বিস্তারিত করছি না, কেবল জেনে রাখুন, এইভাবে তিনটে স্তর বা সিঁড়ি পেরিয়ে চতুর্থ সিঁড়িতে চড়তে পারলেই কেল্লা ফতে! তিনি তখন পূর্ণ মানব—অর্হৎ। জীবন্মুক্ত অর্হৎ। যাঁর সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।'

'আর মহাযানীরা?'

'কেবল নিজের জন্য বুদ্ধত্বলাভের তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা মহাযানীদের নেই। গৌতম নিজে যেমন সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে নিজেকে ডেডিকেট করেছিলেন, মহাযানীরা গৌতমের সেই সাধনার পথকেই নিজেদের পথ বলে মনে করেন। বুদ্ধের জন্মজন্মান্তরের এই অবস্থাকে বোধিসত্ত্ব অবস্থা বলে।' তারকনাথ সাহা ব্যাখ্যা করেন।

'আচ্ছা, অর্হতের থেকে বোধিসত্ত্ব আরও বড় কনসেপ্ট! সকলেই বোধিসত্ত্ব হতে পারেন?'

'হ্যাঁ পারেন তো! মহাযান মতে যিনি বোধিচিত্তের বিকাশ ঘটান তিনিই বোধিসত্ত্ব। সেইভাবে দেখলে প্রত্যেক মহাযানপন্থী পোটেনশিয়াল বোধিসত্ত্ব।'

'আচ্ছা অর্হৎ পরে বোধিসত্ত্ব হতে পারেন না?'

'শাস্ত্রী মশাইয়ের লেখায় দেখেছি অর্হৎ পরে বোধিসত্ত্ব হতে পারেন, এমনকী বুদ্ধ বা জগদ্‌গুরুও হতে পারেন। কিন্তু তারপর উনি বলছেন সে-সকল জন্ম-জন্মান্তরসাধ্য! মানে থিয়োরিটিক্যালি হতে পারেন আরকী!' বলেই হা-হা করে হাসেন অধ্যাপক।

‘থ্যাঙ্ক ইয়ু স্যার, এটুকুই জানার ছিল!’

‘সেদিন আপনি যাওয়ার পর আমি বাৎস্যায়নের কামসুত্র নিয়ে বসলাম—যে-ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তারপর আর স্থির থাকা যায়—’ হেসে বলেন অধ্যাপক।

‘আমার নয় স্যার, কবীর খানের ভাবনা!’ হাসে ডিকেও।

‘একটা কথা মাথায় এল হঠাৎ—আপনি কন্ট্রাক্ট বা বিবাহের কথা বললেন—প্রাচীন ভারতে কৌটিল্য বিবাহের ভাগ করেছিলেন—’

‘ঠিক জায়গায় ধরেছেন স্যার! ভাগগুলো আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে?’

‘ব্রাহ্ম। প্রাজাপত্য। আর্য। দৈব। গান্ধর্ব বিবাহ। তারপর?’ ডান হাতের কড় গুনে বলতে বলতে আটকে যান অধ্যাপক সাহা।

‘আসুর বিবাহ। রাক্ষস আর পৈশাচ বিবাহ।’ ধরিয়ে দেয় ডিকে। তারপর বলে, ‘এই আট রকম বিয়ে আসলে আট রকমের চুক্তি। যে-কোনও এক রকমের চুক্তি সেরে ফেলতে হবে কর্মীদের সঙ্গে। তারপর কর্মে রত হওয়ার পালা, ফসল উৎপাদনের পালা, নিষ্কাম প্রেমচর্চার পালা।’

‘ঠিক।’ সায় দেন তারকনাথ।

‘একটা মজার উদাহরণ দিই স্যার। পরদার বা পরস্ত্রীগমনের কথা বলেছেন বাৎস্যায়ন। তাই তো?’

‘একমিনিট দাঁড়ান—হাতের কাছেই আছে—সেদিন বুকমার্ক দিয়ে রেখেছিলাম—এই তো—বাৎস্যায়ন বলছেন, পরদারে গমন করিতে হইলে প্রথম এইগুলির পরীক্ষা করিবে—-সাধনের যোগ্য কি না, নিরাপদ কি না, সেটি গৌরবজনক কি না এবং তদ্বারা বৃত্তিলাভ সম্ভবপর কি না।’ হাসতে হাসতে বলেন অধ্যাপক।

‘এবার আমি যদি বলি পরস্ত্রীগমন মানে—অন্যের কর্মীবাহিনীকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া!’

‘হুম।’ ডিকে কী বলছে ধরতে না-পেরে তারকনাথ অপেক্ষা করেন।

‘তাহলে বাৎস্যায়নের কথার মানে কী দাঁড়ায়! কর্মী সাধনের যোগ্য কি না, কর্মী নিরাপদ কি না, সে গৌরবজনক কি না এবং তার দ্বারা বৃত্তিলাভ সম্ভবপর কি না—কী দাঁড়াল স্যার! কামসূত্র সেক্সের হ্যান্ডবুক!’

‘অপূর্ব!’ হা-হা করে হাসেন অধ্যাপক সাহা।

তারক সাহাকে ছেড়ে চেয়ারে এলিয়ে দেয় গা। লম্বা বিরতির পর মস্ত এক টান মারে সিগারেটে। ঘড়ি দেখে। একটা জ্যাকেট আর একজোড়া ট্রেকিং শ্যু কিনতে হবে। জলখাবারের কাঁচের থালার দিকে হাত বাড়ায়। রুটি ছিঁড়ে আলুরদম তুলে মুখে দেয়। হাত মুছে পাজামা ছেড়ে প্যান্ট গলায়। এক গালে পুরে দেয় একটি কাঁচাগোল্লা। দ্রুত শেষ করতে চায় জলখাবার। বাজারের যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। জুতো-জ্যাকেট স্থানীয় বাজারে না-পেলে যেতে হবে মধ্যমগ্রাম অথবা বারাসাত।

৯৭

২০ অক্টোবর। কালিম্পং।

‘হ্যালো ম্যাডাম, কেমন আছেন?’

প্রশ্নকর্তার দিকে তাকায় নিবেদিতা। অচেনা। কখনও কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারে না।

‘আপনি তো কলকাতার ভোরের কাগজের নিবেদিতা বাল্মীকি?’

হ্যাঁ-বাচক মাথা নাড়ে নিবেদিতা। তার চোখে জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়, যুগপৎ। অচেনা মানুষটি নিবেদিতার বিমূঢ়তা লক্ষ করে হাসে।

‘আমি সোনম শেরিং লেপচা। কালিম্পং-এর হিল পয়েন্ট পত্রিকায় আছি। আপনার সঙ্গে একবার দিল্লিতে দেখা হয়েছিল ম্যাডাম! আপনার মনে থাকার কথা নয় যদিও!’

অত্যন্ত সপ্রতিভ এক যুবক। নিবেদিতা হেসে তাকে বসতে বলে।

চেয়ারে বসতে বসতে সোনম বলেন, ‘ম্যাডাম আপনি কালিম্পং-এ কেন? এনি নিউজ?’
‘না, না বেড়াতে এসেছি!’

সাংবাদিকতা বৃত্তির দুই মানুষ পাশপাশি বসলে যা হয়, কথার পরে কথা জমে, কালিম্পং-এর মেঘের মতো। কবীর খানের অন্তর্দ্ধান বা অন্য কোনও সংশ্লিষ্ট তথ্য সোনমকে বলে না নিবেদিতা।

সকালে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল জোগচেন গুম্ফার দিকে, পেটে ভারি কিছু পড়েনি। জেলা পুলিশ দফতরে যাওয়ার আগে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে নুডলস নিয়ে বসেছে, এমন সময় সোনম লেপচার প্রবেশ। সোনম কেবল চা নেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে নিবেদিতার। এলাকার সাংবাদিকরা অনেক খবর রাখেন।

‘বেড়াতে! না ম্যাডাম, নিশ্চয়ই কোনও স্টোরি করতে এসেছেন?’ হাসেন সোনম।
‘অফিসের কাজে আসিনি ভাই—তবে এখানে স্টোরির অভাব নেই—করা যেতেই পারে!’ নিবেদিতাও হেসে বলে।
‘নতুন ডিস্ট্রিক্ট, লিখুন না ম্যাডাম! আপনারা বড় কাগজে লিখলে আমাদের একটু লাভ হয়!’
‘ওসব লেখার অনেক লোক আছে—আমি অন্য কিছু লিখতে চাই—’
‘ও আচ্ছা, কালচারাল সাইড লিখবেন? বুডঢিজম ইন কালিম্পং বা—’
‘না!’ সোনমকে থামিয়ে দেয় নিবেদিতা।
‘তাহলে?’
‘কালিম্পং অ্যান্ড চায়না! এই নিয়ে যদি লিখি?’
‘লিখতে পারেন! কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা কী হবে?’
‘চায়না যা শুরু করেছে, যদি ভবিষ্যতে নেপাল বা অরুণাচল প্রদেশ ওরা কব্জা করতে চেষ্টা করে, সিকিম-দার্জিলিং-কালিম্পং-এর কী হবে? তারা কতটা সেফ থাকবে!’ নিবেদিতা বলে।

‘পলিটিক্যাল টপিক! তবে খুবই রেলেভেন্ট! লিখুন ম্যাডাম, হেল্প চাইলে বলবেন!’

দৃশ্যত উত্তেজিত হয় সোনম। মানিব্যাগ থেকে কার্ড বার করে দেয় নিবেদিতাকে।

‘বিজনেজ অ্যান্ড কমার্স এখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট সোনম, চায়না বাণিজ্য ছাড়া কিছু বোঝে না! কালিম্পং-এর লোকেশন খুব সিগনিফিক্যান্ট—আপনি নিশ্চয়ই জানেন জেলেপ লা হয়ে কালিম্পং-লাসা একটা ট্রেড রুট ছিল—সিক্সটি-টু পর্যন্ত ছিল—যুদ্ধের পর চায়না বন্ধ করে দেয়—অথচ—’
‘জানি তো ম্যাডাম! আমার শহর জানব না! ফিফটিজে ভারত-চায়না ট্রেড এগ্রিমেন্ট হওয়ার পর থেকেই কালিম্পং চিনের নজরে চলে আসে! তিনটি শহরে ট্রেড এজেন্সি খুলেছিল চায়না—কলকাতা আর দিল্লির পাশাপাশি অন্য শহর কোনটা, না কালিম্পং! ভাবা যায়!’
‘সো ইম্পর্ট্যান্ট ওয়জ কালিম্পং! অথচ—’ নিবেদিতা বলে।
‘দুর্গম টিবেটে বাল্ক কারগো নেওয়ার ক্ষেত্রে চায়নার সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল এই রুট। মেনল্যান্ড চায়না থেকে টিবেটে যাওয়া খুব কঠিন কারণ রাস্তা প্রায় নেই, পাথুরে চড়াই-উৎরাই। টিবেটের একটা অংশ দখল করার পর চায়না মালপত্র পাঠাবার জন্য এই রুটটা ব্যবহার করতে শুরু করল থ্রু কলকাতা পোর্ট। আর একটা পথও আছে, গ্যাংটক-লাসা রুট থ্রু নাথু-লা। নাথু লা তো খুলে দিয়েছে এখন! কিন্তু মোর কনভিনিয়েন্ট জেলেপ লা কালিম্পং রুট খোলেনি, বিকজ অফ কালিম্পং! পুরনো কারণ। আপনি লিখুন ম্যাডাম, আই’ল হেল্প ইউ!’

চায়ের পেয়ালায় বড় একটা চুমুক দিয়ে হাতের তালু দুটো ঘষে নেয় সোনম। হাসে। আজ তাপমাত্রা নিম্নমুখী। সূর্যের দেখা নেই। ধোঁয়া-ওঠা গরম নুডলস খেয়ে বেশ আরাম হয় নিবেদিতার। খবরের ঝাঁপি খুলে বসেছে সোনম লেপচা। সেই ঝাঁপির গহন অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার চাই।

‘কালিম্পং-এর জন্য এই রুট খুলছে না! কেন?’

চায়ে আবার চুমুক দেয় সোনম লেপচা। সময় নেয়। চারপাশে তাকায়। স্বর নীচু করে বলে,

‘চায়নার ভাবনাচিন্তা বিশাল—এত বড় করে ভাবে, অন্যেরা কল্পনাও করতে পারে না! শত্রু হলেও এটা ওদের কাছে শেখার আছে ম্যাডাম! ভাবতে পারেন স্রেফ নিজের দেশের নিরাপত্তার জন্য উত্তর সীমান্তে অত বড় একটা পাঁচিল দিয়ে দিতে পারে! ক্যান উই ইম্যাজিন! বানিয়েছে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেবল নিজের দেশ নয় সিল্ক ট্রেড রুটকে বাঁচাতেও এই দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল।’

মনোযোগী শ্রোতা নিবেদিতা।

‘আপনি বিআরআই কী জানেন নিশ্চয়ই?’ জানতে চান সোনম।
‘চায়নার প্রোজেক্ট?’
‘হ্যাঁ!’
‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়্যাটিভ। খুব ডিটেইল জানি না।’ কণ্ঠস্বরে কৌতূহল এনে বলে নিবেদিতা।
‘চায়নার এত অ্যাম্বিশাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট ইদানিংকালে হয়নি ম্যাডাম! তিনটে কনটিনেন্ট জুড়ে এই প্রোজেক্ট এত বড়, এত বড়—বিশ্বের সিক্সটি পারসেন্ট মানুষ এই প্রোজেক্টের আওতায় আসবে। এটা হল বিশ্বের পরবর্তী সুপারপাওয়ার হওয়ার প্ল্যান্ড ব্লু-প্রিন্ট।’

সোনম লেপচা খবরের রাজপথ থেকে গলিঘুঁজি, কোথায় ঢুকবে আন্দাজ করতে পারে না নিবেদিতা। তবে সে তুখোড় সাংবাদিক, মোক্ষম সময়ের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে জানে।

‘ওয়েস্টার্ন মিডিয়ায় চায়নার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বেশ লেখালেখি হচ্ছে—কিছু আর্টিকেল পড়ে স্রেফ চমকে গেছি ম্যাডাম! টেকনোলজি গ্লোবাল ইকনমি পুরো বদলে দিয়েছে! আর এই জিও-টেকনোলজিক্যাল শিফটই চায়নার গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি। ওয়েস্টার্ন নেতারা যেখানে এখনও ব্যাকডেটেড কনজার্ভেটিভ ভাবনায় পড়ে আছে, সেখানে চায়না আগামী বিশ্বের একটা ছবি এঁকে ফেলেছে কল্পনায়।’

‘বাব্বা! কেমন সেটা?’

‘ভবিষ্যতে ট্রেড আর্টারিজ আর সাপ্লাই চেইনসের একটাই নেটওয়ার্ক থাকবে আর তার কন্ট্রোল থাকবে চায়নার হাতে! পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট আগে হয়নি। গোটা এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ জুড়ে হবে এই প্রোজেক্ট। স্রেফ চাইনিজ কমোডিটিজের ট্রেড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য।’

‘প্রায় শ’খানেক বছর পভার্টি আর আইসলেশনে থেকে হঠাৎ চায়না এইভাবে উদয় হল, জাস্ট ভাবা যায় না! চায়না প্রথম অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করেছে কবে জানেন? নাইনটি এইট্টি ফোর! এসেই পনেরটা গোল্ড! পজিশন ফোর্থ! এই হল চায়না!’ নিবেদিতা বলে।

‘ওদের থেকে শেখার আছে ম্যাডাম! এই জিও পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি একটা মাস্টারস্ট্রোক। এশিয়া আর ইউরোপকে নিয়ে একটা ইউরেশিয়ান সুপারকন্টিনেন্ট বানাবার দিকে এগিয়ে চলেছে চায়না।’

‘অ্যাফ্রিকা আর লাটিন অ্যামেরিকাও বাদ নেই! নিও-কলোনিয়ালিজম!’

‘সে যাই বলুন ম্যাডাম, ওদের কেউ থামাতে পারবে না!’

‘এই বিশাল লেবার ফোর্স পাচ্ছে কোথা থেকে? নিজেরাই করছে?’

‘কেবল টিবেট বা শিংজিয়াং নয়, সিপিসি এনটায়ার চায়নাকেই একটা লেবার কলোনি বানিয়েছে! মেইলল্যান্ড চায়নাতেও মানুষ ভালো আছেন ভাবছেন? নেভার! পুরো দেশটাই একটা ডিটেনশন ক্যাম্প!’

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপ থাকে নিবেদিতা। ওয়েটারকে ইশারা করে। কফি নেয় এক কাপ। চমৎকার ব্র্যান্ড কফি। সোনম ছেলেটার কথাবার্তাও মনোগ্রাহী। কিন্তু পুরনো কোন কারণের জন্য চিন এখনও লাসা-কালিম্পং ক্যারাভান বাণিজ্য পথ খুলতে রাজি নয়, এখনও খোলসা করেনি সে। অপেক্ষায় থাকে নিবেদিতা।

‘আমার পয়েন্টে এসো সোনম, ভবিষ্যতে শিলিগুড়ি চিকেন নেক করিডরসহ দার্জিলিং হিল এরিয়া কতটা সেফ?’ প্রশ্ন রাখে নিবেদিতা।

আরও এক কাপ চা নিয়েছে সোনম। ধূমায়িত চায়ের কাপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। ঠোঁটের কোনে হাসি। তির্যক। চোখ তোলে সোনম। নিবেদিতা লক্ষ করে তাঁর চোখে রোষ।

৯৮

২০ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

বৃদ্ধ লামার কথা শুনে হতবাক কবীর। এ কী ভয়ানক পরিকল্পনা করেছেন লামা! এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কেঁপে যাবে পুরো পৃথিবী।

‘এটা পাগলামি! আপনি এই কাজ করতে পারেন না!’ কবীর বলেন। উত্তেজিত স্বর।

বৃদ্ধ লামা শান্ত চোখে চেয়ে থাকেন ক্ষুব্ধ কবীরের দিকে। আলতো হাসি চলকে ওঠে চোখের কোনায়।

‘খানসাহেব, আপনার লজিকাল ওরিয়েন্টেশন আমার কাছে পাগলামি। আর আমারটা আপনার কাছে পাগলামি! আপেক্ষিক ব্যাপার!’ তারপর খানিক থেমে বলেন, ‘প্রতিটি তিব্বতি দেশে-বিদেশে সবাই এক-একটি মৃতদেহ। কী যেন বলে বাংলায়—অন্তেষ্টি—আমরা এবার আমাদের অন্তেষ্টি করব!’
‘এটা ভয়ানক! আপনি এই পরিকল্পনা ত্যাগ করুন লামা! পাশরিপুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেন আপনি, আবার সে-ই আপনিই এমন সাংঘাতিক পরিকল্পনা করেছেন!’

‘কুল, শীল, মান, ঘৃণা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা—এই আটটি বাহ্যিক বন্ধনকে বলে অষ্টপাশ। পাশরিপুর এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই অবিদ্যাতন্ত্রের পথকে বর্জন করে বিদ্যাতন্ত্রের পথ গ্রহণ করতে হবে!’ লামা বলেন।

শান্ত। নিস্পৃহ। বৃদ্ধ লামাকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওঁর বুকে জ্বলছে দাউদাউ আগুন।

‘আটটি বাহ্যিক বন্ধনই অষ্টপাশ। আট শুঁড়ওয়ালা জলজ প্রাণীটিকে এর সাদৃশ্যে বলে অক্টোপাস—’
‘এক্সেলেন্ট! আগেও পড়েছি, আপনি ম্যাজিকের মতো সাদৃশ্য খুঁজে পান!’ কবীরকে থামিয়ে বলেন লামা।

উত্তেজনা খানিক প্রশমিত করে কবীর স্পষ্ট করেন তাঁর মত। আরও তীক্ষ্ণ হয় তাঁর উচ্চারণ।

‘রিপু হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। ছয় রিপু। আমি জানি তন্ত্রসাধনা করলে রিপু ও পাশের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আপনার মধ্যে ক্রোধের মাত্রা একটু অতিরিক্ত!’

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে গেলেন না লামা। নিশ্চুপ। জবাবের অপেক্ষায় কবীর।

আজ সকাল থেকেই তিনি লামার মুখোমুখি। গত দিন তিনেক মোটেই দেখা পাননি তাঁর। যদিও দিন-রাতের হিসেব বুঝতে পারছেন না, কিন্তু বিস্তৃত এক সময়কাল যে অতিবাহিত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, এইটুকুই ঠাহর করতে পারছেন কেবল। কাছে ফোন নেই, সময়ের হিসেব নেই, গুম্ফার প্রায়ান্ধকার পরিবেশে রাত-দিন বোঝাও দায়! তিনি জানেনই না, কালিম্পং-এর জোগচেন গুম্ফা থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসা হয়েছে অন্যত্র। অন্য গুম্ফায়। মাথার মধ্যে প্রশ্নের ঢেউ। কিন্তু উত্তর যোগাবার কেউ নেই। গভীর শৃঙ্খলায় নীরবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন সন্ন্যাসীদল। তাঁরা মৃদু হাসেন যে কোনও জিজ্ঞাসার

জবাবে। অনধিকার চর্চায় তাঁরা যান না। নেতা একজনই। টাইগার লামা। সম্ভবত তিনদিন পর লামাকে পেয়েই কবীর ফোন-করার অনুমতি চান।

'অত উতলা হচ্ছেন কেন খানসাহেব! আপনি আমাদের অতিথি, এখানে থাকুন, পড়াশোনা করুন, কম্পিউটার পেয়েছেন তো? সব ব্যবস্থা আমরা করে দেব! ডোন্ট ওয়রি!'
'সে অসুবিধে নেই, কিন্তু দু'একটা ফোন করার দরকার—আমিও চিন্তামুক্ত হতাম, তারাও হোত।'
'আপনি তো একা মানুষ—ঝাড়া হাত-পা—আপনার জন্য চিন্তা করার কে আছে!'
'এখানে কি নেটওয়ার্ক একেবারেই কাজ করে না!'
'ফোন করা যাবে না খানসাহেব, সরি!' নির্লিপ্ত স্বর লামার।

লামার কথায় কবীরের সন্দেহ দৃঢ় হয়, এরা কি তবে তাঁকে জোর করে আটকে রেখেছে! আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি হচ্ছে না, এই বৃদ্ধ লামার সঙ্গে তাঁর তত্ত্ব-ভুবন নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চলছে, আবার একইসঙ্গে উপলব্ধি করছেন বন্দিত্বও। তাঁর নিজের ল্যাপটপের পাশাপাশি, তাঁর ঘরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারও। কবীর যাতে নিজের বাড়ির মতোই যখন যা-খুশি ব্যবহার করতে পারেন। একক বিছানা, চেয়ার-টেবিল, লম্বা একটি রট আয়রনের সোফা, আসবাব বলতে এইটুকুই। বাহুল্যহীন। চারবেলা খাওয়া সরবরাহ হচ্ছে এই ঘরেই।

'লেখা শুরু করেছেন খানসাহেব?' লামার প্রশ্ন।
'করেছি, তবে তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর চাই!'
'বলুন!'
'আমি কি বন্দি?'
'না। আপনি পণ্ডিত মানুষ, আপনাকে বন্দি করার কোনও অসদুদ্দেশ্য আমার নেই! তবে—'

বাক্য সম্পূর্ণ করার আগে থামেন লামা। উদগ্রীব কবীরের চোখে চোখ রেখে হেসে বলেন,

‘কামসূত্রের টীকা পেতে চাই আমি, সম্পূর্ণ টীকা! প্রায় তো লিখেই ফেলেছেন, শেষ করুন, তারপর আপনার ছুটি!’

লামার তীক্ষ্ণ চোখ। কিন্তু কোনও ক্রুরতা লক্ষ করেন না কবীর। শান্ত ভঙ্গিমা। অবিচল।

টাইগার লামা এই কয়েকদিনেই অনুধাবন করেছেন কবীর খানকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখার একটাই উপায়, তাঁর ভাবনা-ভুবনের জল থেকে তাঁকে না-তোলা। সেই ভুবনে তিনি মৎস্যের মতো বিচরণ করে সবথেকে বেশি আনন্দ পান। বিতর্ক বাড়াতে তাই সচেষ্ট হন লামা।

‘আপনার মদনভস্মের ব্যাখ্যা আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে খানসাহেব!’

অবাক কবীর চেয়ে থাকেন লামার দিকে। কী বলতে চান? ধীর, মৃদুস্বরে টাইগার লামা বলেন তাঁদের আগামী পরিকল্পনা। চমকে যান কবীর। এই মারণ-মতলব কীভাবে ফাঁদলেন লামা? টাইগার লামার মধ্যে ক্রোধের মাত্রা যে অতিরিক্ত, বলে দেন সটান! প্রশ্ন তোলেন তাঁর তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য নিয়েও!

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে গেলেন না লামা। স্মিত হেসে খানিক নিশ্চুপ থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে, কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন। সে-উচ্চারণে প্রত্যয়।

‘ক্রোধ একটি পবিত্র গুণ। লজ্জাও। লজ্জা না-থাকলে ক্রোধ আসে না। পরাধীনতার থেকে বড় লজ্জা আর কিছু নেই খানসাহেব! রেভোলিউশন ইজ মেড আউট অফ শেম। আমরা বলি বটে লজ্জা, আসলে লজ্জা নিজেই একটা ক্রোধ! যদি একটা নেশন সত্যি সত্যি লজ্জিত হয়, তখন তাকে আটকায় কে! সে তখন বাঘের বাচ্চা—এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি!’

বৃদ্ধ লামার মুখে কার্ল মার্ক্সের কথা। অবাক চেয়ে থাকেন কবীর। চোখে সম্ভ্রম। গুম্ফার আলো-আবছায়ার জাফরি লামার শরীরে। উচ্চারণে উদ্দীপন।

৯৯

২০ অক্টোবর। কালিম্পং।

‘ম্যাডাম, মাও-এর ছিল এক্সপ্যানশ্যানিস্ট নীতি। দখল কর। সিসিপি’র বর্তমান জিএস এখন মাও-এর সেই এক্সপ্যানশ্যানিস্ট ভিশনকেই রূপ দিচ্ছে! সরাসরি দেশ দখল আর এখন সহজ নয়, তাই অন্যভাবে দখল! চায়না কিন্তু পিএলএ-কে কেবল লাদাখে দাঁড় করায়নি, সিকিম আর অরুণাচলের লাইন অফ অ্যাকচ্যুয়াল কন্ট্রোলেও দাঁড় করিয়েছে, খেয়াল করবেন! সিসিপি নেভার ফরগেটস আদার টু ফিঙ্গারস! ভূটান আর নেপাল। লাদাখ সাইট থেকে পিএলএ-কে সরিয়ে বেজিং কিন্তু নতুন ফ্রন্ট খুলে ফেলেছে ভূটানে। চোখ সেই টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানসন।’

‘বাহ্ তুমি তো ফ্রন্টের প্রচুর খবর রাখ! এমা তুমি বলে ফেললাম!’

‘আরে ম্যাডাম বলুন না, আমি অনেক জুনিয়র! আপনাদের থেকে অনেক শিখি!’

‘পলিটিক্যাল বিট কর?’

‘সব করি! স্টাফ কম, করতেই হয়!’

‘নেপালের অবস্থা কী?’

‘অলমোস্ট কব্জায়! নেপালি কম্যুনিস্ট পার্টির দুই পক্ষকে এক করে দিয়েছে, হিউজ টাকা ঢেলেছে ওদের ইলেকশন ক্যাম্পেনে—চায়না সরাসরি নেপালের রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে ম্যাডাম!’

‘নেপালি কম্যুনিস্ট পার্টি ওদের লোকাল কোল্যাবরেটর, কী বলছ!’ বিস্ময় প্রশ্ন নিবেদিতার।

‘চায়নার স্ট্র্যাটেজিক অরবিটে থেকেও নেপাল সিসিপির অ্যাগ্রেসিভ দখলদারী আটকাতে পারবে না!’

‘না, না রেজিস্টান্স হবেই! যে কোনও দেশেই হবে! অত সোজা নাকি!’
‘সিসিপি ওকে খাবেই ম্যাডাম! বিশাল রোড-কনস্ট্রাকশন প্রোজেক্টের জন্য নর্থ নেপালের বেশ কিছু অংশ চায়না নিজের এলাকায় অলরেডি ঢুকিয়ে নিয়েছে! কয়েকটা রিভারবেড প্রয়োজন মতো ঘুরিয়ে দিয়েছে! বহু নেপালি স্কুলে এখন মান্দারিন ভাষা পড়ান হচ্ছে, ভাবতে পারেন! হিউজ পয়সা ঢালছে চায়না, আপনারা হয়ত তেমন পাত্তা করেন না, কিন্তু আমাদের এগুলো ভাবতেই হয় ম্যাডাম! সবসময় ভয়ে থাকি!’

অবাক হয়ে শোনে নিবেদিতা। ক্রমশ উত্তেজিত সোনম।

‘এশিয়ার ওয়াটার ম্যাপ পাল্টে দিয়েছে! আগেও দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে ম্যাডাম! এশিয়ার দশটা মেজর নদীর অরিজিন হল টিবেট। ড্যাম বানিয়ে, নদী খাত ঘুরিয়ে নানাভাবে নদীগুলোর ওয়াটার রিসোর্স কন্ট্রোল করে চায়না! চায়না যে হাইড্রো-হেজেমনি তৈরি করেছে, অন্তত বিশ্বের মডার্ন হিস্ট্রিতে এর দ্বিতীয় কোনও নজির নেই! ওয়র্ল্ডের লারজেস্ট ড্যাম বানাচ্ছে চায়না টিবেটে, সাংপোর ওপর! ইমপ্যাক্ট কী হবে ভাবতে পারছেন ম্যাডাম!’
‘ব্রহ্মপুত্র?’ প্রশ্ন নিবেদিতার।
‘জাস্ট শুকিয়ে যাবে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি! কেবল তাই নয়, আর্থকোয়েক-প্রোন রিজিয়ন এমনিতেই, ভূকম্পের প্রোবাবিলিটি বেড়ে যাবে বহুগুণ!’

ঠোঁট উল্টে বিস্ময় প্রকাশ নিবেদিতার। উত্তেজিত সোনম ডান হাতের তালু টেবিলে রেখে বলে,

‘এই পাম-মেটাফর দিয়ে মাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন হোল হিমালয়ে চায়নার হেজেমনি প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি হল টিবেট। টিবেট গিলে নিয়ে রাতারাতি ওয়ার্ল্ডের ফোর্থ বিগ কান্ট্রি হয়ে গেল চায়না! সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়রের পর সবথেকে বড় জিও-পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। এই দখলের ফলে ভারত, ভূটান, নেপাল আর মায়ানমারের সঙ্গে ওভারনাইট কমন বর্ডার পেয়ে গেল!’
‘তাহলে এই এলাকা সেফ নয় ইন ফিউচার!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে নিবেদিতা।

‘যতদিন সিসিপি’র হাতে থাকবে অ্যাবসোলিউট পাওয়ার, তদ্দিন চায়নার কোনও নাইবারিং দেশেরই শান্তিতে ঘুমোবার উপায় নেই, ম্যাডাম!’ হাসে সোনম।

নীরবতা। রেস্তোরাঁর অন্যান্য টেবিল থেকে আসছে মৃদু শব্দ। চিনের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উজাড় করে সোনম যেন কিছুটা ক্লান্ত। কিন্তু সব তথ্য পায়নি নিবেদিতা।

‘লাসা-কালিম্পং ক্যারাভান ট্রেড রুট এখনও খুলছে না কেন চায়না, সোনম! কী একটা পুরনো কারণ আছে বলছিলে?’ সরাসরি জানতে চায় নিবেদিতা।

আবার চারপাশ সন্তর্পণে দেখে সোনম। চুমুক দেয় চায়ের পেয়ালায়। তারপর গলা নীচু করে বলে,

‘টিবেটান গেরিলাজ!’

কালিম্পং-এ তিব্বতি গেরিলা বাহিনী! কৌতূহলী নিবেদিতা চেয়ে থাকে সোনমের দিকে। সে বিশদে জানতে চায়।

১০০

২০ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

‘মজফ্ফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী পালালেন! মজফ্ফরপুর থেকে উনচল্লিশ কিলোমিটার দূরে ওয়েনি স্টেশনে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন ক্ষুদিরাম! এদিকে মোকামাঘাট স্টেশনে পুলিশ যখন ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে, পালাবার আর পথ নেই, পুলিশের কাছে ধরা দেননি প্রফুল্ল চাকী! চারপাশ দেখে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন কেবল, তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন দ্রুত। এক ঝটকায় বার করলেন

কোমরে গোঁজা পিস্তল। তারপর—' খানিক থামলেন লামা, তারপর বললেন, 'পিস্তলটা শরীরে ঠেকিয়ে গুলি করলেন! একটা নয় খানসাহেব, দুটো গুলি করলেন নিজেকে! গুলি কে করেছিল এই নিয়ে বিতর্ক আছে, প্রফুল্ল নিজে না কি পুলিশ, আমি প্রচলিত মতটাই ধরে নিচ্ছি যে তিনি সুইসাইড করেছিলেন! ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তিনি ধরা দেবেন না!' থামেন লামা। মুহূর্তেই আবার উত্তেজিত স্বরে বলেন, 'আমি বিস্মিত হই খানসাহেব, একজন মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য নিজেকে দ্বিতীয় গুলি করছেন! আনবিলিভেবল!'

আলো ও অন্ধকারের অলাতচক্রে বৃদ্ধ লামা। বিষণ্ণতা ও জেদ মিশে যায় মুখমণ্ডলে। সারা শরীরে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে অঙ্গীকার।

'এই দ্বিতীয় গুলিটা হল লজ্জা! পরাধীনতার লজ্জা! আসলে পরাধীনতার ক্রোধ! আপনাদের ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা আমাদের প্রেরণা! স্পেশালি বাঙালি বিপ্লবীরা আমাদের প্রেরণা!'

লামার কথায় শিরশিরিয়ে ওঠেন কবীর। বাঙালি বিপ্লবীরা আমাদের প্রেরণা—এই উচ্চারণে শতদীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয় কবীরের শরীরে। কোষে কোষে। চেয়ে থাকেন বৃদ্ধ লামার দিকে। নির্নিমেষ।

'স্বয়ং তথাগত ভিক্ষুর জন্য দশ শীল ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু শীলরক্ষা শ্রাবকের কাছে যত বড়, বোধিসত্ত্বের কাছে ততটা নয় খানসাহেব! পরাধীনের কাছে তো নয়ই!'

চুপ করে চেয়ে থাকেন কবীর। দীপ-প্রজ্জ্বলিত গুম্ফার প্রায়ান্ধকার ভিতরমহল। বৃদ্ধ লামাকে ঘিরে যেন তৈরি হয় এক বিভা। অলৌকিক বিভা।

'আমাকে ভয় পায় সবাই! আমি নাকি অদৃশ্য হতে পারি! বাঘের রূপ নিতে পারি আমি! আমি গুরু রিন-পো-ছে'র অবতার! আমি নাকি অলৌকিক শক্তির অধিকারী! আমায় ঘিরে পাহাড়ে পাহাড়ে মিথের অভাব নেই!'

কিছুটা বিরতি নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন। শান্ত। কম্বুকণ্ঠ।

‘পৃথিবীতে অলৌকিক শক্তি বলে কিছু নেই। মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত শক্তি যার প্রকাশ কখনও কখনও তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। একে বলে বোধি। এই বোধির সম্পূর্ণ বিকাশ হলে একজন সাধারণ মানুষ অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। অন্যের দৃষ্টিতে এটা অস্বাভাবিক লাগে। কিন্তু এ স্বাভাবিক।’
‘এত প্রাজ্ঞ মানুষ আপনি, আপনার মাথায় এমন ভয়াবহ প্ল্যান এল কী করে!’

কবীরের প্রশ্নে হা-হা করে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ লামা। তারপর তাঁর চোখে চোখ রেখে বলেন,

‘ওই যে বললাম আপনার লেখা পড়ে!’
‘আমার লেখা!’ তাজ্জব কবীর।

ঘরের এক কোনায় রাখা তোরঙ্গ খোলেন লামা। বার করেন একটি বই। জীর্ণ। মলিন। কীটদষ্ট প্রচ্ছদ। কিন্তু এক বার দেখেই মুহূর্তের মধ্যে চিনে ফেলেন কবীর। ৪৯ বায়ু। বহু বছর আগে, অন্তত পঁচিশ বছর, এই পত্রিকায় তিনি বাৎস্যায়নের কামসূত্র নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নির্দিষ্ট পাতায় গিয়ে বইটি খুলে কবীরের সামনে মেলে ধরেন লামা।

‘এখানে আপনি যা ইঙ্গিত করেছিলেন আজ তা-ই নিয়েই তো বিস্তারিত গবেষণা করছেন, তাই তো খানসাহেব?’

ইতিবাচক মাথা নাড়েন কবীর। কিন্তু ভেবে কিনারা করতে পারেন না, কী এমন লিখেছিলেন ওই ছোটো প্রবন্ধে, যা এই বৃদ্ধ লামাকে এমন ভয়াবহ পরিকল্পনা করতে প্রণোদনা যোগাবে!

‘মদনভস্ম করছি। সবথেকে আসক্তির জায়গা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি। মাতৃভূমির টান সবথেকে বড় টান! সবথেকে বড় আসক্তি! সেই মত্ততা, সেই ভালোবাসা, সেই কামনাকে আমরা হত্যা করব! মহাদেব স্বয়ং ভস্ম করেছিলেন মদনকে, এখানে মদন নিজেই নিজেকে ভস্ম করবে!’

হতবুদ্ধি কবীর চেয়ে থাকেন বৃদ্ধ লামার দিকে। কীভাবে মদনভস্মের অর্থান্তর করে সম্পূর্ণ নতুন অর্থ আরোপ করছেন লামা! তিনি তো এমন কিছুই লেখেননি! উৎপন্ন বস্তুর প্রতি কামনাকে ভস্ম করার অর্থ নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা হত্যা করা নয়!

‘দুনিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম দেশ, ইন টার্মস অফ এরিয়া—এক নম্বর দেশ, ইন টার্মস অফ পপুলেশন—দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ, দু’দিন পরেই যারা এক নম্বর হবে, ইন টার্মস অফ অর্থনীতি—পৃথিবীর সবথেকে বড় স্টেট, ইন টার্মস অফ স্ট্যান্ডিং আর্মি! আমরা এদের সঙ্গে কোনও তুলনায় আসি খানসাহেব! ডেভিড ভার্সাস গোলিয়াথের তুলনাও করা যায় না! পিঁপড়ের মতো টিপে তিলে তিলে মেরে ফেলছে আমাদের। রোজ রোজ এইভাবে মরার থেকে—’

কথা শেষ করেন না লামা, না কি করতে পারেন না! লামার চোখের আগুনে কি একটু বেদনাও মিশে আছে! তাকিয়ে থাকতে পারেন না কবীর। নামিয়ে নেন চোখ। পরাধীন মানুষের দৃষ্টি অসহনীয়।

মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসে। সম্ভবত শুরু হল সন্ধ্যার প্রার্থনা। বাতাসে শীত। চাদরটা আরও টেনে বসেন কবীর, জড়সড় হয়ে।

ব্যাকুলতা টের পান অন্তরে। চরাচর সংবিগ্ন।

১০১

২০ অক্টোবর। সন্ধ্যা। কালিম্পং।

অর্হৎ বড়ুয়া অপহরণ নিয়ে মেতেছে মিডিয়া। কিন্তু কবীর খানের অন্তর্দ্ধান এখনও অধরা মিডিয়ায়। নিজেকে এখনও সংযত রেখেছে নিবেদিতা। ভোরের কাগজে এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদন সে প্রকাশ করতেই পারে, কিন্তু তদন্তের স্বার্থে বিরত করেছে নিজেকে। আর দিনকয়েক অপেক্ষা করবে, পুলিশ যদি কবীর খানের কোনও সন্ধান দিতে না-পারে, এ যাবৎ ঘটে যাওয়া যাবতীয় ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করতে বাধ্য হবে সে।

পুলিশের ব্যর্থতা, অপদার্থতা ব্যানার শিরোনামে খবর করবে। সংবাদ মাধ্যম কেবল শিশু অর্হৎ বড়ুয়া অপহরণ জানে মহাবোধির দৌলতে, কিন্তু এখনও কিছুই জানে না গুরু পদ্মসম্ভবের প্রাচীন মূর্তি চুরি আর ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক কবীর খানের অন্তর্দ্ধান বিষয়ে। এর সঙ্গে তিব্বত ও চিন যুক্ত হলে সোনায় সোহাগা! কাড়া-নাকাড়ায় কান ঝালাপালা করে দেবে সকল সংবাদ মাধ্যম।

সারাদিন কালিম্পং-এর এ-মাথা ও-মাথা চষে সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরে নিবেদিতা। ঘরে ঢুকেই চালিয়ে দেয় গিজার। জামাকাপড় বদল করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে বিছানায়। ফোন করে গৌরাঙ্গকে। জানায় ঘটনার গতিপ্রকৃতি আর নিজের ক্ষোভ-বিক্ষোভ। সাবধানে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে বলে গৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গকে ছেড়ে ফোনটা ছুঁড়ে দেয় প্রশস্ত বিছানার অপরপ্রান্তে। তারপর টানটান হয়ে শোয়। একটাই চিন্তা, মাথার অন্দরে চঞ্চল মাছের মতো থেকে থেকে ঘাই মারে। তিব্বতি বিপ্লবীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কি জড়িয়ে পড়লেন খানদা?

উঠে বসে। আবার হাতে নেয় ফোন।

‘বলুন?’

‘ডিকেবাবু, পুলিশ কী ইনভেস্টিগেট করছে আমি জানি না—সরসিজ বিশ্বাস আর জোগচেন গুম্ফার লোকজন—এদের জেরা করলেই অনেক তথ্য বেরোবে!’ নিবেদিতার গলায় উত্তেজনা। উষ্মাও।

‘সরসিজ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আরও করবে। আপনি এখন কোথায়?’

‘হোটেলে।’

‘কাল আমি লাভা যাব—বাগডোগরা থেকে সোজা লাভা—’

‘আমিও যাব আপনার সাথে!’

‘সরাসরি লাভা গেলে কালিম্পং ঢুকতে হয় না—আপনি—’

‘আমি এখান থেকে চলে যাব। বাগডোগরায় নেমে আমায় জানিয়ে দেবেন। আমি গাড়ি বলে রাখব। লাভার কোথায়?’

লাভা মনাস্ট্রির রিঞ্চেন লামার সাক্ষাতের গুরুত্ব ডিকে বোঝায় নিবেদিতাকে।

‘ওকে। আপনার ফ্লাইট কখন?’

‘একটু পরে কনফার্মড হবে। সম্ভবত সকালে হচ্ছে না, দুপুরেরটায় হতে পারে।’

‘ওকে। আমি লাভা পৌঁছে যাচ্ছি কাল! বাই!’

‘শুনুন, শুনুন নিবেদিতা!’

‘বলুন।’

‘রিয়াজের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে শুনেছি—নাম্বার আছে ওর?’

‘আছে। গতকাল উনি আমায় লিফট দিয়েছেন—তখনই নিয়ে নিয়েছি।’

‘কোনও অসুবিধে হলে ওকে কল করবেন।’

‘ওকে।’

‘আর একটা কথা নিবেদিতা—’

‘বলুন!’

‘আপনি জার্নালিস্ট—ভালোই জানেন—তবুও বলি, নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখবেন, কেন কালিম্পং গেছেন কারোকে বলার দরকার নেই! জানতে পারলে টার্গেট হয়ে যাবেন!

রিয়াজ বহু চেষ্টা করেও এলাকার মানুষদের থেকে খুব কিছু বার করতে পারেনি! খুবই সেন্সিটিভ ইস্যু!'

কালিম্পং-এ রিয়াজের অভিজ্ঞতা কিছুটা জানায় নিবেদিতাকে। সোনম লেপচার সঙ্গে কথোপকথনের কথা ডিকেকে জানায় না নিবেদিতা।

'আপনার কি ধারণা ডিকেবাবু, টিবেটান রেবেলসদের সঙ্গে প্রত্যেকটা ঘটনার যোগ আছে?'
'আছে!'
'কিন্তু কীভাবে! ওদের গুরুর মূর্তি ওরা উদ্ধার করেছে—মূর্তির ব্যাপারটা তাও মানা যায়—কিন্তু একটা বাচ্চা আর একজন বয়স্ক মানুষকে নিয়ে ওরা কী করতে চায়!'
'রিঞ্চেন লামা হয়ত ক্লিয়ার করতে পারবেন! এই মুহূর্তে আর কোনও অপশন নেই! তাই কালই আমি লাভা যাওয়ার ডিসিশন নিয়েছি!'
'ওকে, আসুন কাল। টেক কেয়ার!'

রিঞ্চেন লামা হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন কেন? কী জানেন তিনি? থই পায় না তলের। ফোন রেখে নিবেদিতা চুপচাপ বসে থাকে বিছানায়।

রাতের খাওয়া সেরে টিভি চালায় ডিকে। দু'একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে দেখে বন্ধ করে দেয়। মাথায় ঘোরে অন্য চিন্তা। নিবেদিতাকে এইমুহূর্তে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। রজতকে সব জানিয়েছে আগেই। নিবেদিতার সন্দেহ অমূলক নয়। বস্তুত উপন্যাসের ভাষায় কালানৌচিত্য দোষ প্রথম ধরেছিল ও-ই। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বইয়ের তাক থেকে নামায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস সমগ্র।

কাগজের টুকরো দিয়ে চিহ্নিত পাতাগুলো আবার দেখে। কি/কী-এর অপপ্রয়োগের যথেচ্ছ ব্যবহার আছে প্রায় সব লেখায়। লক্ষ/লক্ষ্য আলাদা নয়। সব লক্ষ-এই য-ফলা আছে। যদিও ভাষা ও তার প্রয়োগে অ্যানাক্রনিজম বা কালানৌচিত্য দোষ সম্পর্কে তিনি সচেতন।

কামসূত্র উপন্যাসের পাতার চিহ্নিত অংশ খোলে। লেখক এখানে কি/কী-এর নিপুণ ব্যবহার করেছেন। সব লক্ষ-এই য-ফলা দিয়েছেন, কিন্তু আচার্য/আচার্য্য দুই ধরনের প্রয়োগ করেছেন। ভাষায় ভরপুর অ্যানাক্রনিজম আছে, আরবী-ফার্সির ব্যবহার তো আছেই, এমনকী 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার'—রবীন্দ্রগানের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে একাদশ শতকের পটভূমির লেখায়! শরদিন্দু কি এমন করবেন?

রাত এগারোটা চল্লিশ। কলকাতা।

'এনিওয়ে, কাল সাবধানে যাস! সকালে হল না, সোয়া বারোটার ফ্লাইটের আগে টিকিট পেলাম না।'

'অসুবিধে নেই!'

'মিউজিয়ামে আমাদের ফোর্স ডেপ্লয়েড আছে—কোনা কোনা সার্চ করাচ্ছি—খবর আছে—পরে বলব। আর হ্যাঁ এদিকে সিচ্যুয়েশন গ্রেভ হলেই জানাবি। রিঞ্চেন লামা মনে হচ্ছে কি-পার্সন হবে—টাইগারের সঙ্গে টাসেল আছে—যা খবর পাচ্ছি!

'হুঁ।'

'কোনও রিস্ক নিবি না! শিলিগুড়ি কমিশনারেট আর জেলা পুলিশের সঙ্গে আমাদের লিয়াজঁ রিয়াজ—সব ওকে জানাবি—ফোর্স রেডি থাকবে—আমাকেও জানাবি—এসটিএফ কম্যান্ডোদের শিলিগুড়ি বেসক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমরা—হেলিকপ্টার থাকবে—ওকে, টেক কেয়ার ডিকে!'

বাইরে থকথকে অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের রাত। বারান্দা থেকে ঘরে যায় ডিকে। রজতের ফোন ছেড়ে গোছগাছে বসে। আগামিকাল যাত্রা।

।। তৃতীয় অধিকরণ 'কাম' সমাপ্ত।।

মোক্ষ

১০২

একাদশ শতক। ধর্ম্মপুর। সপ্তগ্রাম।

ধর্ম্মপুর সঙ্ঘারামের অন্দরে একটি দ্বিতল বিহার। উঠানে একটি মন্দির। তাহার মধ্যে একটি চৈত্য। মন্দিরের দরজার পাশে গণেশ ও মহাকালের মূর্তি। ধূপ-ধুনা, ফুল-চন্দন, দুর্ব্বা, আলো চাউল, অগুরু-গুগ্‌গল সহযোগে উপাসনাগৃহে পুজার আয়োজন করিতেছেন কয়েকজন ভিক্ষু। কর্পূরের গন্ধ ঘরময়। কর্পূর জ্বালাইয়া আরতির প্রস্তুতি শুরু হইয়াছে।

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বিহারের দ্বিতলে উঠিল দীপন। প্রবেশ করিল একটি কক্ষে।

'এসো দীপন, বহুদিন দেখিনি তোমাকে!'

'দেশে ছিলাম না গুরুদেব!'

'বিক্রমশীল গিয়েছিলে না কি বিদেশে বাণিজ্য?'

'উজ্জয়িনী থেকে আসছি গুরুদেব। বিশেষ প্রয়োজন আছে আপনার সঙ্গে।'

'বলো কী প্রয়োজন?'

'বলছি গুরুদেব। আগে বলুন সমাজের সংবাদ কী?'

'অনাচার ক্রমাগত বাড়ছে! নিজের ধর্ম কদ্দিন ধরে রাখা যাবে সংশয় আছে!' দীর্ঘশ্বাস গুরুদেবের।

'আপনিও এমন কথা বলছেন গুরুদেব!'

'ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করার খেলা চলছে! বৌদ্ধবিহার সংলগ্নভূমিতে ভূমিদান কর্ম্মসুচী হচ্ছে! একশত গ্রাম দানের প্রয়োজন নাই, পঞ্চদশ গ্রাম দিলেই কাম শেষ। বৌদ্ধদের জমি ব্রাহ্মণসাৎ করা যাবে।'

'কী সব্বোনাশ!'

'চতুর্দ্দিকে সব্বোনাশের কালোমেঘ!'

‘ধর্ম্মের কী সংবাদ গুরুদেব?’

‘ধ্বংসের আশঙ্কায় দিনাতিপাত!’

‘কেন গুরুদেব?’

‘ধর্ম্মের অবস্থার কথা যখন জিজ্ঞাসা করছ, তোমার মনেও নিশ্চয়ই সেই আশঙ্কা আছে পুত্র!’

‘অবস্থা ভাল ঠেকছে না গুরুদেব!’

‘ধর্ম্মের শিষ্যকন্যা বৃদ্ধি করতে গিয়েই এই বিপত্তি! তথাগত স্বয়ং ভিক্ষুর জন্য দশশীল ব্যবস্থা করেছিলেন, ধার্মিক-গৃহস্থের জন্য অষ্টশীল। দশশীল-অষ্টশীল ছাড়, পঞ্চশীল নেবার জন্য যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন, তাই বা ক’জনের আছে? বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। যে কেউ প্রাতঃকালে উঠে বললেই নাকি সে বৌদ্ধ হয়ে যাবে! এ কী যুগ পড়ল দীপন! শিষ্যকন্যা বাড়ছে, সব্বোনাশ হচ্ছে ধর্ম্মের! ধর্ম্মকে বাঁচাব কীভাবে!’

‘অপরাধ মার্জ্জনা করবেন গুরুদেব, ভিক্ষুরাও কি চলছেন যথার্থ পথে?’

‘ভুল কিছুই বলনি পুত্র! দুইবেলা আহার আমাদের নিষেধ, তুমি জান।’

‘দ্বিকাল ভোজন।’

‘বহু বৌদ্ধভিক্ষুই আর দ্বিকাল-ভোজন মানে না। দুইবেলা খায়। অসময়েও খায়। এমনকী মঠের অধক্ষ্যেরাও তাই! রসাতলে গেল সব!’ অনতিদীর্ঘ একটি শ্বাস ছাড়িয়া গুরুদেব পুনরায় কহিলেন, ‘ছাড় ওসব, যা হওয়ার হবে, ধর্ম্মের জোর থাকলে বাঁচবে, নাহলে মরবে! তুমি বলো কী বিশেষ প্রয়োজনে এই সকাল-সকাল এসেছ?’

‘ম্লেচ্ছিত বিকল্পে দক্ষ পরিচিত পণ্ডিত কেউ আছেন?’

‘ম্লেচ্ছিত বিকল্প!’

‘হ্যাঁ গুরুদেব, একটি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি পেয়েছি, পুরোটাই সাংকেতিক ভাষায় লেখা!’

‘গুঢ়লেখ উদ্ধার করার মতো পণ্ডিত এই তল্লাটে কোথায়! আমাদের সঙ্ঘারামে কেউ নেই। আমরা এ জিনিস কেউ জানি না। ধর্ম্মপুরে যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ আছে, তারা মূর্খ। নগরে যাজন করে। চন্দন-তিলক পরে ঘরে-ঘরে দেবপূজা আর শ্রাদ্ধ করে বেড়ায়।’

‘কায়েতরা?’

‘কায়স্থরা সকলেই লেখাপড়া জানে। কিন্তু ম্লেচ্ছিত বিকল্প জানে কী না সন্দেহ!’

‘তাহলে কী করণীয় গুরুদেব?’
‘কোথায় পেলে পুত্র, এই পুঁথি?’

দীপন গুরুদেবকে জানাইল সকল কাহিনী। সবিস্তার শুনিয়া গুরুদেব কিঞ্চিৎ ভাবিলেন। অতঃপর পুত্রবৎ দীপনকে উপদেশ দিলেন।

‘তুমি এই গূঢ়লেখ নিয়েই চলে যাও বিক্রমশীল। তুলে দাও অধ্যক্ষের হাতে। ওঁরা সংকেতলিপি উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনবে আচার্য দীপংকরের টীকাভাষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন বহু পণ্ডিত আছেন।’

গুরুদেবের উপদেশ পছন্দ হইল দীপনের। কী-করিতে কী-করিয়া ফেলিবে স্থানীয় পণ্ডিত, মহা-অনর্থ ঘটিবে! গুরুদেব সকালের আরাধনায় যোগ দিবেন। সামান্য কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর উঠিয়া পড়িল দীপন। ত্যাগ করিল সঙ্ঘারাম।

উজ্জয়িনী হইতে গতকাল সন্ধ্যায় ফিরিয়াছে গৃহে। কোনোক্রমে রাত কাটাইয়া ভোরেই শরণাপন্ন হইল গুরুদেবের। বহুদিন গৃহের সহিত যোগাযোগ না থাকায়, সকাল-সকাল গৃহত্যাগে আপত্তি করিয়াছিলেন মা। সত্বর ফিরিয়া আসিয়া দ্বিপ্রাহরিক ভোজন গৃহেই করিবে, জননীকে আশ্বস্ত করিয়া বাহির হইয়াছিল দীপন।

সঙ্ঘারাম ত্যাগ করিয়া, স্বগৃহের পথ ধরিল। পদব্রজেই আসিয়াছে সঙ্ঘারাম। খুব দূরের পথ নয় বলিয়া প্রিয় অশ্ব রৌদ্রকে বিশ্রামে রাখিয়াছে। যদিও নামে মাত্র বিশ্রাম, আগামীকাল প্রাতেই রওনা হইতে হইবে বিক্রমশীল অভিমুখে।

পথেই পড়িল কুমোরপাড়া। পটুয়াপাড়াও পাশে। কুম্ভকারেরা মৃত্তিকা দ্বারা মাটির সরা, হাঁড়ি, কুঁড়ি, মৃদঙ্গ, দগড়, কাড়া, নানা মৃৎপাত্র বানাইতে ব্যস্ত। পটুয়ারা মগ্ন মূর্তিনির্মাণে। পটুয়াপাড়ার মুখে দাঁড়াইল দীপন। কটিবন্ধে ডান হাত দিয়া অনুভব করিল মূর্তির উপস্থিতি। অগ্রসর হইল দক্ষ পটুয়া মদন চিত্রকর-এর কর্মশালার দিকে।

‘আরে দীপন, বাণিজ্য থেকে ফিরলে কবে!’ হাসিয়া কহিল মদন।
‘গতকাল সন্ধ্যায় ফিরেছি।’
‘মঙ্গল হোক তোমার! সংবাদ সব ঠিকঠাক?’
‘সব ঠিক আছে। এবারে বাণিজ্যে গিয়ে উজ্জয়িনী থেকে এক অদ্ভুত মূর্তি পেয়েছি মদন, তোমাকে দেখাতে চাই। এমন মূর্তি আমাদের বঙ্গদেশে দেখিনি।’
‘কই দেখি কী মূর্তি?’ আগ্রহ প্রকাশ করিল মদন।

বঙ্গদেশের নিজস্ব দুইটি উৎকৃষ্ট উৎপন্ন দীপনের বাণিজ্য তালিকায় উপরের দিকেই থাকিত। বঙ্গদেশের শিল্পীর নিজ হস্তে নির্মিত বৌদ্ধ দেব-দেবীর মৃৎ ও ধাতু মূর্তি আর বঙ্গদেশের বস্ত্র।

সমতট অঞ্চল কেবল নয়, বরেন্দ্র, কর্ণসুবর্ণ, পূর্ব্ববঙ্গদেশ, হরিকেল, কামরূপ হইতে উৎকৃষ্ট কার্পাস ও রেশম বস্ত্র সংগ্রহ করিত দীপন। নানা বস্ত্র সংগ্রহ করিতে করিতেই নির্মিত হইয়াছে নিজস্ব রুচি। মাতৃভূমির কার্পাস ও রেশম বস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিলে স্বস্তি বোধ হয় না।

তন্তুবায়দের হস্তশিল্পের পাশাপাশি তাহার বিশেষ প্রবণতা বাঙ্গালি মৃৎশিল্পীর উৎকৃষ্ট হস্তকর্মের বাণিজ্যসাধন। মদন চিত্রকর নির্মিত বহু মূর্তি বিদেশ পাড়ি দিয়াছে দীপনের হাত ধরিয়া। মদন বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত।

বজ্রযানের দেবমণ্ডল মূর্তিরূপ লাভ করিয়াছে মদনের মতো বঙ্গদেশের শিল্পীদের হাতেই। বৌদ্ধতন্ত্রের সাধকরা দেব-দেবীর মূর্তির দর্শন লাভ করিতেন মানসপটে, সাধনার মাধ্যমে। ধ্যানে প্রাপ্ত সেইসব মূর্তি গড়িতে সাধকেরা অনুপ্রাণিত করিতেন বঙ্গদেশের শিল্পীদের। এই উদ্যমে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধকদের ভূমিকা উল্লেখ না করিলেই নয়! তাঁহারা পরম সৌগত পালরাজদের নিকট উপস্থিত হইয়া শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন মহারাজাধিরাজ গড়িয়া দিক মন্দির, স্থাপন করুন মূর্তি। বৌদ্ধ

তান্ত্রিক সাধকদের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে সূচনা হইল মূর্তিশিল্পের। মূর্তি গড়িতে পালরাজগণ আর্থিক সহায়তাও করিতেন শিল্পীদের।

শাক্যসিংহ বা বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করিত শিল্পীরা। দীপন লক্ষ করিয়াছে, ভূমিস্পর্শমুদ্রা বা ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ, এইরূপ মূর্তিই ক্রেতার নিকট অধিক কাঙ্ক্ষিত। বৌদ্ধ বজ্রযানের অন্যান্য দেবদেবীর নানা মূর্তিও লোকপ্রিয়। অবলোকিতেশ্বর ও বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী ছাড়াও তারা, জম্ভল, হেরুক, হেবজ্রের মূর্তিও কম জনপ্রিয় নয়। পাথর ও ধাতুনির্মিত অসংখ্য মূর্তি, দেশ-বিদেশের বহু বৌদ্ধমন্দির বা সঙ্ঘারামে সরবরাহ করিত দীপন। বঙ্গদেশের শিল্পীর হাতের ইন্দ্রজালে জীবন্ত হইয়া উঠে সব মূর্তি। কিন্তু বৃন্দা শাক্যমুনির যে মূর্তি তাকে অর্পণ করিয়াছে তেমন মূর্তি অচেনা। বিরল।

কটিবন্ধ হইতে ক্ষুদ্র মূর্তিটি বাহির করিল দীপন। অর্পণ করিল মদনের হস্তে। মূর্তি হাতে লইয়া গভীর নিরীক্ষণ করিল মদন। দীপন লক্ষ্য করিল মূর্তি দেখিয়া কুঞ্চিত হইল মদনের ভ্রুযুগল। খুব দ্রুত দীপনের হাতে প্রত্যর্পণ করিল মূর্তি।

'কী হল মদন?' জিজ্ঞাসা করিল দীপন।
'এই মূর্তি কোথায় পেলে তুমি?' সন্দিগ্ধ প্রশ্ন মদনের।
'উজ্জয়িনী।'
'এই মূর্তি চীনদেশের! ভোটদেশেও এমন মূর্তির চল আছে। শাক্যমুনির এমন রূপ বঙ্গদেশের নয়।'

আর কিছুই কহিল না মদন। তাহার অভিব্যক্তি দেখিয়া মনে হইল মূর্তি তাহার মন কাড়িতে ব্যর্থ। আবার গৃহের পথ ধরিল দীপন। পিছন হইতে মদনের চিৎকার শুনিল, 'এই মূর্তি কোনও সঙ্ঘারামে দিয়ে দিও দীপন, নিজের কাছে রেখ না!'

চমকাইল দীপন। এমন কথা বৃন্দাও বলিয়াছিল। গৃহে ফিরিয়া নামিল সংলগ্ন পুষ্করিণীতে। সাঁতার কাটিল দীর্ঘক্ষণ। স্নান করিল আশ মিটাইয়া। মায়ের ডাকে সস্মিত ফিরিল এবং

বুঝিল ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে শরীর। দাওয়ায় ভোজনে বসিয়া বিস্মিত হইল। বহুদিন পর গৃহে ফিরিয়াছে পুত্র, সেই উপলক্ষ্যে বিশাল আয়োজন করিয়াছেন মাতা।

মস্ত কলাপাতায় গো-ঘৃত সহযোগে গরম ভাত, তাহার সহিত পলতা পাতার শাক, মুদ্গসূপ, কুষ্মাণ্ড ভাজা, কুষ্মাণ্ড-নিম-পলতা-নালিতা-ডুমুর ও বেতের কচি অগ্রভাগসহ সুক্তা, চিতলের কোল ভাজা, রুহিৎ মৎস্যের ঝোল, সুসিদ্ধ হরিণের মাংস, করঞ্জার অম্বল, মিষ্টান্নখণ্ড এবং দধি। মাটির পাত্রে থরে থরে সাজান ব্যঞ্জন দেখিয়া রসনা সিক্ত হইল দীপনের। জননীকে পাশে বসাইয়া আহারে বসিল সে।

বাণিজ্যের কল্যাণে গৃহে লক্ষ্মী বিরাজমান। স্বয়ং লক্ষ্মী তাহার মাতা। বৎসরের অধিকাংশ সময় একাই থাকেন বিরাট বাসগৃহে। পুত্র ঘুরিয়া বেড়ায় নানাদেশ। মাতা ঠিক করিয়াছেন এই বৎসর পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করিবেন। ধনলক্ষ্মী থাকিলেও, গৃহে লক্ষ্মীশ্রীর অভাব। তাহা পূরণ করিবেন গৃহবধূ। হরিণের মাংসের দিকে পুত্রকে হাত বাড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া প্রস্তাব রাখিলেন মাতা। প্রস্তাব মুহূর্তে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল দীপন।

‘এখন অনেক কাজ, বিবাহ নিয়ে ভাবছি না!’ আঙুল চাটিতে চাটিতে বলিল, ‘কতদিন আমশোলের অম্বল খাইনি মা!’
‘বাড়িতে থাকলে তো খাবি!’ মাতা কপট রাগ প্রকাশ করেন।
‘তেঁতুল দিয়ে পাঁকাল মাছের অম্বল, আহা!’

মাছের অম্বল অতি প্রিয় দীপনের। শোল বা পাঁকাল, দুইয়ের কোনোটাই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই মাতা। যদিও পুত্র মাছ ভালবাসে বলিয়া মাছের পদই অধিক করিয়াছেন। হরিণের মাংস ব্যতীত আর কোনও মাংস করেন নাই। মাতা জানেন বঙ্গদেশের বাহিরে মাংস হয়তো মিলিয়াছে, কিন্তু মাছ রসনা তৃপ্ত করে নাই মৎস্যপ্রিয় পুত্রের। ভোজনে খুবই উৎসাহ দীপনের। কেবল মাছ কেন, বিভিন্ন মাংসও তাহার প্রিয়। নকুলমাংস ও সজারুমাংস খুবই প্রিয়পদ। কিন্তু মাতার আপত্তিতে ওই সকল মাংসের গৃহে প্রবেশ নিষেধ। মদন চিত্রকর বা কর্মকার পাড়ায় নিষিদ্ধ মাংস তৃপ্তি করিয়া ভোজন করিয়াছে।

তেলিপাড়ার পাশে কামার পাড়াতে বাণিজ্যের সূত্রেই যাতায়াত আছে তাহার। বস্তুত, কেবল পটুয়া বা কামার কেন, বাণিজ্যের কারণে বঙ্গদেশের সকল কারুজীবী অঞ্চলেই তাহার অনায়াস বিচরণ।

পঞ্চব্যঞ্জন ও মায়ের আদর সহযোগে মধাহ্নভোজ সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল দীপন।

আগামী কাল ভোরেই যাত্রা।

জানালা দিয়ে বাইরে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে ডিকে। ফালি ফালি মেঘ কেটে উড়ে চলে উড়োজাহাজ। দমদম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে অপেক্ষমান যাত্রীদের মাঝে বসে থাকার সময় আসে রজতের ফোন। অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাসকে হেফাজতে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। তার মেলবক্স ঘেঁটে পাওয়া গেছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের মেল। 'আমার পিতার প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সমস্ত লেখাই কলকাতার প্রকাশকের নিকট অর্পিত হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনও অপ্রকাশিত লেখা সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নাই। পাণ্ডুলিপির হাতের লেখা নিরীক্ষণ করতে পারলে, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হত। পারলে হাতের লেখার ছবি পাঠাবেন।' কিন্তু তার পরে আর কোনও পাল্টা মেল নেই। শরদিন্দু-পুত্রকে হাতের লেখার স্ক্যানড প্রতিলিপি আর পাঠাননি সরসিজ। রজত শেষে জানায়, 'দিল্লি যাচ্ছি। সলিড এভিডেন্স পাব আশা করছি। তুই ক্লু না-দিলে হোত না!'

কিন্তু কামসূত্র উপন্যাসের লেখক তাহলে কে?

উপন্যাস ছবির মতো ভেসে ওঠে মানস পর্দায়। চম্পার বিক্রমশীল মহাবিহারের দিকে দীপনের যাত্রা ক্রমশ হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। উপন্যাসের পাতা থেকে হাজার বছর পরে যেন বাস্তবেও নেমে এসেছে সাংকেতিক পুঁথি ও মূর্তিরহস্য! পাহাড়ের দিকে তার নিজের যাত্রা কতটা বিপন্মুক্ত?

২১ অক্টোবর। লাভা। কালিম্পং।

বিশাল নেওড়া হ্রদের পাশে লাভা গুম্ফা। পাহাড়ের গা বেয়ে লম্বা রাস্তা চলে গেছে গুম্ফা অভিমুখে। বিশাল তোরণের সামনে গাড়ি থামান চালক। ভাড়া মিটিয়ে বিদায় দেয় তাঁকে। অন্ধকার আর ঠাণ্ডা মিলেমিশে দ্রুত ঘিরে ফেলছে জগৎ। দূরে শাদা এলইডি আলো জ্বলছে একটা দোকানে। জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এগোয় ডিকে। ছোট্ট দোকান। মোমো আর নুডলস পাওয়া যায়। গিয়ে বসতেই হাসিমুখে স্বাগত জানান এক মহিলা। ডিকে কী খেতে চায় জেনে নিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশন করেন গরম গরম মোমো।

ঘড়ি দেখে। কাঁটা পাঁচটা পার করেছে। কালিম্পং থেকে নিবেদিতা আসতে এখনও খানিক দেরি। বেলা দেড়টার মধ্যেই নেমে যায় সে বাগডোগরা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই দ্রুত দরদাম করে চেপে বসে একটা ছোটো গাড়িতে। গন্তব্য লাভা। গরুবাথান হয়ে সরাসরি লাভার পথ। গাড়িতে বসেই রিয়াজকে টেক্সট করে দেয়—নেমেছি। এখন লাভার পথে।

গুম্ফার গোড়ায় নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ছিল সাড়ে পাঁচটা। নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই পৌঁছেছে সে। পাহাড়ি পথে নিপুণ স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছেন দক্ষ চালক। খেতে খেতেই চোখ রাখে স্মার্টফোনের পর্দায়। রাস্তায়ও। পর্দায় বার্তা নেই। রাস্তাতেও দেখা নেই কোনও গাড়ির।

আরও মিনিট কুড়ি পরে, সাড়ে পাঁচটার আগেই হাজির নিবেদিতা। নীল জিনস। নেভি-ব্লু জ্যাকেট। লাল উলের টুপি। ‘চলুন!’ অপেক্ষমান ডিকের দিকে তাকিয়ে আলগোছে হেসে বলে।

পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে যায় দু’জন।

গুম্ফায় ঢুকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয় একটি ঘরে। ঢিমে আলোয় প্রশস্ত ঘরটি তার যাবতীয় রহস্যময়তা নিয়ে সেজে বসে আছে। দেওয়ালে বজ্রযানী দেবমণ্ডল। থাংকা। মস্ত এক মণিচক্র। গায়ে খোদাই—ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।

মিনিট চল্লিশেক পর প্রবেশ করেন ত্রিচীবর পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক এক সন্ন্যাসী। ইনিই রিঞ্চেন লামা। দেখে বয়স আন্দাজ করার উপায় নেই। মেদবর্জিত সুঠাম শরীর। সোফায় বসে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন,

‘বলুন, আমার সঙ্গে কী দরকার?
‘টাইগার লামা সম্পর্কে জানতে চাই!’ সটান প্রশ্ন ডিকের।

আরও গম্ভীর হয়ে যান লামা। চোয়ালের কাঠিন্য দৃশ্যমান।

ঘরে উপস্থিত তিনটি মানুষের মধ্যে বহমান নীরব টানাপোড়েন। ডিকে এই স্তব্ধতা উপেক্ষা করে লামার চোখে চোখ রেখে আবার বলে,

‘লামা রিঞ্চেন, তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন আমরা সমর্থন করি, কেবল আমরা নয়, পৃথিবীর সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সমর্থন করে। আমরা—’

ডান হাতের পাঞ্জা তুলে ইশারায় ডিকেকে থামিয়ে দেন লামা।

‘দু’জন পুলিশ এসেছিল এর আগে, আপনারা কারা?’ লামার স্বর নির্দয়।
‘আমরা পুলিশ নই। আমার নাম নিবেদিতা বাল্মীকি, উনি ধরণী কয়াল। কলকাতা থেকে আসছি। আমাদের আত্মীয় কবীর খান জোগচেন গুম্ফায় টাইগার লামার সঙ্গে দেখা করতে এসে নিখোঁজ হয়েছেন। আমরা তাঁর খোঁজে এসেছি। প্লিজ হেল্প আস।’

হাতজোড় করে বলে নিবেদিতা। রিঞ্চেন লামার মুখাবয়বের কাঠিন্য অপরিবর্তিত। কৃপাহীন কণ্ঠেই বলেন,

‘আমার কী করার আছে এখানে?’
‘কবীর খানকে উদ্ধারের পথ বলে দিন!’ জোড়হাতেই নিবেদিতা।
‘আপনাদের ধারণা টাইগার কিডন্যাপ করেছে?’ আবার লামার প্রশ্ন।
‘জানি না।’ দু’দিকে মাথা নেড়ে বলে নিবেদিতা।
‘কেবল কবীর খান নন, একটি সাত বছরের বাচ্চাও কিডন্যাপড!’ ডিকে বলে।

বাচ্চার কথা শুনে মুহূর্তের জন্য কাঠিন্যের মাঝে বিস্ময় হাজির হয়েই মিলিয়ে যায়। লক্ষ করে ডিকে।

‘টাইগারের কথা আসছে কেন?’
‘বিকজ হি ইজ ইনভলভড ইন এভরি ইন্সিডেন্ট!’ নিবেদিতা স্পষ্ট জানায়।

স্মার্টফোনের পর্দা সামনে তুলে ধরে ডিকে দাওয়া লামার ছবি দেখায় রিঞ্চেন লামাকে।

মুহূর্তে উঠে দাঁড়ান লামা।

‘এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। দুঃখিত, আমার অন্য কাজ আছে। তথাগত আপনাদের মঙ্গল করুন!’

হাতজোড় করে নমস্কার করে যে পথে এসেছিলেন, সে পথে অদৃশ্য হলেন।

লামার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে হতচকিত ডিকে ও নিবেদিতা বসে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে দাঁড়ায়।

গুম্ফা থেকে বেরিয়ে নীরবে হাঁটতে শুরু করে দু'জনে। পাহাড়ের গা জড়িয়ে ঢালু পথ। কুয়াশাসিক্ত চরাচর। বাতাসে শৈত্য। উৎকণ্ঠাও।

'সাড়ে সাতটা বাজে, কালিম্পং-এর কোনও গাড়ি পাওয়া যাবে?' ফটকের কাছে এসে বলে ডিকে।
'গাড়ি আছে তো! ড্রাইভারকে ওয়েট করতে বলেছি!' জানায় নিবেদিতা।
'ওহ্, ফাইন! চলুন!'

গাড়িতে উঠেও নিশ্চুপ থাকে দু'জন। অন্ধকার পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলে গাড়ি। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে গহন অরণ্য। প্রাচীন গাছের সারি। গত সপ্তাহে পূর্ণিমা গেছে। কৃষ্ণপক্ষের আলো ওয়াইপারের মতো সরিয়ে দিতে চায় চিকুট অন্ধকার। কিছুদূর এগোনোর পর পিছন ফিরে দু'বার দেখে ডিকে। একটা গাড়ি অনুসরণ করছে। মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিবেদিতাও। ফোন বার করে ডিকে। বার্তা লিখে পাঠায় রিয়াজকে। 'আমাদের ফলো করছে একটা গাড়ি! তুমি পাঠিয়েছ?' রিয়াজ অনলাইন। জবার আসে দ্রুত। 'হ্যাঁ, দাদা। রজতস্যারের অর্ডার!' ডিকে আবার—'ওকে। তাশি নামডোলের সঙ্গে কথা বলব। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঢুকছি।'

জ্যাকেটের পকেটে ফোন ঢুকিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। আবার কাঁপুনি দিয়ে বার্তা ঢোকে ফোনে। নিবেদিতা! আড়চোখে বাঁদিকে তাকায় ডিকে। নিবেদিতার হাতেও ফোন। চালককে এড়াতেই নীরবে কথোপকথন চাইছে। 'গাড়িটা আমাদের ফলো করছে?' উত্তরে ডিকে লেখে—'না।'

আর কোনও কথা হয় না। ঘণ্টাখানেক পর গাড়ি ঢোকে কালিম্পং শহরে।

হোটেল চেরি অর্চ্যার্ড। কালিম্পং।

নিবেদিতার হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়ি। গ্লো-সাইনবোর্ডে উজ্জ্বল হোটেলের নাম —চেরি অর্চ্যার্ড। পুলিশের অতিথিশালায় গিয়ে তাশির সঙ্গে কথা বলতে চায় না ডিকে। বস্তুত পুলিশের সংস্পর্শই সে এড়াতে চায় খোঁজখবরের স্বার্থে। রিয়াজকেও জানিয়ে দিয়েছে সে-কথা।

‘আপনার মঞ্জরী আমের মঞ্জরীতে ঘর মিলবে?’
‘ক’টা চাই?’ হাসে নিবেদিতা।

দোতলায় নিবেদিতার দুটো ঘর ছেড়ে মেলে একটি ঘর। রুম নম্বর দু’শ চার। প্রশস্ত ঘর। পরিচ্ছন্ন বিছানা ছাড়াও আছে সোফাসেট আর সেন্টার টেবিল। ঘরে ঢুকেই চালু করে গরম জলের যন্ত্র। রিয়াজকে জানিয়ে দেয় ঠিক আধ ঘণ্টা পর, ন’টা নাগাদ ইন্সপেক্টর তাশি নামডোলকে ভিডিও কল করবে। তাশি যেন প্রস্তুত থাকেন। তারপর একপ্রস্থ জামাকাপড় নিয়ে টয়লেটে ঢোকে।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে দেখে ফোনে মজুত রিয়াজের গোটা চারেক মিসড কল। ফিরতি কল করে রিয়াজকে।

‘বলো রিয়াজ?’
‘ডিকেদা, তাশি ফোনে কথা বলতে চাইছেন না, মুখোমুখি কথা বলতে চান।’
‘ওকে, তাই হোক। তোমাদের গেস্ট হাউজে গিয়ে কথা বলতে চাইছি না, তাশি হোটেলে আসতে পারবেন?’
‘পাঠাচ্ছি।’

ঠিক ন’টায় হোটেলে ডিকের ঘরে ঢুকে পড়েন তাশি। ছিপছিপে পেটানো শরীর। লম্বা। মুখমণ্ডলে উৎকণ্ঠার ছাপ। সোফায় বসেন। ডিকেও। সেন্টার টেবিলে রাখা ফোনে রেকর্ডার

চালু। পরিচয়পর্ব মিটিয়ে দ্রুত বিষয়ে ঢোকে ডিকে।

‘তাশি, কেস খুব ঘোরাল হয়ে পড়ছে! এখন তথ্য গোপন করা মানে বাচ্চা আর বয়স্ক মানুষ—দু’জনেরই বিপদ বাড়া!’
‘কী জানতে চান স্যার বলুন?’
‘রিঞ্চেন লামার কথা আপনিই বলেছিলেন রিয়াজকে—কেন বলেছিলেন? রিঞ্চেন লামা কী জানেন টাইগার লামা সম্পর্কে?’

নিশ্চুপ তাশি। অপেক্ষা ডিকের।

‘স্যার, আমার টিবেটান অরিজিন—চায়নার অন্যায়ের আগেইন্সটে যে কোনও মুভমেন্টকে আমি সমর্থন করি! আমি গদ্দার নই!’

মুখ খুলে তাশি আবার চুপ করেন। নীরব ডিকেও।

‘কিন্তু আমি পুলিশে চাকরি করি—সেই কমিটমেন্টও আমার আছে—‘ আবার ধীরে উচ্চারণ তাশির।
‘সাত বছরের বাচ্চাটি কী অন্যায় করেছে, তাশি! প্লিজ সাহায্য করুন!’

দ্বিধা-দীর্ণ তাশির অর্গলমুক্তির অপেক্ষা করে ডিকে।

‘২০০৮-এর বেইজিং অলিম্পিকের আগে লাসায় অ্যাজিটেশন হয়—ননভায়োলেন্ট—দে ট্রায়েড টু ড্র অ্যাটেনশন অফ রেস্ট অফ দ্য ওয়র্লড! ওই বিদ্রোহে সলিডারিটি জানিয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে নেপাল, সিকিম, দার্জিলিং পাহাড়ে—আমাদের কালিম্পং-এও! টিবেটানদের সমর্থনে র‍্যালি বেরোয়—এফিজি পোড়ান হয়!’
‘পেছনে ছিলেন টাইগার আর রিঞ্চেন লামা?’

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেন না তাশি। চুপ থাকেন খানিক। তারপর ডিকের দিকে তাকিয়ে বলেন,

‘চুসি গাংদ্রুক-এর নাম শুনেছেন স্যার?’

রজতের পাঠান রিপোর্টের কথা মনে পড়ে ডিকের। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। অভিব্যক্তিতে কৌতূহল সাজিয়ে চেয়ে থাকে তাশির দিকে।

‘আমি যতটুক জানি আপনাকে বলছি স্যার—’

চুসি গাংদ্রুক-এর অতীত-বর্তমান নিয়ে, শান্তস্বরে বলতে শুরু করেন তাশি নামডোল। টাইগার লামা ও রিঞ্চেন লামার পারস্পরিক যোগাযোগের সূত্রও। তাশির প্রতিটি কথা ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নেয় ডিকে।

ঘড়িতে সাড়ে ন’টা। একবার ফোন আসে নিবেদিতার। ডিনারের জন্য প্রস্তুত সে। নিবেদিতার কাছে দশ মিনিট সময় চেয়ে তাশির সঙ্গে আলোচনা গুটিয়ে নেয়। নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানায় তাশিকে। হেসে ধন্যবাদ জানান তাশি। তাঁর রাতের খাওয়া সারা।

হাসিমুখে তাঁকে বিদায় দিয়ে একতলায় হোটেলের খাওয়ার ঘরে যায় ডিকে।

১০৫

একটা টেবিল দখল করে বসে আছে নিবেদিতা। ভিড় কম। হাত ধুয়ে চেয়ারে গিয়ে বসতেই ওয়েটার আসেন। নিবেদিতা নেয় পরটা আর চিকেন কষা। মুরগির ঝোল

সহযোগে গরম ভাত নেয় ডিকে। আনুষঙ্গিক ঝিরিঝিরি আলুভাজা, ডাল, আচার, কাঁচালঙ্কা, স্যালাডও মজুত। উষ্ণ ও উত্তম খাদ্যবস্তু পরিবেশিত হতেই তুমুল খিদে টের পায় ডিকে। নীরবে কেবল সঞ্চালিত হয় ডান হাত।

'আগে এসেছেন কালিম্পং?' জানতে চায় নিবেদিতা।
'একবার। বহু আগে। কলেজ থেকে। আপনি?'
'বার চারেক। খুব ভালো লাগে। লাস্ট এসেছি বছর দুয়েক আগে—আমি আর গৌরাঙ্গ। ও-ও পছন্দ করে কালিম্পং।'
'কালিম্পং খুব কালারফুল! পাঁচের দশকের কালিম্পং তো ইন্টারন্যাশানাল শহর! ধরুন আপনার পাশের টেবিলেই ফেলট কোট, হ্যাট পরা একজন সাহেব চুরুট ফুঁকছেন—আপনার সঙ্গে আলাপ হল—সাহেবের নাম শুনে সাহেবের দিকে তাকালেন!'

খেতে খেতেই গল্প শুরু করে ডিকে। উন্মুখ নিবেদিতা।

'সাহেবের নাম ডেনিস কোনান ডয়েল! নাম শুনে আপনি অবাক হলেন! অবাকই হওয়ার কথা, কারণ কোনান ডয়েল শব্দদুটো আপনি শুনেছেন!'
'মানে!'
'ঠিকই ধরেছেন, উনি আর্থার কোনান ডয়েলের পুত্র। ফিফটিজে কালিম্পং-এ ছিলেন।'
'তাই?' চমকিত নিবেদিতা।
'ফিফটিজের কালিম্পং ছিল গোটা পৃথিবীর সোশ্যাল এলিটদের ডেরা। কে নেই সেই দলে? কালিম্পং-এর সাপ্তাহিক বাজারে গেছেন, দেখতে পেলেন রাজা আমানুল্লা আর আফগান রাজকুমারী হাত ধরাধরি করে বাজার করছেন! রাজা আমানুল্লার সঙ্গে কাবুল থেকে পালিয়ে এসে কালিম্পং-এ উঠেছেন আফগান রাজকুমারী। দেখতে পাবেন বোম্বের বাঙালি নায়িকা দেবিকারাণীকে—হিমাংশু রায় আর বোম্বের টিনসেলটাউনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে উনি তখন বিয়ে করেছেন রাশিয়ান আর্টিস্ট স্বেতোস্লাভ রোয়েরিচকে—বিয়ে করে মাঝেমাঝেই আসেন শাশুড়িকে দেখতে—ওদের ক্রুকেটি হাউস এই কালিম্পং—এই।'
'কনস্টেলেশন অফ স্টারস!' হেসে বলে নিবেদিতা।

‘তাছাড়া সিকিমিজ আর ভূটানিজ শাসক পরিবার, তিব্বতের রয়্যাল-ফ্যামিলির লোকজন, ভারতীয় সরকারি অফিসার, ইওরোপিয়ান আর আমেরিকান রিসার্চ স্কলার, রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার, এক্সপ্লোরার, সাংবাদিক অজস্র লোক!’ খেতে খেতেই গল্পের ঢঙে বলে ডিকে।
‘ট্রেডিং টাউন হিসেবে নাম শুনেছিলাম!’
‘গুপ্তচরদের ডেরা হিসেবেও নাম ছিল!’
‘গুপ্তচর—ইউ মিন স্পাই!’
‘ইয়েস ম্যাম! নেস্ট অফ স্পাইজ—বলেছিলেন স্বয়ং নেহরু!’ হেসে বলে ডিকে।

গলা নামিয়ে কালিম্পং-এর গুপ্তচর ইতিহাস নিয়ে দু-চার কথা বলে। সেইসব কথায় তেমন মন লাগে না নিবেদিতার। ডিকের কথার মাঝেই সে বলে,

‘লাভার লামা মুখ খুললেন না, কিন্তু মনে হল উনি জানেন!’ খেতে খেতেই বলে নিবেদিতা।
‘বিস্তারিত জানেন কি না জানি না, তবে টাইগার লামাকে চেনেন বিলক্ষণ!’ কাঁচালঙ্কায় কামড় দিয়ে বলে ডিকে।
‘পুলিশের কাছে কমপ্লেন করতে চাই ওঁর নামে!’
‘করতে পারেন তবে লাভ হবে বলে মনে হয় না!’
‘পুলিশ করছেটা কী! হোয়ট দ্য হেল আর দে ডুয়িং!’ উত্তেজিত হয় নিবেদিতা।
‘ধৈর্য ধরুন নিবেদিতা! রিঞ্চেন লামাই এই মুহূর্তে আমাদের অগতির গতি!’
‘কেন?’ বিস্মিত প্রশ্ন নিবেদিতার।

বাঁ হাত দিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে বার করে স্মার্টফোন। টেবিলে রাখে। ইয়ারফোন বার করে এগিয়ে দেয় নিবেদিতার দিকে। নির্দিষ্ট ফাইলে ক্লিক করে বলে, ‘শুনুন!’

ইয়ারফোন কানে দেয় নিবেদিতা। নীচু পুরুষকণ্ঠ।

‘সাউথ-ইস্টার্ন টিবেট এরিয়া হল খেম। খেম-এর প্রাচীন নাম চুসি গাংদ্রুক। যার অর্থ চার নদী ছয় পাহাড়। এশিয়ার চার বিশাল নদী অরিজিনেটেড ফ্রম দিস এরিয়া। মেকং, ইয়াং সিকিয়াং, হোয়াং হো আর সালউইন। এই হল চার নদী। আর ছয় পাহাড়ের রেঞ্জ আছে খেম-এ। খেম তিব্বতিদের বলা হয় খেম্পা। এরা মূলত যোদ্ধা জাতি। লাসা বা বেইজিং, কোনও শাসনই তারা বিনা বাধায় মেনে নেয়নি। বাইরের কোনও শক্তি খেম-এ এলেই তারা তাদের নিকেশ করে দিত। সাধারণ টিবেটানদের থেকে খেম্পারা কিছুটা লম্বা হয়।’

‘আপনার অরিজিন খেম?’ ডিকের প্রশ্ন।

‘হুঁ। খেম্পারা বুদ্ধ ওয়ারিয়র। বুদ্ধ ও বুদ্ধিজম রক্ষা করতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে খেম্পারা। প্রাচীনকাল থেকেই খেম্পা যোদ্ধারা দলাই লামার বডিগার্ডের কাজ করে। হিজ হোলিনেস দলাই লামাকে রক্ষা করার জন্য তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। একজন খেম্পা মনে করে তার জীবন তার মাতৃভূমির জন্যই ডেডিকেটেড। পঞ্চাশে চায়না ইস্টার্ন টিবেটে ঢুকতেই তারা বিদ্রোহী বাহিনী বানিয়ে শুরু করে প্রতিরোধ। কিন্তু চল্লিশ হাজার ট্রেইনড পিপলস লিবারেশন আর্মির সঙ্গে লড়াই করা কি সহজ কথা! বিদ্রোহীরা খেম থেকে সেন্ট্রাল টিবেটের দিকে মুভ করে। তৈরি হয় চুসি গাংদ্রুক। গোম্পো তাশি তৈরি করলেন এই টিবেটান রেবেল গ্রুপ। সব দেশের কাছে আবেদন করা হল সাহায্য করার জন্য। পঞ্চাশ থেকে উনসত্তর পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র থেকে টাকাপয়সা আর ট্রেনিং—সব ব্যবস্থা করেছিল সিআইএ, পরে তারাও গুটিয়ে নেয় হাত।’

‘কেন, সিআইএ সরে গেল কেন?’

‘চায়নার বিরুদ্ধে যেতে চায়নি ইউএসএ! টিবেটের জন্য গিয়ে কী লাভ! অসহায় টিবেটানরা মরল না বাঁচল, কী যায় আসে বাকি পৃথিবীর!’

অপরিচিত কণ্ঠ ক্রমশ উত্তেজিত। স্বরে কোমলতা উধাও।

নীরবতা। বেশ কিছুক্ষণ পর কথা বলেন অচেনা স্বর।

‘চুসি গাংদ্রুক গেরিলা বাহিনী একটা কাজ দারুণ করেছিল!’

‘কোন কাজ?’

‘হিজ হোলিনেসকে ইন্ডিয়ায় সেফলি পৌঁছে দেওয়া!’
‘ফিফটি নাইনের পর চুসি গাংদ্রুকের বেস ছিল নেপালে?’ জিজ্ঞাসা ডিকের।
‘সেসব এখন ইতিহাস স্যার! নেপালে মাওয়িস্টরা যে এত শক্তি পেল, অস্ত্র এল কোত্থেকে? প্রাইমারিলি সব চুসি গাংদ্রুকের ফেলে-যাওয়া অস্ত্র। অথচ এখন ওরাই চিনের সঙ্গে গলাগলি করছে!’

কিছুটা উদাস তাশি। চুপ ডিকে।

‘টিবেট-নেপাল বর্ডার—পাহাড়ের মাথায় মুস্তাং নামে এক জায়গায় তৈরি হয় চুসি গাংদ্রুকের ট্রেনিং বেস ক্যাম্প। খেম্পাদের তাই মুস্তাং ওয়ারিয়রও বলে।’ তাশি আবার ফেরেন।
‘খেম্পা ছাড়া আর কেউ ছিল না বিদ্রোহী দলে?’
‘না, তা কেন—টাইগার বা রিঞ্চেন লামা, দু’জনের কেউই খেম্পা নন—তিব্বতের অন্য জায়গার লোকও ছিল!’
‘আচ্ছা, তারপর?’
‘চায়না আর নেপালের বাধা সত্ত্বেও এই বাহিনী একসময় টিবেটের বেশ বড় অংশে নিজেদের অথরিটি তৈরি করে। কিন্তু লিমিটেড রসদ নিয়ে এত বড় শক্তির সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করা জাস্ট অসম্ভব! হিজ হোলিনেস রক্তপাতের ভয়ে টেপড মেসেজ পাঠান গেরিলাদের উদ্দেশে—তোমরা সারেন্ডার কর! অনেকেই সারেন্ডার করে তাঁর কথায়। কেউ কেউ সারেন্ডার না-করে আত্মহত্যা করে। কেউ পালায়।

ফের নীরবতা। কিছুক্ষণ পর আবার শোনা যায় অপরিচিত কণ্ঠস্বরের অনুচ্চ উচ্চারণ।

‘যারা সারেন্ডার করেছিল তাদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে চায়না-নেপাল কমবাইন্ড ফোর্স!’ তারপর বদলে যায় কণ্ঠস্বর। দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘কিন্তু লড়াই শেষ হয়নি! যতদিন-না, স্বাধীনতা পাওয়া যাবে, লড়াই চলবে!’
‘টাইগার লামা চুসি গাংদ্রুকের সদস্য ছিলেন?’

‘হ্যাঁ। সারেন্ডার না-করে যে ক’জন মুস্তাং থেকে পালিয়েছিলেন, তাঁদের একজন টাইগার লামা! রিঞ্চেন লামাও ছিলেন! তিনিও পালান! এর বেশি কিছু আমি জানি না। রিঞ্চেন লামা অবশ্যই আরও কিছু বলতে পারবেন!’
‘চুসি গাংদ্রুক কি আবার অ্যাকটিভ হয়েছে? ভারতকে বেস করেছে?’

ডিকের প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। অডিও শেষ। ইয়ারফোন খুলে ফোনসহ এগিয়ে দেয় নিবেদিতা। খাওয়া শেষ হয়েছে ডিকের। নিবেদিতারও। হল ঘরের শেষ প্রান্তে, রান্নাঘরের দিকে কোনের টেবিলে একটি লোকের দিকে চোখ যায় ডিকের। গাড়ি চেরি অর্চ্যার্ড হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ানোর সময়ও এই লোকটিকে দেখেছে হোটেলের সামনে ঘোরাঘুরি করতে। লোকটার টেবিলে কোনও খাবার নেই। কেবল একদৃষ্টে চেয়ে আছে তাদের টেবিলের দিকে।

‘ইনি পুলিশ। লোকাল লোক।’ ডিকে বলে।
‘কে?’
‘যাঁর গলা শুনলেন!’
‘রিঞ্চেন লামাও তো একই দলের, তাহলে কেন বলছেন উনি অগতির গতি!’
‘টাইগার লামার সঙ্গে টাসেল আছে!’
‘কী করে জানলেন?’
‘খবর আছে!’

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে নিবেদিতা। তার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে কথা বাড়াতে সাহস করে না ডিকে। মাথা নীচু করে ঘাঁটতে থাকে ফোন।

নাক-টানার আওয়াজে চোখ তোলে। গাল বেয়ে নাগাড়ে নামছে চোখের জল। নিবেদিতার নীরব কান্নায় প্রৌঢ় মানুষটির জন্য ডিকের অন্দরমহলও হয়ে ওঠে আর্দ্র। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। টেবিল থেকে টিস্যু কাগজ তুলে এগিয়ে দেয় নিবেদিতার দিকে। কাগজটা দিয়ে চোখ মোছে নিবেদিতা।

‘ভেঙে পড়বেন না নিবেদিতা, কবীরদাকে আমরা ফিরে পাবই! ছোট্ট অর্হৎকেও! পাবই!’

সান্ত্বনার ভাষা ছাড়া আর কিছু জোগায় না মুখে। ওয়েটার আসে বিল নিয়ে। নিবেদিতা ডেবিট কার্ডে মিটিয়ে দেয় বিল।

হল ঘরের শেষ প্রান্তে, টেবিলে এখনও বসে আছে লোকটি। বিদায় নিয়ে উঠে যায় নিবেদিতা। ওঠে না ডিকে। লোকটির দিকে না-তাকিয়ে স্মার্টফোন হাতে নিয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে ক্যামেরার। নীরবে তুলে নেয় লোকটার ছবি। কিছুক্ষণ পর উঠে পড়ে লোকটা। ডিকেও। সম্ভবত লোকটাও টের পায় ডিকের নজর। দ্রুত হল ছাড়ে। বেরিয়ে যায় হোটেল ছেড়েও।

বাইরে বেরিয়ে ডিকে দেখতে পায় রাস্তা পেরিয়ে লোকটা মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশায়।

১০৬

২২ অক্টোবর। ভোররাত। কালিম্পং।

গভীর ঘুম থেকে চেতনায় ফেরে নিবেদিতা। ঠাহর করতে যেটুকু সময়, ফোনের আওয়াজ আসে কানে। ঘড়িতে সাড়ে চারটে। এত ভোরে কার ফোন? অচেনা নাম্বার। নিজেকে প্রস্তুত করে ফোন কলটা নেয় নিবেদিতা। গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ।

‘ম্যাডাম নমস্কার, আমি জোগচেন মনাস্ট্রি থেকে বলছি—আপনি কি এই লোকের তালাশ করছেন?’

ও প্রান্ত থেকে ভেসে আসে একটি কণ্ঠস্বর। কবীর খান! নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। অনর্গল। কত চেনা, কত আপন এই কণ্ঠস্বর! নিবেদিতা তার খানদা'র গলা শুনে উত্তেজিত হয়।

'খানদা! খানদা! আমি নিবেদিতা!'

আবার ফোনে ফেরত আসে শান্ত গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ।

'তাহলে ঠিক লোককেই পেয়েছি!'
'কোথায় তিনি?'
'আপনি কি এখন আমাদের মনাস্ট্রিতে একবার আসতে পারবেন ম্যাডাম?'
'অফকোর্স! এক্ষুনি বেরোচ্ছি!'
'বাইরে বারিশ হচ্ছে—একটা গাড়ি পাঠাচ্ছি, চলে আসুন!'
'ওকে! উনি সুস্থ আছেন তো?'
'এখন সুস্থ!'
'এখন মানে! উনি কি অসুস্থ হয়েছিলেন?' উদ্বেগ নিবেদিতার।
'আসুন, সব বলব! একা আসবেন ম্যাডাম, প্লিজ!'

গাড়ির রঙ ও নম্বর জানিয়ে দেন ফোনের ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর। দ্রুত বিছানা ছেড়ে টয়লেটের দিকে যায় নিবেদিতা।

দু'দিকে বন্ধ দরজার সারি, ঢিমে আলোয় শূন্য করিডোর। ডিকের ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোয়। আধো-অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই প্রশস্ত এলাকা। মস্ত সোফা। অ্যাকোয়ারিয়াম। শূন্য অভ্যর্থনা ক্ষেত্র। বন্ধ বারদুয়ার। এত ভোরে কেউ জেগে নেই। জেগে থাকার কথাও নয়। সারাদিন খাটাখাটনির পর গভীর রাতে শোয় কর্মীরা।

টোকা মারে ম্যানেজারের ঘরে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। এগোয় রান্নাঘরের দিকে। পা দেয় ডাইনিং হল-এ। হল পেরোলেই হেঁসেল। না, রান্নার কোনও তোড়জোর শুরু হয়নি। আবার ফেরে হল-এ। কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে কয়েকজন। নিবেদিতার ডাকে জেগে যায় একটি ছেলে।

ছেলেটি নিরাপত্তা রক্ষীর ঘরে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দরজা খোলানোর উদ্যোগ নেয়। রক্ষী খুলে দেয় দরজা। প্রধান ফটক। অভ্যর্থনা টেবিলের চাবি ঝোলানোর বোর্ডে নিবেদিতা ঝুলিয়ে দেয় ২০১ নম্বর ঘরের চাবি। তারপর ফোনে টাইপ করে একটা বার্তা। 'খানদার খোঁজ পেয়েছি। কল ইউ লেটার।' বার্তা চলে যায় নির্দিষ্ট নাম্বারে।

'ম্যাডাম কোথায় যাচ্ছেন?'
'ট্যুর—ফিরে লাঞ্চ করব!' হেসে বলে নিবেদিতা।

দরজা খুলতেই প্রবেশ করে হিম। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝিরিয়ে। হোটেলের উজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় হেডলাইট জ্বালিয়ে ফটকের সামনেই অপেক্ষা করছে নীল রঙের ছোটো একটা গাড়ি। ডান হাত মেলে বৃষ্টি আড়াল করে, উঠে পড়ে নিবেদিতা। চলতে শুরু করে গাড়ি।

কিছুদূর এগোবার পরই সন্দেহ হয়। ফোন করতে চায়। পারে না। কোনও নম্বরেই ঢোকে না ফোন। চালক নির্বিকার। চালকের বাঁ পাশে বসা একটা লোক পেছন ফিরে দেখে তাকে। চালকের পাশে যে একজন বসে আছে, নজরই পড়েনি আগে!

অতিরিক্ত আবেগতাড়িত হয়ে ভুল করে ফেলল না তো! নিশ্চল বসে থাকে বিমূঢ় নিবেদিতা।

২২ অক্টোবর। লাভা। কালিম্পং।

‘তিব্বতের স্বাধীনতা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই, কিন্তু লামা রিঞ্চেন, এর সঙ্গে মূর্তিচুরি বা শিশু অপহরণসহ পরপর অপহরণ—এইসবের সঙ্গে কী সম্পর্ক ফ্রি টিবেট মুভমেন্টের!’

‘টিবেটের দেশীয় সম্পদ যা বাইরে আছে, সেগুলো উদ্ধার করাকে আমি সমর্থন করি।’

‘কিন্তু বাচ্চাটা বা কবীর খান—’

‘শিশু অপহরণ সমর্থন করি না! আর মূর্তিচুরি বলছেন কেন, মূর্তি উদ্ধার! আমাদের দেশের পবিত্র সম্পদ উদ্ধার করেছি আমরা! শাক্যমুনি বুদ্ধের ওই মূর্তির গুরুত্ব জানেন আপনারা!’

‘বুদ্ধের মূর্তি! না, না, মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়েছে গুরু পদ্মসম্ভবের মুর্তি!’ কিছুটা চমকেই বলে রিয়াজ।

‘গুরু রিন-পো-ছে’র কোনও মূর্তি উদ্ধারের প্ল্যান ছিল না! শাক্যমুনির ওই প্রাচীন মূর্তি ছিল জোখাং মন্দিরে, কীভাবে ওখান থেকে পবিত্র সেই মূর্তি খোয়া গেল কেউ জানে না! সকলের সন্দেহ যাদের দিকে সেই পিএলএ সম্ভবত এই কাজ করেছে! পবিত্র মূর্তি নিয়ে বেচে দিয়েছে অ্যান্টিক মার্কেটে—’

‘কিন্তু থিয়োলজিক্যাল মিউজিয়াম বুদ্ধের মূর্তির কথা রিপোর্ট করেনি, গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তির মিসিং ডায়েরি করেছে!’ তুমুল বিস্ময় রিয়াজের।

‘চায়নার রাজকুমারী ওয়েন চেং টিবেটে নিয়ে আসেন শাক্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি! তিব্বতের সবচেয়ে পূজনীয় মূর্তি এটিই। আজকের কথা নয়, প্রায় ১,৩০০ বছর আগের কথা! বুদ্ধিজম শুরু হয় তারপর। এই মূর্তি যারা চুরি করেছে, আজ অথবা কাল, তাদের শাস্তি পেতে হবে! আবার বলছি, শাক্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি উদ্ধার একশ’ বার সমর্থন করি, শিশু অপহরণ করি না!’

ডিকের দিকে তাকায় রিয়াজ। ডিকেও বিভ্রান্ত।

‘আশ্চর্য! কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে! আমরা গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তির কথাই শুনেছি!’

‘তা আমি জানি না! কিন্তু শাক্যমুনির মূর্তি উদ্ধারের প্ল্যান ছিল—আর যা খবর পেয়েছি সেই মূর্তিই সফলভাবে উদ্ধার হয়েছে!’

উত্তেজিত রিয়াজ আরও কিছু বলতে চায়। চোখের ইশারায় তাকে থামায় ডিকে। নীরব উচ্চারণে বোঝায়, লামার সঙ্গে এই বিষয়ে নিরর্থক তর্ক করে লাভ নেই, মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া পরে হবে।

নিজেকে সংযত করে রিয়াজ। কে ধোঁকা দিচ্ছে ভেবে বিহ্বল হয় সে। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ এই খেলা কেন খেলল? নাকি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে চুসি গাংদ্রুক? কারা সত্য বলছে?

কামসূত্র উপন্যাসে যে-মূর্তি বৃন্দা তুলে দিয়েছিল দীপনের হাতে, তা শাক্যমুনির মূর্তি ছিল। চকিতে মনে পড়ে ডিকের। কিন্তু সে-ই বিষয়ে মাথা আপাতত না-ঘামিয়ে ফেরে আলোচ্য অংশে।

‘কিন্তু অপহরণের পর অপহরণ, উনি এটা কেন করছেন!’
‘অন্যায় করছে, ভীষণ অন্যায়! পরাধীনতার লজ্জা বা গ্লানি আমারও আছে, কিন্তু টাইগার উন্মাদ হয়ে গেছে! ও চুসি গাংদ্রুক রিভাইভ করতে চায়! করুক! আই ডু সাপোর্ট! কিন্তু মা-বাপের বুক খালি করে নয়! আগে পাহাড়ের তিব্বতি অরিজিন পরিবার থেকে বেছে বেছে ছেলে সংগ্রহ করত—এখন পাহাড়ের বাইরে হাত বাড়িয়েছে! তিব্বতি পরিবার কিনা তাও দেখছে না! বুদ্ধিস্ট পরিবার হলেই হল!’ উষ্মা লামার কণ্ঠে।
‘ট্রেনে অর্হতের মা-বাবাকে বারবার বলেছেন অর্হৎ-কে বোধিসত্ত্ব হতে হবে! এমনকী খাদা পরিয়ে বলেছেন, অর্হৎকে বরণ করলাম!’ জানায় ডিকে।
‘উন্মাদ!’

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সন্ন্যাসী। থমথমে মুখ। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ফোন নেন হাতে। পর্দায় চোখ রেখে খুঁজে নেন নম্বর। কিন্তু উদ্দিষ্ট নম্বরে ফোন কল ঢোকে না,

সম্ভবত কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই। বিরক্ত হন সন্ন্যাসী। হাতের ইশারায় অপেক্ষার ইঙ্গিত করে বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে।

ডিকে ও রিয়াজ তাকায় পরস্পরের দিকে। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় ডিকে। এখনও চলছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। তাপমান নিম্নগামী। উৎকণ্ঠাজনিত আবহাওয়ায় যেন আরও কিছুটা গেড়ে বসেছে শৈত্য।

সাড়ে সাতটা নাগাদ ফোন করে ঘুম ভাঙায় গৌরাঙ্গ। নিবেদিতা নাকি কবীর খানের খোঁজ পেয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে কাকভোরে বেরিয়েও গেছে হোটেল ছেড়ে। উত্তেজিত গৌরাঙ্গ'র কণ্ঠে নিবেদিতার এহেন হঠকারী আচরণে বিস্মিত হয় ডিকে।

'সে কী! কোথায় গেলেন উনি?'
'জানি না ডিকেবাবু, আমি ঘুমোচ্ছিলাম—একটু আগে ঘুম ভেঙে দেখি মোবাইলে মেসেজ—খানদার খোঁজ পেয়েছি। কল ইউ লেটার। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম কিন্তু ফোন ঢুকছে না! নেটওয়ার্ক নেই। ভাবলাম, আপনি জানেন—তাই আপনাকে করছি—'
'কখন করেছেন মেসেজ?'
'পাঁচটা পাঁচ!'
'আশ্চর্য! অত ভোরে! আরে কাল রাতে একসঙ্গে ডিনার করলাম আমরা—'
'হ্যাঁ রাতেই বলেছে আমায়—কান্নাকাটি করেছে বলল—আসলে খানদার জন্য খুবই—'
'কিন্তু এটা উনি ঠিক করেননি গৌরাঙ্গ! ওনাকে আমি বারবার বলেছি রিস্ক নেবেন না! কবীরদার খোঁজ উনি পেলেন কখন! ডাইনিং হল থেকে নিজের ঘরে চলে গেলেন সোয়া দশটা নাগাদ—কিচ্ছু বলেননি আমাকে—আপনাকে রাতে কিছু জানিয়েছিলেন?'
'না, এই ব্যাপারে কোনও কথা হয়নি!'
'তাহলে কি আরও রাতে কোনও ফোন পেয়েছিলেন? আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! দাঁড়ান আমি পুলিশকে একবার ফোন করি!'

রিয়াজকে ফোন করেও কিছু জানা যায় না। দ্রুত যায় হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে। ২০১ নম্বর ঘরের অতিথি নিবেদিতা বাল্মীকি খুব ভোরে বেরিয়ে গেছেন একটি নীল রঙের গাড়িতে। বিস্তারিত জানান হোটেলের কর্মীরা। দেখান সিসিটিভি ফুটেজও। ট্যুরে যাচ্ছেন, ফিরে দুপুরের খাবার খাবেন, কর্মীদের এইভাবে বলার অর্থ কাছেপিঠেই কোথাও গেছেন। পুলিশের কাছে কোনও খবর নেই, অথচ নিবেদিতা খোঁজ পেয়ে গেলেন কবীর খানের, ধন্দ এখানেই! ফোনে না-পাওয়াটাও খারাপ লক্ষণ, প্রতিটি নিখোঁজের ক্ষেত্রেই ফোন বন্ধ বা বিকল ছিল। বড়ুয়া দম্পতির ক্ষেত্রেও ফোন ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। কবীর খানের ক্ষেত্রেও তাই। কবীরের ফোন এখনও অধরা।

রজতকে জানায় সব ঘটনা। রজত মারফৎ খবর পেয়ে এসপি সুন্দর শর্মা পুলিশ বাহিনী পাঠালেন জোগচেন গুম্ফায়। রিয়াজকে নিয়ে ডিকে সোজা চলে আসে লাভায়।

এর পরেও রিঞ্চেন লামা সহযোগিতা না-করলে পুলিশ তাদের কাজ করবে।

১০৮

প্রায় পনের মিনিট অতিক্রান্ত, সন্ন্যাসী এখনও ঘরে ফেরেননি। নীচু গলায় ডিকে জিজ্ঞাসু,

‘এখানে স্যাট-ফোন ইউজ লিগ্যাল, রিয়াজ?’
‘ঠিক জানি না দাদা। তবে বর্ডার এরিয়ায় স্যাটেলাইট ফোন সাধারণত ইউজ করে ডিফেন্স, অন্য কেউ পারমিশন পায় না। কিন্তু দাদা, মূর্তির ধাঁধাটা অদ্ভুত লাগছে! কী করে মিউজিয়াম এটা করল! ইনফ্যাক্ট কারা মিথ্যে বলছে সেটাই বুঝতে পারছি না!’
‘পবিত্রমূর্তি নিয়ে এরা মিথ্যাচার করবে না! বুদ্ধের ওই মূর্তি আজকের নয়—সেভেন্থ সেঞ্চুরির—’

‘কিউরেটর তনুময় পালের কাছে শুনেছি এই গল্প—রাজা গাম্পো যাঁর নামে গুম্ফা শব্দ এসেছে—দুই রানি—একজন চাইনিজ, আর একজন নেপালিজ—তারাই রাজাসহ গোটা দেশকে বৌদ্ধ বানিয়েছিল!’
‘রজতকে ফোন করে জানাও সব!’ ডিকে বলে।

বহু চেষ্টা করেও রিয়াজ ফোন করতে পারে না। চিন্তিত হয় ডিকে। রজতের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি। কিউরেটর তনুময় পাল ওর সন্দেহের তালিকায়, কিন্তু কেন? অতিরিক্ত কোনও খবর কি আছে রজতের কাছে? রজতকে ফোন করতে চেষ্টা করে ডিকেও, কিন্তু ব্যর্থ হয়।

‘ঘর থেকে আমাদের সামনে ফোন করাটা ফলস ছিল—এখানে জ্যামার লাগান আছে—আমার তখনই হালকা সন্দেহ হয় উনি বোধহয় স্যাট ফোন ইউজ করছেন—কারণ ফাঁকা চত্বর পেরিয়ে ওনাকে আমি ছাদে উঠতে দেখেছি!’ নীচু গলায় বলে ডিকে।

চোখের ইঙ্গিতে জানালা দেখায়। তাকায় রিয়াজ। প্রশস্ত চত্বর। বৃষ্টি-ধোয়া লাল মেঝে। এক পাশে সিঁড়ি উঠে গেছে উচ্চতর কোনও তলের ছাদে। স্যাটেলাইট ফোন ঘরের অন্দর থেকে ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। খোলা আকাশের নীচে গিয়ে ছুঁতে হয় স্যাটেলাইট সিগনাল।

আজ শুরু থেকেই রিঞ্চেন লামার অন্য রূপ। আগের দিনের মতো কঠোর উদাসীনতা আজ লামার মধ্যে অনুপস্থিত।

‘লামা রিঞ্চেন, আপনি ছাড়া কেউ হেল্প করতে পারবে না, প্লিজ হেল্প আস! নাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে!’

গুম্ফায় লামার ঘরে ঢুকেই ডিকে গড়গড়িয়ে নিবেদিতার অপহরণ-পর্ব বলে কিঞ্চিৎ উত্তেজনাসহ। তারপর হাতজোড় করে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করে।

ডিকের মুখে সব শুনে লামা নিস্তব্ধ হলেন। কিছুটা আশ্বস্ত হল ডিকে। লামার নীরবতায় সহযোগিতার ইঙ্গিত। ধীরে কথা শুরু করেন রিঞ্চেন লামা। নড়েচড়ে বসে ডিকে। উন্মুখ তাকিয়ে থাকেন সন্ন্যাসীর দিকে। মূর্তি উদ্ধারকে সমর্থন কিন্তু অ-তিব্বতি বাচ্চা অপহরণের তীব্র বিরোধিতা করে উঠে যান বৃদ্ধ লামা। ফোনে নির্দিষ্ট কারোর সঙ্গে কথা বলাই উদ্দেশ্য। মিনিট পনের অতিক্রান্ত, এখনও প্রত্যাবর্তন ঘটেনি তাঁর।

‘ওই যে ফিরছেন!’

ডিকের ফিসফিসানি। জানালা দিয় তাকায় রিয়াজ। বৃদ্ধ লামা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন ধীরে। হাতে ছাতা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করেন সন্ন্যাসী। মুখমণ্ডল এখনও থমথমে। সম্ভবত ফোন মারফৎ কথা হয়েছে আকাঙ্ক্ষিত মানুষের সঙ্গে। নিঃস্বর বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎই বলে উঠলেন,

‘টাইগার বাড়াবাড়ি করছে! আমাকে একদিন সময় দিন—আমি দেখছি—’

ডিকে ও রিয়াজ বুঝে উঠতে পারে না, এরপর কী করা উচিত। গুম্ফা ত্যাগ করবে না কি, আরও কিছু শোনার অপেক্ষা করবে। দোলাচলতা তাদের বসিয়েই রাখে। লামার থেকে তারা আরও কিছু শুনতে চায়। নীরব লামা সরব হন ফের।
‘ফিফটিতে টিবেটে এক ভয়াবহ ভূকম্প হয়। লাল হয়ে যায় সাউথ ইস্ট টিবেটের আকাশ। ধস নামে পাহাড়ে। ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পর্যন্ত বদলে দেয় সেই ভয়ানক আর্থকোয়েক! সুদূর কলকাতাতেও এর প্রভাব পড়ে। পোটালা প্রাসাদের একটা প্রাচীন থাম-এর ওপরের অংশ ভেঙে পড়ে। এই দুর্যোগের মধ্যে আরও বড় দুর্যোগের খবর আসে।’

ডিকে ও রিয়াজ স্তব্ধ। আরও কোন বড় দুর্যোগের কথা বলতে গিয়ে থামলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী? তারা সাগ্রহ তাকিয়ে থাকে লামার দিকে। লামা ফেরত আসেন দ্রুত বিরতি থেকে।

‘খেম-এর দিকে এগিয়ে আসছে চাইনিজ সেনা!’

চিনের গণমুক্তি ফৌজের তিব্বতে প্রবেশ ও অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলে যান লামা। ধীর। অনুচ্চ। অস্ফুট সেই স্বর।

‘ফিফটিজের মাঝামাঝি কমবয়সী বাচ্চাদের চায়নায় নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। বাবা-মায়েরা বাধা দিতে এলে বলা হত চেয়ারম্যান মাও-এর নির্দেশ। যে মানবে না, তাকে কোতল করা হবে। ফলে ভয়ে কেউ কোনও প্রতিবাদ করত না। এক সময় অর্ডার এল, প্রত্যেকটি জন্মের খবর পিএলএ-কে জানাতে হবে। মেডিক্যাল কর্মী এসে বাচ্চা নিয়ে যেত বাড়ি থেকে। লোকেদের বোঝাত প্রতিটি নবজাতক কম্যুনিস্ট দেশের সম্পদ। দেশই এদের প্রতিপালন করবে।’

থামেন লামা। যেন থামতে হয় তাঁকে।

‘আসলে আমাদের রিলিজিয়স পরিবেশ থেকে এদের চিরকালের জন্য মুক্ত করাই ছিল উদ্দেশ্য!’

দেশের দুর্দশার কথা বলতে বলতে উদাসী প্রবীণ সন্ন্যাসী চেয়ে থাকেন মণিচক্রের দিকে। স্তব্ধতা গ্রাস করে তাঁকে। বারংবার। বুকের ভেতরে স্তব্ধতার সেই চাপ সরিয়ে ফের ফিরেও আসেন।

‘টাইগার তো ওর নিকনেম—পরে হয়েছে—ওর অরিজিনাল নাম দাওয়া—’

‘টাইগার লামাকে ঘিরে প্রচুর গল্প! প্রচুর মিথ! উনি অদৃশ্য হতে পারেন! ওঁর গায়ে বাঘের গন্ধ!’ কথার মাঝেই ঢুকে পড়ে ডিকে।

‘রাহু আর কেতু ওর পোষা দুই স্নো লেপার্ড—রাহু মারা গেছে—কেতু আছে—পাহাড়ে পাহাড়ে ও টাইগার নামেই পরিচিত—টাইগার খুব ক্যারিশম্যাটিক ক্যারেকটার! মিথ তো থাকবেই!’ হেসে বলেন রিঞ্চেন লামা। জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে ফের সামান্য বিরতি নিয়ে আবার বলেন, ‘তখন ওর বয়সও খুব কম। গুম্ফায় শিক্ষানবিশ লামা। ওকেও চাইনিজরা নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি, পালিয়ে যায় ও। ওদের প্রাইম টার্গেট ছিল মঙ্ক আর নান। ভাবতে পারেন, প্রকাশ্যে বহুজনের সামনে তাদের সঙ্গম করতে বাধ্য

করত! না-করলে এমন অত্যাচার করত, একসময় সেই অত্যাচারের সামনে হয় তারা মেনে নিত নয়ত মরে যেত। সাধারণ তিব্বতিদের ইয়াক, ছাগল, ভেড়ার দখল নিত প্রথমে, তারপর সমস্ত সম্পত্তি। মানুষ আস্তে আস্তে ক্ষেপতে শুরু করল। কিন্তু ক্ষেপলে কী হবে, অস্ত্রধারী হাজার হাজার পিএলএ'র সঙ্গে লড়বে কীভাবে!'

রিঞ্চেন লামার মুখমণ্ডল কখনও উজ্জ্বল, কখনও আলোহীন। সেই আলো-আঁধারে বহমান একটাই ধারা। অসহায় দ্রোহ। তিনি যেন আর এখানে নেই, পৌঁছে গেছেন মাতৃভূমি।

আরও কিছুটা সময় বয়ে যেতে দিয়ে প্রশ্ন করে ডিকে।

'টাইগার পালিয়ে কোথায় গেলেন? অত ছোটো বয়সে!'
'পাহাড়ে। পাহাড়ে-পাহাড়ে লুকিয়ে বাঁচল পিএলএ-এর হাত থেকে! আমরা নোমাডিক রেস —দ্রোকপা—তিব্বতি যাযাবর—বরফ আর পাহাড় বগলে নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই! আমাদের জিনে অ্যাথলেটিসিজম আছে! ইন্ডিয়াও তাই আমাদের ব্যবহার করে!' সামান্য হাসি লামার ঠোঁটের কোণে।
'ইন্ডিয়া? কীভাবে?' বিস্ময় রিয়াজের।
'ই-টুয়েন্টিটু! নাম শুনেছেন?' লামার পাল্টা প্রশ্ন।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, ডিকে ও রিয়াজ, ফের তাকায় লামা রিঞ্চেনের দিকে। ই-টুয়েন্টিটু বিষয়টি যে তাদের অজানা নেতিবাচক মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দেয় তারা।

'ছাড়ুন! কী বলছিলাম যেন—ও হ্যাঁ—পাহাড়ে পাহাড়ে লুকিয়ে কাটাল টাইগার দীর্ঘদিন—'
'আপনিও কি—'
'টাইগারের থেকে আমি কিছুটা জুনিয়র—আমি লাসা অঞ্চলের—খেম আর আমদো শুরুতেই যতটা অত্যাচারের মুখে পড়েছিল, লাসা অনেক পরে। আমার সঙ্গে টাইগারের দেখা হয় বহু পরে—নেপালের মুস্তাং পাহাড়ে।' ডিকের জিজ্ঞাসায় বলেন লামা।
'নেপালকে চাপ দিয়ে নেপাল-চায়না কম্বাইন্ড ফোর্স অপারেশন চালিয়েছিল বলে শুনেছি!'

‘চায়না বলেছিল সারেন্ডার করলে প্রাণে মারবে না—হিজ হোলিনেস ওদের কথায় বিশ্বাস করে আমাদের সারেন্ডার করতে বলেন—উনি ব্লাডবাথ চাননি—কিন্তু যারা সারেন্ডার করেছিল—’

লামা সম্পূর্ণ করতে পারেন না বাক্য। চোয়াল শক্ত হয়।

‘আমরা কয়েকজন সারেন্ডার করিনি—পালিয়ে যাই—আমি আর টাইগার হিমালয়ের পথে চলে আসি সিকিমে।’

দেওয়ালে শোভিত মণ্ডলময় থাংকার দিকে তাকিয়ে চুপ করেন লামা। চাপা দীর্ঘশ্বাস। প্রিয় মাতৃভূমির জন্য নিবেদিত শহীদ সাথীদের মুখ যেন মুহূর্তে ঝিলিক দিল মনের ক্যানভাসে।

১০৯

‘ফিফটিজের মাঝামাঝি তথাগত’র আড়াই হাজার বছরের জন্মবার্ষিকীতে ভারতে এসেছিলেন একুশ বছরের হিজ হোলিনেস। রাজঘাটেও গিয়েছিলেন। গান্ধীর সমাধির সামনে দঁড়িয়ে হি মেড আ প্লেজ টু নন-ভায়লেন্স। কিন্তু চুসি গাংদ্রুক নন-ভায়লেন্সে বিশ্বাস করে না।’

শেষের ব্যাক্যটি কেটে কেটে উচ্চারণ করে আবার বিরতি। সেই বিরতির মাঝেই অনুপ্রবেশ ডিকের।

‘বৌদ্ধরা তো বলেন অহিংসা পরম ধর্ম!’

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সরাসরি তাকান ডিকের দিকে। পূর্ণদৃষ্টি। শান্ত দুই চোখ। সামান্য হেসে বলেন,

‘কোনও রাজশক্তি এই বৌদ্ধধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে কখনও ব্যবহার করেছে কি? বা আর্তকে সেবার ছদ্মবেশ নিয়ে, গরীব নিপীড়িত মানুষকে দলভুক্ত করা হয়েছে কখনও? দেবনামপ্রিয় অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা বা ধর্মপাল দুহিতা তারা, তথাগতের বাণী বহন করে যখন সাগরপারে গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে একজন দেহরক্ষী পর্যন্ত ছিল না!’

লামার দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে শোনে ডিকে। লামা শান্তস্বরে বলে চলেন।

‘বৌদ্ধ গুরুরা জানতেন, রাজনৈতিক মতলবে অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত করলে তাঁদের বা সংঘের আলটিমেট কল্যাণ হয় না। ইসলামের মতো পলিটিক্যাল ধর্ম বৌদ্ধধর্ম নয়। খ্রীষ্টান ধর্মও কম পলিটিক্যাল নয়। বৌদ্ধধর্ম স্টেটের সাপোর্ট পেয়েছে, এটা সত্য, রাষ্ট্রীয় সাহায্যই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তা-ও সত্য, কিন্তু এক হাতে ত্রিপিটক আর অন্য হাতে তরবারি নিয়ে আমরা কখনও অন্য দেশকে দীক্ষিত করতে যাইনি! কিন্তু—’
‘এই অহিংসার কথাই বলতে চাইছি লামা রিঞ্চেন!’ ডিকে বলে।
‘অহিংসা পরম ধর্ম, বুদ্ধিজমের এই প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধিতা হয়েছিল। কারা করেছিল এই বিরোধিতা জানেন? তন্ত্র!’
‘তন্ত্র!’
‘তন্ত্র করেছিল এই বিরোধিতা। হিংসা ছাড়া জীব বাঁচে না। তুমি খাবে কী? খেতে গেলেই জীবহত্যা করতে হবে। আমাদের কেবলমাত্র বুদ্ধিস্ট ভাবলে হবে না, টিবেটান বুদ্ধিজম একই সঙ্গে তান্ত্রিক বুদ্ধিজম। আমি যতটা বুদ্ধিস্ট, ততটাই তান্ত্রিক!’
‘টাইগার লামাও তাই বিশ্বাস করেন?’
‘অবশ্যই! আমরা সবাই তাই করি!’
‘শিশুদের নিয়ে উনি কী করতে চান! অর্হতের বয়স মাত্র সাত!’
‘তন্ত্র শুনে আপনি যা আশঙ্কা করছেন তা নয়—নরবলি-টলি’র ব্যাপার নয়—ওগুলো ডিগ্রেডেড তান্ত্রিকদের কাজ—ভণ্ডদের কাজ—আমাদের উদ্দেশ্য অন্য—বৃহৎ—’

বাচ্চা অপহরণের কী উদ্দেশ্য? উন্মুখ চেয়ে থাকে ডিকে।

‘সাত বছর বয়সই লামা হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বয়স!’ যেন স্বগতোক্তি করেন লামা।
‘লামা! উনি কি কোনও জুভেনাইল ফোর্স তৈরি করতে চান?’ উত্তেজিত ডিকে।
‘না।’

দু’দিকে সামান্য মাথা নেড়ে আবার চুপ করে যান রিঞ্চেন লামা। আবার অপেক্ষায় ডিকে। রিয়াজ নীরব পর্যবেক্ষণে।

‘টাইগার মনে করে একজন বোধিসত্ত্ব হল পেশাদার বিপ্লবী। পেশাদার বিপ্লবীর যেমন দেশ-কাল নেই, একজন বোধিসত্ত্বেরও নেই! একজন বোধিসত্ত্ব জগতের কল্যাণের জন্য নিজেকে ডেডিকেট করেছে। ধর্মপালরা যেমন আছেন বুদ্ধিজম রক্ষার জন্য, চুসি গাংদ্রুকও তেমন। টাইগারের সাফ কথা, চায়না যদি পঞ্চাশ বছর এগিয়ে ভাবতে পারে, আমি কেন ভাবব না! আগামী একশ’ বছরের লড়াইয়ের রসদ ও প্রস্তুত করে যেতে চায়। চুসি গাংদ্রুক আগামী একশ’ বছর ধরে লড়বে স্বাধীনতার জন্য। হিজ হোলিনেস হয়ত স্বাধীনতার দাবি ছেড়েছেন। অন্তত প্রকাশ্যে ছেড়েছেন! বাধ্য হয়েছেন ছাড়তে! আমরা ছাড়িনি। ছাড়ব না!’

আবার খানিক বিরতি নেন রিঞ্চেন লামা। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে ফের শুরু করেন।

‘দেখুন, চায়না হিজ হোলিনেস দলাই লামাকে নিয়ে আর চিন্তিত নয়, হিজ হোলিনেসের অবর্তমানে চায়না পরদিনই একজন জো-হুজুর দলাই লামা বসাবে। কিন্তু চায়নাকে যাতে চুসি গাংদ্রুককে নিয়ে চিন্তা করতে হয় তার ব্যবস্থা করতে চায় টাইগার।’
‘ভবিষ্যতে চুসি গাংদ্রুকই হবে চায়নার থ্রেট!’ ডিকের স্বর অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ়।
‘ইয়েস! আজ অথবা কাল চায়না ফাইভ ফিঙ্গারস দখল করবে, আমরা জানি!’
‘দখল করবে! আর ইন্ডিয়া আঙুল চুষবে!’ কঠিন কণ্ঠস্বর রিয়াজের।

‘ইন্ডিয়া কী করবে আমরা জানি না, তবে এখানে বিপ্লবী বোধিসত্ত্বরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ করবে। প্রত্যেকটি গুম্ফা হবে এক-একটি রেজিস্ট্যান্স সেন্টার। হিমালয়ান রেঞ্জের তাওয়াং থেকে নেপাল, সিকিম হয়ে সেই লাদাখ পর্যন্ত সমস্ত গুম্ফা লড়াই করবে! মনে রাখবেন এই চিকেন নেকও চায়নার টার্গেট। কালিম্পং ওদের টার্গেট। সমস্ত ট্রেড রুট ওরা কব্জা করবে।’ সামান্য উত্তেজনা লামার কণ্ঠে।

‘অর্হতের মতো বাচ্চারা ভবিষ্যতের যোদ্ধা?’ জানতে চায় ডিকে।

‘দশ-বারো বছর পর এরা লড়াই করার জন্য রেডি হয়ে যাবে—’

‘কিন্তু এটা তো অন্যায় লামা রিঞ্চেন! যারা যোগ দিতে চায় স্বেচ্ছায়, তারা যাক কিন্তু—’ ডিকের স্বর এবার কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী।

‘অবশ্যই অন্যায়! আমরা বুদ্ধ ওয়রিয়র অবশ্যই, কিন্তু একটা অন্যায়ের বিরোধিতা করতে গিয়ে একের পর অন্যায় ঘটিয়ে নয়! এগুলো বুদ্ধিজমের বিরুদ্ধে! টাইগার নিজেকে গুরু রিন পো ছে’র অবতার মনে করে! ও মনে করে ওর অলৌকিক শক্তি আছে! এগুলো আমাদের ধর্মবিরোধী!’

‘ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনারা এইসব করছেন কীভাবে?’ আবার উত্তেজিত প্রশ্ন রিয়াজের।

‘নেহরুও ভারতের মাটিকে ইউজ করতে দেননি, তাই তখন আমরা নেপালকে বেস করেছিলাম। এখনও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু—’

উন্মুখ চেয়ে থাকে ডিকে ও রিয়াজ। কী বলতে চান লামা রিঞ্চেন? ভারত সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহী কার্যকলাপ করার সাহস ও রসদ পাচ্ছে কীভাবে?

‘আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিন, আমি বাচ্চাটিকে তার বাপ-মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব!’ প্রত্যুত্তর শেষ না-করে প্রসঙ্গান্তরে যান লামা রিঞ্চেন।

‘কবীর খান? নিবেদিতা?’ উৎকণ্ঠাসহ প্রশ্ন ডিকের।

‘আজকের দিনটা সময় দিন। আমি জানিয়ে দেব।’

‘লামা রিঞ্চেন—’ সরাসরি লামার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ডিকে, ‘টাইগার লামা ঠিক যেভাবে নিজের দেশের মূর্তি উদ্ধার করতে চেয়েছেন, সেভাবেই উনি দেশের তের-মা

উদ্ধার করতে চান! কবীর খানকে ওই উদ্দেশ্যেই নিয়ে গেছেন!'

রিঞ্চেন লামা চেয়ে থাকেন ডিকের দিকে। তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা নেই, আছে নির্লিপ্তি।

'পঁচিশ তারিখের মধ্যে যা করার করতে হবে—' যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছেন লামা। 'ওকে মিস্টার কয়াল, আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় নিচ্ছি—'

হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ান রিঞ্চেন লামা। ডিকে-রিয়াজও।

১১০

গুম্ফা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেই রজতকে ফোন করে রিয়াজ। সংক্ষেপে রিপোর্ট করে যাবতীয় ঘটনা। মূর্তিরহস্য বিস্তারিত জানায়। ডিকের সঙ্গেও কথা বলে রজত। কিউরেটরসহ মিউজিয়ামের মধ্যে যে একটা গণ্ডগোল আছে, পূর্ব-আশঙ্কা রজতের ছিলই, কিন্তু সব কথা ফোনে খোলসা করে না সে। বুঝতে পেরে কথা বাড়ায় না ডিকেও। কেবল বিড়বিড় করে,

'কামসূত্র উপন্যাসে শাক্যমুনির মূর্তির কথাই আছে—'
'আপনার কাছে বহুবার শুনেছি কামসূত্র-এর কথা, আমায় পড়তে দেবেন দাদা?' রিয়াজ বলে।
'নিশ্চয়ই! সময়-সুযোগ পেলে তোমায় একদিন গল্পটাও শুনিয়ে দেব।' হেসে জবাব ডিকের।

ঘটমান বর্তমান রঙ বদলায় দ্রুত। থই পেতে কসরত করতে হচ্ছে রীতিমত। শাক্যমুনি বুদ্ধ নাকি গুরু পদ্মসম্ভব, মূর্তিরহস্য টলিয়ে দেয় রিয়াজকে। ডিরেক্টর ও প্রধান কিউরেটর

তনুময় পালের আচরণ আশ্চর্যজনক! তদন্তকারী অফিসার হিসেবে প্রতারিত মনে হয় নিজেকে!

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর প্রশ্ন জাগে মনে।

‘ডিকেদা এই তন্ত্র-ফন্ত্র, এসব কী? টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে এইসব বুজরুকির মানে কী!’

হাসে ডিকে। প্রত্যুত্তরে সময় নেয়। অপেক্ষায় রিয়াজ।

‘যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা এগুলোর মধ্যে কোনও স্পিরিচুয়াল ব্যাপার নেই! সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার নেই! ধর্মীয় ব্যাপার তো নেই-ই! ছিল না কখনও। পরে আরোপ করা হয়েছে। না-বুঝেই হয়েছে। ডিগ্রেডেড তান্ত্রিকের কথা বললেন লামা! তন্ত্রে অধিকারী ভেদ আছে—উত্তম অধিকারী আর নিম্ন অধিকারী। বাঁদরের হাতে তরোয়াল দিলে যা হয়!’ বলে ডিকে।
‘তাহলে এই তন্ত্র-মন্ত্র আসলে কী?’
‘তুমি গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এইসব শব্দ শুনেছ, এখানে তন্ত্র মানে কী?’
‘একটা সিস্টেম।’
‘একজ্যাক্টলি তাই! তন্ত্র মানে সিস্টেম, আর কিছু নয়। প্রকৃতি কীভাবে কাজ করছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, তাকে দেখে ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদগ্ধ মানুষ এর পেছনে একটা জিনিসই আবিষ্কার করল, একটা সিস্টেম। কেমন সেই সিস্টেম? বাইনারি সিস্টেম। যে কোনও বিপরীত যুগ্ম, একে অন্যের সঙ্গে যোগ হচ্ছে আর তার ফলে উৎপাদন হচ্ছে। সৃজন হচ্ছে।’
‘বাইনারি সিস্টেমটা কী?’ প্রশ্ন রিয়াজের।
‘যামল কথাটা শুনেছ?’
‘যামল!’ নয়া শব্দ কানে বাজে রিয়াজের।
‘তন্ত্র বলে, শিব কখনও শক্তিছাড়া হন না, তেমন শক্তিও শিবছাড়া হতে পারেন না। শিব ও শক্তির পরস্পর মিলিত এই রূপের নামই যামল। যামল মানে যুগল। যুগলেই বিশ্বের উৎপত্তি।’

‘কমপ্লিমেন্ট টু ইচ আদার।’ রিয়াজ বলে।

‘এখান থেকেই আসছে যোগ-এর কনসেপ্ট। সেইজন্যই তারা পরস্পরের যোগ্য। যাকে যোগ করা যায়—তাকে যোগ্য বলে। যেমন নরকে নারীতে বা নারীকে নরে যোগ করা যায় বলে তারা পরস্পরের যোগ্য। সবরকম লিঙ্গ ঠিকঠাক বিপরীত যোনিতে যোগ্য। এই যোগসাধনেই রতিক্রিয়া হয় আর তার ফলেই হয় সন্তান উৎপাদন। তাহলে এখানে প্রশ্ন আসবে, এ কি কেবল নর-নারীর যোগের কেস?’

‘যারা যারা যোগ্য—’ ইতস্তত করে বলে রিয়াজ।

‘ঠিক তাই। থিয়োরির সঙ্গে প্র্যাকটিসের যোগ, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের যোগ, এমন হাজারো যোগসাধনেই তৈরি হয়েছে বিশ্বের এই বিপুল সৃষ্টি-সম্ভার, জ্ঞানসম্ভার আর পণ্যসম্ভার। তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্যই হল টোটাল বিশ্বপ্রকৃতিকে কোটি রকমের বাইনারিতে সাজিয়ে ফেলা! তারপর তাদের যোগসাধন করা! প্রথমে দুই, তারপর চার, ছয়, আট—এইভাবে গড়ে ওঠে বাইনারি-ট্রি এবং অবশেষে বাইনারি-ফরেস্ট। এইভাবে তন্ত্রসাধক বাইনারি-অপোজিটের সমন্বয় করে একটা ব্যবস্থা বা তন্ত্র বা সিস্টেম গড়ে তোলেন, যা আমাদের জগতের সৃষ্টিকে চালু রাখে।’ বিস্তৃত ব্যাখ্যা শেষ করে ডিকে।

‘তাহলে এই যোগের বিদ্যাই তন্ত্র!’ প্রায়-স্বগতোক্তি রিয়াজের।

‘একদম! যোগসাধনার নামই তন্ত্র। নিখুঁত pairing করেই কাজ করে প্রকৃতি। মানুষও প্রকৃতি থেকেই যোগসাধনা শিখল। এই বাইনারির কোনও গরমিল বা গণ্ডগোল হলে আমরা সারাই করি। এই সারাই করাকে তাই বলা হয় re-pair করা।’

‘বাহ্ এটা দারুণ! রি-পেয়ার!’ মুগ্ধতা রিয়াজের।

‘যুগ্মকে আবার নিজের তালে নিয়ে আসাই রি-পেয়ার। একের সঙ্গে অন্যের মিলনই তৈরি করে একটা তন্ত্র। সিস্টেম। তন্ত্রকে তুমি আজকের ভাষায় সিস্টেম ডিজাইনও বলতে পার।’ সিদ্ধান্ত ডিকের।

পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলে গাড়ি। অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলে না। ডিকে ও রিয়াজ, দু’জনের মাথার অন্দরে জমছে কথার পরে কথা। মুখ খোলে ডিকেই।

‘মারণ-উচাটন, বশীকরণ, ভূত-প্রেত, বগলামুখী নামজপ করে গৃহশান্তি বা গ্রহশান্তি এগুলো তন্ত্র নয়! এগুলোকে তন্ত্র ভাবা আর লম্বা চুল-দাড়ি দেখলেই রবীন্দ্রনাথ ভাবা, একই ব্যাপার!’

হা-হা হাসে রিয়াজ। বলে, ‘ফেক তন্ত্র!’

‘তুমি কি জান, আমাদের সায়েন্সে তান্ত্রিকদের বিশাল কন্ট্রিবিউশন?’

‘সায়েন্সের সঙ্গে তন্ত্র?’ অবাক প্রশ্ন রিয়াজের।

‘ভারতীয় কেমিস্ট্রি মূলত তান্ত্রিকদের সৃষ্টি। মেডিক্যাল সায়েন্সেও ব্যাপক অবদান!’

‘মেডিক্যাল সায়েন্স!’ আরও বিস্মিত হয় রিয়াজ।

‘প্রাচীন চিকিৎসকদের ওপর স্মৃতিশাস্ত্রকাররা ছিলেন খড়্গহস্ত।’

‘কেন?’

‘একটাই কারণ—জাতিভেদ! প্রাচীনকালে বৈদিক আয়ুর্বেদ আচার্যরা এই কারণে সঠিকভাবে রোগের চিকিৎসা করতে পারতেন না। জাতপাতের কারণে সব রোগীর গায়ে তাঁরা হাত দিতেন না!’

‘সে তো বটেই! ঘৃণা, ছোঁয়াছুঁয়ি বোধ—এসব থাকলে সে চিকিৎসা করবে কীভাবে!’ রিয়াজ বলে।

‘কেবল রোগী নয়, মড়া-কাটা বা নিষিদ্ধ খাবার-দাবারের গুণাগুণ পরীক্ষা বা শল্যচিকিৎসা —অপারেশন—এগুলোও বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যসমাজ কখনও বরদাস্ত করেনি! নানা বিদঘুটে নিয়মের প্যাঁচ—’

‘তান্ত্রিকদের এসব ইনহিবিশন্‌স্‌ একেবারেই ছিল না?’ প্রশ্ন রিয়াজের।

‘বৈদিক সমাজের সামাজিক রীতিনীতি, নর্মস, কোডস্‌—এসবের বড় একটা ধার ধারত না তান্ত্রিকরা! তান্ত্রিক বৈদ্যরা মনে করতেন, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়! ইনফ্যাক্ট আজও তাই! সব চিকিৎসকই আসলে তান্ত্রিক। মানসিকভাবে তান্ত্রিক না-হলে ডাক্তার হওয়া যায় না! বিজ্ঞানী হওয়া যায় না!’

মনোযোগী শ্রোতা রিয়াজ। তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে তার বায়বীয় ধারণায় কিঞ্চিৎ সার-জল পড়ে। তার প্রশ্নে উত্তর যোগানোয় ডিকে অক্লান্ত।

১১১

‘অত্যন্ত অ্যাডভার্স কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে। অপারেশন-টপারেশন সম্পূর্ণ তান্ত্রিক চিকিৎসকদের কাজ! কেবল অপারেশন বা শল্যচিকিৎসা নয়, শবব্যবচ্ছেদও! এসব তান্ত্রিক বৈদ্যদেরই কনট্রিবিউশন। ধর শবসাধনা, শ্মশানচারী তান্ত্রিকরা শবসাধনা করেন, আমরা শুনেছি, তাই তো? এই শবসাধনার মানে কী?’

‘হাতে মড়ার খুলি নিয়ে ভূত-প্রেতের চর্চা!’ রিয়াজ বলে।

রিয়াজের কথায় হা-হা করে হেসে ওঠে ডিকে। কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয় রিয়াজ।

‘ফিল্মে বা বইটই পড়ে তাই মনে হয়!’ রিয়াজ হেসে বলে।

‘তোমার দোষ নেই রিয়াজ! সাহিত্য-সিনেমা এভাবেই অলৌকিকতা আরোপ করে ড্রামা তৈরি করে! এসব দেখে বা পড়ে আমাদের একটা টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ হয়। আমরা অলৌকিক কর্মকাণ্ড পছন্দ করি। ভালোবাসি এগুলো পড়তে বা দেখতে। কিন্তু তন্ত্রসাধনায় আর যাইহোক অলৌকিকতা নেই! বলা হয় একদা শবসাধনা ছিল আসলে সিম্পল অ্যানাটমির ক্লাস! সমাজ থেকে দূরত্ব তৈরি করে, গুহ্য মন্ত্র দিয়ে নিজেদের আড়াল করে তাঁরা প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে গেছেন।’

‘আজ তো সম্পূর্ণ উল্টো কেস হয়ে গেছে দাদা!’

‘স্রেফ বুজরুকি! অধিকাংশ তান্ত্রিক নামধারীই আসলে ভণ্ড!’

‘কিন্তু ডিকেদা, এই বুজরুকিকে প্রশ্রয় দেওয়াটাও চিটিং!’

‘অবশ্যই! যারা লাই দেয় তারাও প্রতারক!’

‘এসব বুজরুকি নিয়ে বি-গ্রেডেড ওয়েব সিরিজ তৈরি করা বা তৃতীয় শ্রেণির উপন্যাস লেখাও তো একটা চিটিং!’ রিয়াজ উত্তেজিত।

‘তুমি ওসব পড় নাকি!’ মুচকি হেসে ডিকের প্রশ্ন।

হাসে রিয়াজ। গাড়ির ভেতর আবার নীরবতা। পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে যায় গাড়ি।

‘এইসব উন্মাদ তন্ত্রসাধকদের পাল্লায় পড়েছে একটা বাচ্চা, কবীর খানের মতো এক বয়স্ক মানুষ—’ নীরবতা ভাঙে রিয়াজ।
‘নিবেদিতাও—’ অস্ফুটে বলে ডিকে।
‘ভালো বুঝছি না দাদা! রিঞ্চেন লামাকে কাস্টডিতে নিয়ে জেরা করব?’
‘না রিয়াজ, খুব ক্ষতি হয়ে যাবে! সবাইকে অক্ষত ফেরত চাই! রিঞ্চেন লামার ওপর ভরসা করতে হবে!’
‘আই ডাউট দাদা, একে পুরো বিশ্বাস করা উচিত হবে না!’
‘একে তিব্বতি দুইয়ে লামা, এঁরা কতটা কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্যশীল তোমার ধারণা নেই রিয়াজ! তার ওপর স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন—এঁদের কমিটমেন্ট আর পাঁচজনের মতো নয়! এঁদের জেরা করে আদৌ কি কিছু পাবে? তাছাড়া এদের ক্রিমিনাল ভাবাটা কি উচিত হবে?’
‘টাইগার লামা যা করছেন তা অবশ্যই ক্রাইম দাদা!’

সম্মতির মাথা নাড়ে ডিকে। গাড়ি এগিয়ে যায় কালিম্পং-এর দিকে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা।

যেন হঠাৎ-কিছু-মনে-পড়ে-গেছে, এমন ভঙ্গিতে পকেট থেকে ফোন বার করে ডিকে। দ্রুত পর্দায় টোকা মেরে ইন্টারনেটে খোঁজ চালায়। সার্চ ইঞ্জিনে লেখে—রিমার্কেবল ইভেন্ট টু বি হেল্ড অন ফোর্থকামিং টুয়েন্টি ফিফথ অক্টোবর। তারপর তর্জনীর এক টোকাতেই পরপর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় যাবতীয় তথ্যসূত্র।

‘লামা কেন বললেন, পঁচিশ তারিখের মধ্যে যা করার করতে হবে! খেয়াল করেছ?’
‘হ্যাঁ দাদা, মনে পড়ছে। শেষে বললেন বিড়বিড় করে!’ ডিকের দিকে তাকিয়ে বলে রিয়াজ।
‘পঁচিশ তারিখ কী আছে?’ ফোনের পর্দায় চোখ রেখে বলে ডিকে।

১১২

অসংখ্য তথ্যের ভিড়ে পথ হারায় ডিকে। তামাম দুনিয়ার অনুষ্ঠানসূচী হাজির মুহূর্তে কিন্তু ঈপ্সিত তথ্য খুঁজে পায় না সে। তিব্বতি দুনিয়ার সঙ্গে নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক হবে সেই অনুষ্ঠান, নাহলে লামা রিঞ্চেন কেন নির্দিষ্ট একটি দিনের কথা বললেন?

রিমার্কেবল ইভেন্ট ইন টিবেটান বুদ্ধিজম টু বি হেল্ড অন ফোর্থকামিং টুয়েন্টি ফিফথ অক্টোবর। অনুসন্ধান বার-এ অতিরিক্ত শব্দ জুড়ে ডিকে আরও নির্দিষ্ট করে খোঁজ। আবার নতুন করে সেজে ওঠে তথ্যসারি, যেন সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলিত কুচকাওয়াজ। শুরুতেই আসন্ন পঁচিশের অনুষ্ঠান পেয়ে যায় ডিকে। চোংখাপা বাটার ল্যাম্প ফেস্টিভাল। সেদিন কী হয়? চোংখাপা মানে কী? দ্রুত চোখ বোলায় ডিকে।

চোংখাপা তিব্বতের প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগুরু। অতীশের পরেই তাঁর খ্যাতি। অতীশের উপদেশ মোতাবেক তাঁর প্রধান শিষ্য ব্রোম তোনপা তিব্বতে তৈরি করেন একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়। সেই সেক্টের নাম কাদম্পা। অতীশের মৃত্যুর পর, ব্রোম তিব্বতে যে ধর্ম-অভিযান শুরু করেন, শুরুতে তা ধীর গতিতে বাড়লেও, পরে তুমুল গতি পায়। শ'চারেক বছর পরে এই ধর্ম-আন্দোলনের আরও সংস্কার করেন লামা চোংখাপা। সুসংহত হয় কাদম্পা গোষ্ঠী। তখন তাঁদের নতুন নাম হয় গেলুগপা। পরে এই গেলুগপা সেক্টই হয়ে উঠল তিব্বতের প্রধান বৌদ্ধ সেক্ট। এঁদের টুপির রঙ হলুদ। দলাই লামা এই হলদে-টুপি গোষ্ঠীর প্রধান গুরু।

বছরের দশম মাসের পঁচিশতম দিনে মন্দিরে, মঠে, গুম্ফায় মাখন-প্রদীপ জ্বালিয়ে তামাম তিব্বত গুরু চোংখাপা'র পরিনির্বাণকে স্মরণ করে। ঘরে ঘরে আলোয় আলোয় সেদিন স্মৃতিতর্পণ। অনেকটা মুসলমানদের শব-এ-বরাতের মতো।

রিয়াজকে সব জানায় ডিকে। নিশ্চুপ শোনে রিয়াজ। মনে পড়ে যায় অর্হৎ বড়ুয়ার দাদু সুরজিৎ বড়ুয়ার সঙ্গে কথোপকথন। সুরজিৎবাবুর কাছেই শুনেছিল লাল-টুপি ঞিংমাপা আর হলুদ-টুপি গেলুগপা ধারার কথা।

পাহাড় কেটে এগিয়ে চলে গাড়ি। গাড়ির ভেতরে নীরবতা। নীরবতার ভেতরে শঙ্কা। তাহলে কি গুরু চোংখাপা'র পরিনির্বাণের শুভতিথিতে দীক্ষা হবে শিশু অর্হতের? লামাজীবনে প্রবেশ করবে সে?

বৃষ্টি ধরেছে। হঠাৎ গাড়ি থামান ড্রাইভার। অবাক হয় রিয়াজ। ডিকেও। চালক গাড়ি থেকে নামেন। একটি মোড়ক থেকে বার করেন লবণ। জোঁক। জুতোয় লেপ্টে থাকা জোঁকের গায়ে লবণ ছড়িয়ে দেন। গুটিয়ে মাটিতে পড়ে যায় সে কীট। শাদা লবণে ছড়িয়ে যায় রক্ত। রিয়াজ আর ডিকেও নেমে পরীক্ষা করে নেয় জুতো। বৃষ্টি পড়লেই এলাকায় থিকথিক করে জোঁক।

চালক আবার চালু করেন গাড়ি। ডিকে ও রিয়াজ দু'জনেই নির্বাক। মাথায় তাদের বিজবিজে চিন্তা জোঁকের মতোই আটকে।

'হঠাৎ ই-টুয়েন্টিটু কেন বললেন আমি বুঝিনি!' নীরবতা ভেঙে বলে রিয়াজ।
'আমিও!' সায় দেয় ডিকে।
'তবে আমি যতদূর জানি ই-টুয়েন্টিটু একটা ডাবল ব্যারেল ব্লাস্টার রাইফেল! নেটেও চেক করে নিলাম। কিন্তু হঠাৎ রাইফেলের কথা কেন, কে জানে!'
'রাইফেল!' রিয়াজের কথায় চিন্তায় পড়ে ডিকে।
'একটা জিনিস খেয়াল করেছেন দাদা, এখনও ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে—তারপর একটা কিন্তু বলে রিঞ্চেন লামা চুপ করে গেলেন—আর কিছু বললেন না!' মুখ খোলে রিয়াজ।
'এড়িয়ে গেলেন!'
'কী?'

‘ইণ্ডিয়ার একটা গ্রুপ ওদের সাহায্য করছে!’
‘ওহ মাই গড! কারা তারা?’
‘এজেন্সির খবর আছে—রজত আজ কনফার্ম করবে।’ জবাব ডিকের।

অবাক হয় রিয়াজ। কারা আছে এদের পেছনে?

অন্দরে অস্বস্তি নিয়েই নিশ্চুপ থাকে সে। চুপ ডিকেও। গাড়িতে আর কোনও কথা হয় না দু’জনের।

এখনও চলছে টিপটিপ বৃষ্টি। মেঘের পরে মেঘ। ঘোলাটে চারপাশ। মাথাও। দুশ্চিন্তা নিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে ডিকে।

১১৩

২২ অক্টোবর। ‘র’ হেড কোয়ার্টার্স। দিল্লি।

লোদি রোডের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরোয় রজত। সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট ছিল। উইং এক্সিকিউটিভ কেশব গোয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ। তারপর ওদের ক্যাফেটোরিয়ায় বসে ব্যাচমেট দুই আইপিএস, বিনীত কুমার আর অঙ্গদ নারায়ণের সঙ্গে খোশগল্প। সকালের বিমান ধরে সোজা চলে এসেছে লোদি রোড। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং-এর হেড কোয়ার্টার্স। ফিরেও যাবে আজ বিকেলের বিমানে। অনেকদিন পর পুরনো বন্ধুদের সঙ্গ তৃপ্ত করে। হাসিঠাট্টায় কেটে যায় ঘণ্টা দেড়েক সময়। ঘড়ি দেখে। আরও একটি সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট আছে। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে উঠে পড়ে।

গাড়িতে বসে চালককে নির্দেশ দেয়, ‘ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি।’

কিছুক্ষণের মধ্যে, লোদি রোডেই, গাড়ি একটা কফি শপের সামনে দাঁড়ায়। ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি। রজত ঢোকে কফি শপে। পূর্বনির্দিষ্ট টেবিলে বসে আছেন একজন। রজত গিয়ে বসে চেয়ারে। করমর্দন ও প্রাথমিক পরিচয় আদানপ্রদান হয়। বিশাল টোমর। দিল্লির পরিচিত লিটারারি এজেন্ট। সামান্য কথোপকথন হয় দু'জনের। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ। বিশাল কিছু কাগজ দেন রজতকে। এক কাপ করে কফি খেয়ে উঠে পড়ে দু'জনে। আবার করমর্দন করে বিশালকে ধন্যবাদ জানায় রজত।

গাড়ি এবার এগোয় হেইলি রোডে বঙ্গভবনের দিকে। স্নান-খাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ধরতে হবে কলকাতামুখী বিমান। উইং এক্সিকিউটিভ কেশব গোয়েলের সঙ্গে কথা বলে আর এজেন্সির প্রতিবেদন দেখে রজত বাকরুদ্ধ। ব্লু-টুথে প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিয়েছেন কেশব। তিব্বতি বিদ্রোহীদের সরাসরি মদত দিচ্ছে একটি ভারতীয় সংগঠন। ভারত ও চিনের সীমান্ত সমস্যা ও পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন কাজে লাগাতে চাইছে তারা।

বিরোধীদের ভয়ঙ্করভাবে থেঁতলে, এক দেশ দুই সিস্টেম নীতি তুলে দিয়ে, হংকং দখল করে, শিংজিয়াং-এর উইঘুর, কাঝাখ, কিরঘিজ ও অন্যান্য মুসলিমদের দিয়ে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প আর ডিটেনশন ক্যাম্প ভর্তি করে, দেশে সংখ্যাগুরু-সন্ত্রাস তৈরি করেছে চিন। বিশ্ব অর্থনীতি দখলেও তার গতি আপাতত অপ্রতিহত। এহেন চিনের বিরোধিতা করবে কারা? করলেও কীভাবে?

ঠিক এই জায়গায় ঢুকে পড়েছে এই ভারতীয় সংগঠন। চিনের বিরুদ্ধে এদের অন্যতম অস্ত্র তিব্বত তাস। ভারতের সঙ্গে চিনের সাম্প্রতিক বিরোধ সীমান্ত এলাকায় দুটো রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত। প্যাঙ্গং সো'র কাছে একটা রাস্তা আর গালওয়ান রিভার ভ্যালিতে দারবুক-শায়ওক-দৌলত বেগ ওল্ডি পর্যন্ত প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার লম্বা রাস্তা। এইদুটো রাস্তা হলে ভারতীয় সেনা খুব সহজেই কারাকোরাম পাস পর্যন্ত চলে যেতে পারবে, ফলে চিপচ্যাপ নদি, ট্রিগ হাইটস আর দেপসাং প্লেইন-এ নজরদারী চালাতে

পারবে মসৃণভাবে। চিনের চিন্তা এখানেই, তারা কিছুতেই এই সুবিধা দিতে চায় না ভারতকে।

‘ইন্ডিয়ান রাইট-উইং অর্গানাইজেশন ঢুকে পড়েছে, আইবি’র ডিটেইলড রিপোর্ট আছে। তার ওপর ডোলকান ইসা আর রেবিয়া কাদির, এরাও যদি ঢুকে পড়ে, সত্যনাশ হয়ে যাবে! দিমাগ খারাব কর দিয়া ইয়ে লামা! গো থ্রু দ্য রিপোর্ট রজত।’
‘ইয়েস স্যার!’

সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ কথা বলেন উইং এক্সিকিউটিভ কেশব গোয়েল। প্রয়োজনীয় তথ্য জলের মতো বুঝিয়ে দেন রজতকে।

গাড়িতে বসেই ফোনের পর্দায় প্রতিবেদনে চোখ বোলায়। ফোনের পর্দায় লাইন ধরে তরতর করে নেমে যায় রজতের চোখ। রাজনীতি খুব পরিষ্কার। ভারত এবং তিব্বত, দু’জনেরই শত্রুপক্ষ এখন চিন। দলাই লামাসহ লক্ষ তিব্বতিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে ভারত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্তরে শক্তিশালী চিনের বিরুদ্ধে যাওয়া কঠিন। বে-সরকারিভাবে এই কাজটি করছে এই সংগঠন।

গোয়েলের মুখে নামটা শুনে চমকে যায় রজত।

কবীর খানের জন্য চিন্তা বাড়ে। এই মামলাতেও অপ্রত্যাশিত জুড়ে যাচ্ছে যাদের নাম তারা কবীর খানের পক্ষে বিপজ্জনক। এসএস। সত্যসেনা।

১১৪

২২ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

কে ঢুকছে ঘরে? হিমালয়ের এই গুম্ফায় অপ্রত্যাশিত এই উপস্থিতি রা কেড়েছে তাঁর। তিনি স্তব্ধ। টাইগার লামা হাসেন।

‘খানসাহেব, আপনার পুরাতন বন্ধুকে চিনতে পারছেন?’
‘কী রে খান, কেমন আছিস?’

বিস্ময়-দৃষ্টির বলয়ে প্রাথমিকভাবে ঠাহর হয় না মানুষটির উপস্থিতি। যদিও কবীরের হতবাক চাহনি তাকে ঘিরেই। সে-ও হাসিমুখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। একসময় বিস্ময়াভিভূত কবীরের কণ্ঠে অস্ফুটে কেবল উচ্চারিত হয়, ‘নীলকণ্ঠ!’

‘আমায় দেখে চমকালি, খান!’ হাসে নীলকণ্ঠ। ‘চমকাবারই কথা! বহুদিন পর দেখা হল! ভাল আছিস তো!’
‘তুই এখানে কেন নীলু?’ কথায় ফেরেন কবীর।
‘আগে বল তুই এখানে কেন?’

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে নীলকণ্ঠ। ধাতস্থ হয়েছেন কবীর। খুবই সংক্ষেপে বলেন যাবতীয় ঘটনাক্রম। কামসূত্র উপন্যাস থেকে কালিম্পং গুম্ফা পর্যন্ত।

‘তুই লামাকে সাহায্য করছিস?’ শেষে প্রশ্ন কবীরের।
‘সাহায্য করব না কেন তুই বল খান! নেহরু যা পারেননি, এখন আমাদের তা পারতে হবে। তিব্বতিদের নিজেদের পূর্বপুরুষের দেশে ফিরে গিয়ে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। নিশ্চয়ই আছে! হিজ হোলিনেস দলাই লামা সত্তর বছর ধরে টিবেটানদের গাইড করছেন, জ্বালিয়ে রেখেছেন তিব্বতি প্রদীপের অনির্বাণ শিখা, এবং সবটাই করছেন শান্তিপূর্ণ অহিংস গান্ধীবাদী পথে। আমরা মনে করি দলাই লামাকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত।’ নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করে নীলকণ্ঠ।
‘বাব্বা, দলাই লামা আর তিব্বত তোদের কাছে এত গুরুত্বপুর্ণ!’

কবীরের কথায় হাসেন লামা। সেই তির্যক মন্তব্য পাত্তা না-দিয়ে নিজের কথা বলে যায় নীলকণ্ঠ।

‘দলাই লামা আর তিব্বত কেবল রাজনৈতিক কারণে গুরুত্বপুর্ণ নয়, আদর্শগত কারণেও। বৌদ্ধধর্মের জন্ম দক্ষিণ এশিয়ায়, আরও স্পেসিফিক্যালি ভারতে। এশিয়ার অন্য দেশে, প্রতিবেশী তিব্বতেও, ছড়িয়ে পড়ার আগে বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সভ্যতার একটা অংশ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমরা মনে করি, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটা এক্সটেনশন। অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এটাই প্রমাণ করে ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় সভ্যতা অন্য দেশের সভ্যতাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল!’

কবীর জানেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এই গৌরবগাথাই নীলকণ্ঠ তথা এসএস-এর প্রচারের অঙ্গ। তিনি বক্তৃতারত নীলকণ্ঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

‘চিনের দাদাগিরি আমরা সহ্য করব না, তাই চুসি গাংদ্রুককে রিভাইভ করতে আমরা সাহায্য করছি!’
‘চিন তো সরাসরি দখলদারি চালাচ্ছে—ডাইরেক্ট লড় ওদের সঙ্গে!’
‘দ্যাখ, ওদের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করে জেতা কঠিন, তাই যাবতীয় অপশন খোলা রাখতে হবে, সিম্পল! চাইনিজ গুডস আর চাট্টি অ্যাপ বয়কট করে কিস্যু হবে না, ভারতকে তার অর্থনৈতিক শক্তি দেখাতে হবে। পাকিস্তান ওদের কাশ্মীর অংশে টেররিস্ট সেন্টার যেমন বানাচ্ছে, তেমন চিনও নিজস্ব প্রজেক্টের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাচ্ছে টিবেটকে এন্ট্রি পয়েন্ট করে। আমরা মনে করি, দিল্লির পরিষ্কার বলা উচিত এটা বেআইনি ও অন্যায়! চিনের এই ধরণের—’
‘এসএস-এর পাল্লায় আপনি পড়বেন না লামা! এরা ধর্মান্ধ!’ লামার দিকে তাকিয়ে বলেন কবীর।

মাঝপথে বাধা পেয়ে চুপ করে নীলকণ্ঠ। শ্লেষের হাসি নিয়ে ক্রমান্বয়ে তাকায় দু’জনের দিকে।

‘ভুল ধারণা খানসাহেব! ধর্মের সঙ্গে এদের কোনও লেনাদেনা নেই! হিন্দুত্ববাদ এদের কাছে একটা রাজনৈতিক টুল! এদের ইসলাম-বিরোধিতাও তাই! পলিটিক্যাল টুল! আর কিচ্ছু নয়! হিন্দুধর্ম নিয়েও এরা ভাবিত নয়, ইসলাম নিয়েও এদের আলাদা কোনও ভাবনা নেই! এগুলো মুখোশ! এরা ইসলামের বিরোধিতা করে, কিন্তু হিন্দু ধর্মকে ইসলামের মতোই মনোলিথিক বানাতে চায়! এরা চায়নার বিরোধিতা করে, কিন্তু চায়নার মতোই ইন্ডিয়াকে অথরিটিরিয়ান স্টেট বানাতে চায়!’ কিঞ্চিত উত্তেজিত লামা।

‘চিন এদের মডেল নাকি এখন?’ কবীর বলেন।

‘চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি এদের মডেল! বিরোধীদের দুমড়ে দিয়ে গোটা দেশটাকে একটা লেবার কলোনি বানাতে চায়! সকাম প্রেমকে পার্মানেন্টলি ধ্বংস করে এরা নিষ্কাম প্রেমের পূজারি হতে চায়। পার্টি আর সরকার, একটা টোটালিটেরিয়ান ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চায়! চায়না মার্কেট ওপেন করেছে বটে, খেয়াল করবেন পলিটিক্যাল ব্যবস্থা কিন্তু ক্লোজড! ইন্ডিয়ায় এসএস এমনই এক ক্লোজড সিঙ্গল-পার্টির পলিটিক্যাল ব্যবস্থা বানাতে চায়! তবে তার আগে আপাতত কর্পোরেটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে মাত্র!’

টাইগার লামার কথা শুনে উচ্চকণ্ঠে হাসে নীলকণ্ঠ। জবাব দেয় না। লামার কাটাকাটা স্পষ্ট উচ্চারণে আক্রমণ মিশে আছে দেখে অবাক হন কবীর।

‘এরা আপনাদের ব্যবহার করছে লামা!’ কবীর বলেন।

‘এসএস আমাকে ব্যবহার করছে স্রেফ রাজনৈতিক কারণে, আমি খুব ভালো করে জানি খানসাহেব! শত্রুর শত্রু আমার মিত্র—এই নীতিতে কোনও অন্যায় নেই। চায়নার শত্রুপক্ষ আমরা, তাই আমরা ওদের মিত্র। ব্যবহার করুক। তবে সবকিছু একতরফা হয় না। ব্যবহার আমরাও করছি!’ কিছুক্ষণ থেমে আবার বলেন টাইগার লামা, ‘এসএস সাবধানী, তারা খুব ভালো জানে আমাদের এই ভাইব্রান্ট ধর্ম আবার ইন্ডিয়াকে ভাসিয়ে দিতে পারে। বাংলায় যেমন হয়েছিল!’

টাইগার লামার আক্রমণ থামার নয়। লামাকে গত কয়েকদিন ধরে দেখছেন, পরাধীনতাজনিত ক্রোধ তাঁর আছে, কিন্তু মূলত তিনি স্থিতধী। শান্ত। লামার এই নয়া-রূপ আগে লক্ষ্য করেননি কবীর। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটা অংশ, সম্ভবত নীলকণ্ঠ'র এই প্রত্যয় লামাকে দৃশ্যত ক্রুদ্ধ করেছে।

'আমাদের বাংলাছাড়া করতে কারা হাত মিলিয়েছিল তুরুস্কুদের সঙ্গে? তুরুস্কুরা এসে যখন বৌদ্ধ ন্যাড়াদের মারতে শুরু করেছিল, বিহারগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তখন বৌদ্ধদের চিহ্নিতকরণের কাজটা কারা করেছিল খানসাহেব? আপনি ভালোই জানেন। কারা তুরুস্কুদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন বিহারে, সঙ্ঘারামে? বৌদ্ধ স্তুপগুলো ধ্বংস করে ফেলা হল কাদের ইঙ্গিতে?' প্রশ্নের পর প্রশ্ন লামার।
'বাংলাভাষায় ধ্বংসস্তূপ শব্দটা কি আর এমনি-এমনি এল!' হেসে বলেন কবীর।
'এক্সেলেন্ট খানসাহেব! ধ্বংসস্তূপ! সত্যিই আগে কখনও ভাবিনি বৌদ্ধ স্তূপগুলো ধ্বংস থেকেই এই শব্দ বাংলাভাষায় এসেছে!' সামান্য বিরতি নিয়ে টাইগার লামা অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন, 'এসএস বজ্রযান বৌদ্ধধর্মকে ভয় পায়। নীলকণ্ঠবাবুরা আমাদের সাহায্য করবেন ততটুকুই, যতটুকুতে ওঁদের লাভ! ওঁরা জানেন বজ্রযানের ক্ষমতা আছে ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করার। বিশেষত বাংলা।'
'ওইসব কথা থাক লামা! খানও আমাদের সম্পর্কে সবটা জানে না, আপনিও নন, তাই এখনকার কাজের কথা বলাই ভালো!' নীলকণ্ঠ বলে।
'আপনি নিশ্চয়ই জানেন খানসাহেব, একসময় বাংলার সঙ্গে তিব্বতের গভীর সম্পর্ক ছিল!' নীলকণ্ঠের কথায় গুরুত্ব না-দিয়ে কবীরের দিকে তাকিয়ে বলেন লামা।
'তিব্বতি ও চিনাদের সঙ্গে বাঙালিদের বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল! এর ফলে আমাদের জাতবিচারে গণ্ডগোল ঘটে গিয়েছিল!' কবীর বলেন।
'ঠিক তাই খানসাহেব! শৈব বিবাহের ফলে বাঙালির সঙ্গে ইস্টার্ন এশিয়ার সব প্রধান জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক! বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাংলায় জাতবিচার কিছুটা উবে গিয়েছিল। জাতিভেদ আমি ঘৃণা করি!'

নিশ্চুপ নীলকণ্ঠ। কবীরও আর কিছু বলেন না। কিন্তু থামেন না বৃদ্ধ লামা।

‘আমি মনে করি, বাঙালি হিন্দুও নয়, বাঙালি মুসলমানও নয়!’
‘তাহলে বাঙালি কী!’

লামার কথার প্রত্যুত্তরে বিস্মিত-প্রশ্ন ছুঁড়েই অট্টহাসি নীলকণ্ঠ’র। কবীর যুযুধান দুই পক্ষের দিকে তাকান পালা করে।

‘বাঙালি হাফ বৌদ্ধ, হাফ তান্ত্রিক। হ্যাঁ, এখনও! এই সত্তা ফল্গুর মতো বয়ে চলেছে, ভেতরে ভেতরে! ঘোষ, বসু, মিত্র, ভদ্র, পাল, পালিত, রক্ষিত এগুলো বৌদ্ধদের নামের শেষভাগ। অন্নদাশঙ্কর পড়েননি? পালযুগের পরে বাংলায় এল সেন ও বর্মন বংশ। বহিরাগত ব্রাহ্মণদের কোপ থেকে বাঁচতে তখন তাঁরা বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে দেন। ছেড়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করেন। আসলে বাধ্য হন গ্রহণ করতে! পরে তাঁদের নামের এই শেষভাগই বংশের পদবী হয়ে যায়। এই পদবীধারীরা ভুলে গেছেন এঁদের পূর্বপুরুষ বৌদ্ধ ছিলেন। বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি!’

ক্রোধ লুকিয়ে লামা ক্রমশ শান্ত। স্থিতধী। শানিত যুক্তির সঙ্গে মিশে যায় প্রজ্ঞা। চুপ করে যায় নীলকণ্ঠও। লামা আবার বলেন,

‘বাংলাকে এসএসের খুব ভয়। এককালে তান্ত্রিক ধর্ম বাংলার রাজধর্ম ছিল। তন্ত্রপুস্তকে বাংলার দুহাজার বছরের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ, বাংলার ছত্রিশ জাতিকে একসুতোয় গাঁথতে পেরেছিল একমাত্র তন্ত্র! এসএস-এর লক্ষ্য হল তান্ত্রিক বাঙালিকে বৈদিক বাঙালি করা!’
‘এইসব তন্ত্র-মন্ত্রের বুজরুকি আর সেক্সের চাট মিশিয়েই আপনারা আপনাদের ধর্ম তৈরি করেছেন—ওটাকেই ভাইব্রান্ট বলছেন!’ ব্যঙ্গের হাসি নীলকণ্ঠের।
‘তন্ত্রকেই আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। নাহলে বাঙালি জাতি হিসেবে টিকবে না। তন্ত্রই বাঙালির মেরুদণ্ড। ধর্মের চাকা ঘুরিয়ে যাওয়ার রীতি আজও আছে আমাদের বজ্রযানী তিব্বতি লামাদের মধ্যে। চাকা ঘুরিয়ে আমরা বলি ওম মণিপদ্মে হুম। এই চাকা যেন না-

থামে। চক্র যেন ঘুরতেই থাকে। চক্র ঘুরতে ঘুরতে তৈরি হয় একটা চড়কগাছ। তাতে বাঁশ বাঁধা, ঘুরছে—ঘুরছে—যেন ধর্মের চাকা ঘুরে চলেছে। চক্র থেকে চক্কর থেকে চড়ক। মিলেমিশে যাচ্ছে বজ্রযানী বৌদ্ধ আর শৈব ধর্ম!' লামার কণ্ঠে আবেগ।

'বাহ!' অজান্তেই বাহবা বেরোয় কবীরের মুখ দিয়ে।

'বাঙালির বার মাসে তের পার্বণ মূলত স্ত্রীআচার যার সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের কোন সম্পর্কই নেই।'

'আমিও তো বাঙালি, নাকি স্বীকার করেন না!' শ্লেষ নীলকণ্ঠর'র কণ্ঠে।

'আপনি একজন সত্যসেনা! বাঙালি সত্তা বর্জন করেছেন! আপনার কাছে প্রথমে রাষ্ট্র, তারপর দল, সবশেষে ব্যক্তিসত্তা!' তীক্ষ্ণ উচ্চারণ লামার।

'অবশ্যই! আমি একজন গর্বিত সত্যসেনা! কোনও খাদ নেই! আপনারা তো ভেজাল বুদ্ধিস্ট! আসল বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে আপনাদের বৌদ্ধধর্মের কোনও মিল নেই! চারিদিকে এত মূর্তি, পুতুল, বুদ্ধ কখনও মূর্তিপূজার কথা, পুতুলপূজার কথা বলেছেন!' চূড়ান্ত আক্রমণে নীলকণ্ঠ।

'শাক্যমুনির মূর্তির কথা বলছেন? বুদ্ধের মূর্তি তো এক মহামানবের প্রতিমূর্তি। তিনি তো ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি যে ছিলেন মূর্তি তার প্রমাণ। এটা পৌত্তলিকতা নয়।' প্রত্যুত্তর লামার।

'ঈশ্বরের নামে যারা পুতুল পূজা করে তাদেরই বলে পৌত্তলিক। শাক্যমুনির মূর্তির বাইরেও আপনাদের অজস্র মূর্তি!' পাল্টা আক্রমণ নীলকণ্ঠ'র।

'ঈশ্বরের প্রতিরূপ সাজিয়ে পুতুলকে পূজা করলেই তাকে পৌত্তলিকতা বলে, কিন্তু আমরা যে-দেবদেবীর মূর্তি পূজা করি তা ঈশ্বরের প্রতিরূপ মোটেই নয়। আমাদের দেব-দেবীর মূর্তি প্রতীক, অবলম্বন, ধ্যানের সহায়ক মাত্র। আমরা মণ্ডল তৈরি করে পূজা করি! এমনকী হিন্দু বাঙালিও কোনও মূর্তিকে পূজা করে না! আপনাদের পুজা পদ্ধতি খেয়াল করে দেখবেন, দুর্গা বা কালি কোনও পূজাই মূর্তিকে করা হয় না, ঘট বসিয়ে বা যন্ত্র এঁকে, ঘট আর যন্ত্রকে পূজা করা হয়! বৈদিক পদ্ধতি নয়, বাঙালি হিন্দুর পূজা হয় তান্ত্রিক পদ্ধতিতে। নিজের ধর্ম ও আচার সম্পর্কেও আপনার ধারণা সঠিক নয়!'

প্রত্যুত্তরে যায় না নীলকণ্ঠ। সেই অবসরে সদ্য-জাগ্রত এক জিজ্ঞাসার উত্তর চান কবীর।

‘একটা তথ্য জানার ছিল লামা?’
‘আগে আর একটা তথ্য নীলকণ্ঠকে জানাই, তারপর আপনার প্রশ্ন শুনছি—’ লামার জবাব।

উন্মুখ নীলকণ্ঠ। আর কি তথ্য দিতে চান লামা?

‘কেবল এসএস নয়, আরও অনেকেই আমাদের সাহায্য করছেন!’

আর কারা আছে লামার পেছনে? সেনাপ্রমুখদের কথাই কি সত্য? সকলকে অগ্রাহ্য করে সে একা চলে এসেছে এই নির্জন পাহাড়ে। একটাই উদ্দেশ্য—উচিত শিক্ষা দিতে হবে চিনকে! কিন্তু লামা এইসব কী বলছেন? লামার কথায় দৃশ্যত বিমূঢ় নীলকণ্ঠ। নিরুত্তর।

‘বলুন খানসাহেব, আপনি কী জানতে চান!’ লামা ফেরেন কবীরের দিকে।
‘আপনার পূর্বপুরুষের সঙ্গে বাংলার কি কোনও যোগ আছে? কোনও বৈবাহিক সম্পর্ক?’

কবীরের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে কিছুই বলেন না লামা। মৃদু হাসেন কেবল। তারপর প্রসঙ্গান্তরে যান,

‘চলুন খানসাহেব, আপনার আরেক শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে দেখা করাই!’ তারপর গলা ঈষৎ উঁচিয়ে ডাকেন, ‘পাসাং!’

ঘরে ঢোকেন পাসাং লামা।

‘আপনারা আসুন, আমি আগে গিয়ে মোলাকাত সেরে রাখি! কেবল খান-এর কেন, উনি আমারও পূর্বপরিচিত! শুভাকাঙ্ক্ষীও বটে!’ হাসতে হাসতে উঠে পড়ে নীলকণ্ঠ। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অবাক চোখে চেয়ে থাকেন কবীর। কী বলতে চান এঁরা? কে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী?

১১৫

২২ অক্টোবর। কালিম্পং।

'নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ মুখার্জি!'

রজতের কথায় হতভম্ব ডিকে। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এই মামলায় অনুপ্রবেশ করবে কীভাবে, প্রাথমিকভাবে ভাবনার থই পায় না সে!

'হ্যাঁ! এসএস!' আবার বলে রজত।
'কী বলছিস! ওরা এখানে কেন?'

ব্যাখ্যা করে রজত, কীভাবে চিনের বিরুদ্ধে টাইগার লামাকে কাজে লাগাচ্ছে এসএস। সর্বশক্তি দিয়ে তারা পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে, একদা সক্রিয় অধুনা লুপ্ত, তিব্বতি বিপ্লবী সংগঠন চুসি গাংদ্রুক!

চিনের ফন্দি-ফিকির ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুব পরিষ্কার! লাদাখ সীমান্তের এলএসি বা লাইন অফ অ্যাকচ্যুয়াল কন্ট্রোল অঞ্চল থেকে একবার ভারতীয় সেনা যদি সরে যায়, তারা তাদের প্রস্তাবিত তিব্বত আর পাকিস্তানের গিলগিট-বালুচিস্তান সংযোগকারী রাস্তা বানাতে পারবে। এই রাস্তা হলে সিয়াচেন হিমবাহ এলাকায় ভারত পজিশনাল অ্যাডভান্টেজ পাবে না, উল্টে অনেক দুর্বল হয়ে যাবে। পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর-এর এন্ট্রি পয়েন্ট রক্ষা করার জন্য চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি যতদূর যেতে হয় যাবে। এই ইকোনমিক

করিডোরের বেস হিসেবে ইতোমধ্যেই তারা ভারত মহাসাগরে দখল করেছে পাকিস্তানের গদর বন্দর।

কেবল লাদাখ সীমান্ত নয়, সিকিম, নেপাল, ভূটান, অরুণাচল প্রদেশ—সব সীমান্তেই চিন খুলে ফেলেছে ফ্রন্ট। সর্বত্র সক্রিয়। এই কাজে তাদের সেরা অস্ত্র ও ভরসা এক দুরন্ত বাহিনী—গণমুক্তি ফৌজ। পিপলস লিবারেশন আর্মি। এত বৃহৎ, শক্তিশালী ও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী আর কোনও দেশের নেই। ফলত টক্কর দিতে হলে, মুখোমুখি এই বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি এসএস-এর অন্য বিকল্প দরকার। এইমুহূর্তে এই বিকল্পই টাইগার লামা ও চুসি গাংদ্রুক।

‘নীলকণ্ঠ এই মুহূর্তে টাইগারের সঙ্গে আছে।’ জানায় রজত।
‘কোথায় ওরা?’
‘পাহাড়েই আছে—কিন্তু ঠিক কোথায় আছে নির্দিষ্ট রিপোর্ট নেই। টাইগার খুব দ্রুত আস্তানা বদলায়! এক জায়গায় দু’দিনের বেশি ওকে পাওয়াই যায় না!’
‘অর্হৎ, কবীরদা আর নিবেদিতা কি এক জায়গায় আছে?’ উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা ডিকের।
‘জানি না! ওদের ব্যাপারে কোনও রিপোর্ট নেই!’
‘নীলকণ্ঠের মতো বিপজ্জনক মানুষ কম আছে রজত!’ উৎকণ্ঠা ডিকের।
‘এর সঙ্গে টাইগার লামা জুড়ে গেলে, কী জুটি তৈরি হবে ভেবে দেখ! এজেন্সি ডিটেইল করেনি, তবে ওদের হাঞ্চ, কোনও ভয়ঙ্কর প্ল্যান ওরা কষেছে!’
‘প্ল্যান!’
‘হুঁ!’
‘এনি গেজ?’
‘না, কিচ্ছু না! ঠিক আছে ডিকে, এখন রাখছি, যা হবে জানাবি!’

রজতের ফোন ছেড়ে বিছানায় বসে ডিকে। স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে মুণ্ডিতমস্তক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নির্দয় মুখ। বেদরদি চোখ। কবীর খান ও নিবেদিতাকে অপহরণের ছক কি নীলকণ্ঠের? পুরনো শত্রুতার জেরে সে কি প্রতিশোধ নিতে চায়? ক্রমশ পরিষ্কার ও দৃঢ়

হচ্ছে এই সত্য, কামসূত্র উপন্যাস আসলে একটা ফাঁদ! কালিম্পং-এর গুম্ফায় হাজার বছর আগের পুরনো পুঁথি মিলতে পারে, তার একটা ইতিহাস আছে, বাংলা-তিব্বত প্রাচীন যোগসূত্র ইত্যাদি, কিন্তু আধুনিক বাংলা উপন্যাস পাওয়া যাচ্ছে গুম্ফায়, এখানেই তৈরি হচ্ছে সংশয়। হাজার প্রশ্ন হাজির ডিকের মাথায়। কবীর খানও যে একেবারেই বুঝতে পারেননি এমন নয়, সন্দেহ ওঁরও ছিল, কিন্তু নিজের কাজের সঙ্গে উপন্যাসের মিল দেখে আপ্লুত হয়ে যান। নতুন শব্দসূত্রের প্রগাঢ় ইঙ্গিত ছাপিয়ে যায় সাদামাঠা সন্দেহ। আবেগে বেরিয়ে পড়েন কাজকামের নতুন সূত্রের সন্ধানে।

রিঞ্চেন লামার সঙ্গে মোলাকাত সেরে, লাভা থেকে দুপুরে ফিরে ডিকে ঢুকে গিয়েছিল হোটেলেই। রিয়াজও ডিকের সঙ্গে ঢোকে হোটেল চেরি অর্চার্ডে। দুপুরের খাওয়া একসাথে হোটেলে সেরে রিয়াজ চলে যায় তার গেস্ট হাউজ। ডিকে গড়িয়ে নেয় বিছানায়। সাড়ে চারটে নাগাদ তন্দ্রা ফেড়ে ফোন ঢোকে রজতের। দিল্লি এয়ারপোর্টে কলকাতার বিমানের অপেক্ষায় সে। অপ্রত্যাশিত তথ্য হাজির করে যেন বিস্ফোরণ ঘটায় রজত। বন্ধুর সঙ্গে কথা শেষ করে আবার অপেক্ষা। বস্তুত রিঞ্চেন লামার প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কানে বাজে রিঞ্চেন লামার কথা। টাইগার মনে করেন একজন বোধিসত্ত্ব পেশাদার বিপ্লবী। পেশাদার বিপ্লবীর যেমন দেশ-কাল নেই, একজন বোধিসত্ত্বেরও নেই! শিশু অর্হৎকে নিয়ে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেছেন এই লামা। কেবল অর্হৎ নয়, অসংখ্য শিশুকে অপহরণ করে, নিজের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে বানাতে চান ভবিষ্যতের বুদ্ধ-যোদ্ধা! ভিডিও-তে দেখা অর্হতের মা, অঞ্জনা বড়ুয়ার ক্রন্দনরত মুখটা মনে পড়ে।

কখন কোন সংবাদ আসবে রিঞ্চেন লামা মারফৎ, প্রতীক্ষাজনিত সেই উৎকণ্ঠা আছেই, সঙ্গে জুড়ে গেল নয়া উদ্বেগ। নীলকণ্ঠের অনুপ্রবেশ ওলটপালট করে দেয় হিসেব। রজতের খবর অনুযায়ী ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা যৌথভাবে করেছে! সেই পরিকল্পনার অংশ কি অপহৃত তিনজন? টাইগার লামার সঙ্গে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি, অপ্রত্যাশিত এই যোগসূত্রের খবরে হতভম্ব ডিকে।

কোন মহা-মতলব টাইগার-নীলকণ্ঠ জুটি ফেঁদেছে, এই খবর জানতে না-পারলে তিনজন অপহৃত মানুষের খোঁজ পাওয়া কার্যত অসম্ভব। এই খবর নিশ্চয়ই রাখেন রিঞ্চেন লামা!

ঘড়ি দেখে ডিকে। লামা চেয়েছেন চব্বিশ ঘণ্টা সময়। কাল সকালের আগে কোনও সংবাদ কি আসবে?

১১৬

২২ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

দরজায় একটা চিতা। চমকায় নিবেদিতা। থমকে যায়। কিন্তু সেই শ্বাপদ প্রাণহীন। স্টাফড। বুঝতে পেরে এগোয়। ঘরে ঢুকে কিছুই দেখতে পায় না। অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর ঠাহর হয়। না, নিকষ অন্ধকার নয়, সামান্য আলো আছে। আলো থেকে অন্ধকারে ঢুকে ধাঁধিয়ে গিয়েছে চোখ। একটা ছোট্ট প্রদীপ জ্বলছে। সেই দরিদ্র ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত আলো অপর্যাপ্ত, ঘরে তাই ঠাসাঠাসি আলো-আঁধার। পাসাং লামা হাত দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান নিবেদিতাকে। চারিদিকে দেবদেবীদের মূর্তি। রাগী-রাগী তাঁদের চেহারা। অদ্ভুত মুখব্যাদান। প্রদীপের ঢিমে আলোয় তারা ক্রমশ বীভৎস। ডান হাতের ইঙ্গিতে এগোতে বলেন পাসাং লামা। চোখ সইয়ে এগোয় নিবেদিতা।

দু'একটা মূর্তির মুখে কাপড়। রঙিন। দেওয়ালেও ঝোলান রঙচঙে কাপড়। সম্ভবত ওগুলো থাংকা, কাপড় দিয়ে ঢাকা।

বড় বড় থামের গায়ে ঝুলছে মুখোশ। মুখোশের মুখেও ঘরের দেবদেবীদের ক্রুদ্ধ মুখের আদল। পাসাং লামার পিছু পিছু এগোয় নিবেদিতা। বেলা কত হয়েছে আন্দাজ করতে পারে না। ব্যাগ নিয়ে নিয়েছে এরা। ফোনও। গাড়িতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা

মিষ্টি গন্ধ আচ্ছন্ন করে দেয় চেতনা। কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙে দেখে একটা বিছানায় শুয়ে আছে সে। সামনে এক সন্ন্যাসিনী বসে আছেন চেয়ারে যেন পাহারায়। পরনে রক্তবর্ণ বসন। নিবেদিতা চোখ মেলতেই তিনি দ্রুত ডেকে আনেন এক সন্ন্যাসীকে। মুণ্ডিতমস্তক, লাল ত্রিচীবর আবৃত লামা নির্লিপ্ত জরিপ করেন তারপর ইঙ্গিত করেন সন্ন্যাসিনীকে। ঘর থেকে বেরিয়ে যান সন্ন্যাসিনী। ধাতস্থ হয়ে সন্ন্যাসীর দিকে স্থির চোখে তাকায় নিবেদিতা। দৃষ্টি কঠোর।

‘কী ব্যাপার, মিথ্যে কথা বলে আমায় এখানে নিয়ে আসার কারণ কী?’
‘নমস্কার, আমি পাসাং লামা।’ লামা বলেন।
‘কবীর খান কোথায়?’
‘সময় হলেই জানতে পারবেন!’ নিঃস্পৃহ উত্তর লামার।

ফিরে আসেন সন্ন্যাসিনী। হাতের পাত্রে গরম নুডলস। চা। ধোঁয়া-ওঠা নুডলস দেখেই পেটের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে খিদেয়। কোনও কথা না-বলে শান্ত করে পেট। ঝড়ের বেগে নুডলসের শেষ সুতোটা মুখে পুরে চুমুক মারে চায়ের কাপে। তারপর চোখ তুলে লামার দিকে তাকিয়ে বলে,

‘কবীর খান কোথায়? আমায় নিয়ে চলুন তাঁর কাছে!’

হাতের ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলেন লামা। পিছু পিছু এগোয় নিবেদিতা। ঘরের এক কোণে ডাঁই করা বন্দুকসহ নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। তাদের দেহে প্রাচীনতার প্রলেপ। যেন এইসব যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে একদা কোনও যুদ্ধ হয়েছিল, পরে অর্পিত হয়েছে গুম্ফায়।

প্রায়ান্ধকার ঘর পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত একটি ছোটো ঘরে প্রবেশ করেন লামা। পেছনে নিবেদিতা। এই ঘরে বিদ্যুতের আলো। বাহারি কাপড়ের ল্যাম্প-শেড পেরিয়ে ঢিমে হলুদ আলোর আয়োজন। ইঙ্গিতে কাঠের সোফায় বসতে বলেন পাসাং লামা। বসে নিবেদিতা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যান লামা। একা ঘরে বসে নিবেদিতা তাকায় চারিদিকে। নজরদারী আছে কিনা পরখ করে। আপাতচোখে পায় না কোনও সিসি ক্যামেরার হদিশ।

লম্বা এক শ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে। সোফার কাঠের হাতলে নিজের ডান হাতের করতল। অনামিকার আংটির দিকে চোখ যায়। ঝিলিক দেয় ছোট্ট হিরে। এরা ব্যাগ আর ফোন নিয়ে নিলেও আংটি খুলে নেয়নি। তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে। এই ঘরেই কি আসবেন খানদা?

১১৭

খানদাকে নিয়ে এত রহস্য তৈরি করার অর্থ অনুধাবন করতে পারে না। ওঁর লেখাতেই কি আছে এই রহস্যময়তার ইঙ্গিত? কী লিখেছেন খানদা? রামায়ণ-মহাভারত থেকে যেভাবে ভারতবর্ষের জাতপাতের ইতিহাস ও চক্রান্ত আবিষ্কার করেছিলেন, তেমন চমকপ্রদ ইতিহাস কি তিনি আবার খুঁড়ে বার করেছেন প্রাচীন কোনও টেক্সট থেকে? কোন টেক্সট? কামসূত্র? কিন্তু সেই ব্যাখ্যা, তিব্বতি লামার কোন পাকা ধানে মই দিল? অনতিদীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলে, মাথা নীচু করে, কবীর খানের জন্য অপেক্ষায় থাকে নিবেদিতা।

দরজার কাছে একটি ছায়ার উদয়। পায়ের শব্দ। সম্ভবত কেউ আসছেন? চোখ তোলে নিবেদিতা। দরজার মুখে দেহলিতে এসে দাঁড়িয়ে কে ইনি? সবুজ পাঞ্জাবি আর সাদা ঢোলা পায়জামা। মুণ্ডিতমস্তক। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে নিবেদিতা! এ কী, এই লোকটি এখানে কেন?

‘বসুন, বসুন নিবেদিতাদেবী, ব্যস্ত হবেন না!’ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে আগন্তুক।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে নিবেদিতা। উল্টোদিকের সোফায় আয়েশে বসে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। তীক্ষ্ণ চোখ। মুখে সেই ক্রুর হাসি।

'আপনি! এখানেও আপনি নাটের গুরু!' দ্রুত সম্বিতে ফিরে আক্রমণে নিবেদিতা।

ঘর কাঁপিয়ে হাসে নীলকণ্ঠ। বসে পড়ে নিবেদিতা। মুখে আক্রমণ ফিরিয়ে দিলেও, টের পায় পেটের ভেতর গুড়গুড়ানি। বুক ধড়ফড়। ভয়ঙ্কর এসএস-এর ততোধিক ভয়ঙ্কর নেতা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এই গুম্ফায় কেন, কুলকিনারা পায় না ভেবে। বিলুস্যার ও খানদার সহপাঠী এই নীলকণ্ঠ! বিলুস্যারকে খুন করেছে এই নীলকণ্ঠ! খানদা ও তাকে খুন করতে চেয়েছিল এই নীলকণ্ঠ! ফরফরিয়ে পুরনো স্মৃতি ভেসে ওঠে মগজের পর্দায়। মনে পড়ে, মুর্শিদাবাদের খোশবাগে, গভীর রাতে সিরাজের সমাধিতে ঘটে-যাওয়া ভয়ানক দৃশ্য!

'না, এবার সেইরকম কোনও অভিপ্রায় নেই! যা-দরকার টাইগার লামার সঙ্গেই!'
'কবীর খান কোথায়?'
'খানের কথা খান জানে। আমি আজই এসেছি এখানে—'
'খানদা কেন কিডন্যাপড? আপনি কেন এখানে? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না!' একটু চেঁচিয়েই ফেলে নিবেদিতা।

মুখে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত করে নীলকণ্ঠ। হাসে।

'এটা মনাস্ট্রি, এত জোরে কথা বলবেন না ম্যাডাম! আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'

উঠে এসে নিবেদিতার পাশে এসে বসে নীলকণ্ঠ। শিহরিত হয় নিবেদিতা। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। শারীরিক নিগ্রহ বা হঠাৎ-আক্রমণ করলে কীভাবে মোকাবিলা করবে ভেবে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়। ঘিরে ধরে টেনশন। তার প্রভাব পড়ে চোখেমুখেও।

হাসে নীলকণ্ঠ। নিরাপদ দূরত্বে সোফার অপরপ্রান্তে বসে। জড়সড় নিবেদিতা মনে মনে প্রস্তুতি নেয় আত্মরক্ষার।

'ডোন্ট ওয়রি ম্যাডাম! আপনার বা খানের সঙ্গে আমার এই মুহূর্তে কোনও শত্রুতা নেই। প্লিজ রিল্যাক্স! বরং এখান থেকে আপনাদের রেস্কিউ করার জন্য আমি সাহায্যও করতে পারি! যতই হোক খান আমার প্রাক্তন সহপাঠী!' তারপর গলা আরও নামিয়ে বলেন, 'টাইগারকে চিনের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবহার করব। ওর প্রতিটা স্টেপ যাতে আমাদের ফেভারে যায় দেখা হবে। কিন্তু হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার। কারণ টাইগার একটা উন্মাদ!'

তারপর ভারত-তিব্বত রাজনীতি, চিন-ভারত যুদ্ধ, চিনের দাদাগিরি, নেহরুর ব্যর্থতা, পাকিস্তান ইত্যাদি নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা। বিরক্তিকর লাগলেও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে নিবেদিতা। তারপর আর পারে না।
'দিজ আর নান অফ মাই বিজনেজ মিস্টার মুখার্জি! খানদা কোথায়?'

নিবেদিতার প্রশ্নে কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় নীলকণ্ঠ। তারপর আবার ঘর কাঁপিয়ে হাসি। নিজেকে ততক্ষণে ফিরে পেয়েছে নিবেদিতা। ঠোঁটের ওপর ডানহাতের তর্জনী তুলে নীচুস্বরে বলে,

'এটা মনাস্ট্রি, এত জোরে হাসবেন না মিস্টার মুখার্জি!'

নিবেদিতার বলার ভঙ্গিমায় আরও হাসে নীলকণ্ঠ, তবে এবার শব্দের প্রাবল্য কিঞ্চিৎ প্রশমিত। গোটা শরীর কাঁপতে থাকে তার। কিছু মানুষ আছে, হেসেও মুখের ক্রুরতা লুকোতে পারে না, নীলকণ্ঠ সেই গোত্রের।

২২ অক্টোবর। লাসা রেস্তোরাঁ। কালিম্পং।

‘কামসূত্র উপন্যাসের গল্পটা বলবেন বলেছিলেন দাদা, বলুন না, শুনি!’

রিঞ্চেন লামার খবরের অপেক্ষায়, হোটেলের ঘরে নিজেকে বন্দি না-রেখে, রেস্তোরাঁয় যায় ডিকে। চলে আসে রিয়াজও। বস্তুত রিয়াজের ডাকেই যায় লাসা রেস্তোরাঁয়। বহুবার শোনা এই রেস্তোরায় যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া অনুচিত, রিয়াজ প্রস্তাব দিতেই সহর্ষ আগ্রহ দেখায় ডিকে।

টেবিলে চা দিয়ে গেছে রাবতেন। তিব্বতি মাখন-চা খেতে খেতে দু’জনে মেতে ওঠে খোশগল্পে। জনৈক এসবি লিখিত কামসূত্র উপন্যাসের কথা ডিকের মুখে শুনেছে রিয়াজ, এই অবসরে বহুশ্রুত উপন্যাসের কাহিনি শুনতে আগ্রহী হয় সে। ডিকে শুরু করে দীপন ও বৃন্দার সেই কাহিনি। বঙ্গদেশ থেকে চম্পার বিক্রমশীল মহাবিহার হয়ে নেপাল-ভোট সীমান্ত, তারপর উজ্জয়িনী—কাহিনি এগিয়ে চলে ডিকের উচ্চারণে, বৈঠকি গল্পের মেজাজে। নিশ্চুপ শ্রোতা রিয়াজ।

দিপন বিন্দা মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।।
মেছিত বিকপ্প কোই সরিরহি লুক্কো।
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো।।

অতীশ দীপঙ্কর কৃত বাৎস্যায়নের কামসুত্র-এর টীকা সাংকেতিক ভাষায় লিখে দিয়েছে বৃন্দা। পরনের ভুনীধুতির নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে সেই লেখা আবিষ্কার করে দীপন। সেই আবিষ্কারের সূত্রও পোষা বাজপাখির মারফৎ পাঠায় বৃন্দা। সেই সূত্র সিদ্ধযোগীদের সন্ধ্যাভাষায় লেখা। উজ্জয়িনী থেকে বিদায়পর্বে বৃন্দা দেয় একটি ক্ষুদ্র মূর্তি। শাক্যমুনির মূর্তি। সঙ্গে সাবধানবাণীও, মূর্তিটা যেন নিজ হেফাজতে না-রাখে, কোনও সঙ্ঘারামে অর্পণ

করলেই মঙ্গল। ক্রমশ রহস্যময় সেই নারীর থেকে দূরে যেতে যেতে তার প্রেমে অধীর হয়ে ওঠে দীপন।

একাধিক বার পড়েছে সে-উপন্যাস। স্মৃতি থেকেই গড়গড়িয়ে কাহিনি-সংক্ষেপ বলে যায় ডিকে।

‘আসল পুঁথি হারিয়ে মনখারাপ হলেও, বৃন্দার সন্ধ্যাভাষা ক্র্যাক করতে পারে দীপন, ভুনীধুতিতে অতীশের টীকা আবিষ্কার করে বেশ উৎফুল্ল হয়। তখনকার বর্ণনা আমার স্পষ্ট মনে আছে—দীপনকে লইয়া অগ্রসর হইল রৌদ্র। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল নগর উজ্জয়িনী। শর্ব্বিলকের মিত্রতা। বসন্তসেনার আভিজাত্য। আর চমকপ্রদ এক নারী, বৃন্দা। কটিবন্ধে হাতের স্পর্শে অনুভব করিল শাক্যমুনির মূর্তি। অতঃপর স্ফুর্তির সহিত তীব্র বেগে ছুটাইল অশ্ব। কিন্তু দীপন কল্পনাও করিতে পারিল না, সংকেতলিপি ও মূর্তির সূত্রে, সম্মুখে কী ভয়ঙ্কর বিপদ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে!’
‘কী বিপদ?’ কাহিনির শেষপর্ব শুনতে উৎসুক রিয়াজ।
‘বাড়ি ফিরে পরদিন সকালে ধর্মপুর সঙ্ঘারামে যায় দীপন। ম্লেচ্ছিকা বিকল্পের পণ্ডিত চাই। ধর্মপুরে তেমন পণ্ডিত কেউ নেই, গুরুদেব তাকে পরামর্শ দিলেন সংকেত লিপি নিয়েই সোজা বিক্রমশীল যেতে, মহাবিহারের পণ্ডিতরাই এই গূঢ়লেখ উদ্ধার করতে পারবেন। পরদিন ভোরে ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা হল দীপন চম্পার উদ্দেশে—বিক্রমশীল মহাবিহার! তারপরেই এল আসল বিপদ!’

হাঁ করে ডিকের দিকে তাকিয়ে থাকে রিয়াজ। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের কাহিনী শুরু করে ডিকে।

গল্পের মাঝেই ঢোকে রজতের বার্তা। গল্প থামিয়ে ফোনের পর্দায় চোখ বোলায়। তারপর মৃদু হেসে ফোন এগিয়ে দেয় রিয়াজের দিকে। দ্রুত সেই বার্তা পড়ে হাসে রিয়াজও। ফোন ফিরিয়ে দেয় ডিকেকে।

অধ্যাপক সরসিজ বিশ্বাসের পর এবার আন্তর্জাতিক থিয়োলজিক্যাল জাদুঘরের দুই কর্তা অবশেষে পুলিশের জালে। মিথ্যা বলে তদন্ত ভুলপথে চালিত করার জন্য মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ও প্রধান কিউরেটর তনুময় পালকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে লালবাজার। স্বয়ং দলাই লামা যে মূর্তিটি মিউজিয়ামকে উপহার দিয়েছিলেন বলে প্রচার করে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ, পদ্মসম্ভবের সেই মূর্তি পাওয়া গেছে স্টোরে।

শাক্যমুনির মূর্তিটি সম্ভবত বেআইনী অ্যান্টিক বাজার থেকে সংগৃহীত। মোটা টাকার বিনিময়ে হাতবদল হয়ে এসেছে জাদুঘরে। এরপর জাদুঘর থেকে হাতবদলের পালা ছিল পদ্মসম্ভরের মূর্তিটি। শাক্যমুনির মূর্তি চুরি যেতেই দ্রুত 'পদ্মসম্ভবের মূর্তি চুরি'র নাটক তৈরি করেন ডিরেক্টর ও প্রধান কিউরেটর তনুময় পাল। তাঁরা এই চোরাচালানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। সন্দেহ ছিলই, জাদুঘরে তাই বাহিনীর তল্লাশী জারি রেখেছিল রজত। লাভা থেকে ইন্সপেক্টর রিয়াজ আলম মূর্তিচুরি-বিভ্রান্তির তথ্য যোগাতেই এই সন্দেহ ঘনীভূত হয় লালবাজারের মস্তিষ্কে। স্টোরেই পাওয়া যায় পদ্মসম্ভবের 'অপহৃত' মূর্তি। তারপরেই আজ কলকাতা পুলিশের এই সক্রিয়তা।

'স্যারের গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল!'
'চিফ কিউরেটর তনুময় পাল এত ধড়িবাজ, এত অসৎ বোঝাই যায় না! বিচিত্র চরিত্র মানুষের!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিকে।

১১৯

২২ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

ঘরে পাসাং লামার পুনরায় প্রবেশ। লামার পেছনের ছায়ামূর্তিকে দেখে চকিতে উঠে দাঁড়ায় নিবেদিতা। ঘরের চৌকাঠ ডিঙোন কবীর খান।

‘খানদা!’
‘নিবেদিতা! তুমি এখানে!’

নিবেদিতাকে দেখে বিস্মিত কবীর। হিমালয়ের এই গুম্ফা, তাঁর জন্য, আর কত বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছে! ঘর থেকে বেরিয়ে যান পাসাং। জিজ্ঞাসু কবীরের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে ঘটনাবলি বলে নিবেদিতা। অর্হৎ বড়ুয়া অপহরণ ও মূর্তিচুরির কথাও।

‘তবে কাউকেই বিশ্বাস করার কিছু নেই, ওরা আপনাকেও কিডন্যাপ করে এখানে এনেছে, আমাকেও!’
নিবেদিতার ইঙ্গিত বুঝে নীলকণ্ঠ বলে, ‘তোদের কথা আমি জানতাম না খান! আমাদের লেনাদেনা টাইগারের সঙ্গে। টাইগারের পাল্লায় তোরা পড়লি দেখে অবাক হচ্ছি! খুব সাবধান খান, হি ইজ ডেঞ্জারাস!’
‘আপনার থেকেও?’ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে নিবেদিতা।

ঘর কাঁপিয়ে আবার হাসে নীলকণ্ঠ। ঘরে প্রবেশ করেন টাইগার লামা।

‘এই তো, আসুন আসুন লামা!’ উঠে দাঁড়িয়ে লামাকে অভ্যর্থনা করে নীলকণ্ঠ।

লামার আনখশির জরিপ করে নিবেদিতা। ইনিই টাইগার লামা! অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়ে না লামার মধ্যে, আর পাঁচজন লামার মতোই। নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করেন লামা। প্রত্যুত্তরে হেলদোল দেখায় না নিবেদিতা।

‘নমস্কার ম্যাডাম, আপনি খুব লক্ষ্মীমন্ত—খানসাহেবের প্রিয়পাত্রী—এখানে কয়েকদিন কাটান—ভালো লাগবে।’
‘সরি, আমি এখানে বেড়াতে আসিনি—মিথ্যে কথা বলে নিয়ে এসেছে আপনার লোক! দ্রুত আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করুন!’ নিবেদিতার স্বর কঠোর।

‘ফিরবেন, অবশ্যই ফিরবেন! খানসাহেবের কাজ মিটে গেলেই ফিরবেন! ততদিন একটু কষ্ট করে থাকুন!’
‘যা-যা করছেন আপনি, ভারতের আইনে প্রত্যেকটিই ক্রাইম, জানেন নিশ্চয়ই!’ ঠান্ডা গলায় বলে নিবেদিতা।

স্তব্ধতা ঘরময়। কবীর খানের পাশে বসেন লামা। মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ লাল মেঝের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর মুখ তোলেন।

‘জানি ম্যাডাম।’ সামান্য থেমে আবার বলেন, ‘খোয়া যাওয়া ধর্মীয় সম্পদ উদ্ধার করা অপরাধ নয়। শাক্যমুনির ওই মূর্তি আমাদের জাতীয় সম্পদ। বরং ওটা চুরি করা ছিল মহা-অপরাধ।’
‘একটা সাত বছরের বাচ্চাকে কিডন্যাপ করলেন কেন?’
‘ভবিষ্যতের এক বোধিসত্ত্বকে বরণ করলাম, একে অপহরণ বলছেন কেন? আপনাকেও কোনও মিথ্যা বলা হয়নি, খানসাহেবের খোঁজ চেয়েছেন, খোঁজ পেয়েছেন! হ্যাঁ, বলতে পারেন খানসাহেবের সঙ্গে একটু ছলনা করেছি, অবশ্যই অপরাধ করেছি, ক্ষমা করবেন খানসাহেব।’ কবীর খানের দিকে হাতজোড় করে বলেন লামা। ‘যদিও জাতীয় স্বার্থেই করেছি!’
‘আপনাদের মূর্তি আপনারা ফিরিয়ে নিয়েছেন, ভালো কথা, কিন্তু খানদা’র কিডন্যাপিং জাতীয় স্বার্থ কেন?’
‘বাৎস্যায়নের আসল কামসূত্র ও জোবোজে অতীশের টীকাভাষ্য এখন খানসাহেবের মাথায় —’
‘তার সঙ্গে আপনাদের জাতীয় স্বার্থের কী সম্পর্ক?’
‘ওই টেক্সট আর টীকা আমাদের সম্পত্তি!’
‘বোঝো! কামসূত্র ভারতের সম্পত্তি, অতীশ দীপঙ্করও ভারতের সন্তান—’
‘অতীশ তিব্বতে গিয়ে কামসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন—বাৎস্যায়নের লেখা আসল কামসূত্র—আমাদের লোচাবরা ভারত থেকে অনুবাদ করে নিয়ে এসে সেই টেক্সট রক্ষা করেছেন—আপনারা তাকে রক্ষা করতে পারেননি—আসল কামসূত্র ভারত থেকে হারিয়ে গেছে!’

থামেন লামা। তারপর আবার অনুচ্চস্বরেই বলেন, 'আর অতীশের ওপর কোনও অধিকার ফলাবার যোগ্যতা আপনাদের নেই—অতীশকেও আপনারা হারিয়েছেন—তিনি ভারত ছেড়ে আমাদের দেশে গিয়েছিলেন—ফিরে আসেননি, সুযোগ থাকলেও ফিরে আসেননি! আমরা তাঁকে মহাগুরু হিসেবে আজও পূজা করি, আপনারা তাঁকে স্রেফ ভুলে গিয়েছেন!'

'লামা, অতীশ যেমন আমাদের, আপনাদেরও! অস্বীকার করার উপায় নেই! কিন্তু কামসূত্র নিয়ে আপনার ধারণা ভুল, কামসূত্র আমাদের!' কথার মাঝে প্রবেশ করে নীলকণ্ঠ।

'এখন যে-কামসূত্র পাওয়া যায়, তা অবশ্যই আপনাদের! আমি তার অধিকার চাই না! কিন্তু তিব্বতে প্রাপ্ত কামসূত্র আমাদের!'

'হ্যাঁ তাই হোক, ওই কামসূত্র আপনাদের! তার সঙ্গে কবীর খানের কামসূত্রের কী সম্পর্ক! খানদা নতুন করে যে-ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা খানদারই, অন্য কারো নয়!' আবার বলে নিবেদিতা।

'না, খানসাহেবের নয়, ওটা অতীশের টীকাভাষ্য!' লামা বলেন।

'আশ্চর্য! অতীশের টীকাভাষ্য—আরে ওই তথ্য তো কামসূত্র উপন্যাসে আছে! আর ওটা একটা ওয়র্ক অফ ফিকশন!' কিছুটা গলা চড়ে নিবেদিতার।

'আসল তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে তৈরি হয়েছে ওই ফিকশন! এখন আপনার সঙ্গে তর্ক করার সময় নেই, পরে বলব—' বলেন লামা।

তারপরেই হাত ঘুরিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করেন। ঘরে ঢোকেন পাসাং লামা। তাঁর পিছু পিছু যে ঢোকে, তাকে দেখে শিহরিত হয় নিবেদিতা। বরফচিতা কেতু। প্রাণহীন নয় এ শ্বাপদ!

'গেট রেডি নিবেদিতা ম্যাডাম!' টাইগার লামা বলেন।

'আমি কোথায় যাব! আমি খানদাকে নিতে এসেছি, আমাদের দু'জনের যাওয়ার ব্যবস্থা করুন!'

'আপনি পাসাং-এর সঙ্গে যান—কিছু রিচ্যুয়ালস আছে—'

'আমি কোথাও যাব না!' দাঁড়িয়ে পড়ে নিবেদিতা।

‘গর্‌র্‌র্’—একটা চাপা গর্জন করে এগিয়ে আসে কেতু। চোখে সামনে জলজ্যান্ত এক বরফচিতাকে দেখে আগেই ঈষৎ ঘাবড়ে গিয়েছিল, এখন এগিয়ে আসতে দেখে শিরদণ্ডে কাঁপন লেগে গেল নিবেদিতার। হাতদুয়েক দূরে এসে থামে কেতু।

‘ভয় পাবেন না নিবেদিতা, কেতু নরমাংস খায় না, মানে কখনও খায়নি আরকী! ওর জুড়ি ছিল রাহু, রাহু একবার গুম্ফার এক সন্ন্যাসীকে খেয়ে ফেলেছিল—’ লামা মৃদু হেসে বলেন।

লামার চোখের দিকে তাকিয়ে নিবেদিতা বুঝতে পারে, আর পাঁচজন লামার থেকে এই লামা কোথায় আলাদা! শান্ত চোখে মিশে আছে শ্বাপদ-দৃষ্টি। তীব্র আতঙ্কধারা বহমান নিবেদিতার শরীরে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কপালে।

‘পাসাং-এর সঙ্গে যান।’ লামা বলেন আবার।

পাসাং লামার হাতের ইঙ্গিতে আহ্বান, এগিয়ে যায় নিবেদিতা।

‘দাঁড়াও নিবেদিতা! ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লামা?’ প্রশ্ন কবীরের।
‘কিছু রিচ্যুয়ালস আছে—আপনি টেনশন নেবেন না খানসাহেব!’ টাইগার লামা হেসে বলেন কবীরকে, তারপর ডান হাতের ইশারায় যেতে বলেন পাসাং লামাকে।
নিবেদিতাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান পাসাং। বিপদের আশঙ্কায় বসে থাকেন অসহায় কবীর।

১২০

২২ অক্টোবর। লাসা রেস্তোরাঁ। কালিম্পং।

রিঞ্চেন লামার ডাকে ফোনের ঘন্টি বাজতে এখনও ঢের দেরি, তবুও উদ্বেল অপেক্ষা ডিকের, মাঝেমাঝেই তাই ফোনের পর্দায় চলে যায় চোখ। ঘড়ির কাঁটা প্রায় সন্ধে সাড়ে ছ'টার কাছাকাছি। কিন্তু রিঞ্চেন লামার অপেক্ষায় না-থেকে অপ্রত্যাশিত খবর নিয়ে হাজির রেস্তোরাঁ লাসা।

রিয়াজকে দেখে এগিয়ে আসে রাবতেন। হাতে দু'কাপ পো-চা। টেবিলে চায়ের কাপদুটো রাখতে রাখতে অনুচ্চ স্বরে বলে,

'পঁচিশ তারিখ বাটার ল্যাম্প ফেস্টিভাল আছে, থাকবে তো?'
'কী হয় ওই ফেস্টিভ্যালে?' হেসে জিজ্ঞাসা করে রিয়াজ।
'চারিদিকে আলোয় আলোয় ভরে যায়! এবার অনেক বেশি আলো হবে!'

হাসিমুখী বাচ্চা ওয়েটারকে দেখেই ডিকে বুঝতে পারে, এই ছেলেটিই রাবতেন। এই রাবতেনই টাইগার লামা'র খোঁজ দিয়েছিল রিয়াজকে।

'এবার বেশি আলো কেন হবে?' জানতে চায় ডিকে।

ডিকের দিকে তাকিয়ে হাসে রাবতেন। উত্তর দেয় না। রিয়াজকে খাবার পছন্দ করতে বলে চলে যায় অন্য টেবিলে। ডিকে হাতে তুলে নেয় স্মার্টফোন। ডানহাতের তর্জনী ছুঁয়ে খোঁজে নির্দিষ্ট কোনও ফাইল। পর্দায় চোখ রেখেই রিয়াজকে বলে,

'জোখাং মন্দির পুরনো লাসার সবথেকে দর্শনীয় জায়গা। বহু প্রাচীন মন্দির। রাজা গাম্পো বানিয়েছিলেন। কেবল প্রাচীন নয়, তিব্বতের সবচেয়ে পূজনীয় মন্দিরও এই জোখাং। চারতলা উঁচু। সোনায়-মোড়া ছাদ। দক্ষিণমুখী। চমৎকার স্থাপত্য। আমাদের যেমন এসপ্ল্যানেড, পুরনো লাসার মাঝখানে আছে ঠিক তেমনই বার্খোর স্কোয়ার, এই চত্বরেই জোখাং টেম্পল। নেট-এ চোংখাপা বাটার ল্যাম্প ফেস্টিভাল সার্চ মেরে একটা ভিডিও পেয়েছিলাম—অপূর্ব দৃশ্য!'

উদ্দিষ্ট ভিডিওটি খুঁজে পেয়ে রিয়াজের দিকে মেলে ধরে ফোন।

চোংখাপা আলোর উৎসবের দিন রাতে জোখাং মন্দিরের সামনে এসে জড়ো হয়েছেন বহু তিব্বতি লামা। কেবল লামা নন, অজস্র ভক্ত ও পর্যটকের ভিড়ে তখন এলাকা জমজমাট। এমন কোনও জায়গা নেই, মাখন-প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত নয়। কথায় বলে, যেখানে প্রদীপ রাখার সামান্য জায়গা পাবে, জ্বালিয়ে দাও মাখন-প্রদীপ। গৃহস্থ বাড়ির জানালা, ছাদের কার্ণিস, গুম্ফার সর্বত্র, মঠ আলোয় আলোয় ভরা। ড্রোন ক্যামেরার ছবি দেখে মনে হয়, জোখাং গুম্ফার ছাদে যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে হাজার তারা। জ্বলজ্বল করে রাতের আকাশ। ভক্তরা মণিচক্র ঘুরিয়ে উচ্চারণ করেন, ওম মণি পদমে হুম। বার্খোর স্কোয়ার তখন জনারণ্য। শুরু হয় গুরু চোংখাপা স্মরণ। পর্যটক ও ভক্তরা অনেকেই শুরু করেছেন মন্দির প্রদক্ষিণ। তিব্বতি ভাষায় কো-রা। মন্দিরের সামনে রাখা অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে দিচ্ছেন সাইপ্রেসের ডাল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে উঠছে চারপাশ। ভক্তদের সমবেত আওয়াজ ওঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে। লা-সোরো।

আবার টেবিলে আসে রাবতেন। রিয়াজের হাতের স্মার্টফোনে আলোর উৎসবের চলমান ভিডিও দেখে হাসে।

‘লা-সোরো মানে কীরে, রাবতেন?’ জানতে চায় রিয়াজ।
‘গড উইনস ইন দ্য এন্ড! শয়তান হারবে! কী খাবে বল?’ রাবতেনের সপ্রতিভ উত্তর।
‘টাইগার লামা এখন কোথায় আছে জান?’ সটান প্রশ্ন ডিকের।
‘সামদ্রুপ্টসে!’
‘কী করে জানলে?’ আবার প্রশ্ন ডিকের।

উত্তর না-দিয়ে আবার টেবিল ছাড়ে রাবতেন।

রিয়াজ তাকায় ডিকের দিকে। ডিকের চোখ রাবতেনের দিকে। এইটুকু বাচ্চা ছেলে কীভাবে জানল টাইগারের গতিবিধি?

১২১

২২ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

‘লামা, আপনি ঠিক কী চাইছেন?’ অধৈর্য প্রশ্ন কবীরের।

‘কেন এমন বলছেন খানসাহেব?’

‘নিবেদিতাকে আপনি এখানে আনলেন কেন?

‘আপনাকে আমি গুরুর মতো শ্রদ্ধা করি খানসাহেব! তেরমা মাথায় নিয়ে বসে আছেন, আপনি স্বয়ং বোধিসত্ত্ব! অযথা প্রশ্ন করে আমার কাজে বাধাদান করবেন না প্লিজ!’

‘আপনি আমার সঙ্গে যা-খুশি করুন, নিবেদিতাকে আপনি ছেড়ে দিন!’ আর্তি কবীরের কণ্ঠে।

স্তব্ধতা। কেতু এসে বসেছে প্রভুর পায়ের কাছে। পোষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন লামা।

‘লামা, আমি আজই বেরিয়ে যাব।’ দীর্ঘক্ষণ পর কথা বলে নীলকণ্ঠ।

‘কেন? আপনি আমাদের প্রোগ্রামে থাকবেন না, নীলকণ্ঠবাবু?’

লামার কণ্ঠস্বরে অন্যসুর টের পায় নীলকণ্ঠ। তিনদিন পর, আগামী পঁচিশ তারিখ যে-অনুষ্ঠান হতে চলেছে, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা তার নেই। লামা এখন এমন কথা বলছেন কেন?

‘অনুষ্ঠানে আমার তো থাকার কথা নয়!’

‘আপনি না-থাকলে অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকবে নীলকণ্ঠবাবু! আপনি অবশ্যই থাকবেন।’

‘না লামা, আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে, আমি আজই ফিরব।’
নীলকণ্ঠের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে লামা বলেন, ‘ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছা! তবে সন্ধে হয়ে গেছে, অন্ধকারে না-বেরিয়ে কাল ভোরে বেরোন—’
‘ঠিক আছে, তাই হোক!’ সায় দেয় নীলকণ্ঠ, পরক্ষণেই জুড়ে দেয় প্রশ্ন, ‘তবে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে লামা, আর কারা আছেন আপনার সঙ্গে?’

জবাব না-দিয়ে মুচকি হাসেন লামা।

‘বলুন লামা, এটা জানা দরকার! সীমা পার হবেন না!’ গলা সামান্য চড়ে যায় নীলকণ্ঠের।
‘আমাকে হুমকি দিচ্ছেন নীলকণ্ঠ?’ মৃদু হাসি লামার ঠোঁটের কোণে।
‘না, হুমকি নয়, আপনার অধিকার বুঝিয়ে দিচ্ছি! আপনি বা আপনারা ভারতের আশ্রিত, এইটুকু মনে রাখলেই হবে! ভারতের সঙ্গে গদ্দারি করবেন না!’ ঠাণ্ডা স্বর নীলকণ্ঠের।

লামা স্তব্ধ। কবীর তাকান তাঁর দিকে। সম্ভবত লামা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, প্রশমিত করছেন ক্রোধ। গদ্দার শব্দের প্রয়োগ তাঁকে চঞ্চল করেছে। ক্রোধ আয়ত্তে রেখে শীতল কণ্ঠে লামা বলেন,

‘আশ্রয় দেওয়ার জন্য আমরা ভারতের কাছে সবসময় কৃতজ্ঞ!’
‘ব্যস এটুকু মাথায় রাখবেন সবসময়, আপনাদের অন্ন জোগাচ্ছি আমরা, ভারত—’
‘এমনি এমনি কি করছেন মিস্টার মুখার্জি? অন্নের দামও তুলে নিচ্ছেন!’ লামা বলেন।

নীলকণ্ঠ বুঝতে পারে না লামা কী বলতে চান। সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে লামার দিকে।

‘লাদাখে চায়না-ইন্ডিয়া যে লড়াই চলছে, লড়ছে কারা?’ সরাসরি নীলকণ্ঠের চোখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন লামার।
‘ইন্ডিয়ান আর্মি! আবার কে? উই আর প্রাউড অফ আওয়ার আর্মি!’
‘আজ্ঞে না, ওখানে লড়ছে এক সিক্রেট ব্যাটেলিয়ন!’

‘সিক্রেট ব্যাটেলিয়ন! সেটা কী বস্তু?’ বিস্ময় ও ব্যঙ্গ নীলকণ্ঠের জিজ্ঞাসায়।
‘ই-টুয়েন্টি টু! এস্টাব্লিশমেন্ট টুয়েন্টি টু! এই ই-টুয়েন্টি টু ব্যাটেলিয়ন ইন্ডিয়ান আর্মির পার্ট নয়! এখন নতুন নাম হয়েছে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স! যদিও এখন আর কোভার্ট ফোর্স বলা যাবে না। গোটা ফোর্সটাই তৈরি হয়েছে ভারতে নির্বাসিত টিবেটানদের নিয়ে! আপনাদের অন্নের দাম আপনারা কড়ায়-গন্ডায় আদায় করে নিচ্ছেন মুখার্জিবাবু!’

প্রত্যুত্তরে চেঁচিয়ে ওঠে নীলকণ্ঠ। আলোচনা উত্তপ্ত হওয়ায় হস্তক্ষেপ করেন কবীর। যুযুধান দুই পক্ষকে থামান। বিষয়মুখ না-ঘোরালে অনভিপ্রেত কাণ্ডের সম্ভাবনা। কবীর তাকান নীলকণ্ঠের দিকে।

‘এখানে যা-ঘটছে আমাদের সঙ্গে, সবই কি তোর মস্তিষ্কপ্রসূত?’ নীলকণ্ঠের দিকে তোপ কবীরের।
‘না খানসাহেব, সবই আমার মস্তিষ্কপ্রসূত! এসএস আমাদের সাহায্য করছে আর নীলকণ্ঠ মুখার্জি এসএস-এর পক্ষে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।’ নীলকণ্ঠ নয়, উত্তর দেন লামাই।

নিশ্চুপ কবীর। নীলকণ্ঠের উপস্থিতি তাঁকে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা দিয়েছে। যাবতীয় চিন্তা এখন নিবেদিতাকে ঘিরে, কোথায় নিয়ে গেল মেয়েটাকে!

‘আগামী পঁচিশ তারিখ যে ভয়ঙ্কর প্ল্যান করেছেন লামা, তোরা সাপোর্ট করিস?’
‘করি! সারা বিশ্বের নজর কাড়ার জন্য এছাড়া আর উপায় নেই!’ জবাব নীলকণ্ঠ’র।
‘উন্মাদ হয়ে গেছিস নীলকণ্ঠ! তোর মাথার ভেতর গেঁড়ে-বসা দীর্ঘমেয়াদী ঘৃণা আর ধর্মান্ধতা তোকে উন্মাদ করে তুলেছে!’
কবীরের কথায় হাসে নীলকণ্ঠ। তার নিজস্ব ঘর-কাঁপানো হাসি।

‘আমাদের ভুল বুঝবেন না খানসাহেব, এসএস-এর এই দীর্ঘমেয়াদী ঘৃণা ও ধর্মান্ধতার পার্ট আমরা নই!’ কবীরের দিকে তাকিয়ে বলেন লামা।

‘অবাক হচ্ছি, এসএস-এর সঙ্গে আপনি কেন?’

‘পলিটিক্যাল কম্পালসান খানসাহেব!’

‘ভারত সরকার আপনাদের সাহায্য করবে না, রাদার করতে পারবে না! আমাদের সাহায্য নিতে আপনারা বাধ্য! আর কোনও অপশন নেই আপনার হাতে!’ আবার ঔদ্ধত্য নীলকণ্ঠের স্বরে।

নীলকণ্ঠকে উপেক্ষা করেন লামা। কেতুর মাথায় হাত রেখে কবীরের দিক তাকিয়ে বলেন,

‘আমরা টেররিস্ট নই খানসাহেব, আমরা বুদ্ধিস্ট। আমরা অন্য কারো ক্ষতি করব না। নিজেদের ক্ষতি করতে পারি, অন্যের নয়! কৃষ্ণ কৃপালিনীর লেখায় পড়েছি, গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, বহু তীর্থস্থানে গিয়েছেন, কিন্তু কোথাও আভূমি প্রণাম করেননি! ব্যতিক্রম মাত্র একটি জায়গা! সারা জীবনে একটি জায়গাতেই তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমমূলের সামনে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মনে করতেন। আমরা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তথাগত’র অনুগত খানসাহেব।’

‘যে-পরিকল্পনা করেছেন, এর থেকে বড় ভায়োলেন্স আর কি কিছু হতে পারে লামা!’ বিস্ময়-প্রশ্ন কবীরের।

‘এরা প্রত্যেকে এক-একজন বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বের যা-কাজ, এরা তাই করছে! আপনাকে আগেই বলেছি, শীলরক্ষা শ্রাবকের কাছে যত বড়, বোধিসত্ত্বের কাছে ততটা নয়!’ ‘

‘আপনি অর্থান্তর ঘটাচ্ছেন লামা! বোধিসত্ত্ব’র অর্থ আপনি বদলে দিচ্ছেন! মহাযানে কি তাই আছে?’

‘শব্দের কি কোনও ফিক্সড অর্থ হয় নাকি! সময় ও অবস্থার সাপেক্ষে শব্দের অর্থান্তর তো ঘটবেই! আপনি তো সারাজীবন এই অর্থান্তরের কাজই করছেন! আশ্চর্য, আপনার থেকে এমন কথা আশা করি না খানসাহেব!’

আবার স্তব্ধতা। উচ্চারিত হয় না কথার পিঠে কথা। তবে বোঝাই যায়, লামার কথা শেষ হয়নি, তিনি আরও কিছু বলবেন।

‘প্রথম বা দ্বিতীয় সেঞ্চুরিতে মহাযানের সূত্রপাত। মহাযান মনে করে গৌতম বুদ্ধও একজন বোধিসত্ত্ব মাত্র। তবে অন্য বোধিসত্ত্বদের সঙ্গে তাঁর ডিফারেন্স হচ্ছে, তিনি অন্যান্য সব বোধিসত্ত্বের কলম। স্পোকস পার্সন। কেন? যেহেতু তাঁর মুখ দিয়েই ধর্মের নিয়মগুলো প্রকাশিত হয়েছে। তথাগত’র মৃত্যুর কয়েকশ’ বছর পরে তাঁর মুখনিঃসৃত এই বাণীকে বলা হল সূত্র। এগুলো শাক্যমুনি সবাইকে বলেননি। বলেছিলেন তাঁর বিশেষ কয়েকজন শিষ্যকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তখন সেই বাণী বোঝার মতো ম্যাচিওরিটি তাঁদের ছিল না। সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল সেইসব বাণী। তখন সেই সূত্রগুলি লুকিয়ে রাখা হল নাগ-দের কাছে। যাদের সাপের মতো দেহ, মাথাটা মানুষের, থাকে জলের তলায়। তারপর সেকেন্ড সেঞ্চুরিতে পৃথিবীতে এলেন কয়েকজন মহাগুরু, তাঁদের হাত ধরেই সেইসব সূত্র আবার ফিরে এল মানুষের কাছে। তাঁদেরই একজন নাগার্জুন। তাঁর মাধ্যমিক কারিকা এমনই এক সূত্র।’

‘আপনি জানেন কি না জানি না, আমাদের দেশে কিছু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে যেমন কানফোড়, নাগা, রামানন্দী ইত্যাদি। এরা জাতিবিচার মানে না, যাকে-তাকে স্বদল-ভুক্ত করে। নাগা বা নাগপন্থীরা ছেলে চুরি করে আনত, সেইসব ছেলেদের প্রতিপালন করে নিজেদের দল পুষ্ট করত।’

কবীরের কথা চুপ করিয়ে দেয় লামাকে। তিনি কেতুর মাথায় হাত বোলাতে থাকেন। কবীর আবার বলেন,

‘ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে আপনি কী করতে চান?’

‘সে আগামী বোধিসত্ত্ব—পঁচিশের সকালে তার দীক্ষা! না, চিন্তা করবেন না, সে অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না!’

‘নিবেদিতা!’ আতঙ্কিত কবীর।

‘নিবেদিতা অংশ নেবে!’

‘লামা! আপনি এটা করতে পারেন না!’ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন কবীর। তীব্র আতঙ্ক তাঁর চোখেমুখে।

‘আই নিড বুদ্ধ ওয়রিয়র্স, তাওয়াং থেকে লাদাখ—ওয়রিয়র দরকার! নিবেদিতার জন্মসন, তারিখ সব সংগ্রহ করে দেখে নিয়েছি—সে যোগ্য!’

‘আপনি বুদ্ধকে অপমান করছেন লামা! বুদ্ধের বাণীর অমর্যাদা করছেন! অন্যায় করছেন আপনি!’

আর সহ্য করতে পারেন না লামা, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে, চিৎকার করে ওঠেন।

‘খানসাহেব!’

মস্ত এক গর্জন করে কেতু দু’কদম এগিয়ে যায় কবীরের দিকে।

১২২

২২ অক্টোবর। লাসা রেস্তোরাঁ। কালিম্পং।

মেনুকার্ড নাড়াচাড়া করে ডিকে। রিয়াজ খেয়াল করে আগের দিনের মতো জড়তা বা সাবধানতা নেই রাবতেনের। এড়িয়েও যাচ্ছে না। ভিডিও শেষ। স্মার্টফোন ফিরিয়ে দেয় ডিকে-কে। ডিকে কেবল অস্ফুটে বলে,

‘আবার আসবে রাবতেন!’

বলতে বলতেই রাবতেন হাজির। হাসিমুখে আবার জিজ্ঞাসা,

‘কী খাবে বল?’ তারপর গলা না-নামিয়ে একই ভঙ্গিতে বলে, ‘আমার দাদা রোলাং মনাস্ট্রিতে পড়ে—ওর বন্ধু তেনজিং বলেছে! লাচুং তাগসাং মনাস্ট্রির স্টুডেন্ট তেনজিং—টাইগার লামা ওদের টিচার! মোমো দেব নাকি নুডলস?’
‘সাম্পা আর ভেড়ার মাংস।’ হেসে রাবতেনকে বলে ডিকে।

ফোন বাজে রিয়াজের। আবার টেবিল ছাড়ে রাবতেন। নীচু গলায় প্রয়োজনীয় কথা সেরে ডিকের দিকে তাকায় রিয়াজ।

‘রিঞ্চেন লামার গাড়ি লাভা মনাস্ট্রি থেকে বেরিয়েছে—কোথায় যাচ্ছে খবর পেয়ে যাব!’
‘তাশিকে ফোন কর! গাড়ি অ্যারেঞ্জ করতে বল! পুলিশের গাড়ি নয়!’
‘কোথায় যাব দাদা?’
‘সামদ্রুপ্টসে! রিঞ্চেন লামার জন্য আর অপেক্ষা নয়! আমি রজতকে জানাচ্ছি!’

তাশি নামডোলকে ফোন করে রিয়াজ। রজতকে ডিকে। সিকিম পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে হবে মূলত দুটো মনাস্ট্রি নিয়ে—সামদ্রুপ্টসে ঞিংমা-পা গুম্ফা আর লাচুং-এর তাগসাং। কথার মাঝেই খাবার দিয়ে যায় রাবতেন।

কিন্তু রজতকে ফোনে ধরতে পারে না ডিকে। ফোন কেটে দেয় রজত। ফোনের পর্দায় ফুটে ওঠে বার্তা। ‘সেক্রেটারিয়েটে আছি। দিল্লির সঙ্গে ভিসি চলছে। পাহাড়ে সাংঘাতিক প্ল্যান করেছে লামা! শেষ হলে ফোন করছি!’

দিল্লি থেকে ফিরেই মিটিং-এ ব্যস্ত রজত। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের ভিডিও কনফারেন্স চলছে রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ মহলে, এই সংবাদেই ঘটনার গুরুত্ব স্পষ্ট। পঁচিশ তারিখ কী ভয়ানক মতলব ফেঁদেছেন লামা? উদ্বেগ গ্রাস করে ডিকেকে। সে যা-ভাবছে, লামার পরিকল্পনা যদি সমতুল হয়, ভয়াবহ পরিস্থিতি আসন্ন। কবীর খান ও নিবেদিতার জন্য দুশ্চিন্তা ক্রমশ গাঢ়। অ-দেখা শিশু অর্হতের জন্যও।

১২৩

২২ অক্টোবর। লালবাজার। কলকাতা।

দোলকান ইসা আর রেবিয়া কাদীর। প্রতিবেদনে এই দুটো নামের উল্লেখ আছে বেশ কয়েকবার। উইং এক্সিকিউটিভ কেশব গোয়েলের দুশ্চিন্তাও এঁদের নিয়ে। এঁরা কারা জানতে হলে উত্তর-পশ্চিম চিনের দিকে ফেরাতে হবে চোখ। প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত ম্যাপে দৃষ্টি মেলে রজত। বেশিরভাগ ভূখণ্ড জুড়ে মরুভূমি। তার মধ্যে সামান্য সবুজ অংশে প্রাণের স্পন্দন।

এই এলাকায় মধ্য এশিয়ার জনজাতিরাই বসতি করে আছে দীর্ঘদিন। এরা মূলত তুর্কি ভাষাভাষী মুসলমান। এদের বড় অংশ উইঘুর। তাছাড়া আছে কাঝাখ, তাজিক, মঙ্গোলিয়ান আর কিরঘিজ জনজাতিও। পূর্ব তুর্কিস্তানকে এরা নিজেদের মাতৃভূমি মনে করে। পরে চিনারা তাদের এই স্বদেশভূমি দখল করে আর নাম পালটে রাখে শিংজিয়াং।

তিব্বতের প্রতিবেশী ভূখণ্ড শিংজিয়াং। তিব্বতিদের মতো উইঘুররাও মুক্ত করতে চায় তাদের মাতৃভূমি। দলাই লামা স্বদেশ থেকে নির্বাসিত ধর্মগুরু, অধরা তিব্বতি স্বাধীনতার স্বপ্নধর। ইসা ও রেবিয়া, দলাই লামার মতো ধর্মগুরু নন, কিন্তু দলাই লামার মতোই দেশ থেকে নির্বাসিত, বাধ্য হয়ে বসবাস করেন অন্য দেশে। তাঁরা উইঘুর স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্বাসিত দুই নেতা। চিন এই দু'জন উইঘুর নেতাকেই গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিতে চায়। প্রাণরক্ষার তাগিদে তাই দু'জনকেই ছাড়তে হয়েছে স্বদেশ। ইসা আশ্রয় নিয়েছেন জার্মানীতে আর রেবিয়া আমেরিকায়।

পাহাড়ের ঘটনায় তিব্বতি বিদ্রোহী কেবল নয়, নাম জড়িয়েছে শিংজিয়াং-এর উইঘুর বিদ্রোহী বাহিনীরও। ইসা বা রেবেয়া, পাহাড়ের ষড়যন্ত্রে সরাসরি জড়িত কিনা তার কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি, তবে সন্দেহ ষোল আনার ওপর আঠের আনা।

গত ষাট-সত্তর বছর ধরে দখলীকৃত তিব্বত যেমন চিনের মাথাব্যাথার কারণ, ঠিক তেমনই চিন-ভূখণ্ডের অন্তর্গত শিংজিয়াংও গত দশ বার-বছর ধরে তাদের গলার কাঁটা। দমন-পীড়ন চরম পর্যায়ে। অসংখ্য উইঘুর, কাঝাখ, কিরঘিজ জনজাতির মানুষ এখন নিজভূমেই পরবাসী। ডিটেনশন ক্যাম্পের অনন্ত অন্ধকার তাদের ভবিষ্যৎ। বহির্বিশ্বের

সঙ্গে শিংজিয়াং-এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে চিন, এমনকী সাংবাদিকদেরও প্রবেশ নিষেধ।

১২৪

২২ অক্টোবর। লাসা রেস্তোরাঁ। কালিম্পং।

‘রাবতেন আরও কিছু ইনফর্মেশন দিতে পারে, ওকে থানায় নেব?’ রিয়াজ জানতে চায়।
‘একদম না! লোকাল প্রবলেম হবে! রাবতেন আর যা জানে, বলবে না। এর থেকে খুব বেশি কিছু জানে বলেও আমার মনে হয় না! ব্যাপক লোকাল সাপোর্ট আছে টাইগারের পক্ষে।’ ডিকের জবাব।
‘আপনি যা অ্যাপ্রিহেন্ড করছেন দাদা, তেমন কিছু হলে তো—’

একটু আগে কামসূত্র-এর গল্প শুনিয়ে ডিকে যে-আশঙ্কার কথা তাকে বলেছে, সেই উদ্বেগ ও শঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় রিয়াজ।

‘২০০৮-এর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল বেইজিং অলিম্পিকের ঠিক আগেই, ইন্টারন্যশানাল অ্যাটেনশন পেতে!’ খেতে খেতেই বলে ডিকে।
‘এবার এমন কোনও ইভেন্ট আছে?’ রিয়াজ জানতে চায়।
‘এ’বছর চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ। বেশ বড় ইভেন্ট। সারা বছর জুড়ে প্রোগ্রাম হবে। অক্টোবরের শেষে স্পেশাল সেন্টিনারি প্রোগ্রাম। দেশ-বিদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অতিথি আর মিডিয়া আসবে। যেহেতু চায়না এখন বেশ বড় পাওয়ার, অন্যান্য দেশও লক্ষ রাখবে, পার্টি সেন্টিনারিতে কোনও স্পেশাল পলিসি নেয় কি না—’
‘কবে থেকে শুরু স্পেশাল সেন্টিনারি প্রোগ্রাম?’
‘সাতাশ!’
‘দু’দিন আগে এমন একটা কাণ্ড করে দিলে বিশাল হইচই বেঁধে যাবে গোটা দুনিয়ায়!’

‘এর এপিসেন্টার কোথায় হবে সেটাই ভাবছি! টিবেট? তারপর ওখান থেকে ছড়াবে? নাকি অন্যত্র হবে! সেই অন্য জায়গা কোথায়?’ পরপর প্রশ্ন ডিকের, নিজেকেই।

‘আট-এ কীভাবে শুরু হয়েছিল?’

‘দ্রেপাং আর সেরা মনাস্ট্রির লামারা তিব্বতের পতাকা নিয়ে হঠাৎ স্লোগান শাউটিং শুরু করেন—তিব্বতের স্বাধীনতা চাই! দলাই লামাকে তিব্বতে ফিরিয়ে দাও! কিন্তু সবথেকে ইন্টারেস্টিং ছিল সাতাশির আন্দোলন—লাসায় সন্ন্যাসীরা জোখাং মন্দির ঘিরে কো-রা শুরু করেন!’

‘কো-রা!’

‘স্তূপ, চোর্তেনসহ যে কোনও পবিত্র থানকে ঘিরে কো-রা তিব্বতে প্রাচীন ও চালু প্রথা। তুমি তো গ্রামের ছেলে, দণ্ডি-কাটা দেখনি?’

‘প্রচুর দেখেছি! চৈত্র মাসে শীতলা পূজায় প্রচুর লোক দীঘিতে স্নান করে দন্ডি কেটে শীতলার থানে আসত—মুসলমানরাও থাকত—সবাই মিলে—’

‘মন্দির বা পবিত্র থান রাউন্ড মারা, পরিক্রমণ বলতে পার, তিব্বতে এই পরিক্রমণকে বলে কো-রা। এই কো-রা অনেকে দণ্ডি কেটেও করে। কোনও মন্দির, গুম্ফা, পবিত্র সরোবর বা পাহাড় ঘিরেও হয় এই কো-রা। যেমন মানস সরোবর বা কৈলাশ পর্বত ঘিরে কো-রা তো খুবই পপুলার। সেদিন লামারা শুরু করার পর মুহূর্তে কো-রা বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে যায় গোটা তিব্বত জুড়ে। কেবল তিব্বত জুড়েই নয়, নেপালে, ভারতেও! ধর্মিয়া আচারের ওপরও তাই তিব্বতে এখন অনেক রেস্ট্রিকশন! সব গুম্ফায়, মঠে এখন কেবল এলএমজিধারী পিএলএ থিকথিক করছে!’

‘কো-রা’র ভয়ে?’

‘কেবল কো-রা কেন, যেকোনও আচার! আজ কো-রা হয়েছে, কাল অন্য কিছু হবে না, তার গ্যারান্টি নেই! ধর্মীয় সিম্বল কীভাবে বিদ্রোহের সিম্বল হয়ে যায় তার উদাহরণ কো-রা!’

‘তার মানে এবার কো-রা দিয়ে নাও শুরু হতে পারে!’

‘এবার বাটার ল্যাম্প ফেস্টিভ্যাল—নির্দিষ্ট উৎসব তো আছেই!’

‘আপনার অ্যাপ্রিহেনশন জয়েন্ট সিপিস্যারকে জানিয়েছেন ডিকেদা?’

‘জানাব।’

আধঘণ্টার মধ্যে খাওয়া সেরে, বেরিয়ে যায় দু'জনে। একটা এসইউভি জোগাড় করেছেন তাশি নামডোল। পুলিশি বন্দোবস্ত এড়িয়ে নিজ-উদ্যোগেই ব্যবস্থা করেছেন তাশি। গোপনীয়তা রক্ষার আদেশ দিয়েছিলেন রিয়াজস্যার। আপাতত গন্তব্য নামচি। প্রায় দু'ঘণ্টার পথ। সামদ্রুপ্টসে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা। রাতে কোনও আশ্রয় নাও মিলতে পারে। নামচি'র খুব কাছেই সামদ্রুপ্টসে মাত্র কিলোমিটার পাঁচেক।

'ঠিক আছে, চলুন, আগে নামচি তো যাই!' বলতে বলতে গাড়িতে ওঠে ডিকে।

ডিকের পাশে রিয়াজ। চালকের পাশে তাশি।

খবর যায় সিকিম পুলিশের কাছে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটেও পৌঁছায় বার্তা। এসটিএফ-এর পাঁচজন স্পেশাল কম্যান্ডোসহ তিরিশজনের একটি দলও বেরিয়ে যায় নামচি'র দিকে।

১২৫

২২ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

প্রায়ান্ধকার কক্ষ। আয়তাকার সেই ঘর বেশ বড়সড়। উচ্চতা সাধারণ ঘরের থেকে অনেক বেশি। কম ওয়াটের একটি বিজলি বাতি জ্বলছে কেবল। ঘরের আয়তনের তুলনায় আলোর আয়োজন সামান্য। চারপাশের দেওয়ালে ঝুলছে হরেক মুখোশ। বিশাল তাদের আকার। এত বড় মুখোশ আগে কখনও দেখেছে কি? অদ্ভুত মুখ মুখোশগুলোর। কদাকার। ভয়াল।

ঘরের একপাশে বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র। টেলেস্কোপিক ট্রাম্পেট। তিব্বতি শিঙা। শাঁখ। ঘণ্টা। কর্তাল। ডমরু। কয়েকজন সন্ন্যাসিনী মেঝেয় বসে ঘষেমেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে

তুলছেন মুখোশ ও বাদ্যযন্ত্র। যেন আসন্ন কোনও অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। লম্বা লম্বা বেশ কয়েকটি বাঁশ দাঁড় করান দেওয়ালের গায়ে। পাহাড়ি বাঁশ। তাদের গায়ে রঙিন কাগজ জড়ান।

আর বাধা দিতে না-পেরে থেমে যায় নিবেদিতা। চুপচাপ পড়ে থাকে শয্যায়। নগ্ন। চারজন সবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে শারীরিকভাবে যোঝা অসম্ভব। সব বাধা ঠেলে ওরা খুলে ফেলেন তার সমস্ত পোশাক। তারপর শুইয়ে দেন শয্যায়। দুই সন্ন্যাসিনী ভেষজ পুলটিস মাখিয়ে দিলেন সর্বাঙ্গে। অদ্ভুত এক অনুভূতি। শরীরের সর্বত্র যে তাঁরা মালিশ করছেন তা নয়, বিশেষ বিশেষ জায়গায়, মাখিয়ে দিচ্ছেন সেই প্রলেপ। তারপর অসামান্য হাতে মর্দন। ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখ।

হর-মে প্রাচীন তিব্বতি চিকিৎসা পদ্ধতি। ভেষজ প্রলেপ, উষ্ণ ভেষজ তেল ও মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে লেপন করা হয় নিবেদিতার শরীরে। সারা শরীরে নয়, শরীরের নির্দিষ্ট বায়ুস্থানে। সেইসব বায়ুস্থানের নাম লুং। সন্ন্যাসিনীরা এই হর-মে পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন নিবেদিতার শরীরের লুং-এ।

শত্রুর ডেরায় ঢুকেও মনোবল তার শিথিল হয়নি, কিন্তু সেই ডেরায় অপ্রত্যাশিতভাবে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়কে দেখে নিবেদিতা কেবল চমকায়নি, কিছুটা ভয়ও গ্রাস করেছিল তাকে। টাইগার লামা কতটা বিপজ্জনক, এখনও অজানা, কিন্তু নীলকণ্ঠ যে ধূর্ত ও খতরনাক, সে-পরিচয় সে জানে বিলক্ষণ। এহেন শত্রুপক্ষের কব্জায় এসে, কবীর খান ও নিজের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা তৈরি হয় তার অন্দরে। উপরন্তু, এই উৎকণ্ঠায় যুক্ত হয় বরফচিতা কেতুর আবির্ভাব। ভয়াল সেই শ্বাপদের উপস্থিতি বিবশ করে তাকে। স্নায়ু আর নিতে পারে না চাপ।

ফলত, পাসাং লামা যখন তাকে সন্ন্যাসিনীদের কাছে নিয়ে আসেন, নিবেদিতা দৃশ্যত ভয়াচ্ছন্ন। স্নায়ুবিবশ। হর-মে চিকিৎসা মানসিক ও শারীরিক ধকল নিরাময়ে কার্যকরী। মুহূর্তে এক সন্ন্যাসিনী পাত্রে তেল গরম করে তার মধ্যে ভেষজ মেশাতে শুরু করেন।

সন্ন্যাসিনীদের হাতে তাকে তুলে দিয়ে ঘর ছাড়েন পাসাং লামা। দরজা বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ তাকে পোশাক খুলতে সাহায্য করেন দু'জন। তখনইও বাধা দেয় নিবেদিতা। কিন্তু চারজন সন্ন্যাসিনী এসে বলপ্রয়োগ করে নগ্ন করেন তাকে।

উপাসনাগৃহের দেওয়াল সাদা, নীল, সবুজ ও লাল রঙে চিত্রিত। দেওয়ালের গায়ে উঁচু বেদিতে শাক্যমুনির মূর্তি। অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি চতুর্দিকে। বেদির সামনে লাল মেঝেতে বিশাল মণ্ডল। মণ্ডলের ওপর প্রদীপ। প্রতিটি প্রদীপে ইয়াকের দুধজাত মাখন। বিজলি বাতি আর প্রদীপের হলুদ আলো মিশে যায় গুম্ফার গভীর অন্ধকারে। মণ্ডল ঘিরে কয়েকজন লামা মন্ত্রোচ্চারণ করছেন গম্ভীর গলায়। সুললিত মন্ত্রোচ্চারণের সুর ছড়িয়ে পড়ছে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে।

যত্ন করে নিবেদিতার মাথার চুলে ভেষজ তেল লেপন করেন একজন। অপর সন্ন্যাসিনী সেই সিক্ত চুল আঁচড়ে দেন কাঠের চিরুনি দিয়ে। অন্যজন চামড়ায় ঘষে ধারাল করে তোলেন ক্ষুর। তারপর তার মস্তক মুণ্ডনের জন্য সিক্ত চুলে চালনা করেন অতি সাবধানে।

বিশাল মুখোশগুলো পরিষ্কার করার পর তারা আরও রঙিন, উজ্জ্বল ও ভীষণ। তিব্বতি শিঙা, শাঁখ, ঘণ্টা, কর্তাল, ডমরু—সব যেন বেজে ওঠার অপেক্ষায়। গায়ে জল পড়তেই নড়ে ওঠে নিবেদিতা। সাড় আসে শরীরে।

উপাসনাগৃহ থেকে ভেসে আসে মন্ত্রের আবছা সুর। শায়িত নিবেদিতাকে ঘিরে সন্ন্যাসিনীরা শুরু করেন মন্ত্রোচ্চারণ। গভীর নিদ্রা থেকে, মন্ত্রের সুর, তাকে ফেরত আনে জাগরণে। ধীরে চোখ মেলে সে। কিন্তু কিছুই ঠাহর হয় না তার।

স্নান করিয়ে সন্ন্যাসিনীরা নিবেদিতাকে পরিয়ে দেন রক্তবর্ণ পবিত্র চীবর।

১২৬

২২ অক্টোবর। লালবাজার। কলকাতা।

কিছুদিন আগে ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘে দাবি করেছিল পাকিস্তানের কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক, কিন্তু চিনের সক্রিয় বিরোধিতায় ভারতের সেই দাবি আমল পায়নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভারত সুযোগ পেয়ে যায় চিনকে সমুচিত জবাব ফিরিয়ে দেওয়ার। ধর্মশালায় আয়োজিত মানবাধিকার বিষয়ক এক সেমিনারে আমন্ত্রিত হন দোলকান ইসা। ইসার ভিসা মঞ্জুর করে ভারত। এই আন্তর্জাতিক সেমিনার চিন ভালো চোখে দেখেনি, কারণ ধর্মশালার সেমিনারে অন্যতম বক্তা হিজ হোলিনেস দলাই লামাও।

সচিবালয়ে সংক্ষিপ্ত সভা সেরে অফিসে ফেরে রজত। চেম্বারে ঢুকেই চালু করে ল্যাপটপ। মেল খুলে বিশদে পড়ে প্রতিবেদন।

ফেরার পথে গাড়িতে বসেই ফোনে ডিকের সঙ্গে কথা সেরেছে। শিলিগুড়ি কমিশনারেট ও কালিম্পং পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে যাবতীয় তথ্য। নির্দেশ পেয়ে এসটিএফ কম্যান্ডো'র একটা অংশ বেরিয়ে যায় পুলিশবাহিনী নিয়ে। তৈরি থাকতে বলে হেলিকপ্টার ও বাকি এসটিএফ কম্যান্ডো বাহিনীকে।

মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল, সিপি, জয়েন্ট সিপি-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আলোচিত হয় পাহাড় পরিস্থিতি। দিল্লির স্বরাষ্ট্র দফতর গোয়েন্দা এজেন্সি সূত্রে যা জানতে পেরেছে, সেই প্রতিবেদন শুনে চিন্তিত হন সকলেই। সকালে 'র' সদর দফতর থেকে যা-খবর পেয়েছে রজত, পরে সারাদিনে আরও প্রতিবেদন যোগ হয়েছে দফায় দফায়। পাহাড়ের ঘটনা এইমুহূর্তে আর আঞ্চলিক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়, যা-ঘটতে চলেছে, জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষেও বিপজ্জনক।

বছর দশেক আগে দিল্লি রেবিয়া কাদীরকে ভিসা দেয়নি। আন্তর্জাতিক দুনিয়া ভেবেছিল ইসার ক্ষেত্রেও দিল্লি ভিসা না-মঞ্জুর করবে, কিন্তু সকলকে অবাক করে ইসার ভিসা-অনুমতি দেয় দিল্লি। ইসার বিরুদ্ধে বেইজিং-এর মূল অভিযোগ, পশ্চিম শিংজিয়াং-এ ইসা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে জড়িত। বিশেষত, ২০০৯-এ বিশাল জাতিদাঙ্গায় প্রায় শ'দুয়েক মানুষের মৃত্যুর পর চিন ও তাইওয়ান সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইসাকে। প্রভাব খাটিয়ে চিন ইন্টারপোল থেকে রেড নোটিস পর্যন্ত ইস্যু করিয়েছে ইসার বিরুদ্ধে।

গত দশ বছর ধরে ইসাকে 'মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট' তালিকায় রেখেছে চিন। ভারতের অভিযোগ চিনের এই দ্বিচারিতা নিয়ে। ইসা সন্ত্রাসবাদী হলে মাসুদ আজহার নয় কেন? ভারতের এই যৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর নেই চিনের কাছে। গায়ে-গতরে শক্তিশালী হলে দরকার পড়ে না যুক্তির। ঠিক সেই ঘটনাই ঘটল। জয় হল বাহুবলের। অনুমোদনের দু'দিনের মধ্যে ইসার ভিসা বাতিল করে ভারত। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের ধারণা শক্তিশালী চিনের প্রবল চাপেই দোলকান ইসার ভিসা বাতিল করতে বাধ্য হয় ভারত।

দোলকান ইসা ও রেবিয়া কাদীর যেমন চিনের নিশানায়, টাইগার লামাও তাই। বিস্তারিত প্রতিবেদন খুঁটিয়ে পড়ে রজত।

১২৭

২২ অক্টোবর। মেল্লি। সিকিম।

'আমার পিছনে পুলিশ দিয়েছেন কেন মিস্টার কয়াল? দিস ইজ আনফেয়ার! বিশ্বাস করছেন না আমাকে?'

মেল্লি পেরিয়ে গাড়ি সিকিমে ঢুকেছে, ফোন আসে রিঞ্চেন লামার। সহসা বিব্রত ডিকে নিজেকে সামলে নেয় দ্রুত।

‘ওটা পুলিশের কাজ, আমি ঠিক জানি না লামা রিঞ্চেন, সরি—কোনও খবর আছে?’
‘কাল নামচি আসেন, ফোন করুন সকালে।’

ফোন কাটেন রিঞ্চেন লামা। মনে মনে আঁক কষে ডিকে। নামচি যেতে বলছেন মানে তাদের গন্তব্য নির্ভুল। রাবতেনের খবর যথার্থ। টাইগার লামা অবশ্যই সামদ্রুপ্টসে’র ঞিংমা-পা গুম্ফায় আছেন!

‘তিব্বতি বৌদ্ধরা ভায়োলেন্ট হতে পারেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন, তাশি?’ তাশি নামডোলের সঙ্গে গল্পে মজতে চায় ডিকে।
‘পরাধীনতার জ্বালা কী জিনিস একমাত্র ভুক্তভোগী মাত্রই বোঝে স্যার! আমার দেশ অন্যেরা দখল নিয়ে যদি আমাকেই মাইনরিটি বানিয়ে দেয়, তাহলে আমি করব, আপনিই বলুন! সব মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকব?’ প্রত্যুত্তর তাশির।
‘টিবেটানরা কি এখন নিজের দেশে মাইনরিটি?
‘চাইনিজদের নোংরা ছলচাতুরীর অভাব নেই স্যার! মেনল্যান্ড চায়না থেকে মেজরিটি হান চাইনিজদের এনে টিবেট ভরিয়ে দিয়েছে! এথনিক টিবেটানরাই এখন মাইনরিটি! বিশ্বের হাইয়েস্ট রেলওয়ে শাংহাই-লাসা রেলওয়ে তৈরিই হয়েছে এই মতলবে! বেইজিং-লাসা রেলওয়েও তাই। হাজারে হাজারে হান চাইনিজ চলে এল লাসায়!’
‘কী সাংঘাতিক!’
‘টিবেট দখলের সময় ফিফটিজে যেখানে সাধারণ চাইনিজ বসতি প্রায় ছিলই না, এইট্টিজের শেষে টিবেট অটোনমাস রিজিয়নে প্রায় দশ লক্ষ চাইনিজের বাস, ভাবতে পারেন! হান শ্রমিক আর ব্যবসায়ীরাই দখল করে নিল লাসা। ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জের সঙ্গে কালচারও খুব ফাস্ট চেঞ্জড হয়ে গেল! চাইনিজ সরকার এভাবেই ভেতর থেকে দখল করতে চাইল টিবেটকে।’
‘এর প্রতিরোধ হল না!’
‘ভায়োলেন্টলি হল না, হওয়া সম্ভবও ছিল না! অন্যভাবে হল!’ দৃঢ়স্বর তাশির।
‘কীভাবে হল?’ নাছোড় ডিকে।

‘চাইনিজদের এই আক্রমণে টিবেটানরা আরও ইউনাইটেড হয়ে উঠল। নিজেদের কালচার নিয়ে আরও সচেতন হল। ২০০৮-এর রিভোল্টের পর থেকে টিবেটানরা অলআউট নন-কোঅপারেশনে গেছে!’

‘সেটা কেমন?’

‘হান চাইনিজ ব্যবসায়ীদের বয়কট করা হল, তাদের দোকানে কেউ জিনিস কেনে না! কেবল ব্যবসায়ী নয়, সব চাইনিজকেই বয়কট করা হল! প্রশাসনের সঙ্গেও যতটা পারা যায় নন-কোঅপারেশন শুরু হল, একটা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স—’

‘ফিফটি নাইনে কিন্তু যথেষ্ট ভায়োলেন্স ছিল!’

‘ফিফটিনাইন আপরাইজিং-ই একমাত্র ভায়লেন্ট ছিল—চুসি গাংদ্রুক সামান্য হাতিয়ার নিয়ে কিছু লড়াই করেছিল। তাছাড়া লেট এইট্টিজের সেকেন্ড আপরাইজিং বলুন বা দু’হাজার আট-এর থার্ড—সব রিভোল্টই মোটের ওপর নন-ভায়লেন্ট। দু’চারটে পাথর ছোঁড়ার ফুটেজ দেখিয়ে বেইজিং ট্রিমেন্ডাস ক্র্যাকডাউন শুরু করল আট-এ! খুন করল কয়েক শ’ লামাকে! গুম করে দিল কয়েক শ’ টিবেটানকে! আর জেলে তো ভরলোই! আট-এর পরে যেটা হল, পুরো রেজিস্ট্যান্স ঢুকে গেল ঘরে, বাইরে কিছু নেই! টিবেটান ভাষায় কথা বলব, টিবেটান দোকান থেকে সামান কিনব, টিবেটান রেস্টোর‍্যান্টে খানা খাব—এর ফলে টিবেটান ন্যাশানালিজম আরও জোরদার হল!’

‘আন্দোলনের ধরনটাই বদলে ফেলা হল!’

‘ট্রান্সফর্মড রেজিস্ট্যান্স!’

‘এতে চাইনিজদের ব্যবসার ক্ষতি হল না?’

‘বহু চাইনিজ শপ বন্ধ হয়ে গেল কাস্টমারের অভাবে!’

‘হাতে না মেরে ভাতে মারা!’

‘হাতে তো মারত পারবে না টিবেটানরা, ওরা জানে! তাই তরিকা বদলে দিল! এর জন্য স্যার কোনও বড় নেতার দরকার হল না! স্পন্টেনিয়াসলি হল! এলাকার নেতারাই বিরাট রোল প্লে করল!’

‘এটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট তাশি, জানতাম না! থ্যাঙ্ক ইউ!’

ডিকের মুখে প্রশংসা শুনে লজ্জা পান তাশি নামডোল। তিব্বত তাঁর পূর্বপুরুষের দেশ। দেশের মাটি-পাহাড়কে তিনি অগ্রাহ্য করবেন কীভাবে? তিব্বতের পরাধীনতা তাঁরও পরাধীনতা! তিব্বতের লড়াই তাঁরও লড়াই! সেই লড়াইয়ের কথা বলতে গেলে তাঁকে গ্রাস করে আবেগ, দৃপ্ত আবেগ।

পকেটে কেঁপে ওঠে ফোন। রজত।

১২৮

২২ অক্টোবর। লালবাজার। কলকাতা।

লাল কালি দিয়ে প্রতিবেদনের গুরুত্বপুর্ণ জায়গা চিহ্নিত করে রজত। গভীর মনোযোগে তলিয়ে দেখে নেয় জরুরি তথ্য ও তার তাৎপর্য।

গত শতকে সাতের দশকের গোড়ায় নেপালে চুসি গাংদ্রুকের শেষঘণ্টা বাজিয়ে দেয় চিন-নেপাল যৌথবাহিনী। টাইগার লামা তখন পালিয়ে চলে আসেন সিকিমে। সেখান থেকেই তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন চোরাগোপ্তা। তখনও ভারতের অংশ নয় সিকিম। চিন বহু চেষ্টা করেও টাইগার লামাকে নিতে পারেনি নিজেদের কব্জায়। ১৯৭৫-এ সিকিমের ভারত ভুক্তির পর, চিন সরকারিভাবে টাইগার লামার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় ভারত সরকারের কাছে।

তারপর থেকে তিনি প্রায় পঁচিশ বছর নামচির কাছে সামদ্রুপ্টসে নামে একজায়গায় একটা ঞিংমাপা গুম্ফায় গৃহবন্দি ছিলেন। ২০০০ সালে মূলত দলাই লামার চাপেই ভারত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। আন্তর্জাতিক চাপও ছিল। বেরিয়েই টাইগার লামা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর কাজে। গুপ্তসেনা তৈরি করে তিনি তিব্বতকে স্বাধীন করতে চান। প্রথমদিকে দেশ থেকে পালিয়ে-আসা তিব্বতিদের নিয়েই তিনি তৈরি করছিলেন বিপ্লবী সেনাদল।

পরে পাহাড়ের ছেলেমেয়েদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন তাঁর বাহিনীতে। বৌদ্ধ যোগাযোগ থাকলেই যথেষ্ট, টাইগারের গুপ্তসেনাদলে সে স্বাগত। কমবয়সী বালকদের দিকেই আপাতত তাঁর নজর হলেও, গোয়েন্দাসূত্রে খবর, টাইগার এবার হাত বাড়াবে বালিকাদের দিকেও। লামার বিরুদ্ধে আছে বলপূর্বক অপহরণের অভিযোগও।

এহেন মরিয়া ও আগুনখোর দ্রোহীর সঙ্গে, প্রতিবেশী শিংজিয়াং-এর উইঘুর বিপ্লবী দলের যোগাযোগ না-থাকাটাই বিস্ময়ের! ফলত, লাদাখ, সিকিম, নেপালসহ তিব্বত, শিংজিয়াং—বিস্তৃত এলাকা জুড়ে দ্রোহকাল আসন্ন। এজেন্সি খুব গুরুত্ব দিয়েছে দুই বিদ্রোহী দলের পারস্পরিক মেলবন্ধনে। এই আঁতাতের আগুন গলিয়ে দিতে পারে হিমালয়ের জমাট বরফ। সেই হিমস্রোত ভাসিয়ে দিতে পারে অনেক রাজনৈতিক সমীকরণ! ট্রান্স-হিমালয় এলাকা সন্ত্রাসবাদের নব্য-আঁতুরঘর হিসেবে যুক্ত হতে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে। প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে সন্ত্রাসবাদের নতুন মানচিত্র নিয়ে সতর্কবার্তা। চিনের কাছে এই রিপোর্ট নেই, হতে পারে না। পাঁচ-আঙুল কব্জা করতে তাদের সাম্প্রতিক মরিয়া চেষ্টাই প্রমাণ করে, তারা এই বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

১২৯

বেজায় খিদে পেয়েছে। বেল বাজায় রজত। সেন্ট্রি ঢোকেন। ক্যান্টিন থেকে কিছু খাবার আনতে বলে রজত। কফি আর চিকেন স্যান্ডুইচ দিয়ে যান সেন্ট্রি। স্যান্ডুইচ-এ কামড় বসিয়ে আবার ল্যাপটপের পর্দায় ফেরে।

ভারত সরকারও এই বিষয়ে সতর্ক, অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপ তাদের। খাতায়-কলমে চিনের তুলনায় শক্তিতে দুর্বল দেশ হলেও, দলাই লামাসহ লক্ষ তিব্বতিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে ভারত তার অনমনীয় অবস্থান স্পষ্ট করেছে অনেক আগেই। কিন্তু

অহিংসপন্থী দলাই লামাকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে যতটা ঝুঁকি, তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকি টাইগার লামার মতো চিনবিরোধী বিপ্লবীকে ভারতের মাটিতে আশ্রয় দেওয়া!

ভারত নিজের মাটিতে টাইগার লামার উপস্থিতি নিয়ে কূটনৈতিক স্তরে নীরব থেকেছে বরাবর। এই অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে লামার গোপন গতিবিধি। পাহাড়ের অধিকাংশ মানুষই তাঁকে কখনও দেখেনি! কিন্তু টাইগার ভারতের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক হয়ে পড়লে, তাকে থামাতে হবে। তাই টাইগারকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-কে। কিন্তু এনআইএ-এর কাজে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এসএস—সত্যসেনা। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। টাইগার লামাকে কী ধরনের সাহায্য করছে সত্যসেনা? মূলত টাকাপয়সা ও প্রশিক্ষণ। অস্ত্রসরবরাহ নিয়েও অভিযোগ আছে।

ফোন বাজে। ডিসি ডিডি স্পেশাল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে ফোন ধরে।

‘হ্যাঁ, বলুন!’
‘প্রফেসর বিশ্বাসকে অ্যারেস্ট করে নিচ্ছি স্যার! ওর বউ আবার ল-ইয়ার নিয়ে এসেছিল!’
‘তাই কর! কোর্টে পিসি রিমান্ড চাও! ল-সেলকে জানাও! পাক্কা শুওরের বাচ্চা! উপন্যাসের টোপ দেখিয়ে কবীর খানকে নিয়ে গেছে! ডিকে ঠিক বলেছে!’
‘স্যার, লন্ডনের সিলভার লাইনের সঙ্গে কনট্রাক্ট সাইন করেছেন উনি। বিশাল টোমর আপনাকে যা কাগজ দিয়েছেন, তারপর আর কী প্রমাণ লাগবে!’
‘ওকে, অ্যারেস্ট হিম!’

প্রতিবেদনে ফেরার আগে ডিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ডিসি ডিডির ফোন ছেড়ে ডিককে ধরে রজত। প্রয়োজনীয় কথা সেরে আবার প্রতিবেদনে চোখ।

এসএস-এর অন্য সেনাপ্রমুখদের, টাইগার প্রসঙ্গে, পরিষ্কার অবস্থান—চুসি গাংদ্রুক ও টাইগার লামার পেছনে তাঁরা একসময় দাঁড়ালেও এখন সরে এসেছেন তাঁরা। কেন সরে

এসেছে, যুক্তি দিতে গিয়ে তারা এমন এক সম্ভাবনার অবতারণা করেছেন, বিপদের মাত্রা আরও বেড়েছে। এসএস-এর মতে, টাইগার লামা বিপজ্জনক জেনেও তাঁরা চিনের বিরুদ্ধে তাঁকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে তাঁকে যতটা বিপজ্জনক মনে হয়েছিল, লামা তার থেকেও ঢের বিপজ্জনক। সেনাপ্রমুখদের সন্দেহ কাশ্মীরী মুজাহিদিনদের সঙ্গেও সম্ভবত যোগাযোগ করেছেন টাইগার। তিব্বতি মুক্তি বাহিনী চুসি গাংদ্রুক, উইঘুর লিবারেশন আর্মি আর কাশ্মীরী মুজাহিদিন জঙ্গি—এই ত্র্যহস্পর্শ থেকে সত্যসেনা নিজেদের বিযুক্ত করেছে। স্বীকৃত ভারত-রিরোধী শক্তির সঙ্গে তারা কখনোই মেলাবে না হাত।

কিন্তু, এখানে বড় একটা কিন্তু আছে, অন্যতম সেনাপ্রমুখ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সেনালাইন অগ্রাহ্য করে যোগ দিয়েছে টাইগারের সঙ্গে। এক্ষেত্রে তার উগ্র-চিনবিরোধী ভাবনাকেই দায়ী করেছেন অন্যান্য সেনাপ্রমুখ। এসএস-এর চিন-বিরোধিতা নিয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। চিন-বিরোধিতার সঙ্গে টাইগার লামা যদি ভারত-বিরোধী কোনও অবস্থান নেন, সেই অবস্থানকে সমর্থন করার প্রশ্নই ওঠে না। চিরকালীন রোমান্টিক নীলকণ্ঠ নিজেই সশরীর হাজির হয়েছেন পাহাড়ে। টাইগারের ডেরায়। সেনাপ্রমুখদের সন্দেহ, লামার ফাঁদে পা দিয়েছে নীলকণ্ঠ।

ডিকেকে পাঠায় প্রতিবেদনের বাছাই অংশ। চেয়ার ছেড়ে ওঠে রজত। ধূমপান এলাকায় গিয়ে পায়চারি করতে করতে একটা সিগারেট ধরায়। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও টাইগার লামার যুগলবন্দির সঙ্গে যদি দোলকান ইসা ও রেবিয়া কাদীর নামক জোড়াফলা যুক্ত হয়ে যায়, মামলা হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। সেন্ট্রাল এজেন্সি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এর সুরাহা অসম্ভব!

গভীর রাত। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

লামার অনুরোধে আজকের রাত গুম্ফায় থেকে যায় নীলকণ্ঠ। একটা রাতের অপেক্ষা। রাতটা কাটিয়েই বেরিয়ে পড়বে আগামিকাল ভোরে। এই উন্মাদ লামার সঙ্গে সে আর একমুহূর্ত থাকতে রাজী নয়। রাতে সামান্য খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ঘিরে ফেলে অন্য এক অনুভূতি। তার দু-দুটি ফোন ও ট্যাব নিখোঁজ। ব্যাগে অন্যান্য সব জিনিস যথাযথ জায়গায় থাকলেও, যোগাযোগের মাধ্যমগুলি অদৃশ্য। স্নায়ু বিবশ না-করে নিজেকে সংহত করে নীলকণ্ঠ।

লামার আচরণেই সন্দেহ হয়েছিল, তিনি অন্যকিছু ভাবছেন। পঁচিশ তারিখ মূল অনুষ্ঠানে সে থাকতে পারবে না, আগে থেকে জানা সত্ত্বেও, থেকে যাওয়ার কথা বলছিলেন বারবার। সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেলেই মঙ্গল হত, সৌজন্যবশত লামার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে বাড়ল বিপদ। নিবেদিতা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যোগান দিয়ে, তাকে বুদ্ধ-যোদ্ধা বানিয়ে দেওয়া গেছে! লামার কেবল সংখ্যা চাই, তিনিও যোদ্ধা পেয়ে আনন্দিত। গতবার মুর্শিদাবাদে সিরাজের সমাধিতে হাত ফসকে গিয়েছিল, এবার মধুর প্রতিশোধ! নারীরক্তে রঞ্জিত হল না নিজের হাত, ছুঁল না পাপ, অথচ চরিতার্থ হল প্রতিহিংসা। বস্তুত, বৃদ্ধ লামার কবীরপ্রীতি দেখেই মাথায় আসে ভাবনা। কবীর এলে নিবেদিতাও আসবে। অবধারিত। এলোও প্রত্যাশা মতো। সব হিসেব মিটিয়ে ফুরফুরে মেজাজেই ছিল নীলকণ্ঠ, কিন্তু সব নষ্ট করে দিলেন লামা। এমন প্রাজ্ঞ অথচ বিপজ্জনক মানুষ এই জীবনে কমই দেখেছে সে!

অযথা চঞ্চল না-হয়ে অপেক্ষা করে গভীর রাতের। আজ রাতের মধ্যেই ত্যাগ করতে হবে গুম্ফা। ভোর অবধি অপেক্ষা করা যাবে না, লামার যা মতিগতি, শেষমেশ তাকেও হয়তো বানিয়ে দেবেন বুদ্ধ-যোদ্ধা! বাঁ হাত তুলে ঘড়ি দেখে । রাত একটা দশ। এপাশ-ওপাশ করে আরও কিছুক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে উঠে পড়ে। ব্যাগ থাকে ব্যাগের জায়গায়। দরজা খোলে। গুম্ফার ভেতরে কোনও নজরদারী ক্যামেরা নেই, যা-আছে সব প্রধান ফটকে। তার ঘরের সামনেই অন্ধকার অলিন্দ। দেহলি পেরিয়ে পা বাড়ায় নীলকণ্ঠ।

এই গুম্ফায় সে আগে এসেছে বারদুয়েক, কখনও কাটায়নি রাত। গুম্ফায় যেতে সবসময়ই বারণ করেছেন সঙ্গী সব সেনাপ্রমুখ। টাইগার লামার মতো বিপজ্জনক মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের বিরোধী ছিলেন তাঁরা। নীলকণ্ঠ'র রোমান্টিকতা, তার ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা, সেনালাইন অগ্রাহ্য করে তাকে নিয়ে এসেছে সরাসরি বাঘের ডেরায়। বৃদ্ধ লামার যা-পরিকল্পনা, বিশ্ব-কাঁপান চিন-বিরোধী আসন্ন সেই পরিকল্পনার অংশীদার না-হলে কীসের এই সেনাজীবন! কিঞ্চিৎ ঝুঁকিই সে নিয়েছে এই পরিকল্পনার সাক্ষী থাকতে।

আন্দাজ করে এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে। কিছুদূর এগোতেই নজরে আসে আলো। কোন ঘরে আলো জ্বলছে? থামে নীলকণ্ঠ। কান খাড়া। জেগে আছে কেউ এই মাঝরাতেও? কোনও শব্দ আসে না কানে। সতর্ক পা-ফেলে আবার এগোয় নীলকণ্ঠ।

১৩১

নিজের রক্তবর্ণ পোশাকের দিকে তাকায় নিবেদিতা। এই মুহূর্তে এই ঘরে কেউ নেই। ঘুমও নেই তার চোখে। বাদ্যযন্ত্রগুলো অদৃশ্য। লম্বা বাঁশগুলোও নেই যথাস্থানে। শুইয়ে রাখা হয়েছে মেঝেয়। ভোর হলেই সম্ভবত নিয়ে যাওয়া হবে। গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে বোঝে বাইরে অন্ধকার, নিশুতিরাত। মস্ত ঘরে হলুদ আলোর পরিবর্তে জ্বলছে নীলাভ বিজলিবাতি। স্তিমিত সেই আলোর ইশারায় মুখোশগুলো স্থির। অলৌকিক।

হঠাৎ শব্দে চমকে তাকায় নিবেদিতা। কিন্তু চোখে পড়ে না কিছুই। মনে হল দরজার দিকেই শব্দের উৎস। ভেজান দরজা। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দরজার দিকে। ধীরে খুলে যায় কপাট। যেন খুব সাবধানে কেউ প্রবেশ করতে চাইছে ঘরে। সচকিত হয় নিবেদিতা। এই রাতে আবার কার আগমন? উদ্দেশ্য কী?

দুয়ারে মুণ্ডিতমস্তক এক তরুণ মুখ। ধীরে ঘরে প্রবেশ করে সন্ন্যাসী। গায়ে তার মতোই রক্তবর্ণ বেশ। এখানে সব সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর একই পোশাক। ছেলেটির বয়স চোদ্দ-পনের'র বেশি হবে না। ঢুকেই আবার ঠেলে দেয় কপাট। এগোয় দু-পা। থামে। পেছনে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে নিবেদিতার কাছে।

ভাঙা হিন্দি আর নিজের ভাষা মিশিয়ে সে বলে, 'তাশি দেলেক, আমি তেনজিং, তুমি?'

অবাক নিবেদিতা কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে কিশোর সন্ন্যাসীর দিকে। ফিসফিসিয়ে কথা বলে বালক, মাঝেমাঝে চারপাশে তাকায় সন্তর্পণে, যেন তাড়া আছে তার, গোপনীয়তাও। আবার প্রশ্ন করে অবাক নিবেদিতার আরও নিকটবর্তী হয়ে। প্রত্যুত্তরে যায় নিবেদিতা। সে বুঝেছে ছেলেটি সহানুভূতিপ্রবণ, হয়তো তাকে সাহায্য করতে চায়।

'নিবেদিতা।'
'কোথা থেকে এসেছ?'
'কলকাতা!' সংক্ষিপ্ত উত্তর নিবেদিতার।
'আখা লা, পালাও! পালাও! ফার গিউ!'
'টাইগার লামা কী করতে চায়?'
'পরশু ফেস্টিভ্যাল! চু থং! চু থং!'
'তুমি একটা ফোন করতে পারবে?'
'না! গোং দা!'
'মেসেজ?'
'মেল করতে পারব!'
'পারবে! ভেরি গুড!'

হাতের কাছে কাগজ নেই, চোখ বুজে দু'বার উচ্চারণ করে মগজে মেল-সাকিন নিয়ে নেয় তেনজিং। বিপদকালে বাছবিচারের সুযোগ কম, কিশোর সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করে না নিবেদিতা। বস্তুত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সময় অতিক্রান্ত, যেভাবেই হোক এই মৃত্যু-মুলুক

থেকে বেরোতে হবে। চটজলদি মনে পড়ল গৌরাঙ্গ'র মেল-আইডি, মনে রাখাও অপেক্ষাকৃত সোজা, দিয়ে দিল তেনজিংকে। মেল-এর বিষয়বস্তুতে, নিবেদিতা বাল্মীকি, তার পুরো নাম যেন লিখে দেয়, বালক-যোগীকে এইটুকুই অতিরিক্ত বলতে পারল নিবেদিতা, বিড়বিড় করতে করতে দ্রুত ঘর ছাড়ল তেনজিং।

তেনজিং বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ভেজান দরজায় আবার শব্দ। সন্তর্পণে দরজা ঠেলছে কেউ। পুরনো পাল্লা ভুলেছে মসৃণতা, লুকোতে পারে না আওয়াজ। চোখ তোলে নিবেদিতা। কপাট ঠেলে মুখ বাড়ায় আরও এক মুণ্ডিতমস্তক। চোখাচুখি হতেই হাসে সে মুখ। কী কুটিল ও ঘিনঘিনে হাসি! দৃষ্টি নির্দয়।

শীতল শিহরন নেমে যায় নিবেদিতার শিরদণ্ড বেয়ে।

১৩২

গভীর রাত। নামচি। দক্ষিণ সিকিম।

কেবল সন্দেহের বশে গুম্ফায় তল্লাশির অনুমতি দেয় না সিকিম পুলিশ। গভীর রাতে ধর্মীয় স্থানে পুলিশি অভিযান, অকারণ বিতর্ক ডেকে আনতে পারে, তাই ঝুঁকি নেয় না তারা। খানাতল্লাশি যা করার, দিনের আলোয় করাই মঙ্গল। গুম্ফা অভিযানের প্রবল ইচ্ছেয় লাগাম টেনে, নামচিতেই ঘাঁটি গাড়তে বাধ্য হয় ডিকে। থেমে যায় এসটিএফ কম্যান্ডো ও পুলিশের দলও। আগামিকাল সকালেই খোঁজ নেওয়া হবে গুম্ফায়। তবে সিকিম পুলিশের পক্ষে গুম্ফায় যাতায়াতের পথে থাকবে অহোরাত্র টহল। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে রিয়াজের সঙ্গেই কথা হয়। তাকে আশ্বস্ত করেন সিকিম পুলিশকর্তা।

নামচি'র 'সানরাইজ' হোটেলে আশ্রয় নেয় ডিকে, রিয়াজ ও তাশি নামডোল।

দুই শয্যার ঘরে ঢুকে রিয়াজ ব্যস্ত হয় ফোনে। ফোন শেষ করে সে যায় তাশি'র ঘরের দিকে। ডিকে খোলে রজতের মেল। লামার বিস্তৃত পরিকল্পনা দেখে চিন্তা বাড়ে। ফোন করে রজতকে।

'ডিজিসাহেব দিল্লির সঙ্গে কথা বলছেন, সিকিম পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আশা করি হোম মিনিস্ট্রি একটা রফায় আসবে! গুম্ফায় ঢুকতে না-দিলে উদ্ধার হবে কী করে তিনজন?' ফোন ধরেই বলে রজত।

'চায়নার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে নিশ্চয়ই!' কৌতূহল ডিকের।

'হলেও সেই খবর আমার লেভেলে আসবে না! দিল্লির হোম মিনিস্ট্রির এক জয়েন্ট সেক্রেটারি ভিসিতে বললেন, চায়না কাউন্টার-টেররিজম আর প্রিভেন্টিভ রিপ্রেসনে বিশ্বাস করে। জাস্ট গুঁড়িয়ে দেবে এইসব ইনফ্যান্টাইল এন্ডেভার!'

'দিল্লি কি একে ইনফ্যান্টাইল মনে করছে!' বিস্ময়-প্রশ্ন ডিকের।

'তা মনে করছে না, কিন্তু চায়না এই ধরনের টেররিজম সম্পর্কে সচেতন!'

'চায়না নিজে যা-করার করবে, কিন্তু খবর যখন পাওয়া গেছে চাইনিজ সরকারকে নিশ্চয়ই জানাবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট!'

'আমার ধারণা, ইন্ডিয়া আগ বাড়িয়ে কিছু বলবে না, কারণ ইন্ডিয়ার মাটি কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, আগে তা নিশ্চিতভাবে জানা দরকার!'

'টাইগার লামা ইন্ডিয়ার মাটিই তো ব্যবহার করছেন! এসএস-ও আছে!'

'এসএস সরকারিভাবে দায় ঝেড়ে ফেলেছে! এখন দায় ব্যক্তি নীলকণ্ঠ'র!' রজত স্পষ্ট।

'এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী উইঘুরদের পার্টিসিপেশন কিন্তু খুব চিন্তার বিষয়!' ডিকে বলে।

'হ্যাঁ, দিল্লির কথা শুনে মনে হল উইঘুরদের ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলেছে। ইনফ্যাক্ট, চায়না এখন টিবেটের থেকেও শিংজিয়াং সমস্যাকে বেশি বিপজ্জনক ভাবে!'

'কোনও সন্ত্রাসবাদী কাজে লামা ইন্ডিয়ার মাটি ব্যবহার করলে তিব্বতিরাই বিপদে পড়বে ভবিষ্যতে! আমার ধারণা ধর্মশালা গভর্নমেন্টও এটা সাপোর্ট করবে না!' ডিকে বলে।

'নেভার! একজনই এই ষড়যন্ত্র থামাতে পারেন—'

'দলাই লামা!' ডিকে বলে।

'তাঁকে জানানো হচ্ছে সম্ভবত!' রজত বলে।

‘কী ধরনের টেররিস্ট অ্যাটাক সন্দেহ করছে দিল্লি?’ জিজ্ঞাসা ডিকের।
‘উইঘুর লিবারেশন আর্মি আছে বলেই বড়সড় অ্যাটাকের আশঙ্কা করছে ওরা! বম্বব্লাস্ট বা নাইফ-অ্যাটাকের বহু হিস্টরি আছে, কেবল শিংজিয়াং-এ নয়, বেইজিং-এও একবার অ্যাটাক করেছিল!’
‘তাহলে ভারতের মাটিতে কিছু হচ্ছে না?’ ফের প্রশ্ন ডিকের।
‘চাইনিজ এম্ব্যাসিতে বম্বব্লাস্ট বা চাইনিজ হোটেল-রেস্তোঁরায় হামলা হতে পারে!’
‘আমার ধারণা এগুলো কিছুই হবে না!’ আশঙ্কার ইঙ্গিত ডিকে।
‘মানে?’
‘অন্যরকম অ্যাটাক হবে—ভারতের মাটিতেই হবে!’

বিস্মিত রজতকে আশঙ্কার কথা বলে ডিকে। স্তব্ধ হয়ে শোনে রজত। সম্ভবত আগামী পঁচিশ অক্টোবর, আলোর উৎসবের দিনই ঘটতে চলেছে এই নাশকতা।

‘তুই সিওর ডিকে?’
‘আমার আশঙ্কা!’
‘এর ভিত্তি কী? এমনি নিশ্চয়ই তোর মনে হয়নি?’
‘কামসূত্র উপন্যাসের শেষে এর ইঙ্গিত আছে—তাছাড়া এমন ঘটনা তো হয়নি এমন নয়, হিস্টরি আছে।’

চিন্তিত রজত ফোন ছাড়ার আগে অতিরিক্ত এক তথ্য দেয়।

‘সরসিজ অ্যারেস্টেড। পাক্কা ক্রিমিনাল।’

তারপর সংক্ষেপে জানায় দিল্লির লিটারারি এজেন্ট বিশাল টোমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পর্ব এবং পরবর্তী ঘটনাবলি।

‘যাদবপুরে আইআর-এর এক প্রফেসর আছেন, শুনেছি টিবেটোলজিস্ট, নাম অংশুমান মিত্র, কথা বলা যাবে?’ ডিকে জানতে চায়।

‘হ্যাঁ কেন যাবে না! ফোন করে বলে দেব, হেল্প চাই! পুলিশকে হেল্প না-করার কারণ নেই! ন্যাশানাল ইস্যু! রাদার ইন্টারন্যাশানাল ইস্যু! কিন্তু কেন?’ প্রতিপ্রশ্ন রজতের।

‘ভারতে যে টিবেটানরা আশ্রিত তাদের ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে। ধর্মশালা গভর্নমেন্টের বিষয়টাও একটু জানা দরকার।’

‘ওক্কে, বলে দেব। কখন ফোন করবি বল?’

‘কাল উনি যখন সময় দেবেন।’

‘না, না টাইম ফিক্স কর—কাল সন্ধ্যায় বলে দিচ্ছি—সারাদিন গুম্ফা-টুম্ফায় ঘোরাঘুরি করবি —অবশ্য জল কোথায় গড়াবে কাল কেউ জানে না।’

‘ঠিক আছে, কাল আটটা নাগাদ। ওঁর ফোন নম্বর আমায় টেক্সট করিস।’

ফোন ছেড়ে একটা সিগারেট ধরায় ডিকে। বাতাসে শীত। কানে ইয়ারফোন দিয়ে, বিছানায় শুয়ে, ট্যাবে চোখ রিয়াজের।

১৩৩

গভীর রাত। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে আবছা আলো আসছে। এগিয়ে গিয়ে ওই সামান্য ফাঁকেই চোখ রাখে নীলকণ্ঠ। মুণ্ডিতমস্তক এক বালক দাঁড়িয়ে আছে এক সন্ন্যাসিনীর সামনে। দু’জনের কথোপকথন চলছে। কানে আসে না, নীচুগলার সেই সংলাপবিনিময়। কে এই বালক? বারবার চারপাশ দেখছে কেন? তার আচরণে এত সাবধানতা কেন? কী কথা বলছে এই গভীর রাতে সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে?

দু'জনের চোখেমুখেই উত্তেজনা। বালক হাত নেড়ে কিছু বলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কথা বলছেন সন্ন্যাসিনীও। বালকের কথায় মৃদু হাসেন সন্ন্যাসিনী। কিছু বলেন। বালক হঠাৎ পেছন ফেরে। দরজার দিকেই আসছে সম্ভবত। কথা শেষ। এবার বেরিয়ে যাবে। বিড়বিড় করছে কেন বালক?

বালক কথা শেষ করে দরজার দিকে এগিয়ে আসতেই নীলকণ্ঠ সরে যায় দ্রুত। ন্যাড়া-মাথা বালক বেরিয়ে যায়। দেওয়ালে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে নীলকণ্ঠ। উত্তেজিত বালক খেয়ালই করে না তাকে। ফিসফিসিয়ে নিজের মনে নিজেই কথা বলতে বলতে চলে যায় দ্রুত। নিরাপদ সময় বয়ে যেতে দিয়ে, দরজার দিকে এগোয় নীলকণ্ঠ। তারপর এদিক-ওদিক দেখে কপাট ঠেলে। মৃদু শব্দ। সামান্য ফাঁক গলিয়ে মুখ বাড়ায় ঘরে।

ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে নিবেদিতা। মস্তকমুণ্ডিত নিবেদিতাকে দেখে হাসে নীলকণ্ঠ। বাহ, বেশ লাগছে তো নতুন সন্ন্যাসিনীকে! ঘরে প্রবেশ করে।

'কী ব্যাপার, এত রাতে আপনি এখানে?' তীক্ষ্ণ প্রশ্ন নিবেদিতার।
'সুন্দরী সন্ন্যাসিনীকে দেখতে এলাম!'
'বেরিয়ে যান! নাহলে আমি চেঁচাব!'
'চেঁচান! কেউ আসবে না!' হাসে নীলকণ্ঠ।

কুৎসিত সেই হাসি অসহ্য লাগে নিবেদিতার। সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

'আরে বসুন, বসুন! আপনি এখন ভিক্ষুণী! আমার প্রণাম নেবেন!' ব্যঙ্গের সুর নীলকণ্ঠের গলায়।
'আপনাদের মতলবটা কী?'
'আপনাকে ভিক্ষুণী বানানো! আপনার জন্মের সন-তারিখ খুব পছন্দ লামার, ব্যস!'
'ওহ, আমার ঠিকুজি-কুষ্টিও জোগাড় করে ফেলেছেন?'

‘সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে কিছুটা পেলাম, আর কিছুটা আপনাদের ভোরের কাগজ-এর সাইটে! খুবই সহজ কাজ! তারপর লামাকে দিলাম, লামা গণনা করে বললেন, এ নারী সর্বসুলক্ষণা! সন্ন্যাসিনী হওয়ার যোগ্য! ব্যস, ক্ষৌরী করে লাল জোব্বা পরিয়ে দিল আর আপনি নান হয়ে গেলেন! তবে ভারী সুন্দর লাগছে কিন্তু আপনাকে ম্যাডাম!’

আবার কুৎসিত হাসি নীলকণ্ঠ’র। শরীর বেয়ে হিমস্রোত টের পায় নিবেদিতা। মনে পড়ে গৌরাঙ্গ’র মুখ। সাংবাদিক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ও পরিচিতি আছে তার। ভিকে গ্রুপের কর্ণধার, ভোরের কাগজ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিল্বদল চট্টোপাধ্যায় তাকে নিজের মতো করে গড়ে-পিটে নিয়েছিলেন। বিলুস্যারের অকাল মৃত্যুর পর অনেকটা দায়িত্ব এসে পড়ে তার কাঁধে। ভোরের কাগজ-এর সহকারী সম্পাদক সে। কলকাতা তো বটেই, দিল্লির রাজনৈতিক মহলেও তার সুগম যোগাযোগ। এহেন নিবেদিতা বাল্মীকিকে কি বাকি জীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে হবে এদের ডেরায়!

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে নীলকণ্ঠ’র দিকে। এই ভয়ানক লোকটার হাত থেকে কি তার মুক্তি নেই! কদর্য হাসি লেপ্টে আছে মুখে, ঘোলাটে চোখ। চোখ বোজে নিবেদিতা। অজানা গুম্ফায়, গত কয়েক ঘণ্টার উপর্যুপরি অভিজ্ঞতা তাকে পরাবাস্তব অনুভূতি দেয়। বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা যেন সযত্ন মুছে দিচ্ছে কেউ। সামান্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খোলে। চমকে যায়। ক্রমশ সংলগ্ন নীলকণ্ঠ। তার এক হাতের মধ্যে এসে হাসছে সেই বিশ্রী ভঙ্গিতে। আর সহ্য করতে পারে না নিবেদিতা। সর্বশক্তি দিয়ে চড় কষায়। সশব্দ সেই থাপ্পড়ে নড়ে যায় নীলকণ্ঠ।

অবলা-আঘাত মুহূর্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয় মাথায়। ডান হাতের কঠিন পাঞ্জা দিয়ে চেপে ধরে সেই অবাধ্য নারীর গলা। কণ্ঠরোধ হয় নিবেদিতার। ছটফটায় সে। ছাড়াতে চেষ্টা করে বজ্রমুষ্ঠি। চেতনা হারাবার আগে হাঁটু দিয়ে অকুস্থলে আঘাত করে পাল্টা। কঁকিয়ে ওঠে নীলকণ্ঠ। আলগা হয় পাঞ্জা। দুই হাতের সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলে দেয় নীলকণ্ঠকে। কিন্তু প্রবল রাগে নীলকণ্ঠ নিবেদিতার লাল চীবরে মারে হ্যাঁচকা টান। ফালা ফালা হয়ে যায়

রক্তবস্ত্র। প্রকাশিত হয় নগ্নতা। আবার কুৎসিত হাসি। শরীর কাঁপিয়ে অনুচ্চ শব্দে হাসতে থাকে নীলকণ্ঠ।

১৩৪

হতচকিত নিবেদিতা পরনের ছিন্ন বস্ত্রের দিকে তাকিয়ে স্থির হয় মুহূর্ত। বিমূঢ়। তারপর সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় ছিন্ন চীবর দিয়েই ঢাকে শরীর। ততক্ষণে ঘটে যায় পরবর্তী ঘটনা। চোখের পলক। বিকট গর্জন। শ্বাপদ হুঙ্কার। ছিন্ন চীবর জড়িয়ে চোখ মেলে নিবেদিতা। বরফ-চিতা কেতু মাটিতে পেড়ে ফেলেছে নীলকণ্ঠকে। তার আছাড়ি-পিছাড়ি আর কেতুর বিকট গর্জনে কাঁপতে থাকে নিবেদিতা। থাবা দিয়ে ধরতে চায় নীলকণ্ঠ'র অঙ্গ। দাঁত বসাতে চায় তার শরীরে। অসহায় নীলকণ্ঠ হতবুদ্ধি। তাকে যেন ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে সেই শ্বাপদ।

প্রাথমিক আকস্মিকতা কাটিয়ে প্রতিরোধ করে নীলকণ্ঠ। সেনাশিবিরের নিয়মিত প্রশিক্ষক সে। পটু মার্শাল আর্টে। কুস্তির প্যাঁচও করায়ত্ত। কেতুকে ঠেলে সরিয়ে উঠে পড়ে। আবার লাফিয়ে আক্রমণ কেতুর। চকিতে একপাশে সরে গিয়ে তুলে নেয় পড়ে-থাকা একখণ্ড কাঠ। প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে কেতুর মুখে। ছিটকে যায় চিতা।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ। গর্‌গর্‌ আওয়াজ। হিংস্র চোখ। শ্বদন্ত প্রকাশ করে চাপা গর্জন। তারপরেই মস্ত এক লাফ কেতুর। প্রতিরোধ চুরমার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে নীলকণ্ঠের ওপর। পড়ে যায় নীলকণ্ঠ। চোখ বন্ধ করে নিবেদিতা। প্রবল চিৎকারে চোখ খোলে। তারপর বিস্ময়-চোখে দেখে নীলকণ্ঠের বাঁ-হাতের কব্জি কামড়ে ধরেছে কেতু, তীব্র যন্ত্রণায় ভয়াবহ চিৎকার করছে নীলকণ্ঠ।

'কেতু!'

এক চিৎকারেই হাত ছেড়ে দেয় বরফ-চিতা। গুটিয়ে যায়। ঘরে উপস্থিত হয়েছেন টাইগার লামা। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছেন নীলকণ্ঠ'র দিকে। নিবেদিতার ছিন্ন বসনের দিকে তাকিয়ে এক লহমায় বুঝে ফেলেন কী অনাচার হয়েছে এই গভীর রাতে, গুম্ফার পবিত্র ঘরে। রক্তাক্ত হাত নিয়ে উঠে দাঁড়ায় নীলকণ্ঠ। আগুন জ্বলছে তার চোখেও। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে তেনজিংসহ আরও দু'একজন সন্ন্যাসী ঢুকে পড়ে ঘরে। দু'জন সন্ন্যাসিনী। পাসাং লামাও।

সবাইকে অবাক করে, মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, নিজের রক্তাক্ত বাঁ-কব্জির দিকে এক পলক তাকিয়ে, টাইগার লামাকে আঘাত করে নীলকণ্ঠ। ছিটকে পড়েন লামা। পাসাং-সহ সকলে এগিয়ে আসে হইহই করে। মস্ত গর্জন কেতুর।

'না!'

ডান হাত তুলে সবাইকে থামতে বলেন লামা। নিবেদিতা দেখে, মাটিতে ছিটকে-পড়া লামার শরীর ক্রমাগত গুটিয়ে ক্ষুদ্র, যেন এক বালকের শরীর। তারপর স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন নীলকণ্ঠ'র সামনে। সটান। মুহূর্তে মার্শাল আর্ট দক্ষ দুই মানুষের লড়াইয়ে হুলুস্থুল পড়ে যায় ঘরে। কখনও নীলকণ্ঠ, কখনও লামা, আঘাত করেন একে-অপরকে।

স্তব্ধ নিবেদিতা হাঁ করে চেয়ে দেখে লড়াই। উপস্থিত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের ভিড় থেকে সকলের অলক্ষে ঘর থেকে কেবল বেরিয়ে যায় একজন। তেনজিং।

আঘাত-প্রাপ্ত লামা ছিটকে পড়েন, কিন্তু গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াচ্ছেন। বৃদ্ধ লামার শারীরিক সক্ষমতা ও শক্তি বিস্মিত করে নিবেদিতাকে। খুব বেশিক্ষণ চলে না লড়াই। নিখুঁত একটি লাথি উড়ে এসে পড়ে নীলকণ্ঠ'র বুকে। ছিটকে পড়ে নীলকণ্ঠ কেতুর সামনে। আর সুযোগ দেয় না সেই বরফ-শ্বাপদ। বাঁ-হাতের কব্জি আবার কামড়ে

ধরে। মরণ-কামড়। যন্ত্রণায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য নীলকণ্ঠ। কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পারে না হাত।

প্রচণ্ড আক্রোশে কব্জি থেকে হাতের পাঞ্জা ছিঁড়ে নেয় কেতু। কব্জিসহ নিজের বাঁ-হাতের পাঞ্জা কেতুর মুখে দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে নীলকণ্ঠ। পাসাং ছুটে গিয়ে কেতুর মুখ থেকে ছাড়িয়ে নেয় সেই ছিন্ন করতল। রক্তমুখ কেতু চাপা গর্জনে তাকিয়ে থাকে যন্ত্রণাদীর্ণ নীলকণ্ঠ'র দিকে।

'একে নিয়ে যাও আমচি'র কাছে!'

লামার আদেশে দু'জন সন্ন্যাসী ধরে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় রক্তাক্ত নীলকণ্ঠকে। পেছনে পাসাং লামা। হাতে তার নীলকণ্ঠ'র ছিন্ন পাঞ্জা।

সন্ন্যাসিনী দু'জন এগিয়ে যায় নিবেদিতার দিকে। একজনের হাতে নতুন চীবর। রক্তবর্ণ চোখে লামার দিকে তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। লামা নামিয়ে নেন চোখ। চোখে তাঁর লজ্জা। এক পরিতাপহীন মানুষের জন্য অসম্মানের মুখে পড়তে হল তাঁকে। নির্বাক লামা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে। পেছনে বরফ-চিতা কেতু।

পাসাং লামার ঘরে ঢুকে, ল্যাপটপ খুলে, ততক্ষণে মেল করে দিতে পেরেছে তেনজিং। বিষয়—শিরোনামে লিখে দেয়—নিবেদিতা বাল্মীকি। উত্তেজনায় লিখতে পারে কয়েকটা শব্দ। পাঠিয়ে দেয় নির্দিষ্ট ঠিকানায়। তারপর মুছে দেয় সেই মেল। ল্যাপটপ বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

রক্তাক্ত নীলকণ্ঠকে তখন পাসাং লামা নিয়ে যাচ্ছে আমচি'র ঘরে। তেনজিংও এগিয়ে যায় পাসাং-এর পিছু পিছু।

১৩৫

একাদশ শতক। চম্পা। বিক্রমশীল মহাবিহার।

গঙ্গার তীরে পর্ব্বতের উপর সুবিশাল মহাবিহার। রৌদ্র সমভূমি অতিক্রম করিয়া পাহাড়ি পথ ধরিল। পথে দেখা মিলিল দুই অচেনা ভোটদেশীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তাহারা কী করিতেছে পথের ধারে দাঁড়াইয়া, বোধগম্য হইল না। হাসিমুখে নীরব সম্ভাষণ আদান-প্রদান হইল, অগ্রসর হইল দীপন। সে স্থির করিয়াছে, প্রথমেই প্রধান আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিবে। তাঁহার হাতে তুলিয়া দিবে বৃন্দা-লিখিত সাংকেতিক-টীকা। আচার্য্য অতঃপর নিজস্ব বিবেচনায় যাহা করিবেন তাহাই শিরোধার্য। মহাগুরু দীপঙ্করের স্বহস্তে লিখিত কামসূত্র টীকাভাষ্য সে আনিতে পারে নাই। ব্যর্থ হইয়াছে দায়িত্ব পালনে। এই ব্যর্থতা তাহাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করিতেছে অহর্নিশ। এই অপরাধে আচার্য্য তাহাকে কোনও শাস্তি প্রদান করিলে, তাহাও সে মানিয়া লইবে।

রক্তিম সূর্য্য ক্রমশ পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িতেছে। দিনের আলো বিলীন হইতেছে ধীরে। ফটকের নিকট দুইজন ভোটদেশীয় মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী পরস্পর কথা বলিতেছে। সম্ভবত লোচাব। আগে দেখিয়াছে কী না মনে করিতে পারিল না। আজ মহাবিহারে ভোটদেশীয় সন্ন্যাসীদের সক্রিয়তা চোখে পড়িতেছে। কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিয়াছে কি? কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রধান প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল।

প্রধান দ্রব্য সরবরাহকারী দীপনকে দুই দ্বাররক্ষী চিনিলেন বিলক্ষণ, অন্দর-প্রবেশের অনুমতি দিলেন হাসিমুখে। বিহারের প্রধান প্রবেশ দ্বারে খোদিত নাগার্জ্জুনের মূর্তির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফটক অতিক্রম করিল দীপন। অগ্রসর হইল আচার্য্যের ভবনের দিকে। বিহারের কেন্দ্রে তথাগত'র এক পূর্নাবয়ব মূর্তি ও একটি মন্দির। প্রণাম করিল মাথা নত করিয়া। বিজ্ঞানভবন অতিক্রম করিয়া আচার্য্য ভবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, পথ রোধ করিল দুইজন মুণ্ডিতমস্তক ভোট-সন্ন্যাসী।

‘দীপন, আচার্য্য মন্দিরে আছেন, আপনাকে ওইখানে দেখা করতে আদেশ দিয়েছেন।’

মহাবিহারের চারিদিকে অষ্টোত্তর শত মন্দির। গুহ্যতন্ত্র অধ্যয়নের স্থান। আচার্য্য এইস্থানে কী করিতেছেন? রৌদ্র’র পিঠ হইতে নামিল দীপন। পিছনে আলতো চপেটাঘাত করিয়া ইঙ্গিত করিল। অশ্বশালার দিকে ধীরে অগ্রসর হইল রৌদ্র।

‘কোন মন্দির?’
‘চেনরেজি। অবলোকিতেশ্বর।’

সন্ন্যাসীরা মন্দিরের উদ্দেশ্যে পা চালাইল। তাহাদের পিছন পিছন দীপন। প্রায়ান্ধকার পরিবেশ। রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী গৃহে গৃহে দীপ ও মশাল জ্বালাইতে ব্যস্ত। নিজ নিজ সত্রে চলিয়া গিয়াছে শিক্ষার্থীসকল। চারপাশ নিঝুম ও নির্জন।

মহাবিহারের পশ্চিম সীমানার প্রাচীর সংলগ্ন অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করিল সন্ন্যাসীদ্বয়। চত্ত্বর অতিক্রম করিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল তাহারা। মন্দিরের গর্ভগৃহে না থাকিয়া আচার্য্য উপরে কী করিতেছেন? প্রশ্ন না করিয়া সন্ন্যাসীদ্বয়ের পিছন পিছন সিঁড়ি ধরিল দীপন।

মন্দিরের দ্বিতলে প্রশস্ত চত্ত্বর। পাশেই প্রাচীর। নীচে গঙ্গা। আকাশে সামান্য রক্তাভা রাখিয়া সূর্য্য অস্তে। আকাশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চত্ত্বর দেখিল দীপন। আচার্য্য কোথায়? পাঁচ-ছয় জন ভোট-সন্ন্যাসী যেন তাহারই জন্য অপেক্ষমান। চত্ত্বরে উপস্থিত হইতেই তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল তাহারা। সিঁড়ির পথও রুদ্ধ করিয়া পাহারায় দাঁড়াইল দুইজন।

‘মূর্তি আর অতীশের টীকাভাষ্য আমাদের দাও দীপন!’ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে এক সন্ন্যাসী কহিল।

কোনও ভণিতা না করিয়া সন্ন্যাসী সরাসরি মূল বিষয়ে প্রবেশ করিল। বিস্মিত হইল দীপন। উজ্জয়িনীতে যাহা শেষ হইয়াছে, বিক্রমশীলেই তাহা পুনরায় আরম্ভ হইল! প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করিল দীপন, কিন্তু একজনকেও চিনিতে পারিল না। দীর্ঘদিন সে এই মহাবিহারের সহিত যুক্ত, মহাবিহারে উপস্থিত ছয়-সাতজন ভোট-সন্ন্যাসী বা লোচাবের একজনকেও সে চিনিতে পারিবে না, ইহা অসম্ভব!

'তোমরা কারা? বিহারে আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!'
'আমরা ভোটদেশ থেকে সদ্য এসেছি!' একজন কহিল।
'তথাগত'র মূর্তি আর টীকাভাষ্য উদ্ধার করতে!' অপর এক সন্ন্যাসী কহিল।
'আমার কাছে নেই!'
'মিথ্যা! উজ্জয়িনীতে এক গণিকা তোমায় মূর্তি দিয়েছে!'
'তুমি বালপোয় গিয়েছিলে, স্বয়ম্ভূচৈত্যে তোমাকে ব্রোম তোনপা জলবেই-জুং-নে অতীশের টীকা দিয়েছে!'

চাপা স্বরে পরপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিল ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীগণ। পুনরায় সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া সামান্য বিরতি লইল দীপন।

'সে টীকা আমার কাছে নেই!' দৃপ্তস্বরে বলিল সে।
'কোথায় সেই টীকা?'
'উজ্জয়িনীর রক্ষীরা পুড়িয়ে দিয়েছে!'
'জানি। গণিকার সাংকেতিক অনুবাদ চাইছি আমরা!'
'আচার্য্যকে দেব, তোমাদের দেব কেন?'

চকিতে ছুরিকা বাহির করিল এক সন্ন্যাসী। ক্রমে সকলের হাতেই উঠিয়া আসিল অস্ত্র। ইহারা যে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ভোট-দস্যু আর কোনও সন্দেহ রহিল না। মহাবিহারের অন্দরে এমত বিপদের মধ্যে সে পড়িবে, কখনও ভাবিতে পারে নাই দীপন। তথাপি ভীত হইল না। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ চিন্তা করিল। ইহারা কি উজ্জয়িনী হইতেই

তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে? যে ভোট-দস্যুরা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহারা কি তাহাদের লোক? শর্ব্বিলকের যোদ্ধারা দস্যুদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করিয়াছিল! দস্যুরা নিশ্চয়ই সংখ্যায় আরও অধিক ছিল!

'দাও দীপন!' হাতে ছুরিকা কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত সন্ন্যাসীর।
'আচার্য্যকে দেব, তোমাদের নয়!'
'আচার্য্য তোমাকে বালপো-ভোট সীমান্তে কেন পাঠিয়েছিলেন আমরা জানি দীপন।'
'তাহলে চাইছ কেন?'
'মূর্তি দাও। আচার্য্য তোমাকে কোনও মূর্তি আনার দায়িত্ব দেননি!' অন্য এক সন্ন্যাসী কহিল।
'উজ্জয়িনীর এক মিত্র আমাকে মূর্তিটি উপহার দিয়েছে, তোমরা সেই মূর্তি চাইছ কেন?'
'তোমার সেই গণিকা মিত্র আমাদের পবিত্র মূর্তি চুরি করেছে!'
'চুরি করেছে!'
'অবিশ্বাস করছ! সে নিজেই তোমাকে সত্য বলবে!'
'সে তো উজ্জয়িনীতে, তাকে পাব কোথায়!'
'তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

অবাক হয় দীপন। উজ্জয়িনীর বৃন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে কী উপায়ে? ইহারা কী বলিতে চায়!

'সে এখন আমাদের অধিকারে!'
'মানে!'
'দেখা করতে চাও তার সঙ্গে?'

সহসা ভাসিয়া উঠিল বৃন্দার মুখ। তাহার আশ্লেষ। বৃন্দা আসিয়াছে এই বিক্রমশীলে? কিন্তু 'অধিকার' শব্দ কানে বাজিতেই শঙ্কা জাগিল, নিরাপদে আছে কি বৃন্দা!

‘বৃন্দাও তোমার কথা বলছিল!’ এক সন্ন্যাসী কহিল।

বৃন্দা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে? পিনাকেতে কি লাগিল টঙ্কার! দৃশ্যত চঞ্চল হইল দীপন।

‘বৃন্দার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে মহাবিহারের বাইরে যেতে হবে। যাবে?’

ইতিবাচক মাথা নাড়িল দীপন। বৃন্দার সহিত দেখা করিবে না, ইহা হইতে পারে!

‘মূর্তি দাও আগে, তারপর দেখা!’
‘না, আগে দেখা করব, তারপর দেব!’ কঠোর স্বর দীপনের।

বৃন্দার প্রসঙ্গে চিত্তচাঞ্চল্য হইলেও, আহ্লাদে ভাসিল না সে। অচেনা-অজানা এই ভোটদস্যুদের বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই!

ইঙ্গিত করিল এক সন্ন্যাসী। ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া ইহাকেই দলের পাণ্ডা মনে হয়। আদেশ পাইয়া অন্য এক সন্ন্যাসী অগ্রসর হইল চত্বরের কিনারায়। মুখ বাড়াইয়া দেখিল নীচে। অতঃপর দীপনকে আসিতে ইঙ্গিত করিল। অগ্রসর হইল দীপন।

নীচে মন্দির সংলগ্ন মহাবিহারের পশ্চিম দিকের প্রাচীর। তাহার পিছনে একটি মস্ত প্রস্তরখণ্ড। অতিথি ও অভিভাবকদের জন্য নির্ম্মিত ধর্ম্মশালার পাশে ছিল এমনই এক প্রস্তরখণ্ড। পিতার সহিত প্রথমদিন আসিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া বিশাল নদীর শোভা দেখিয়া ছিল বালক দীপন। পাথরের টুকরা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া ছিল দূরে। সেই পাথর বিলীন হইয়া ছিল নীচে গঙ্গাগর্ভে। মনে পড়িয়া গেল সহসা সেই দিনের স্মৃতি।

বিশাল প্রস্তরখণ্ডের পাশে অনতিবিশাল আরও এক প্রস্তরখণ্ড। কিন্তু সেই প্রস্তরখণ্ডে দণ্ডায়মান ও কে? ছাদের কিনারায় আসিয়া নীচে তাকাইতেই স্মৃতিকাতর হইল কিন্তু

পরক্ষণেই চমকাইয়া উঠিল দীপন। প্রায়ান্ধকারেও নিশ্চিত চিনিয়া ফেলিল সেই মুখ।

রজ্জু বাহিয়া মন্দিরের ছাদে উঠিয়া আসিল বৃন্দা। পিছনে এক সন্ন্যাসী-দস্যু। অনিমেষ চাহিয়া রহিল দীপন, বৃন্দার দিকে। বৃন্দার চোখেও চঞ্চলতা। সেই গভীর দৃষ্টি। সেই শারীরিক বিভঙ্গ। প্রস্ফুটিত ঠোঁট। মৃণালভুজ। বর্তুল স্তন। তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না অসহায় কাঁচুলি। গভীর নাভিমূল। কৃশ কটিদেশের নীচে প্রশস্ত শ্রোণি। কলাগাছতুল্য উরু। কিন্তু সব কিছু অতিক্রম করিয়া, দীপন কেবল চাহিয়া রহিল ব্যাকুল দুই চোখের দিকে। দিপন বিন্দা মিলি মিলি মাঙ্গা / বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা। এই নারীর সঙ্গে আর মহাসুখে থাকিতে পারিল কই!

'এবার দাও!' হাত বাড়াইয়া কহিল এক সন্ন্যাসী।
'কী?'
'মূর্তি!'
'দীপন, দেবে না ওই মূর্তি! ওই মূর্তি আমার!' চিৎকার করিয়া উঠিল বৃন্দা।
'তুমি চুরি করেছ ওই মূর্তি!' এক সন্ন্যাসী কহিল।
'চুরি করিনি, উপহার পেয়েছি! ভোটদেশীয় একজন সাধক উপহার দিয়েছিলেন!'
'বৃথা তর্ক করে সময় ব্যয় করতে চাই না, আমাদের তাড়া আছে।'

আবার ইঙ্গিত করিল দলের পাণ্ডা। দুইজন অগ্রসর হইল দীপনের দিকে। হঠাৎ দীপন ও দস্যু দলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল বৃন্দা। তাহার হাতেও ছুরিকা।

'এক পা এগোলে চিরে দেব!'

খানিক পিছু হঠিল দস্যুদ্বয়। হতচকিত দীপন সম্বিত ফিরিয়া পাইল। সে-ও বাহির করিল ছুরিকা। দুইজনে এমনভাবে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল, দস্যুগণ সকলে চত্বরের এক দিকে আসিয়া জড়ো হইল। একদিকে সাতজন মুণ্ডিতমস্তক চীবর-পরিহিত ভোট-দস্যু, অন্যদিকে তাহারা দুইজন। ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দা ও দীপন ছাদের কিনারায় আসিয়া পড়িল।

‘দীপন, লাফাও!’

ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্তেই এক দস্যু ছুঁড়িল ছুরিকা। বৃন্দার বামবাহুতে সেই ছুরিকা আমূল বসিয়া গেল। ছুরিবিদ্ধ বাহু লইয়াই লাফাইল বৃন্দা। দীপনও। প্রস্তরখণ্ডের পাশে ঝোপে পড়িল দুইজন। দস্যুগণ ছাদের কিনারায় আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। চকিতে নিজের ছুরিকা ছুঁড়িল দীপন উপরে তাক করিয়া। সোজা গিয়া বিঁধিল এক ভোটদস্যুর কণ্ঠে। ধুপ করিয়া পড়িল সে নীচে। বাম বাহু হইতে ততক্ষণে ছুরিকা বাহির করিয়া বৃন্দা উপরে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়াছে। আরও একজন দস্যু ভূপতিত হইল। কিন্তু অন্তত পাঁচজন দস্যু লাফ দিয়া দ্রুত নীচে নামিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল। তাহাদের হাতে আর অস্ত্র নাই। দস্যুদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র।

‘মূর্তি আর পুঁথি দাও দীপন! আত্মসমর্পণ কর! প্রাণে মারব না! মূর্তি আর পুঁথি নিয়ে আমরা এক্ষুণি বিহার ত্যাগ করব!’ চিৎকার করিল পাণ্ডা।

বৃন্দা ও দীপন তাকাইল পরস্পরের দিকে। বৃন্দার চোখে অবিশ্বাস দেখিল দীপন। এই দস্যুদের বিশ্বাস করা যায় না। মুহূর্তের অসতর্কতা। ছাদ হইতে রজ্জুর ফাঁস আসিয়া দুইজনের গলায় বসিল। সহসা বন্দী হইল তাহারা। দুই হাতে কণ্ঠ হইতে রজ্জুফাঁস আলগা করিতে চাহিলেও সফল হইল না। হা-হা করিয়া অট্টহাসি হাসিল দস্যুদল।

কিন্তু সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে না দীপন। রজ্জু ধরিয়া অসীম শক্তিতে টান মারিতেই উপর হইতে এক দস্যু হুমড়ি খাইয়া পড়িল নীচে। সফল হইয়া বৃন্দার কণ্ঠলগ্ন রজ্জু ধরিয়াও মারিল টান। অপর দস্যুও নীচে পড়িল।

এক দস্যু আসিয়া দীপনের কটিবন্ধে হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিলে বৃন্দা তীব্র পদাঘাত করিল। ছিটকাইয়া পড়িল দস্যু। অপর এক দস্যু ক্রুদ্ধ হইয়া ছুরিকা ছুঁড়িল বৃন্দার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া। দীপন নিজ শরীর দিয়া বৃন্দাকে আড়াল করিল। ছুরিকা বিঁধিল তাহার পৃষ্ঠে।

এক টানে ছুরিকা বাহির করিয়া বৃন্দা নিপুণ হাতে দস্যুকে পাল্টা আঘাত করিল। সে দস্যু লুটিয়া পড়িল মরণের কোলে। অবশিষ্ট দস্যুগণ প্রত্যেকে ছুরিকা তাক করিল।

তাহারা ছুরিকা ছুঁড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্তেই ঘটিল অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। সহসা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল বৃন্দা-দীপন। গভীর আশ্লেষে পরস্পর পান করিল ওষ্ঠ। মুহূর্তের জন্য স্থির হইল দস্যুদল। ওষ্ঠ আলগা করিয়া দীপনের আলিঙ্গন মুক্ত হইল বৃন্দা। অতঃপর চিৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্তে দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল তাহার সর্বাঙ্গে। অগ্নিবলাকার মধ্যে বৃন্দা। মুখে হাসি। প্রসারিত করিল দুই হাত দীপনের দিকে। মোহিত দীপন পুনর্বার আলিঙ্গন করিল বৃন্দাকে। দুই শরীর এক হইল। অগ্নিবলয় ঘিরিল তাহাদের। দস্যুগণকে বাকরুদ্ধ করিয়া অতঃপর আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই শরীর ঝাঁপাইল নীচে। দাউদাউ অগ্নিপিণ্ড ধাবিত হইল নদীর দিকে। ঝপ করিয়া শব্দ হইল গঙ্গাগর্ভে। স্রোতে ভাসিল সেই অগ্নিপিণ্ড। দীপন ও বৃন্দা সত্যি সত্যিই মিলিল একে অপরে চিরকালের জন্য। দিপন বিন্দা মিলি মিলি মাঙ্গা / বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।

ভাসিয়া চলিল দুই দগ্ধ দেহ গঙ্গার প্রবল স্রোতে। অন্ধকার। নিঝুম রাত নামিতেছে। কেবল একটি অশ্ব গঙ্গার পাড় ধরিয়া ছুটিয়া চলিতেছে গঙ্গার স্রোতের পাশে পাশে। কয়েক মুহূর্ত, পরপর দুই-তিনটি ছুরিকা আসিয়া বিঁধিল অশ্বের ঘাড়ে-পিঠে। ছিটকাইয়া গঙ্গাবক্ষে পড়িল অশ্ব। লাল হইল স্রোত।

আলিঙ্গনাবদ্ধ দগ্ধ দুই দেহের পিছনে ভাসিয়া চলিল এক মনুষ্যেতর শরীর। রৌদ্র।

গভীর রাত। নামচি। দক্ষিণ সিকিম।

দাউদাউ আগুনের বলয় চরাচর জুড়ে। পুড়িয়ে দিচ্ছে দুনিয়া। সেই আগুনের গ্রাস থেকে নিস্তার নেই কারো। এই আগুনে কি বলি হবে নিবেদিতা? কবীর খান? এমনকী ছোট্ট শিশু অর্হৎ? ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যেতেই চারপাশে অন্ধকার দেখল ডিকে। সামান্য সময় নিয়ে

ঠাহর করতে পারল, নামচি'র হোটেলে শুয়ে আছে সে। পাশের খাটে ঘুমোচ্ছে রিয়াজ। মোবাইলে সময় তিনটে চল্লিশ। আবার চোখ বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না।

ঠিক সেই সময় সামদ্রুপ্টসে ঞিংমা-পা গুম্ফা থেকে বেরোল দুটো এসইউভি। দামথাং বাজার পেরিয়ে রাভাংলার দিকে গাড়ি এগোতেই তাদের আটকাল পুলিশের টহলদারি জিপ। দু'জন কনস্টেবল ও দু'জন ইন্সপেক্টর এগিয়ে এলেন। প্রথম এসইউভি'র জানালার কাচ নামালেন চালক। ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন এক কনস্টেবল।

একটি চিতা। টর্চের আলো চিতার মুখে পড়তেই জ্বলজ্বল করে উঠল সবুজ চোখ। পাশে মুণ্ডিতমস্তক এক লামা উপবিষ্ট মাঝের আসনে। শান্ত দৃষ্টি। চমকে ওঠেন ইন্সপেক্টরসহ উপস্থিত পুলিশকর্মীরা। সমীহ ও ভয়ের এক যৌথ শীতলধারা নেমে যায় শিরদাঁড়া বেয়ে। শ্রদ্ধামিশ্রিত শঙ্কায় নমস্কার করে সরে যায় প্রত্যেকে। এগিয়ে যায় দুটি গাড়ি।

১৩৬

২৩ অক্টোবর। নামচি। দক্ষিণ সিকিম।

'ঠিকই শুনেছেন, টাইগার সামদ্রুপ্টসে-তে ছিল, বেরিয়ে গেছে!' বললেন রিঞ্চেন লামা।

'এখন কোথায় আছেন?' ডিকের প্রশ্ন।

'বলা কঠিন। তবে ও থাকে বেশি তাগশাং গুম্ফায়।'

'সেটা কোথায়?'

'লাচুং।'

'সে তো বহুদূর!'

'নর্থইস্ট সিকিম!'

'আমরা এখন আছি সাউথ সিকিমে, আর লাচুং নর্থইস্ট! কতক্ষণ লাগবে যেতে?'

'গাড়িতে ঘণ্টা পাঁচেক!'

‘পাঁচ ঘণ্টা!’

রিঞ্চেন লামার কথা মতো তাকে সকালই সকালই ফোনে ধরে ডিকে। তিনি এই মুহূর্তে নামচি গুম্ফায় আছেন। ডিকেকে গুম্ফায় আমন্ত্রণ জানান। অনুরোধ করেন সঙ্গে পুলিশ না-আনতে। ডিকে ও রিয়াজ দ্রুত তৈরি হয়ে ওঠে গাড়িতে। তাদের ‘সানরাইজ’ হোটেল থেকে খুব দূরে নয় নামছি গুম্ফা। মিনিট পাঁচ-ছয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যায় তারা। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর সরাসরি প্রসঙ্গে আসে ডিকে।

‘লামা রিঞ্চেন, আপনি সামদ্রুপ্টসে-তে না-গিয়ে নামচিতে হল্ট করলেন কেন?’
‘আপনারা পেছনে পুলিশ দিয়ে আমার প্ল্যান নষ্ট করলেন! টাইগারের সঙ্গে আমার মুভমেন্টের মোডালিটিজ নিয়ে বিরোধিতা আছে, আলটিমেট গোল নিয়ে নেই! আমি আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারব না! নেভার!’ লামা রিঞ্চেনের কণ্ঠে দৃঢ়তা।
‘আপনি আপনার আন্দোলন নিয়ে ভাবছেন, আমরা একটি শিশুসহ তিনজন মানুষের মুক্তি নিয়ে ভাবছি!’
‘হাতে মাত্র দু’দিন আছে, পঁচিশের সকালে টাইগার বাচ্চাটাকে দীক্ষা দেবে, তারপর বাচ্চাটাকে কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে কেউ জানবে না!’
‘কেউ জানবে না মানে!’ বিস্ময় রিয়াজের।
‘গোটা হিমালয়ে কত গুম্ফা আছে জানেন? কয়েক হাজার! কোন গুম্ফায় ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে জানাই যাবে না!’
‘নিবেদিতা আর কবীর খান?’ ডিকে জানতে চায়।
‘ওনাদের ব্যাপার এখনও জানি না!’
‘এখন সামদ্রুপ্টসে গুম্ফায় যাওয়া যাবে, লামা?’ ফের ডিকের জিজ্ঞাসা।
‘যাওয়া যেতে পারে, বাট নো পুলিশ!’
‘আমরা দু’জন যাব আপনার সঙ্গে! প্লিজ!’
‘চলুন!’

উঠে পড়ে সকলে। লামা রিঞ্চেন তাঁর গাড়িতে ওঠেন। পেছনে ডিকেদের গাড়ি। ঘড়িতে প্রায় আটটা। ফোন বেজে ওঠে ডিকের। গৌরাঙ্গ।

‘বলুন গৌরাঙ্গ?’
‘সকালে মেলবক্স চেক করতে গিয়ে একটা মেল পেলাম—গতরাতে, দুটো কুড়ি নাগাদ অজানা কেউ পাঠিয়েছে!’

গড়গড় করে মেল-বৃত্তান্ত বলে গৌরাঙ্গ। চুপ করে শোনে ডিকে।

‘শেষে লেখা নো রিপ্লাই। আপনাকে স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছি, একটু দেখুন, আমার তো খুবই ভয় লাগছে ডিকেবাবু! নিবেদিতা—’
‘পাঠান, দেখছি! আপনি রিপ্লাই দেবেন না, যিনি আপনাকে খবর দিয়েছেন তিনি বিপদে পড়তে পারেন!’

সশব্দ বার্তা ঢোকে ফোনে। স্ক্রিনশট দেখে ডিকে। বিষয়ে লেখা নিবেদিতা বাল্মীকি। ভেতরে দু’চারটে শব্দ ভুল বানানে লেখা—নিবেদিতা ডেঞ্জার। ফেস্টিভ্যাল! লাইট! চু থং! চু থং! নো রিপ্লাই।

ইন্টারনেট খুলে দেখে নেয় চু থং-এর অর্থ। চু থং তিব্বতি সংখ্যা। দশ হাজার। নিবেদিতার বিপদ কেন, টেলিগ্রামের মতো ছোট্ট মেল-এ স্পষ্ট হয় না। তবে এটুকু বোঝা যায়, আলোর উৎসবে নিবেদিতার বিপদ। কিন্তু এখন প্রশ্ন, এই আলোর উৎসব কোথায় হবে? লাচুং-এ? সামদ্রুপ্টসে গুম্ফা ছেড়ে চলে গেছেন টাইগার লামা, সেখানে কি হতে পারে? টাইগার ফিরেও আসতে পারেন সেই গুম্ফায়। সামদ্রুপ্টসে গুম্ফা সরজমিন দেখতে উন্মুখ সে।

বিপজ্জনক বাঁকের মুখে গতি কিছুটা কমান চালক, নচেৎ গতি বাড়িয়ে দক্ষ হাতেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন গাড়ি। পাহাড়ি পথে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিক্রম

করেন। গুরু পদ্মসম্ভবের বিশাল মূর্তি ঘিরে প্রশস্ত চত্বর। পাশেই গুম্ফা। রিঞ্চেন লামার গাড়ি ঢোকে গুম্ফায়।

পিছু পিছু ডিকেদের গাড়িও পেরিয়ে যায় গুম্ফার ফটক। ভেতরে বিশাল চত্বর। রঙিন লুংদার আর দারচেন ধ্বজায় মোড়া গোটা গুম্ফা। যেন কোনও উৎসবের প্রস্তুতি। গাড়ি থেকে নেমে ডিকে ও রিয়াজ অনুসরণ করে রিঞ্চেন লামাকে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রিয়াজ কেবল গুরু পদ্মসম্ভবের বিশালাকার মূর্তি দেখে। লামাকে স্বাগত জানান গুম্ফায় উপস্থিত অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। চোখের ইশারায় রিয়াজকে এগোতে বলে গুম্ফার অন্দরে প্রবেশ করে ডিকে। লামা রিঞ্চেনের পিছু নেয় রিয়াজ।

উপাসনাগৃহে দু'জন সন্ন্যাসী সম্ভবত পূজার আয়োজন করছেন। জুতো খুলে ঢুকে পড়ে ডিকে। দেওয়ালের গায়ে উঁচু বেদিতে শাক্যমুনির মূর্তি। বেদির সামনে কাঠের মেঝেয় লাল কার্পেটের ওপর বিশাল মণ্ডল। মণ্ডলের ওপর প্রদীপ। তথাগত'র ডান দিকে গুরু পদ্মসম্ভবের বিশাল মূর্তি। আছেন তিন বোধিসত্ত্ব। মঞ্জুশ্রী। অবলোকিতেশ্বর। বজ্রপাণি। অবলোকিতেশ্বরের পাশে আছেন দেবী তারা। তবে সকল দেব-দেবীর মূর্তি নেই। অনেকেই আছেন দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রে। দেওয়ালে ঝুলছে বিশালাকার থাংকা। তাদের গায়ে অঙ্কিত বৌদ্ধ দেবদেবীর চিত্র।

মণ্ডল ঘিরে চারজন লামা মন্ত্রোচ্চারণ করছেন অনুচ্চস্বরে। সুললিত মন্ত্রোচ্চারণের মৃদু সুর ছড়িয়ে পড়ছে বিশাল কক্ষে। সাধারণ দর্শনার্থীর মতো এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে, উপাসনাগৃহের দক্ষিণের দরজার দিকে এগোয়। সিঁড়ির পাশে সরু একফালি গলি। গলি পেরিয়ে অনতিপ্রশস্ত এক চত্বর। চত্বরের ডাইনে একটি ঘর। অন্ধকার সেই ঘরে না-ঢুকে সরু করিডোর ধরে এগিয়ে যায় ডিকে। করিডোর পেরোতেই ডান দিকে একটি ঘর। আলো-অন্ধকার। ডিকে মুখ বাড়ায় সেই ঘরে। কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন এক সন্ন্যাসী। ডিকের ছায়া পড়তেই তিনি চকিতে মুখ ফেরান। সরে যায় ডিকে।

'কে? কে ওখানে?'

সন্ন্যাসীকে ফাঁকি দিয়ে সরু করিডোর ধরে আবার দক্ষিণের ঘরের সামনে আসে দ্রুত। এদিক-ওদিক দেখে ঢুকে পড়ে ঘরে। ঘর নয়, অলিন্দ। পায়ে পায়ে এগোয় আলো-অন্ধকার অলিন্দ। অলিন্দ পেরোতেই একটি ঘর, তার দরজায় একটি স্টাফড চিতা। ঘরে জ্বলছে ছোট্ট একটি প্রদীপ। চারিদিকে বৌদ্ধ দেবদেবীদের মূর্তি। তাদের চেহারা ভয়ঙ্কর। মুখমণ্ডলে ক্রোধ। থামের গায়ে ঝুলছে বড় বড় মুখোশ। ঘরের উত্তরে একটা দরজা। এগোয় ডিকে।

সন্তর্পণে পেরোয় চৌকাঠ। ঘরের ভেতরে বিজলিবাতি। অপর্যাপ্ত আলো কিন্তু ঘরে ঢুকে সেই আলোতেই চমকায় সে। লামা রিঞ্চেন বসে আছেন সোফায়। উল্টোদিকে রিয়াজ।

‘গুম্ফা দেখা হল? যে-ঘরের ভেতর দিয়ে এলেন ওটা গুম্ফার সবথেকে পবিত্র ঘর। গোন থাং! ওটা ধর্মপালদের জায়গা!’ হেসে বলেন লামা রিঞ্চেন।

অপ্রস্তুত ডিকে রিয়াজের পাশে গিয়ে বসে। অস্বস্তি এড়াতে সরাসরি আক্রমণের রাস্তাই শ্রেয়। সেই পথই নেয় ডিকে।

‘আপনারা যা-ই প্ল্যান করুন লামা রিঞ্চেন, চায়না কি আপনাদের ছেড়ে দেবে? এটা একটা পলিটিক্যাল হারাকিরি হয়ে যাচ্ছে না!’

রিঞ্চেন লামার ভাবলেশহীন মুখে যেন সামান্য বিস্ময়, দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় আবার। তিনি চুপ করে বসে থাকেন কিন্তু বিস্ময়মৌন নন। চুপ থাকে না ডিকে।

‘উইঘুর লিবারেশন আর্মি আপনাদের সঙ্গে আছে?’

জবাব দেন না লামা। তাঁর মাথায় যেন অন্য চিন্তা। অপেক্ষায় থাকে ডিকে।

১৩৭

ডিকের পাশে বসে নীরব প্রতীক্ষা রিয়াজেরও। সোফার কাঠের হাতলে ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে নিঃশব্দ টোকা মারে। করতল সরাতেই কাঠের হাতলে নজরে পড়ে দুটি অক্ষর। এনবি। কঠিন কোনও বস্তু ঘষে কাঠের গায়ে লেখা। খোদাই বলা যাবে না, খুবই হালকা আদল সেই অক্ষরদ্বয়ের। নিমেষে চিনে ফেলে নামের আদ্যক্ষর। ছোট্ট এই স্বাক্ষর তার স্মরণে আছে। পকেট থেকে বার করে ওয়ালেট। হাতে নেয় সযত্ন-রক্ষিত কার্ড। নিবেদিতা বাল্মীকি। অ্যাসিট্যান্ট এডিটর। ভোরের কাগজ। উল্টে দেখে অপর দিক। এনবি। ছোট্ট ইনিশিয়াল করে এই কার্ড তাকে দিয়েছিল নিবেদিতা, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কাফেটেরিয়ায়।

'হাতে মাত্র দু'দিন আছে, আজ আর কাল, এর মধ্যে বাচ্চাটাকে রেসকিউ করতে হবে! তাওয়াং থেকে লাদাখ, অসংখ্য গুম্ফার মধ্যে থেকে কীভাবে খুঁজবেন বাচ্চাটাকে, আগে এটা ভাবুন!' রিঞ্চেন লামা বলেন।
'আপনিই বলুন লামা!'
'এই মুহূর্তে লাচুং যেতে হবে—টাইগার বাচ্চাদের ওখানেই দীক্ষা দেয়!'

নীচু গলায় ডিকেকে অক্ষর-পর্ব জানায় রিয়াজ। নিবেদিতার কার্ড দেখায়। ডিকে ঝুঁকে দেখে কাঠের হাতলে উৎকীর্ণ নিবেদিতার নামের আদ্যক্ষর। ঘটনা প্রকৃতি না-বুঝে চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন রিঞ্চেন লামা।

'লামা রিঞ্চেন, নিবেদিতা বাল্মীকি এই গুম্ফায় ছিলেন!' কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বলে ডিকে।

লামা রিঞ্চেন নিজের আসন ছেড়ে এগিয়ে আসেন। দেখেন নিবেদিতার ছোটো স্বাক্ষর। এক নজর দেখে গম্ভীর মুখে ফিরে গিয়ে বসেন চেয়ারে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে

বলেন, ‘লাচুং!’

‘নিবেদিতা বাল্মীকি, কবীর খান আর অর্হৎ বড়ুয়া—এরা কি আলাদা আলাদা জায়গায় আছে?’ ডিকে জানতে চায়।
‘প্রায়োরিটি বলুন কয়ালবাবু, কাকে প্রথমে রেসকিউ করতে চান? বাচ্চাটাকে নিশ্চয়ই!’ রিঞ্চেন লামার জিজ্ঞাসা।
‘তিনজনকেই উদ্ধার করতে হবে লামা! প্রত্যেকের জীবন মূল্যবান!’
‘আপাতত সাত বছরের শিশু অর্হৎ বড়ুয়াকে রেসকিউ করি চলুন!’
‘গাড়িতে লাচুং গেলে তো অনেকক্ষণ সময় লাগবে!’
‘গাড়ি ছাড়া উপায় কী মিস্টার কয়াল! চলুন এখনই বেরিয়ে পড়ি! এখন বেরোলে পৌঁছোতে বিকেল গড়িয়ে যাবে!’

রিয়াজের সঙ্গে আলোচনা করে ডিকে। লামার দিকে ফিরে বলে, ‘হেলিকপ্টারে গেলে সময় বাঁচবে!’

ফোনে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ শুরু করে রিয়াজ। লাচুং-এ হেলিকপ্টার নামার জায়গা একমাত্র সেনা-হেলিপ্যাড। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুমোদন প্রয়োজন। খবরাখবর আদানপ্রদান করে কিছুক্ষণের মধ্যেই চূড়ান্ত হয় যাত্রা। নিকটবর্তী নামচি’র হেলিপ্যাড থেকে হেলিকপ্টার উড়তে পারে আগামী এক ঘণ্টা থেকে সোয়া-ঘণ্টার মধ্যেই। পাইলট ছাড়া সর্বোচ্চ ছয় জন উড়তে পারে হেলিকপ্টারে। লামা রিঞ্চেন, ডিকে, রিয়াজ ও তাশি নামডোলের সঙ্গে সঙ্গী হবেন এসটিএফ-এর দু’জন কম্যান্ডো। লামা রিঞ্চেনের অনুরোধে প্রত্যেকে থাকবে সাধারণ পোশাকে।

সকলে দ্রুত গুম্ফা ছাড়ে। সামদ্রুপ্টসে থেকে নামচি হেলিপ্যাডের দিকে এগিয়ে যায় গাড়ি।

২৩ অক্টোবর। লাচুং। উত্তর-পূর্ব সিকিম।

‘এই প্রোগ্রামে কি দশ হাজার সন্ন্যাসী পার্টিসিপেট করবেন?’

ডিকের প্রশ্নে চমকে তাকালেন লামা রিঞ্চেন। তারপর জানালা দিয়ে মেলে দিলেন দৃষ্টি। সে দৃষ্টি উদাস। প্রায় হাজার দুয়েক ফুট নীচে সবুজ পাহাড় আর পাহাড়ের ঢালে সারি সারি বাক্সবাড়ি। উপত্যকার মাঝ-বরাবর বয়ে চলেছে নদী। হেডসেট কানে-মাথায় জুত করে বসিয়ে মাইক্রোফোনে প্রশ্ন করে ডিকে। লামা রিঞ্চেনও মাথায় বসিয়ে নিয়েছেন হেডসেট।

‘কোন প্রোগ্রাম?’ লামা রিঞ্চেনের উদাসীন প্রশ্ন।
‘আমি গেস করছি লামা, এমন একটা প্রোগ্রাম আপনারা অর্গানাইজ করছেন—যার হিস্টরি আছে, কিন্তু এত বড় মাপে আগে কখনও ঘটেনি।’ ডিকের উত্তর।
‘আপনি উইঘুরদের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, না?’ সরাসরি প্রসঙ্গে গেলেন না লামা রিঞ্চেন।
‘দোলকান ইসা ও রেবিয়া কাদীর কি আছেন আপনাদের সঙ্গে?’ ডিকে সরাসরি।
‘আমার জানা নেই।’
‘গোটা হিমালয় রিজিয়ন জুড়ে, ভারত, টিবেট, শিংজিয়াং—এই প্রোগ্রাম হবে?’
‘জানা নেই মিস্টার কয়াল! তবে উইঘুরদের প্রসঙ্গে বলি, টিবেট নয়, শিংজিয়াং-এর ডোমেস্টিক সিকিউরিটি এখন বেইজিং-এর কাছে টপ প্রায়োরিটি। কারণও আছে।’

আবার চুপ করে যান লামা। সামান্য বিরতি। তারপর নিজেই শুরু করেন কথা।

‘বেইজিং-এর ভয়, উইঘুর রেবেলরা ওয়েস্ট এশিয়ার ইসলামিক টেররিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড় নাশকতা ঘটাতে পারে। টেররিস্ট অ্যাটাকের খুব ভয় বেইজিং-এর। অবশ্য

কোন দেশ ভয় পায় না! সবাই পায়! কেবল এই কারণও নয়, আরও একটা মেজর কারণ আছে। চাইনিজ প্রেসিডেন্টের ড্রিম প্রোজেক্ট ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড উদ্যোগ। হোল এশিয়া এমনকী ইওরোপের সঙ্গে ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড কমার্সের একটা স্ট্র্যাটেজিক ক্রসরোড হল শিংজিয়াং। কোর এরিয়া। এই কোর এরিয়ার স্টেবিলিটি ওই ড্রিম প্রোজেক্টের জন্য খুব দরকার। শিংজিয়াং-এর মতো স্ট্র্যাটেজিক কোর এরিয়া অশান্ত হলে মুশকিল!'

'উইঘুররা তো ওটাই চায়! ইকোনমিক্যালি চায়নাকে আঘাত করতে না-পারলে আপনি তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না!' বলে ডিকে।

'উইঘুররা ওটা পারে, আমরা পারি না! টিবেটানরা করলে পাহাড়ি পোকা টিপে মারার মতো মেরে দেবে চায়না! ভবিষ্যতে ক্ষতি হবে আন্দোলনের—এমনিতেই দু'হাজার আট-এর বিদ্রোহের পর টিবেটে যেটুকু প্রতিবাদ সবই স্পোরাডিক। ছুটকো-ছাটকা আন্দোলন। বড় কিছু করাই যায়নি!'

'টিবেটানরা টোটাল নন-কোঅপারেশনে গেছেন বলে শুনেছি!'

'গেছে কিন্তু প্রবলেমও আছে। আমাদের দেশ গরিব—সেই সুযোগ নিয়েছে বেইজিং! চায়নার কাউন্টার-টেররিজম স্ট্র্যাটেজিও জবরদস্ত! শেন খোয়াঙ্গোয়াও'র নাম শুনেছেন?'

দু'দিকে মাথা নাড়ে ডিকে। না, অজানা নাম। হাসেন রিঞ্চেন লামা। জানালা দিয়ে মেঘের পালের দিকে তাকিয়ে বলে যান তার কথা। কী বিষয়ে কথা বলছেন লামা, প্রাথমিকভাবে ঠাহর করতে না-পারলেও দ্রুত ধরতে পারে ডিকে। নিবিষ্ট হয়ে শোনে লামা-কথা।

প্রথমে তিব্বত, তারপর শিংজিয়াং, নিরাপত্তা কৌশলে বড় বদল আনল চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি। আনলেন চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি বা সিসিপি'র এক নেতা। শেন খোয়াঙ্গোয়াও। হেনান প্রদেশ থেকে আগত শেন আঠের বছর বয়সে যোগ দেন পিএলএ-তে। গণমুক্তি ফৌজ-এর আর্টিলারি শাখায় চার বছর কাটিয়ে লেগে পড়েন কমিউনিস্ট পার্টির কাজে। ছোটোখাটো চেহারার শেন পছন্দ করেন লো-প্রোফাইলে থাকতে। প্রাক্তন সেনা শেন-এর হাতেই তিব্বতকে সঁপে দিল সিসিপি। অর্থনীতিতে মাস্টার্স শেন আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য কলোনিয়াল মডেলই ইতিহাস থেকে তুলে আনলেন। ব্রিটেন

বা জাপান যেভাবে নেটিভ পুলিশ দিয়েই স্বদেশের লোকের ওপর নজরদারি চালাত, শেন সেই মডেলই প্রয়োগ করলেন তিব্বতে।

বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষকে নিয়োগ করা হল পুলিশে। পাড়ায় পাড়ায়, মোড়ে মোড়ে, পাঁচশ মিটার অন্তর তৈরি হল পুলিশ ফাঁড়ি আর থানা। অত্যাধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে চূড়ান্ত নজরদারি। আধুনিক সিসিটিভি, অটোমেটেড সারভেইল্যান্স সিস্টেম, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে মুড়ে ফেলা হল এলাকা। এমনকী গুম্ফাগুলোও বাদ রইল না। ফলও মিলল হাতেনাতে। তিব্বতে দু'হাজার আট-নয় সালের পর খুব বড় কোনও আন্দোলন হয়নি। হতে দেওয়া হয়নি।

বছর পাঁচেক পরে তিব্বত যখন শান্ত, শিংজিয়াং ক্রমশ অশান্ত হচ্ছে, উরুমকিতে ঘটে যাচ্ছে দাঙ্গা, দু'শর ওপর লোক মরছে, তিব্বতে সাফল্যের পর শিংজিয়াং-এও শেনকে নিয়ে আসা হল শিংজিয়াং-এ পার্টির সম্পাদক করে। তিব্বতে এই সময়কালে আত্মাহুতি বা সাধারণ নজরকাড়ার চেষ্টা ছাড়া বড় কিছু ঘটেনি। কিন্তু উইঘুর বিদ্রোহীরা থানা বা জনসমাজে বড় আক্রমণ করেছে। এমনকী শিংজিয়াং-এর বাইরেও তারা আক্রমণ করেছে। এমনকী বেইজিং-এ আত্মঘাতী গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণ করিয়েছে! শিংজিয়াং-এ এসেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করল শেন। শেন-এর সাফল্য এতটাই যে তার জায়গা হয়ে গেল সিসিপি'র পলিটব্যুরোয়!

নেটিভ পুলিশ দিয়ে এই নজরদারি দেশের ভেতরে কোনও প্রভাব ফেলল না? ডিকের প্রশ্ন শুনে দীর্ঘ এক শ্বাস ফেলে লামা রিঞ্চেন বললেন,

'ইকনমিক কন্ডিশন যেখানে খুব ভালো নয়, সেখানে একটা মোটা মাইনের সরকারি চাকরি খুব বড় ব্যাপার! এক ঢিলে দুই পাখি মারল সিসিপি! এলাকাভিত্তিক নজরদারির একটা ডেন্স নেটওয়ার্ক তৈরি হল, আবার একইসঙ্গে পিছিয়ে-পড়া একটা জায়গায় এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটও হল! মানতেই হবে, এটা সিসিপি'র মাস্টারস্ট্রোক!'

‘এই ব্যাপক সিকিউরিটাইজেশন পলিসি’র কোনও ব্যাড ইমপ্যাক্ট নেই?’ আবার প্রশ্ন ডিকের।

‘আছে। প্রচুর সরকারি চাকরির প্রভাব পড়েছে সরকারি ট্রেজারিতে। নিরাপত্তার এত কড়াকড়িতে লেবারের ফ্রি-ফ্লো কমে গেছে। নিরাপত্তার জন্য ব্যবসার খরচ বেড়েছে। মেটাল ডিটেক্টর লাগাও, এয়ারপোর্টের মতো এক্সরে স্ক্যানার লাগাও, সিকিউরিটি অ্যালার্ম লাগাও, নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ কর, এর ফলে বিজনেসের খরচ বেড়েছে বিশাল। তাছাড়া এত টেররের মধ্যে কাস্টমারও আসে না। ফলে প্রচুর দোকান-পাটসহ বহু ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতায় চরম হস্তক্ষেপ যাকে বলে! ভাবতে পারেন, পারমিট ছাড়া আপনি আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যেতে পারবেন না! স্থানীয় থানা থেকে পারমিট নিতে হবে।’

‘ভয়ঙ্কর!’ বিস্ময় ডিকের।

‘এভাবে থাকা যায়! এর একটা লং টার্ম এফেক্ট আছে। সারফেস লেভেলে আপনি ভাবছেন সব ঠিক আছে, আসলে তলায় তলায় কিছুই ঠিক নেই। ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাড়ছে। একইসঙ্গে ইউনাইটেডও হচ্ছে।’

‘কোথায়? শিংজিয়াং-এ?’

‘টিবেটেও! দুই দেশেই একই ইমপ্যাক্ট!’

‘লামা রিঞ্চেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?’

‘বলুন?’

‘যা-ঘটতে চলেছে পরশু, আপনি কি এই প্রোগ্রাম সমর্থন করেন?’

কোনও উত্তর দিলেন না লামা। আবার জানালা দিয়ে ভাসিয়ে দিলেন চোখ। হেডসেট খুলে ঝুলিয়ে রাখলেন হ্যান্ডেলে।

হেলিকপ্টার ক্রমশ নিম্নমুখী। গন্তব্য এসে গেছে। লাচুং-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হেলিপ্যাডে নামল কপ্টার। কিন্তু বাধ সাধল গুম্ফা কর্তৃপক্ষ, তাঁরা রিঞ্চেন লামা ছাড়া অন্য কারোকে গুম্ফায় প্রবেশাধিকার দেবেন না। লামার অনুরোধে শেষপর্যন্ত অতিরিক্ত একজনের প্রবেশাধিকার অনুমোদিত হল। ডিকে রিয়াজকে পাঠাতে চাইল কিন্তু রাজি হল না রিয়াজ। তার যুক্তি, একজন যদি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পায়, ডিকে ছাড়া অন্য

কারোর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রিয়াজ ও তাশির অনুরোধে রিঞ্চেন লামা'র সঙ্গী হল ডিকে।

এখান থেকে ভারত-চিন সীমান্ত প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। সীমান্ত পেরোলেই তিব্বত। লাচুং থেকে মাউন্ট কাতাউ-এর দিকে পাহাড়ের ঢালে তাগশাং গুম্ফা। তিব্বতি ভাষায় তাগশাং মানে বাঘের গুহা। এই গুম্ফা টাইগার লামার নিজস্ব চণ্ডীমণ্ডপ।

পাহাড়ের কোলে উঠে যায় গাড়ি। গুম্ফার পেছনে দূরে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণি। শিশু অর্হতের সঙ্গে এই গুম্ফায় কি আছেন নিবেদিতা ও কবীর খান? বরফ-শীতল বাতাসে রহস্যের শিস।

রিঞ্চেন লামার সঙ্গে ডিকে প্রবেশ করে প্রাচীন ঞিংমাপা ধারার এই বৌদ্ধমন্দিরে।

১৩৯

২৩ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

চারিদিকে সাজসাজ রব। আসন্ন কোনও উৎসবের প্রস্তুতি গুম্ফা জুড়ে। সন্ন্যাসিনীরা নিবেদিতাকে ঘিরে থাকলেও আলাদা করে কেউ পাহারায় নেই। সকলেই কাজে ব্যস্ত। গুম্ফার ভেতর মস্ত চত্বরে চলছে তোড়জোড়। নিবেদিতা জানে গুম্ফা বদল হয়েছে রাতে। গাড়ি করে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন গুম্ফায়। কেবল তাকে নয়, সম্ভবত কবীর খানকেও। তার চোখজোড়া খুঁজে চলেছে একজনকে, কিন্তু তার দেখা নেই। তেনজিং। গত রাতের ঘটনার পর সেই বালক-সন্ন্যাসীর আর দেখাই মেলেনি।

চত্বর পরিষ্কার ও পবিত্র করছেন সন্ন্যাসীরা। গতকাল যে-গুম্ফায় ছিল নিবেদিতা, সেখানেও একই প্রস্তুতি চোখে পড়েছিল। এমন কোনও বড় অনুষ্ঠান আসন্ন, যা পালিত হবে সব

গুম্ফাতেই। নীরব নিয়মানুবর্তিতায় তেল-খাওয়া-মেশিনের মতো চলছে কাজ। একটা তাগড়া পাহাড়ি বাঁশ, গুম্ফার বিপরীতে, চত্বরের শেষ প্রান্তে আখাম্বা দাঁড়িয়ে। বাঁশের সঙ্গে রঙিন সুতোর প্রান্ত বেঁধে অন্য প্রান্ত মাটিতে টানটান করে নামিয়ে আনছেন কয়েকজন। ক্রমশ পিরামিডের আকৃতি নিচ্ছে সেই বাঁশ ও সুতোর কাঠামো। নিবেদিতার পাশে বসে ময়দা ঠেসে একটি পিণ্ড তৈরি করছেন এক সন্ন্যাসিনী। সেই পিণ্ড শেষমেশ রূপ নিল এক মানুষের মাথার খুলির, পিরামিডের কাঠামোর ওপর স্থাপিত হল সেই করোটি। তারপর শুরু হল বাজনা। কাঠামো ঘিরে আরম্ভ হল নাচ। নাচ শুরুর প্রক্রিয়াটি ভারি চমৎকার।

তামার তৈরি বিশাল লম্বা টেলেস্কোপিক ট্রাম্পেট ধরে নিয়ে এলেন দু'জন। শিঙাবাহকেরা শিঙা ধরে বসলেন হাঁটু গেড়ে। শিঙায় ফুঁ দিতে তৈরি অন্য লোক। বাদকেরা প্রস্তুত। তাঁদের কারও হাতে শাঁখ। কারও হাতে ঘণ্টা। ঝাঁঝ বা কর্তাল। একজনের হাতে ডমরুও। আছে ডমরুর মতোই দেখতে খুলি-ড্রাম। দুদিকে দুটো মড়ার খুলি দিয়ে তৈরি। এক লামার ইঙ্গিত পেয়েই বাদকেরা শুরু করেন বাজনা। কিছুক্ষণ বাজনা বাজার পর, তালে তালে গুম্ফার ভেতর থেকে নৃত্যস্থলে ঢুকলেন মুখোশ-পরা দু'জন নর্তক। লামার ইঙ্গিতে নৃত্যস্থলে প্রবেশের অভিনয়ই বারবার করতে হল নর্তকদের। তাঁদের মুখে ছোটো মুখোশ। নিবেদিতা বুঝতে পারল, আসন্ন নৃত্যানুষ্ঠানের মহড়া চলছে জোরকদমে।

নিবেদিতার পাশে এসে মোড়ায় বসলেন পাসাং লামা। মুখে হাসি। হাতে জপমালা। পাসাং লামাকে দেখেই গতকালের স্মৃতি আবার ফিরে আসে। মুখমণ্ডলে তার ছাপ পড়ে। সম্ভবত সেই কারণেই হালকা চালে কথা শুরু করেন লামা।

'পরশু আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে, চোংখাপা কর্‌মে উৎসব। বাটার ল্যাম্প ফেস্টিভ্যাল। সেদিন এই নাচ হবে। আগে দেখেছেন এই নাচ?'

লামার দিকে না-তাকিয়ে না-বাচক মাথা নাড়ে নিবেদিতা।

'এই নাচের নাম ছম। ধর্মীয় নৃত্য। কেবল পুরোহিত আর লামারাই করতে পারেন।'

প্রত্যুত্তরে কিছুই বলে না নিবেদিতা। পাসাং লামা তাঁর কথা বলেই চলেন। পাশে বসে একজন অনর্গল কথা বললে, কিছু কথা কানে যেতে বাধ্য। লামা ছম নৃত্যের ঠিকুজি-কুষ্ঠি নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা রাখছেন। লামা যা-বলছেন, সবই অজানা তার কাছে, ফলত, অচিরেই, সাংবাদিক নিবেদিতার কান ও মন, ছাড়পত্র দেয় পাসাং লামাকে।

'ছমের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বাগ-ছম। মুখোশ নৃত্য। গ্যাংটকে প্রতিবছর হয় এই নৃত্য। ছম নৃত্য মূলত লামাদের নৃত্য। খুবই বৈচিত্রপূর্ণ। একেকটি গুম্ফায় একেক রকম নৃত্য তাদের গোষ্ঠী অনুযায়ী হয়। আমরা ঞিংমা-পা গোষ্ঠী, আমরা গুরু পদ্মসম্ভবের স্টাইল ফলো করি। গুরু পদ্মসম্ভবের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

বেশ কয়েকবার কালিম্পং ভ্রমণ তাকে তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছে। সেই সূত্রে গুরু পদ্মসম্ভবের নাম তার জানা। তাছাড়া মিউজিয়াম থেকে মূর্তিচুরির প্রসঙ্গে পদ্মসম্ভবের কথা সে শুনেছে ডিকেবাবুর কাছে। পাসাং লামা গুরু পদ্মসম্ভব ও ছমনৃত্যের পরিচয় দেন নিবেদিতাকে। গুরু পদ্মসম্ভব ছাড়া তিব্বতে শাক্যমুনির ধর্ম প্রতিষ্ঠাই পেত না।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম চালু করার সবথেকে বড় বাধা ছিল পোন-পা উপ ও অপদেবতারা। গুরু পদ্মসম্ভব দেখলেন, এদের ঠান্ডা না-করলে বৌদ্ধধর্ম চালু করা যাবে না। তিনি ঠিক করলেন একটি নৃত্য করবেন। বজ্রকীলয় নৃত্য। উপদেবতাদের জয় করার নৃত্য। এই নৃত্যের মাধ্যমে জয় করে তিনি তিব্বতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম ধারা ঞিংমা-পা স্কুল শুরু করেন। তান্ত্রিক নৃত্যের একটা ধারাও এইভাবে শুরু হয়। অন্যান্য লামারা পরে এর অনুকরণেই প্রতিবছর এই নৃত্য করেন। দৈত্য-দানোদের পরাজয় আর পদ্মসম্ভবের জয়কে স্মরণ করে এই নাচ।

'সব গুম্ফাই ছম করে না। করতে পারে না। ছোটো ছোটো গুম্ফা একত্রে করে কোন নির্দিষ্ট জায়গায়। কমপ্লিট একটা ছম ডান্স একদিনে শেষ হয় না। সময় লাগে।'

নাচের ময়দানে এবার অনেক নর্তক। প্রত্যেকের মুখে ছোটো মুখোশ। নিবেদিতা অপলক। দুই মূল নর্তক চত্বরের মাঝখানে এসে সামান্য লাফিয়ে বিভিন্ন শরীরী বিভঙ্গে নাচ করেন। লাফ দেখে ছৌ নাচের কথা মনে পড়ে নিবেদিতার। পুরুলিয়ায় বহুবার ছৌনৃত্য দেখেছে সে। এমনকী বিখ্যাত ছৌ-গ্রাম চড়িদা নিয়ে তার প্রতিবেদনও আছে।

‘বালুঘড়ির মতো দেখতে ওই ইনস্ট্রুমেন্টটার নাম জ্ঞা-চুং। ডমরু। জাদুমন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে এখন, শুনুন কেমন তালে তালে বাজছে ডমরু!’

মাঠে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন কয়েকজন লামা। ছন্দোবদ্ধ সেই উচ্চারণের তালে নাচছেন লামা নর্তক।

‘ওই যে ময়দার খুলি, ওটাকে বলে দোরমা, নাচ শেষ হলে ওটা পোড়ানো হবে!’

করোটির পরিচয় দেন পাসাং লামা। ময়দা-নির্মিত সেই মনুষ্যখুলির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নৃত্যস্থল থেকে গুম্ফার অন্দরে চোখ ফেরায় নিবেদিতা। সেখানেও সাজসাজ রব।

বিশাল মুখোশ পরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন অন্য নর্তকের দল। তাঁদের পালা পরে। মুখোশগুলো মানুষের মাথার আকার থেকে দুই থেকে তিনগুণ বড়। খুব সাবধানে মুখোশ পরছেন নর্তকরা। মুখোশের ধারগুলো ব্লেডের মতো ধারাল, তাছাড়া তাদের ওজনও বিশাল। তিন-চারজন কমবয়সী সন্ন্যাসী সাহায্য করছেন নর্তকদের। প্রথমে প্যাডেড টুপি পরিয়ে, কপালে তোয়ালে বেঁধে তারপর বিশাল সেই মুখোশ পরিয়ে দিচ্ছেন দু’তিনজন মিলে। ঘাড়েও গুঁজে নিতে হচ্ছে কাপড়। বড় এক আয়না ধরে ঘুরছে এক বালক। নর্তক বারংবার নিজেকে দেখে নিচ্ছেন সেই ভ্রাম্যমান মুকুরে। ছম নর্তকদের পোশাক ও অলঙ্কারের দিকেও অবাক তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। রঙের প্রাচুর্য পোশাক থেকে যেন চুঁইয়ে নেমে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে। পাসাং লামার কণ্ঠস্বরে হুঁশ ফেরে।

‘গয়নাগুলো বেশিরভাগই কিন্তু হাড়ের! মানুষের হাড়! বহু পুরনো গয়না! নষ্ট হয়ে গেছে, যেটুকু আছে এই সময় বের করা হয়! ট্রাম্পেট বা ভেরী দেখছেন, ওটা মানুষের উরুঅস্থি দিয়ে বানান। আমরা বলি কাংলিং। যত পুরনো, তত পবিত্র! তবে পুরনো পোশাক, মুখোশ, গয়না এখন পাওয়া খুব কঠিন। কালচারাল রেভলিউশনের সময় সিসিপি সব ধ্বংস করে দিয়েছে! প্রাচীন ঐতিহ্যের আর কিছুই পড়ে নেই। সব ধ্বংস করে দিয়েছে!’

পাসাং লামার স্বরে ক্রোধ ও হতাশা মিশে যায়। বহুক্ষণ পর সরাসরি লামার চোখের দিকে তাকায় নিবেদিতা। দৃষ্টিতেও আগুন। তবে দ্রুত শান্ত হন লামা। নৃত্যের মহড়ার দিকে চোখ রেখে ঠোঁট নাড়েন।

‘যেগুলো গুম্ফার গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা ছিল, যত্ন ও প্রপার প্রিজার্ভেশনের অভাবে সেগুলো পোকায় কেটেছে, ড্যাম ধরে পচেছে। এখন অবশ্য অনেকটাই পালটে গেছে। ট্যুরিস্টদের জন্য আধুনিক ঝকঝকে রঙিন পোশাক এসে গেছে। হাড়ের বদলে প্লাস্টিকের গয়না। এইগুলো সহজলভ্য। নষ্ট হয় না সহজে। তবে যখন স্পেশাল উৎসব হয় গুম্ফায়, ওসব আর্টিফিশিয়াল জিনিস চলে না, জেনুইন পোশাক, জেনুইন গয়না লাগে! পরশু সেই উৎসব! জেনুইন উৎসব!’

কণ্ঠস্বর আবার দৃপ্ত। ঠোঁটের কোণে হাসি। পাসাং লামা নিবেদিতার দিকে তাকান।

‘ম্যাডাম, এই উৎসবে আপনিও আমাদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করবেন!’
‘আমি কী করব!’ বিস্মিত নিবেদিতা আর কথা না-বলে পারে না।
‘জানতে পারবেন যথা সময়ে!’

মৃদু হেসে উঠে যান পাসাং লামা। নিবেদিতা হতবুদ্ধি। আসন্ন উৎসবে তাঁর ভূমিকা কী? নৃত্যে সে কখনওই সাবলীল নয়। এমনকী ছাত্রাবস্থাতেও কখনও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়নি সে। অবশ্য এখানে নৃত্যে কোনও সন্ন্যাসিনীকেই অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে না! তাহলে কি অন্য কিছু, অন্য কোনও কাজ তার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন টাইগার লামা? কী সেই কাজ?

বিবশ নিবেদিতা হাঁ করে চেয়ে থাকে বিশাল মুখোশধারী নর্তকের দিকে। মুখোশধারী নর্তকরা নেমে যায় চত্বরে। রক্তচীবর পরিহিত বালক হাতে আয়না নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখে মুখোশ-নৃত্য। বাগ-ছম। নৃত্যস্থল থেকে চোখ ফেরায় নিবেদিতা। আয়নায় এ প্রতিচ্ছবি কার? মস্তকমুণ্ডিত লাল চীবর পরিহিত কে এই নারী! অজানা গুম্ফায় নিজের এই রূপ দেখে, ভিতর মহল কেঁপে যায় তার!

শিঙা, ঘণ্টা, ঝাঁঝের শব্দে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে পূর্ণাঙ্গ বাগ-ছম। ধর্মপাল পেলদেন লেহ্‌মোর ভয়াবহ মুখের আদল মুখোশে। দেবীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডলে জ্বলছে ডাগর দুই চোখ। আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে দেবীর মুখোশের দিকে তাকায় নিবেদিতা। মুখোশ-নৃত্য কিছুক্ষণ দেখার পরই ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন জানান দেয়, কেউ তাকিয়ে আছে তার দিকে। চকিতে তাকায় আবার ডানদিকে, গুম্ফার ভিতর। পিছনে অন্ধকার, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে মুণ্ডিতমস্তক এক বালক। তেনজিং। হাঁ-করে চেয়ে আছে তার দিকে। নবীন সন্ন্যাসীর পাশে সেই শ্বাপদ। বরফচিতা কেতু।

১৪০

২৩ অক্টোবর। তাগশাং গুম্ফা। লাচুং। উত্তর-পূর্ব সিকিম।

‘টাইগার গুম্ফায় আছে!’ গুম্ফার ঢোকার মুখে নীচুগলায় ডিকেকে বলেন রিঞ্চেন লামা।

‘কীভাবে বুঝলেন! ডিকে জানতে চায়।

‘বাঘের গন্ধ!’

‘আপনিও বিশ্বাস করেন এইসব গাঁজাখুরি কথা!’ ডিকের গলায় হালকা শ্লেষ।

লামা রিঞ্চেন আড়চোখে তাকান ডিকের দিকে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

‘রাহু আর কেতু’র গল্প বলেছিলাম আপনাকে গতকাল, ভুলে গেলেন?’
‘স্নো লেপার্ড!’
‘রাহু মারা গেছে—কেতু আছে। আমি কেতুর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি!’
‘কেতু!’ বিস্ময় ডিকের।
‘গুম্ফায় কোনও অ্যাডভেঞ্চার করতে যাবেন না মিস্টার কয়াল! সামদ্রুপ্টসে গুম্ফায় আপনি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন, এখানে এমন করবেন না! কেতু আছে! খবর পেলাম, গতকাল রাতে কেতু সামদ্রুপ্টসে গুম্ফায় একজনের হাতের পাঞ্জা ছিঁড়ে নিয়েছে!’

চমকে তাকায় ডিকে। সামদ্রুপ্টসে গুম্ফায় গতকাল নিবেদিতা ছিল, হয়তো কবীর খানও! ওঁদের কোনও বিপদ হল না তো!

‘ক-কার?’ তুতলে যায় ডিকে।
‘গুম্ফায় অসভ্যতা করেছিল, শাস্তি পেয়েছে!’
‘কে সে?’ আবার প্রশ্ন ডিকের।
‘নীলকণ্ঠ মুখার্জী!’

লামা রিঞ্চেন গুম্ফায় কেবল যথেষ্ঠ পরিচিত নন, শ্রদ্ধার পাত্রও। উপস্থিত লামারা সম্মানের সঙ্গে নমস্কার করেন তাঁকে। প্রতি-নমস্কার করেন লামাও। নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে একজন লামা তাঁদের বসান। টাইগার লামাকে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি এসে পড়বেন।

গুম্ফার ভেতরে দিন-রাত গুলিয়ে যায় বেমালুম। গবাক্ষ-বাহিত সামান্য আলোয় মিশে থাকে শান্ত আঁধার। ঘরগুলোর উঁচু সিলিং, চওড়া দেওয়াল। স্তব্ধ চরাচর। এখানেও তাই। বাইরের ঠাণ্ডাও টের পাওয়া যাচ্ছে না ঘরের অন্দরে। চারিদিকের দেওয়াল সাদা, নীল, সবুজ ও লাল রঙে চিত্রিত। দেওয়ালের গায়ে থাংকা। মণ্ডল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢোকেন লাল চীবর পরিহিত এক লামা। লামা রিঞ্চেন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করেন। প্রতি-নমস্কার করেন সদ্য উপস্থিত লামাও। ডিকেও উঠে দাঁড়ায়।

নমস্কার করে। দার্জিলিং মেলের কামরায় এই লামার সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইনিই দাওয়া বা টাইগার লামা, আবার ইনিই চিত্রক চন্দ্র। মৃদু হেসে লামা বসতে বলেন হাতের ইঙ্গিতে। সকলে আসন গ্রহণ করেন।

লামা রিঞ্চেন শুরু করেন কথা। নিজস্ব ভাষায় টাইগার লামার সঙ্গে বাতচিত চলে তাঁর। কিছুক্ষণ পরে দু'জনের কণ্ঠস্বরেই উত্তেজনা, পরিবর্তিত হয় দৈহিক ভাষা ও মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিও। ভাষা না-বুঝলেও ডিকে বোঝে, টাইগার লামার সাম্প্রতিক কাজকর্মে উষ্মা প্রকাশ করছেন লামা রিঞ্চেন। হয়তো মুক্তি দিতে বলছেন অপহৃতদের। কথোপকথনে স্বরের ওঠানামা ও ভাবভঙ্গি দেখে অনুমান করে ডিকে। কিছুক্ষণ পর দু'জনেই নিশ্চুপ হয়ে যান।

'ইনি মিস্টার কয়াল, কলকাতা থেকে কবীর খানের খোঁজে এসেছেন।' পরিষ্কার বাংলায় ডিকের পরিচয় দেন লামা রিঞ্চেন।
'দার্জিলিং মেলে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, খানসাহেবকে ছাড়তে এসেছিলেন?' টাইগার লামা হাসেন।

লামার স্মরণশক্তিকে মনে মনে তারিফ করে ডিকে। সামান্য হেসে ইতিবাচক মাথা নাড়ে।

'কামসূত্র-এর টীকা পেয়ে গেছি, উনি মুক্ত! চিন্তা করবেন না মিস্টার কয়াল!'
'নিবেদিতা বাল্মীকি!'
'উনি প্রোগ্রামের স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন—'
'স্বেচ্ছাসেবক মানে!'
'শি উইল পার্টিসিপেট অ্যাকটিভলি!'

কেঁপে যায় ডিকে। নিবেদিতা পঁচিশের ভয়ানক অনুষ্ঠানে অংশ নেবে! এর অর্থ সত্যিসত্যিই ওর জীবনসংশয়!

‘পার্টিসিপেট করবেন মানে!’
‘অনুষ্ঠানে উনি থাকবেন!’
‘দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে নিবেদিতাও একজন!’ বিস্মিত ডিকে।

ডিকের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ লামা। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চোখ সরায় না ডিকেও।

‘কামসূত্র উপন্যাসের শেষে একটা ইঙ্গিত আছে, আমার অনুমান আপনারা এমনই কোনও প্রোগ্রাম করতে চলেছেন! এর আগে টিবেটের মাটিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি তা নয়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত, ইন্ডিভিজুয়াল এফোর্ট! এবার আপনারা কেবল সংগঠিতই নন, মনে হচ্ছে মুভমেন্টও ছড়িয়ে দিচ্ছেন! কিন্তু লামা, আপনারা নিজের দেশের মুক্তির জন্য যা-খুশি করতে পারেন, সব জায়েজ!’

সামান্য থামে ডিকে। শান্ত চোখে চেয়ে আছেন টাইগার লামা। শুনছেন ডিকের কথা। বাক্য সম্পূর্ণ করে ডিকে।

‘কিন্তু কিডন্যাপ করে ধরে নিয়ে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বানানোর মধ্যে বিপ্লবটা ঠিক কোথায়?’

তীব্র শ্লেষের মধ্যেই চলকে ওঠে ক্রোধ। নিবেদিতাকে স্বেচ্ছাসেবক বানাবেন লামা, এই সিদ্ধান্ত শুনেই রাগ লুকোতে পারে না ডিকে।

‘কামসূত্র উপন্যাসের সূত্র আপনি ধরতে পেরেছেন! খুব ইন্টারেস্টিং!’ টাইগার লামার মুখে হাসি।
‘সত্যিই আপনারা সংগঠিত সেলফ ইমোলেশন করছেন?’ স্তম্ভিত ডিকের জিজ্ঞাসা।

আর অনুমান নয়, সটান সওয়াল খোদ কাণ্ডারির চোখে চোখ রেখে। লামাও চেয়ে থাকেন ডিকের দিকে। দৃষ্টিতে বিস্ময় নেই, আছে প্রসন্ন ইশারা।

‘উপায় নেই মিস্টার কয়াল! চায়না আমাদের পাঁজর ভেঙে সত্তর বছর ধরে মশাল জ্বালাচ্ছে, এই লাগাতার অন্যায় বন্ধ করার জন্য এবার আমরা নিজেরাই নিজেদের মশাল করে জ্বালিয়ে দেব! তাওয়াং থেকে লাদাখ বরাবর গোটা ট্রান্স হিমালয়ান রিজিয়ন সেদিন জ্বলবে! পির-পাঞ্জাল জ্বলবে! কারাকোরাম জ্বলবে! টিবেট জ্বলবে! শিংজিয়াং জ্বলবে! কাশ্মীর জ্বলবে! যেখানে যেখানে এনটায়ার নেশনকেই ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে লেবার কলোনি বানান হয়েছে, সব জ্বলবে আর আমরা জ্বলব!’ শান্ত, অকম্পিত স্বর লামার।

বুকের ভিতর হাতুড়িপাত। দাউদাউ অগ্নিবলাকা চরাচর জুড়ে। ড্রোন ক্যামেরায় যেন দেখতে পায় গোটা হিমালয় জুড়ে সেই পরিকল্পিত দহন। স্যাটেলাইট প্রেরিত ছবিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমালা। পুড়ে যাচ্ছে দুনিয়া। সেই আগুনে কি বলি হবে নিবেদিতা? কবীর খান? এমনকী ছোট্ট শিশু অর্হৎ? ভিতর-বাহিরে, অন্তরে-অন্তরে কেঁপে ওঠে ডিকে।

‘ভয়ঙ্কর!’ ডিকের আতঙ্ক প্রকাশিত হয় অস্ফুটে।
‘অনেকেই মনে করেন আত্মাহুতি বিনয়কে লঙ্ঘন করছে। বিনয়-এ আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। মিস্টার কয়াল, জাতক-এর গল্প নিশ্চয়ই পড়েছেন? জাতকে আছে তথাগত ক্ষুধার্ত বাঘিনীকে নিজের শরীর অফার করছেন!’ বৃদ্ধ লামা বলেন।
‘আমরা তো কারোকে আক্রমণ করছি না! আক্রমণ যদি বলেন, নিজেকে করছি!’ বলে চলেন রিঞ্চেন লামা।
‘মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে হিরো ওয়রশিপ! তবে হিরো অহিংস হলে হবে না, ভায়োলেন্ট হিরো হতে হবে। রেবেল হতে হবে। গান্ধীকে দিয়ে হবে না, হিরো হতে হবে নেতাজীর মতো! ফলে গান্ধীকে নিয়ে যতটা হবে, নেতাজীকে নিয়ে ঢের বেশি হিরো ওয়রশিপ হবে! আমরা লড়াই বা যুদ্ধকে রোমান্টিসাইজ করি, জেতাকে গ্লোরিফাই করি, হারকে ড্রামাটাইজ করি, শহিদ স্মরণে উদ্বেল হই! এটা মানুষের কমন সাইকি! আমরা টিবেটানরাও এর ব্যতিক্রম নই। চুসি গাংদ্রুকের কাণ্ডারি গোম্পো তাশি ও তাঁর সঙ্গীদের

মরণপণ লড়াই এখনও শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ হয় টিবেটানদের মধ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, এর পাশাপাশি নন-ভায়োলেন্ট মুভমেন্টগুলো সমান ভাবে ইজ্জত পায় না।' ধীরে কেটে কেটে উচ্চারণ করেন টাইগার লামা।

'এই আপনাদের নয়-ভায়োলেন্ট মুভমেন্টের নমুনা!' আবার শ্লেষ ডিকের কণ্ঠে।

'নন-ভায়োলেন্ট নয়!' বিস্মিত প্রশ্ন লামা রিঞ্চেনের।

'যা-ঘটতে চলেছে এর থেকে বড় ভায়োলেন্স আর কী হতে পারে, আমি জানি না!' ডিকের উত্তর।

'ঠিক এই কথা খানসাহেবও বলেছেন! ইনফ্যাক্ট আপনাদের এই কথাটাই আরও সরাসরি বলে সিসিপি! ওরা বলে, আত্মাহুতি আসলে টেররিজম ইন ডিজগাইজ। ওরা আত্মহত্যাকারীদের টেররিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করছে যারা একজন ফিউডাল দাসমালিকের কথায় নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। স্পষ্ট ইঙ্গিত হিজ হোলিনেসের দিকে।' টাইগার লামা বলেন।

'পার্টি কংগ্রেসে টিবেটান ডেলিগেট বলেন, আত্মাহুতি একধরনের মার্ডার, দলাই লামা গ্রুপ আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করছে তিব্বতিদের, নিজেদের বদ উদ্দেশ্য মেটাতে! সারপ্রাইজিংলি, যিনি শান্তির জন্য নোবেল পেয়েছেন তিনি কীভাবে এই আত্মাহুতি নিয়ে নিশ্চুপ থাকতে পারেন! চুপ থাকার অর্থ বহু মানুষের আত্মাহুতিকে পরোক্ষে সমর্থন করা!' সংযোজন লামা রিঞ্চেনের।

'বোঝাই যাচ্ছে সিসিপি'র সেন্টিনারি উৎসবের সময় এই কাণ্ড ঘটিয়ে আপনারা বৃহত্তর বিশ্বকে বার্তা দিতে চাইছেন। আচ্ছা একটা কথা বলুন লামা, এই আত্মাহুতি সেই অর্থে তিব্বতিদের কোনও উপকার করেছি কি? উল্টে চায়না সিকিউরিটি আরও টাইট করেছে!'

'খুব ভুল বলেননি মিস্টার কয়াল! সিকিউরিটি টাইট তো করেইছে, আত্মহত্যাকারীর পরিবারকে কেবল নয়, তার গোটা গ্রামের জীবন হেল করে দিয়েছে! শেন খয়াঙ্গোয়াও'র কথা আপনাকে বলেছি। আবার এটাও ঠিক, খুব বিফলে যায়নি, আত্মাহুতি আমাদের উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধও করেছে! গোটা বিশ্বের অ্যাটেনশন ড্র করতে পেরেছি আমরা!' লামা রিঞ্চেন বলেন।

'এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, ইট উইল শেক দ্য ওয়র্ল্ড! এমন কাণ্ড পঁচিশের রাতে ঘটলে গোটা ওয়র্ল্ড জাস্ট নড়ে যাবে!'

ডিকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন টাইগার লামা। সেই হাসির নেপথ্যে কি বিষণ্ণতা চুপ করে বসে আছে? ডিকেও তাকিয়ে থাকে লামার ডিকে।

‘কোনও প্রতিহিংসা নয় মিস্টার কয়াল, চায়নাকে শিক্ষা দিতেও নয়, আত্মাহুতির মাধ্যমে টিবেটানরা বলতে চায়, চায়নার রাজত্বে তারা তো এক-একজন মৃতদেহ, শরীরে আগুন দিয়ে কেবল তারা নিজেদের মৃতদেহ দাহ করছে!’

নিশ্চুপ ডিকে। মাথা নীচু করে চুপ লামা রিঞ্চেনও। ঘরের মধ্যে কেবল টাইগার লামার অনুচ্চ-স্বর, সে-উচ্চারণ মাখন-প্রদীপ শিখার মতো অচঞ্চল।

‘দগ্ধ আত্মহত্যাকারীরা প্রত্যেকে এক-একজন বোধিসত্ত্ব, তাঁরা নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য উৎসর্গ করছেন তাঁদের প্রাণ।’
‘আপনার আবেগকে শ্রদ্ধা করেই বলছি লামা, এই ঘটনার কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে আপনার ধারণা আছে নিশ্চয়ই! তিব্বতের মানুষের ওপর এক ভয়ানক টর্চার শুরু করবে চায়না! আপনি তো ভবিষ্যতের মুভমেন্টের মাজা ভেঙে দিচ্ছেন! সত্যি সত্যিই সুইসাইডাল স্টেপ!’

ডিকের কথায় প্রত্যয়ী লামা মুহূর্তে জ্বলে ওঠেন দপ করে।

‘ভবিষ্যৎ আমাদের! আগামী একশ’ বছর আমরা লড়াই করব! ব্যভিচারী তুমি, তুমি যেখানেই যাও আমি যাব, আমারই পাঁজর ভেঙে যদি শুধু মশাল জ্বালাও, আমার করোটি নিয়ে ধুনুচি নাচাতে চাও যদি, তবু আমি কোনোদিন ছেড়ে যেতে দেব না তোমাকে, এক শতাব্দীর পরে আরেক শতাব্দী আরো এক, আমি যদি না-ও থাকি তবুও আমিই পড়ে থাকে!’
‘শঙ্খ ঘোষ!’

হিমালয়ের এক গুম্ফায় বসে রহস্যময় এক লামার মুখে শঙ্খ ঘোষের কবিতা শুনে তাজ্জব ডিকে। অস্ফুটে কেবল কবির নাম উচ্চারণ করে সে!

‘কবি কী ভেবে লিখেছেন জানি না, তিনি তো প্রফেট, এখানে আমি হচ্ছে টিবেট আর তুমি চায়না!’ নিজেকে সংযত করে বলেন লামা।
‘আমি শিংজিয়াংও হতে পারে!’ ডিকে বলে।
‘কাশ্মীরও হতে পারে! ওয়র্ল্ডের সমস্ত অবরুদ্ধ অঞ্চলই আমি! সমস্ত ডিটেনশন ক্যাম্পই আমি!’ উত্তর দেন লামা রিঞ্চেন।

কাশ্মীরের প্রসঙ্গ তুললেন কেন লামা রিঞ্চেন? তাহলে কি স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরিদেরও সঙ্গে নিতে পেরেছেন এঁরা? কেন্দ্রীয় এজেন্সির অনুমান অযৌক্তিক নয় তবে! ভারতের মাটিতে দীর্ঘদিন আশ্রিত থেকে এমন ভারতবিরোধী আচরণ করছেন কীভাবে এই লামা? হিজ হোলিনেস দলাই লামা এই ধরনের হঠকারী আন্দোলনের পদ্ধতি সমর্থন করেন কি না সন্দেহ আছে। বৃদ্ধ লামার কথায় মুগ্ধ হলেও, এক অজানা আশঙ্কা ক্রমশ গ্রাস করে ডিকেকে।

তিনজন অসমবয়সী মানুষ এই অদ্ভুত লামার হাতে বন্দি এবং সকলেরই প্রাণ সম্ভবত সংশয়ে, তাঁদের উদ্ধার করবে কে? কীভাবে?

১৪২

‘মদন নিজে প্রমত্ত এবং অন্যকে মত্ত করে! এই মদনই আমাদের জীবনকে জড়িয়ে রেখেছে। দেশের প্রেমে মত্ত হওয়াও তো মদন, তাই না কয়ালবাবু?’

বৃদ্ধ লামার কথায় অবাক ডিকে। কী বলতে চান এই লামা?

‘এই দেশপ্রেমের নাড়িটা পুড়িয়ে দিতে হবে!’
‘আপনি কি মদনভস্মের কথা বলছেন লামা?’ বিস্ময় ডিকের।
‘ইয়েস! খানসাহেব আমার চোখ খুলে দিয়েছেন!’
‘কিন্তু লামা, কবীর খান শ্রম-উৎপাদন থেকে শ্রমিকের কর্ম-উন্মাদনা বা কর্মপ্রেম পুড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন! দেশপ্রেমকে কি এইভাবে নষ্ট করা যায়?’
‘কেন যাবে না? দুটোই তো উন্মাদনা। কর্মের প্রতি উন্মাদনা আর দেশের প্রতি উন্মাদনা! শ্রমিকের নিজের উৎপন্ন দ্রব্যে তাঁর নিজের ভাগ নেই। অধিকার নেই। এখানেও তাই! আমার দেশ, অথচ আমার নয়! একই ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক আত্মবিচ্ছেদ! মার্ক্স তরুণ বয়সে এমনই এলিয়েনেশনের কথা বলেছিলেন।’

বিরতি নেন লামা। মাথা নীচু করে বসে আছেন লামা রিঞ্চেন।

‘কয়ালবাবু, আমরা তো জীবন্মৃত হয়েই বেঁচে আছি গত সত্তর বছর! দেশে যারা আছে, তারা নিজভূমে পরদেশী, আর আমরা তো এমনিই পরদেশী! কেবল দেশপ্রেমটুকু ছাড়া আর আমাদের কিছুই নেই! দেশের প্রতি, দেশের মাটির প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি এই যে মত্ততা বা আসক্তি বা প্রেম, তার নাড়ি কেটে দিতে হবে! পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে দেশের প্রতি এই আসক্তি! তাহলেই আর অসহনীয় কিছু থাকবে না, সব অত্যাচার, সব অনাচার সয়ে যাবে আমাদের! পড়ে থাকবে কেবল অসহায় রতিবিলাপ!’ নিষ্কম্প স্বর টাইগার লামার।

মস্ত এক শ্বাস ফেলেন লামা রিঞ্চেন। নির্গত দীর্ঘশ্বাস ডুকরে মরে ঘরের ভিতর। তিনটি মানুষের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কায় কোনও আবেগকে প্রশ্রয় দেয় না ডিকে।

‘আই ডু পারসিভ ইয়োর অ্যাগনি লামা, কিন্তু তিনজন নন-টিবেটান মানুষের দোষ কোথায়! তারা চাইনিজও নন! ওঁদের মুক্তি দিন!’
‘সকলেই মুক্তি পেয়ে গেছেন!’

‘মানে!’
‘কবীর খান তেরমা লাভ করেছেন, উনি বোধিসত্ত্ব। নিবেদিতা বাল্মীকি স্বেচ্ছাসেবক হবেন আগামী পরশু, উনিও বোধিসত্ত্ব। শিশু অর্হৎ আগামীর বোধিসত্ত্ব। ছোট্ট জীবন থেকে এঁরা সবাই মুক্তি লাভ করেছেন!’

লামার কথায় স্পষ্ট হয় না তিনজনের ভবিতব্য। নিবেদিতাকে ইতোমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ঘোষণা করে তার জীবনকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন। নাবালক অর্হৎ তাঁর আগামীদিনের যোদ্ধা! কবীর খানকে নিয়ে কী করবেন, এখনও খোলসা করেননি! লামা কি হেঁয়ালি করছেন? প্রসঙ্গান্তরে যায় ডিকে।

‘একটা প্রশ্ন আছে লামা?’
‘বলুন!’ স্মিত হাসি লামার।
‘কামসূত্র উপন্যাসটি কার লেখা? এসবি কে? শরদিন্দু?’
‘জানি না। শিলিগুড়ির প্রফেসরসাহেবকে ম্যানাস্ক্রিপ্ট দেখালাম, দিয়ে দিলাম, পরে যখন ফেরত দিলেন, দেখলাম নীচে এসবি লিখে দিয়েছেন।’
‘সে কী!’
‘বললেন মার্কেটে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হবে, ম্যানাস্ক্রিপ্টের দাম বাড়বে! এসবিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় হয়!’
‘আবার এসবিতে সরসিজ বিশ্বাসও হয়!’

ডিকের কথায় হা-হা করে হাসেন টাইগার লামা।

‘সরসিজ বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার কীসের ডিল হয়েছে লামা? আপনি ওনাকে কামসূত্র উপন্যাস দেবেন আর উনি আপনাকে কবীর খানের কামসূত্র টীকা দেবেন?’

ডিকের সরাসরি আক্রমণেও হাসি সরে যায় না লামার মুখ থেকে।

‘মিস্টার বিশ্বাস খুব লোভী, যশের লোভ, অবশ্য সব ইন্টেলেকচ্যুয়ালেরই এই লোভ থাকে! যদিও এটা স্বীকার করতেই হবে সরসিজ বিশ্বাসের জন্যই খানসাহেবকে পেয়েছি।’
‘সরসিজ বিশ্বাসের এই যশোলোভকেই আপনি ব্যবহার করেছেন লামা!’

স্মিত হাসি এখনও লামার মুখমণ্ডলে। দুই চোখে জরিপ করছেন ডিকেকে। ডিকে থামে না।

‘কবীর খানের লেখার সঙ্গে আপনি পূর্বপরিচিত, সরসিজ বিশ্বাস এসে সেই পরিচয়ে হাওয়া দিলেন। কামসূত্র-এর ব্যাখ্যার ইংরেজি এক্সসার্পটস আপনি পাঠালেন বিলেতে, সাহেবরা লুফে নিল! কামসূত্র নিয়ে সাহেবদের বরাবরই খুব আগ্রহ! কাম মানে সেক্স নয়, কাম মানে কাম-কাজ আর কামসূত্র কোনও সেক্সোলজির বই নয়, প্রাচীন ভারতের ম্যানেজমেন্টের বই—এই সেনসেশনাল টীকার জন্য লন্ডনের পাবলিশিং হাউস, সিলভার লাইন, আপনাকে অলরেডি এক মিলিয়ন পাউন্ড অ্যাডভান্স করে দিয়েছেন! কিন্তু অজানা-অচেনা কবীর খানের নামে অত দাম আর কে দেবে, তার জন্য একটা জুতসই গল্প লাগবে, তাই দীপঙ্করের গল্প যোগ হল! বাৎস্যায়নের হারিয়ে-যাওয়া আসল কামসূত্র তিব্বতি অনুবাদে অতীশ পেলেন একাদশ শতকে, তিব্বতের সামিয়ে মহাবিহারে, পেয়েই তার টীকাভাষ্য সংস্কৃত ও বাংলায় অনুবাদ করে ফেললেন! সেই গল্পের সূত্র দিয়ে তৈরি হল আস্ত একটা বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস যা গত শতকের পাঁচের দশক থেকে পড়ে আছে কালিম্পং-এর গুম্ফায়! উপন্যাসের শেষে এসবি লিখে দিয়ে কনফিউশনও তৈরি হল! তাই বলে কি আপনি কবীর খানের কৃতিত্ব খাটো করলেন? না, করলেন না! তাঁর নামও জুড়লেন কিন্তু অন্যভাবে, কবীর খান মাইন্ড টেরমা লাভ করেছেন তাঁর অন্তরে, তাঁকে পুরো কৃতিত্ব না-দিয়ে যোগ করলেন তিব্বতি লোকগাথা ও বিশ্বাস। তিব্বত, অতীশ দীপঙ্কর, হারিয়ে-যাওয়া-কামসূত্র—সাহেবরা এই পুরো গল্পে দেখতে পেলেন এক আগামী বেস্টসেলারের সফল রোডম্যাপ! সব লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করে গবেষণাপত্রের মতো সাজিয়ে পরিবেশন করবেন সরসিজ বিশ্বাস! তার সঙ্গে দশ হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শনীয় আত্মাহুতির গল্প যদি যোগ হয়ে যায়, সোনায়া সোহাগা! আন্তর্জাতিক যশের লোভ সংবরণ

করা সম্ভব হল না সরসিজের পক্ষে, বস্তুত, অসৎ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোন বুদ্ধিজীবীই বা এই লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন!'

অনেকটা বলে থামে ডিকে। তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে টাইগার লামা।

'আমি জানি আপনি নিজের জন্য নয়, আন্দোলনের জন্য টাকা জোগাড় করেছেন লামা, তবু কবীর খানের কৃতিত্বকে ছোটো করবেন না!'

টাইগার মাথা নাড়েন দু'দিকে। ডিকে বুঝতে পারে না, নেতিবাচক মাথা নেড়ে উনি কী বলতে চাইছেন! উঠে দাঁড়ান লামা। এই বিষয়ে বিস্তারিত কথায় উনি যাবেন না, পরিষ্কার বোধগম্য হয় ডিকের। লামা নমস্কার করেন মৃদু হাসিসহ। ডিকে লামা রিঞ্চেনের দিকে তাকান।

'টাইগার, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও!'
'অসম্ভব! শেষ কথা বলে দিয়েছি তোমায় রিঞ্চেন!' গলা না-উঁচিয়েই বলেন লামা।
'আমি মিস্টার কয়ালকে কথা দিয়েছি!'
'ফিরিয়ে নাও!'
'অসম্ভব!'
'মিস্টার কয়াল, আপনি চলে যান!' তারপর আবার রিঞ্চেন লামার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি যাবে না রিঞ্চেন, গুম্ফায় থাকবে!'
'বাচ্চাটাকে রেসকিউ না-করে আমরা কেউই যাব না টাইগার!' লামা রিঞ্চেনের গলা চড়ে।
'ওরা তিনজনের কেউই এই গুম্ফায় নেই!' টাইগার লামা নীচু স্বরেই জানান।
'ওরা কোথায় লামা? যদি না-বলেন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা নেবে!' ডিকে বলে।

আর প্রচ্ছন্ন নয়, ডিকের কথার সুরে হুমকি প্রকট। টাইগার লামা স্থির চেয়ে থাকেন ডিকের দিকে। সম্ভবত নিজেকে সংযত করছেন। দরজা পেরিয়ে ঢোকে কেতু। মনিবের পাশে এসে দাঁড়িয়ে মস্ত এক হাই তোলে। টাইগার লামার ডানহাতের তালু কেতুর

মাথায়। দু'বার মাথা দুলিয়ে চেয়ে থাকে ডিকের দিকে। সামনে জলজ্যান্ত বরফ-চিতা দেখে স্তম্ভিত ডিকে। গতরাতে সামদ্রুপ্টসে গুম্ফায় এই চিতাই নীলকণ্ঠ'র হাতের পাঞ্জা ছিঁড়ে নিয়েছে! রিঞ্চেন লামার সতর্কবাণী মনে পড়তেই ক্রমশ অবশ হয় ডিকে!

'তুমি মিস্টার কয়ালকে নিয়ে গুম্ফার তল্লাশি নিতে পার রিঞ্চেন!' অনুত্তেজিত টাইগার লামা।
'বাচ্চাটা কোথায় টাইগার, লাদাখে পাঠিয়ে দিয়েছ?'
'এই বিষয়ে আমি আর কিছুই বলব না! মিস্টার কয়াল ইউ মে গো নাও!'

ডিকে বেরোতে উদ্যত হতেই তাকে থামায় লামা রিঞ্চেন।

'দাঁড়ান আমিও যাব!'
'তুমি যাবে না রিঞ্চেন! কথা আছে!'

কেতু এক-পা এগিয়ে আসে লামা রিঞ্চেনের দিকে। বিস্ফারিত চোখে কেতুর দিকে তাকায় ডিকে। নড়বার মতো সাহসও তার নেই! কেতু এগিয়ে আসে আবার। ভয়ে দম যেন বন্ধ হয়ে আসবে ডিকের! লামা রিঞ্চেন হাত বাড়িয়ে দেন কেতুর উদ্দেশে। কেতু এগিয়ে আসে লামা রিঞ্চেনের গায়ের কাছে। লামা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপর ডিকের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন,

'আপনি যান মিস্টার কয়াল! আমি পরে যাব!'

দরজা দিয়ে বেরোবার মুখেই টাইগার লামার অবিচল কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'মিস্টার কয়াল, হিমালয়ের একটি গুম্ফাতেও যদি পুলিশ বা মিলিটারি পৌঁছায়, আপনার আপনজনেদের ক্ষতি হবে! চরম ক্ষতি! এইটুকুই মনে রাখবেন!'

ঘাড় ঘুরিয়ে টাইগার লামার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে যায় ডিকে।

১৪৩

২৩ অক্টোবর। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

ঝলমল করছে নীল আকাশ। এলাচ ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে তেনজিং। আঙুল বোলায় এলাচ গাছের পাতায়। সেই অতি-চেনা পুরনো গন্ধ। ভুলে যেতে চায় কিন্তু পারে না। এলাচ ক্ষেতের পাশে এলেই মনে পড়ে মায়ের কথা, বাবার কথা। কিন্তু পূর্বাশ্রমের কথা মনে করতে নেই, রিন-পো-চেই বলেন। ক্ষেতের পাশে নাম-না-জানা শাদা ফুল। উড়ে বেড়াচ্ছে অজস্র রঙিন প্রজাপতি। আর দাঁড়ায় না তেনজিং। হাঁটতে থাকে। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। পাহাড়ের গায়ে যে কোনও গাছ আঁকড়ে উঠে গেছে ইস্কুস লতা। সবুজ ত্রিফলা পাতার আড়ালে ঝুলছে ফল। তার রঙও সবুজ। ডুমো ডুমো ভাতের মাঝে ইস্কুসের ঝোল যখন পড়ে, সেই সুবাসও বয়ে আনে স্মৃতি। ভুলতে পারে না, তেনজিং ভুলতে চাইলেও অনেক কিছুই ভুলতে পারে না। মাঝেমাঝে ভাবে সে, ভুলবেই বা কেন? আমি তেনজিং, কী ভুলব আর কী মনে রাখব, সব আমার ব্যাপার!

বৌদ্ধধর্মে কি আমি বলে কোনও কিছুকেই স্বীকার করা হয় না? রিন-পো-ছেই বলেন, হয়, অবশ্যই হয়। কিন্তু এই আমি কে? রিন-পো-ছেই'র পাঠ মনে পড়ে।

তোমার নাম তেনজিং, এই তেনজিং কী? কিছুই না, একটা নাম মাত্র। তোমার চেনা মানুষদের ব্যবহারের জন্য একটা সংজ্ঞা। এই তেনজিং নামটা তোমাকে বা তোমার দেহের ভিতরের যে মানুষটি আছে, তাকে কি বোঝাতে পারছে? না, পারছে না। কিন্তু এবার তেনজিং প্রশ্ন করতেই পারে, ব্যক্তিসত্তা বলে যদি কোনও বিষয় না-থাকে তাহলে আচার্যই বা কে, লো-পোন কে বা রিন-পো-ছে? আমাদের চিত্ত ক্রমশ সংশয়াচ্ছন্ন। রহস্যাবৃত।

তেনজিং ভাবছে আমি তাহলে কে? তেনজিং-এর মুখটা কি তেনজিং না কি হাতটা? ওর লোম, দাঁত, নখ, চামড়া, মাংস, কোনটি তেনজিং? সব মিলিয়েই তেনজিং। আমাদের চৈতন্যই প্রতিমুহূর্তে ভিন্ন হয়ে স্মৃতির ভিতর একটা ঐক্যের বোধ তৈরি করে। সেই একতার অনুভূতি থেকেই জাগে আমাদের ব্যক্তিমানুষ বা আত্মার কল্পনা। আমাদের বৌদ্ধশাস্ত্র বলে আত্মা আমাদের কল্পনা মাত্র, আর কিছু নয়।

যিনি স্কন্ধপুঞ্জের মধ্যে আত্মার অনুপস্থিতি ধরতে পারেন, তিনি জানেন যে ব্যক্তি হিসাবে তাঁর কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, এবং ঠিক সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে তাঁর চারপাশের বস্তুর কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, কাজেই জগতে এমন কিছুই নেই যা তাঁকে আনন্দিত অথবা দুঃখিত করতে পারে। ফলে তিনি বিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ। তিনি অর্হৎ।

থেগ-পা-মাং-পা'য় নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু থেগ-পা-চেং-পো'য় নিজের মুক্তির কোনও স্থান নেই। জগতের সকল মানুষ, সকল পশু-পক্ষীর মুক্তি আগে, তারপর নিজমুক্তি। জগৎ যতক্ষণ বন্ধনাবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাদের মুক্তির জন্য প্রয়াস ও সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করাই আমাদের প্রধান কাজ।

আমরা কারা?
জ্যাংচুপ সেম্পা! আমরা বোধিসত্ত্ব।

সে তেনজিং, সে আগ্রহী মানবমুক্তির জন্য কাজ করতে, নিজেকে উৎসর্গ করতে, কিন্তু যে অনাগ্রহী, যে অনিচ্ছুক, যে ভিন্নধর্মী, তাকে জোর করে ধরে এনে জ্যাংচুপ সেম্পা বানান যায় কি? পাসাং লামাকে এই প্রশ্ন সে করেছিল, কিন্তু জ্বলন্ত দৃষ্টি ছাড়া পাসাং লামার থেকে কিছুই পায়নি। প্রশ্নের উত্তরে জ্বলন্ত দৃষ্টির অর্থই হল এমন প্রশ্ন করা বারণ! নিজেকে সংযত করেছিল সে, আর কখনও তোলেনি অপ্রিয় প্রশ্ন।

ডাকবাংলো পেরিয়ে, লেক পেরিয়ে, সরলবর্গীয় গাছের ঘন জঙ্গল অতিক্রম করে ক্রমশ পাহাড় ভেঙে দৌড়ে ওপরে উঠতে থাকে তেনজিং। আধঘণ্টা দৌড়োবার পর হঠাৎ উন্মুক্ত

চরাচর। লম্বা শ্বাস ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যায় গুম্ফার দিকে। পরিত্যক্ত গুম্ফা। কতদিন খোলা হয়নি ঘর, জ্বলেনি কর্‌মে, ওড়েনি নতুন লুংদার, পতপত করে কাঁপেনি রঙিন দারচেন ধ্বজা, ঘোরেনি মণিচক্র, হয়নি মন্ত্রোচ্চারণ—ওম মণি পদ্‌মে হুম! কিছু লুংদার আর দারচেন পতাকা আছে বটে, তবে পুরনো। বিবর্ণ। বহুকাল আগে ঝোলান হয়েছিল কোনও অনুষ্ঠানে। আগামী পরশুর অনুষ্ঠান হবে এখানে, কাল সকালেই লাগান হবে নতুন লুংদার আর ধ্বজা।

গুম্ফার ভাঙা জানালায় চোখ রাখে তেনজিং। আলো-অন্ধকার উপাসনাগৃহের অন্দরে কেবল দেখতে পায় দেওয়ালজোড়া গুরু রিন-পো-ছে'র ছবি। তাঁর দৃষ্টি এখনও তীক্ষ্ণ। সজাগ। খাপ খোলেনি সময়। ছাপ ফেলেনি মালিন্য। গুরু পদ্মসম্ভবের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। জানালা থেকে চোখ সরায় তেনজিং। গুম্ফার পাশে ফুলগাছ। শাদা ফুল ফুটে আছে গাছে। ডাগর সেই পাপড়ির মাঝে লালচে গোলাকার আলপনা। ম্যাগনোলিয়া।

সাদা চোর্তেনের গায়ে শিস দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যায় বাতাস। দূরে শেষ-বিকেলের কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রমাগত সোনালি ও স্তব্ধ। হাঁ-করে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে তেনজিং।

সূর্যাস্তের পর আবার ফেরার পথ ধরে। সন্ধ্যার প্রার্থনায় না-দেখলে বড় চেঁচামেচি করেন লামা পাসাং। তরতর করে ঢালু পথে নেমে যায় তেনজিং।

গভীর রাত। অজানা গুম্ফা। হিমালয়।

তুমুল উত্তেজনায় একটি শব্দের বেশি লিখতে পারে না মেল-এর শরীরে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় দ্রুত পাঠিয়ে সেই বার্তা মুছে ফেলে ই-মেল অ্যাকাউন্ট থেকে। ল্যাপটপ বন্ধ করে পেছন ঘুরতেই দেখে সামনে পাসাং লামা দাঁড়িয়ে। চমকে যায় তেনজিং। দরজার দিকে এগোতেই হাত দেখিয়ে তাকে থামান পাসাং। দাঁত চেপে তিব্বতি ভাষায় কিছু বলেন।

চাপা গর্জনের মতো শোনায়। মাথা নীচু করে প্রত্যুত্তর দেয় তেনজিং। সপাট একটা চড় এসে বসে যায় তার গালে। ছিটকে পড়ে সে।

'রিন-পো-ছেই জানতে পারলে তোকে কেতুকে দিয়ে খাওয়াবে!'

নিরুত্তর তেনজিং ধীরে উঠে দাঁড়ায়। চোখ তুলে তাকায় পাসাং লামার দিকে। ভাব নিষ্কলুষ। দৃষ্টি নির্বিকার।

১৪৪

২৪ অক্টোবর। হাইল্যান্ড পার্ক। কলকাতা।

নিবেদিতা নিখোঁজ হওয়ার পর দু'দিন কেটে গেছে, সার্ভে পার্ক থানায় নিখোঁজ-ডায়রি দায়ের করে অস্থির গৌরাঙ্গ। ধরণী কয়ালকে দু'চারবার ফোন করে উদ্বেগের কথা জানাতে উনি ধৈর্য ধরতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু উৎকণ্ঠাকে বশীভূত করা দুঃসাধ্য। বিশেষত, যখন বোঝাই যাচ্ছে, বাচ্চাটি ও খানদা'র মতোই নিবেদিতাও অপহৃত। সম্ভবত একই দল কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পরপর অপহরণে মেতে উঠেছে। পুলিশও শোনাতে পারেনি কোনও আশ্বাসবাণী। মস্ত এক প্রতিবেদন লিখে আজ অ্যাঙ্কর-স্টোরি করেছে নিবেদিতার পত্রিকা ভোরের কাগজ। পুলিশ-প্রশাসন ক্রমাগত চাপে। মূর্তি চুরি ও তিনটি অপহরণ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে তারা কাঠগড়ায়। ঘরে বসে স্নায়ুর ওপর চাপ না-বাড়িয়ে কালিম্পং যাত্রার প্রস্তুতি নেয় গৌরাঙ্গ। ঘটনাস্থলে না-পৌঁছালে নিবেদিতার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। গতকালই বন্দোবস্ত করেছে দমদম-বাগডোগরা আকাশপথের টিকিট। আজই যাত্রা।

সকালে মেলবাক্সে চোখ বোলাতে গিয়ে দেখে, অচেনা মেল-ঠিকানা থেকে আবার বার্তা পাঠিয়েছে অজানা কেউ। সম্ভবত শুভাকাঙ্ক্ষী। কেবল একটি মাত্র শব্দ। আর কিছু নেই। দ্রুত ফোন করে ডিকেকে।

২৪ অক্টোবর। নামচি। দক্ষিণ সিকিম।
‘রিনচেনপং! কেবল এটাই লেখা!’ উত্তেজিত কণ্ঠ ডিকের।
‘হ্যাঁ ডিকেবাবু, আপনাকে স্ক্রিনশট পাঠিয়েছি, দেখুন।’

মূল অনুষ্ঠান কি তবে রিনচেনপং-এ? পশ্চিম সিকিমের ছোট্ট একটি জনপদ। সড়কপথে নামচি থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে। কাছাকাছি অনেক মনাস্ট্রি আছে। গৌরাঙ্গ’র সঙ্গে কথা শেষ করে, সময় নষ্ট না-করে রিনচেনপং যাত্রার ব্যবস্থা করে ডিকে।

গতকাল লাচুং থেকে ফিরে টাইগার লামার পরিকল্পনা বিস্তারিত জানিয়েছিল রজতকে। গণ-আত্মাহুতির আশঙ্কা যে সত্য, জেনে চমকে যায় রজত। পঁচিশ অক্টোবর চোংখাপা আলোর উৎসবে ঘটতে চলেছে অভূতপূর্ব ঘটনা। দ্রুত দিল্লির স্বরাষ্ট্র দফতরে যোগাযোগ করে যাবতীয় তথ্য জানায় রজত। আজও ডিকে মেল-বাহিত রিনচেনপং-এর কথা জানিয়ে দেয় রজতকে।

সরাসরি রিনচেনপং যাওয়া কি উচিত হবে? প্রশ্ন তোলেন তাশি নামডোল। এসটিএফ কম্যান্ডো, কালিম্পং পুলিশ ও সিকিম পুলিশের দল সড়কপথে যাক। ডিকে, রিয়াজ, তাশি ও তিনজন কম্যান্ডো যাক হেলিকপ্টারে। দুই দলের সাক্ষাৎ হোক কালুক-এ। কারণ রিনচেনপং-এর আকাশে হেলিকপ্টার দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে টাইগারের বাহিনী। হেলিকপ্টার নামুক কালুক-এ। ওখান থেকে রিনচেনপং তিন কিলোমিটারও নয়। তাশি নামডোলের প্রস্তাব মেনে নেয় রিয়াজ ও ডিকে। নিকটবর্তী কালুক থানায় আপাতত কিছু না-জানিয়ে একটি এসইউভি’র বন্দোবস্ত করতে বলা হয়। কালুক থানার বড়বাবু তাশির পরিচিত।

এসটিএফ কম্যান্ডো ও পুলিশের দল সড়কপথে এগিয়ে যায়। প্রায় দু’ঘণ্টার পথ যেতে হবে তাদের। কিছুক্ষণ পর নামচি হেলিপ্যাড থেকে যখন হেলিকপ্টার ওড়ে, ঘড়িতে তখন প্রায় সোয়া বারোটা। ঝলমলে নীল আকাশ। ডিকে জানালা দিয়ে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে

থাকে নীচে। পাহাড়ি উপত্যকায় বয়ে চলেছে নদী। রঙ্গিত। মাথায় দুশ্চিন্তার স্রোত, সামদ্রুপ্টসে-লাচুং-রিনচেনপং, সিকিমের তিন প্রান্তের তিন জায়গার কোথায় আটক ছোট্ট অর্হৎ, কবীরদা আর নিবেদিতা? কোন গুম্ফার অন্ধকারে তারা প্রহর গুনছে সর্বনাশের? মনে পড়ে অধ্যাপক অংশুমান মিত্রের কথা।

লাচুং থেকে ফিরে যাদবপুরের ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনসের প্রফেসর অংশুমান মিত্রের সঙ্গে দীর্ঘ কথা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়। ডিকের মূল প্রশ্ন ছিল ই-২২ নিয়ে। অমায়িক ও সুবক্তা অধ্যাপক প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিলেন ডিকের জিজ্ঞাসা।

ই-২২ একটি গুপ্তবাহিনী। ১৯৬২-এর যুদ্ধে চিনের কাছে গোহারান হেরে ভারত তৈরি করে এই সিক্রেট গ্রুপ। সিআইএ-এর মদত ছিল। প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল ধর্মশালার নির্বাসিত তিব্বতি সরকারের। হাজার হাজার তিব্বতি দলাই লামার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন ভারতে। তিব্বতি গেরিলা বাহিনীর প্রচুর সদস্যও তিব্বত ও নেপাল থেকে তখন তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। প্রায় ছয় হাজার তিব্বতিকে নিয়ে তৈরি হল ই-২২ বা এস্টাব্লিশমেন্ট ২২। জন্মদিন ১৪ নভেম্বর ১৯৬২। পিএম নেহরু'র জন্মদিনের দিনই আবির্ভাব। চিনা-ভারত যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। পিএলএ-এর আক্রমণে ছন্নছাড়া ভারতীয় সেনা। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে চিন। যদিও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে থাকলেও, তিব্বতি সোলজারদের প্রস্তুতি ছিল না। ওই বাহিনীতে ছিলেন মহিলা যোদ্ধারাও। তিব্বতি যুবক-যুবতীরা মহা উৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন গুপ্তবাহিনীতে। চোখে তাঁদের স্বপ্ন, বাহিনী একদিন বড় হবে আড়েবহরে, পিএলএ-কে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে স্বদেশ থেকে।

'হাই অলটিটিউডে লড়াই লাগলেই ডাক পড়ে এদের। তিব্বতিরা বরফের পাহাড়ে যে-উচ্চতায় জীবনযাপন করে, একটা সহজাত এনডিওরেন্স ওদের থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এদের পাঠান হয়েছিল চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে। বাহিনীর ডাকনাম ছিল ঈগল। পাহাড়ের কোনা কোনা থেকে খানসেনাদের ঠেঙিয়ে বার করতে তিব্বতি গেরিলারা সাহায্য করেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। তারপর ধরুন, পাকিস্তানের সঙ্গে কার্গিল ওয়র—হাই

অলটিটিউড ওয়রফ্রন্ট—১৪০০০ ফুট—সাব-জিরো টেম্পারেচর—সেখানেও ওরা। কেবল হিমালয়ে কেন, মিসেস গান্ধী এদের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে অপারেশন ব্লু স্টারেও ব্যবহার করেছিলেন!'

'এই ব্যাটেলিয়ন এখনও এক্সিস্ট করে?' জানতে চায় ডিকে।

'অবশ্যই করে!' অধ্যাপক বলেন, হেসে। সামান্য থেমে, সম্ভবত চুমুক দিলেন চায়ের পেয়ালায়, বলেন, 'লাদাখে—গালওয়ান ভ্যালিতে কারা লড়াই দিচ্ছে পিএলএ-কে? সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে ওয়র্ল্ডের সবথেকে শক্তিশালী আর্মির সঙ্গে! মিডিয়া লিখছে দেখবেন, বিকাশ ব্যাটেলিয়নের কথা—এদেরই ডাকনাম দেওয়া হয়েছে বিকাশ!'

'কাগজে দেখেছি।'

'মজার ব্যাপার হল, এই গ্রুপ কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির পার্ট নয়! এখন অবশ্য আর এদের ই-২২ বলে না, নতুন নাম হয়েছে—এসএফএফ—স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। তিব্বতিদের সঙ্গে এখন ফোর্সে কিছু গোর্খা আছে। বেশিটাই এক্সাইলড টিবেটান। এখন প্রায় বারো হাজারের ফোর্স!'

'এখন কি এরা সিক্রেট থেকে ওপেন গ্রুপ?' ডিকের কৌতূহল।

'এসএফএফ-এর এক সোলজার রিসেন্টলি লাদাখের প্যাঙ্গন সো-তে প্যাট্রলিং-এর সময় ল্যান্ডলাইন ব্লাস্টে মারা যান—বাষট্টির যুদ্ধের সময়কার মাইন—খবর হয়—এসএফএফ তখনই স্পটলাইটে আসে!'

'এতে সিক্রেট গ্রুপের উদ্দেশ্য নষ্ট হবে না?'

'ডিটেইলড সবকিছু জানা গেছে এমন নয়। মজার ব্যাপার হল, প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর চায়না এই ই-২২ বিষয়ে জানতই না! তবে আমার ধারণা সিক্রেট গ্রুপকে এখন প্রকাশ করাটা ইচ্ছাকৃত!' বলেন অধ্যাপক মিত্র।

'ইচ্ছাকৃত! কেন?' জানতে উৎসুক ডিকে।

'তিব্বতে বসবাসকারী তিব্বতিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য! আমরা ভারতে পালিয়ে এসেছি কিন্তু তোমাদের ভুলিনি, মাতৃভূমিকে ভুলিনি!'

'টিবেট এখন চায়নার অংশ, পিএলএ কি তিব্বতিদের রিক্রুট করছে না?'

'গুড কোয়েশ্চেন ধরণীবাবু, খুব চেষ্টা করছে পিএলএ নিজেদের মিলিশিয়া আউটফিটে টিবেটানদের নিতে, কিন্তু এখনও সফল হয়নি!'

‘ইন্ডিয়ার টিবেটানদের মধ্যে এসএফএফ-এ জয়েন করার ট্রেন্ড এখনও আছে? নতুন জেনারেশনের মধ্যে সেই মোটিভেশন আছে?’ ডিকের ফের সওয়াল।

‘অ্যানাদার গুড কোয়েশ্চেন কয়ালবাবু! ইন্ডিয়ায় এক্সাইলড টিবেটানদের নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ আর ইন্ডিয়ায় থাকতেই চায় না! হতাশা। অনেকেই চলে যাচ্ছে—এদের ডেস্টিনেশন মূলত ইউএসএ। বহু স্কুল, কলেজ এমনকী মন্যাস্ট্রি স্রেফ ছাত্রের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! তাছাড়া ই-২২ গ্রুপের একটা স্বপ্নভঙ্গও আছে! তারা ভেবেছিল ইন্ডিয়া তাদের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করবে, কিন্তু তাদের অভিযোগ, কোথায় কী, ইন্ডিয়া নিজেদের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করছে কিন্তু তিব্বতের স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রায় নীরব!’

‘দেশের প্রতি টান কমে গেছে বলছেন?’

‘না, তা নয়। পরাধীনতার জ্বালা কখনও জুড়োয় না! আমি বাস্তব অবস্থাটা বললাম।’ নিজের বক্তব্য আরও পরিষ্কার করেন অংশুমান মিত্র।

‘ইন্ডিয়ার টিবেট পলিসি এখন ঠিক কী?’ ফের ডিকের জিজ্ঞাসা।

‘খুবই অস্বচ্ছ! এসএফএফ সম্পর্কে চাইনিজ পত্রিকায় লেখা হচ্ছে—ইন্ডিয়া আগুন নিয়ে খেলছে!’ সামান্য বিরতি নিয়ে বলেন, ‘চায়না এখন সুপারপাওয়ার! প্রতিপক্ষ এত শক্তিশালী হলে ইন্ডিয়ার গো-স্লো ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে!’

‘থ্যাঙ্ক ইউ প্রফেসর মিত্র। পরে আবার কথা হবে। অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম।’

‘আরে না, না, এটা আমার সাবজেক্ট—যখন খুশি ফোন করবেন। গুড নাইট।’

ছয় দশক পেরিয়ে গেছে নির্বাসনের, কখনও তিব্বতে নিজেদের দেশে ফিরতে পারবে কি না, সন্দেহ। এই হতাশা কি গ্রাস করেছে ই-২২ যোদ্ধাদের? নতুন প্রজন্মের তিব্বতিদেরও কি একই হতাশা? নতুন প্রজন্ম কখনও স্বদেশ দেখেইনি, পরাধীনতার জ্বালা কি তারা অনুভব করে না? তাদের উদ্বুদ্ধ করা কি কঠিন হচ্ছে? না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়ে তরুণ প্রজন্ম কি অতিরিক্ত হতাশ? এদের নেতিবাচক আচরণ কি অধৈর্য করেছে টাইগারকে? ই-২২ নিয়ে স্বপ্নভঙ্গই কি টাইগারকে নিজস্ব গুপ্তসেনা বানাতে প্ররোচিত করল? আবার যে-গুপ্তসেনা বানাতে চান তিনি, সেখানে যোগ দিতে প্রয়োজনীয় তিব্বতিই যদি না-পান, বাহিনী বানাবন কীভাবে! লামাও কি এই কারণে হতাশ! নাহলে এত বেপরোয়া কেন?

টাইগার কি সত্যিই একজন বিপ্লবী না কি এক উন্মাদ? চিনের সঙ্গে লড়াইয়ের দীর্ঘ পরিকল্পনা করছেন, আবার একইসঙ্গে হঠকারি কর্মসূচি পালন করতে বদ্ধপরিকর! বেপরোয়া মনোভাবে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে। প্রত্যয় কি নড়ে গেছে লামার? প্রফেসর অংশুমান মিত্র যা-বললেন, লামার মনোভাবে সেই চিত্রই কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত।

নীচে বহমান রঙ্গিতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিকে। এহেন বিপজ্জনক মানুষের কবল থেকে তিনজন মানুষকে উদ্ধার করবে কীভাবে?

১৪৫

২৪ অক্টোবর। কালুক। পশ্চিম সিকিম।

কালুক-এ হেলিপ্যাড নেই। শূন্যে স্থির হেলিকপ্টার থেকে দড়ির মই বেয়ে নীচে নামে রিয়াজ ও বাকিরা। একজন কম্যান্ডো নামতে সাহায্য করেন ডিকেকে। লোকালয় এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় অবতরণের ব্যবস্থা করেছেন সুভাষ রাই, কালুক থানার বড়বাবু। তাশি নামডোলের পরিচিত অফিসার সুভাষ রাই। বিস্তারিত পরিকল্পনা না-জানিয়ে তাশিই সুভাষ রাইকে বলে দিয়েছিলেন সুবিধাজনক ফাঁকা জায়গা খুঁজে রাখতে। তবুও মস্ত শব্দ-করা আকাশপাখি দেখতে কেবল ছেলেপুলেরা নয়, ভিড় করে বয়স্ক মানুষেরাও। সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ন্ত্রণে রাখে কালুক থানার পুলিশ।

নাম-না-জানা রঙিন ফুলগাছ ও এলাচ ক্ষেতের মাঝে একে একে নামে সকলে। পাইলট বিদায় নিয়ে আবার উড়ে যায় নিকটবর্তী পেলিং-এর দিকে। ওখানে হেলিপ্যাড আছে। প্রয়োজনে যেন দ্রুত উড়ে আসতে পারে রিনচেনপং। হেলিকপ্টার উড়ে যাওয়ার পর শূন্য আকাশের দিকেও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ছেলেবুড়োর দল। তারপর ধীরে ফাঁকা হয় ভিড়।

এদিকে কম্যান্ডো ও পুলিশ বাহিনীর তিনটি এসইউভি সড়কপথে জোড়থাং পেরিয়ে দ্রুত কালুকের পথে। ঘড়ি দেখে ডিকে। প্রায় একটা বাজে। এখনও ন্যূনতম আধঘণ্টা অপেক্ষা। কালুক থানায় অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ন্তর নেই। খাতির করেন ওসি সুভাষ রাই। ওসি'র সঙ্গে বসে গল্প জোড়ে ডিকে। মেজবাবুর ঘরে বসে এক কাপ চা খান তাশি, তারপর মেজবাবুকে সঙ্গে করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। রিয়াজের কানে কিছু বলে যান বেরোবার আগে।

রিয়াজ থানার ভেতরে না-ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখে। অপূর্ব পাহাড়ি জনপদ। এত হাওয়া যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে দূর দেশে। বাতাসে হালকা হিম। জ্যাকেটের জিপার টেনে দেয় গলা পর্যন্ত। রাস্তার ধারে যে কোনও গাছের গায়ে লতা। সবুজ তিনফলা পাতার আড়ালে ঝুলছে সবুজ ফল। চিনতে পারে রিয়াজ। স্কোয়াশ। এক কনস্টেবল জানালেন এলাকায় এই ফলের নাম ইস্কুস। পাতার আড়ালে ঝুলন্ত এক স্কোয়াশের গায়ে হাত বুলিয়ে দূরে পাহাড়ের দিকে তাকায় রিয়াজ।

অফিসের কাজে যখনই রায়গঞ্জ বা জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গের যেখানেই গেছে সর্বত্রই ভাতের সঙ্গে পেয়েছে স্কোয়াশের ঝোল। আলু ও হালকা-ভাজা বিউলির ডালের বড়ি সহযোগে সামান্য ঘি-সুবাসিত স্কোয়াশের ঝোলে পেয়েছিল অমৃতের স্বাদ। এক-আধবার কুচো চিংড়ি সহযোগেও খেয়েছিল কোনও সহকর্মীর বাড়ি। খাবারের স্মৃতি জাগ্রত করে খিদে। সেই কোন সকালে আচার দিয়ে গোটা চারেক আলুর পরটা আর ডাবল ডিমের ওমলেট খেয়েছে, এখন তারা কোথায়! ঠিক এই মুহূর্তে দ্বিপ্রাহরিক একটি ভোজন বড় জরুরি। কখন আসবেন তাশি? দূর-পাহাড় থেকে চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে সতৃষ্ণ তাকায় রিয়াজ।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে একটি লোককে ধরে নিয়ে আসছেন দু'জন কনস্টেবল। লোকটির মাথায় গলফ টুপি, গায়ে লাল জ্যাকেট, নীল জিনস, পায়ে শাদা স্নিকার্স। হাতে তার কোনও যন্ত্র। তাঁরা আরও নিকটবর্তী হলে বুঝতে পারে ধৃত লোকটির

হাতে ড্রোন। কনস্টেবল দু'জন থানার ভেতরে নিয়ে যান তাকে। পিছু পিছু যায় রিয়াজ। বড়বাবু সুভাষ রাইয়ের সামনে নিয়ে দাঁড় করান লোকটিকে।

'স্যার, এই লোকটা ড্রোন ওড়াচ্ছিল! উইদাউট পারমিশন!'

ডিকে জরিপ করে লোকটিকে। ওসি'র ঘরে ঢুকে চমকে যায় রিয়াজ। এই লোকটি তার চেনা!

'আরে, সোনম আপনি!'

রিয়াজের দিকে চমকে তাকায় কালিম্পং-এর হিল পয়েন্ট পত্রিকার সাংবাদিক সোনম শেরিং লেপচা। ডিকেকে সোনমের পরিচয় দেয়। টিবেট আনবাউন্ড আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী সোনম লেপচা এবং তার হাতে ড্রোন-ক্যামেরা। মুহূর্তে উত্তেজিত হয় ডিকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তাহলে কি টাইগার লামা পরিকল্পনা বদলালেন!

'টাইগার লামার প্রোগ্রাম কালকের বদলে কি আজ হচ্ছে? মিথ্যে বললে বাকি জীবন জেলেই কাটাতে হবে!' কঠোর স্বর ডিকের।

নিশ্চুপ সোনম। তাঁর মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। আদৌ তিনি ভয় পেয়েছেন কি না, বোঝা যায় না।

'ড্রোন-ক্যামেরা দিয়ে সো কলড স্পেকট্যাক্যুলার দৃশ্যের ছবি তুলবেন, এই তো প্ল্যান আপনার, কী তাই তো? স্পিক আউট!' চিৎকার করে ডিকে।

তাপ-উত্তাপ নেই সোনমের। তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও উচ্চারিত হবে না, বুঝে যায় ডিকে। রিয়াজের দিকে তাকায়। ডিকের ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে রিয়াজ বলে, 'অ্যারেস্ট হিম ওসিসাহেব! লকআপে ভরুন!'

ড্রোন, স্মার্টফোন, ঘড়িসহ যাবতীয় জিনিস বাজেয়াপ্ত করে, সোনম শেরিং লেপচাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় লকআপে। একজন কনস্টেবল যখন তাঁকে সামান্য বলপ্রয়োগ করে হাজতে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, সোনম চিৎকার করে ওঠে, 'লং লিভ টিবেট! লং লিভ ফ্রি টিবেট মুভমেন্ট!' গারদে ঢুকেও থামে না শ্লোগান। 'ডাউন উইদ দ্য পিএলএ!' 'ডাউন উইদ দ্য সিসিপি!' তারপর কম্বল পেতে গারদের ভিতরে বসে পড়ে শুরু করে গান। ডিকে লক্ষ করে তাশি নামডোল ও আরও দু'একজন পুলিশকর্মীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই গান শুনে। তিব্বতি ভাষায় সেই গান সম্ভবত কোনও স্বপ্ন আর স্বাধীন তিব্বতের কথা বলে।

রজতকে ফোন করে ডিকে জানায় সব। গতকাল লাচুং গুম্ফায় ডিকের সঙ্গে কথোপকথনে 'মাস সেলফ ইমোলিশন' বা গণ আত্মাহুতি'র পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায়, টাইগার লামা তাঁর প্রাথমিক পরিকল্পনা ত্যাগ করে প্ল্যান-বি প্রয়োগ করছেন সম্ভবত। ভারতের মাটিতে গোটা হিমালয়ান রেঞ্জে সতর্কতা প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে কম্যান্ডো ও পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় হোটেল থেকে তাশি ও মেজবাবু নিয়ে এসেছেন জনা তিরিশেক লোকের খাবার। দ্রুত হাতে ভাত ও মুরগির মাংসের ঝোল খেয়ে চাঙ্গা হয়ে যায় সকলে। চাগাড়-দেওয়া পেটের আগুন প্রশমিত করতে পেরে সন্তুষ্ট রিয়াজ।

আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে, সুভাষ রাই ও তাঁর পুলিশকর্মীদের থানায় রেখে, চারটে এসইউভি এগিয়ে যায় রিনচেনপং-এর দিকে।

গাড়ি কিছুদূর এগোতেই ডিকের ফোন বেজে ওঠে। রিঞ্চেন লামা।

'মিস্টার কয়াল, আপনাকে টাইগার বলেছিল হিমালয়ের একটি গুম্ফাতেও যদি পুলিশ বা মিলিটারি পৌঁছায়, আপনার আপনজনেদের ক্ষতি হবে! চরম ক্ষতি! আপনি কথা রাখেননি! এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে!'

কেটে যায় ফোন। টাইগারের পরিকল্পনা নিয়ে তার অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণ হলেও, ঠান্ডা একটা ধারা নামে শরীর জুড়ে। নিবেদিতাকে ওরা জোর করে স্বেচ্ছাসেবক বানিয়েছে! চোখ বোজে ডিকে। দাউদাউ অগ্নিবলাকায় দগ্ধ হচ্ছে দুনিয়া। আগুনের সেই গ্রাস থেকে মুক্তি নেই!

এই আগুনে কি বলি হতে চলেছে নিবেদিতা?

১৪৬

২৪ অক্টোবর। কালুক। পশ্চিম সিকিম।

গাড়ি থামায় ডিকে। তাশিকে ডেকে বলে,

‘গুম্ফায় কোনও প্রোগ্রাম থাকলে লোকাল লোকেরা গুম্ফায় যায়?’
‘হ্যাঁ। দলে দলে যায়। বুদ্ধিস্টরা তো যায়ই। ছম থাকলে হিন্দু বা অন্য নন-বুদ্ধিস্টরাও যায়।’ তাশি জানান।

ছম-এর কথা উঠতেই রিয়াজের চোখে ভেসে ওঠে কিউরেটর তনুময় পালের দেখান ছম নৃত্যের ভিডিও। মুখোশ নৃত্য। রিয়াজ মনে করতে পারে, নৃত্যানুষ্ঠান ঘিরে যথেষ্ট দর্শক সমাবেশ ছিল। সকলেই নিশ্চয়ই গুম্ফার অধিবাসী নন।

‘এলাকা থেকে খবর নিন, রিনচেনপং-এর কোন গুম্ফায় আজ প্রোগ্রাম আছে! ক্যুইক!’

তাশি ফোন করেন ওসি সুভাষ রাইকে। তারপর একটি গাড়ি নিয়ে চলে যান লোকালয়ের দিকে। রাস্তায় নেমে সিগারেট ধরায় ডিকে। নেটে ছম-এর ভিডিও দেখায় রিয়াজ।

সিগারটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফোনের পর্দায় চোখ রাখে ডিকে।

দশ মিনিটের মধ্যে ফোন করেন তাশি। রিনচেনপং ঞিংমাপা গুম্ফায় আজ ছম নৃত্যের অনুষ্ঠান আছে। সকাল দশটা থেকেই শুরু হয়ে গেছে সেই উৎসব, রাত্রিকালীন বিরতি দিয়ে চলবে আগামিকাল বিকেল পর্যন্ত। গুরু চোংখাপা বাটার ল্যাম্প ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষ্যে কমবেশি সব গুম্ফাতেই অনুষ্ঠান হয়। দু'তিনটি গুম্ফা একত্রে আয়োজন করে ছম নৃত্যানুষ্ঠান।

কালুক থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপর চড়াই ভেঙে পৌঁছাতে হয় ওই গুম্ফায়। বছরের অন্য সময় প্রায়-পরিত্যক্ত পড়ে থাকে। বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় সেজে ওঠে। গুরু চোংখাপা আলোর উৎসবের জন্য দু'দিন ধরে অনুষ্ঠান হবে গুম্ফায়। তাশিকে দ্রুত ফিরতে বলে ডিকে রিয়াজের সঙ্গে কথা বলে নেয় একান্তে।

পুলিশ ও এসটিএফ কম্যান্ডোদের নিয়ে অপারেশনের ছক কষতে বসে রিয়াজ। তিরিশ জনের দল ভাগ হবে পাঁচটি দলে। প্রতি দলে চারজন সশস্ত্র পুলিশকর্মীর সঙ্গে থাকবেন দু'জন কম্যান্ডো। রিয়াজ, তাশি ও ডিকে সাধারণ দর্শনার্থী হয়ে মূল ফটক দিয়ে ঢুকবে গুম্ফায়।

তাশি এসে যোগ দেন। তাঁর হাতে কালুক থানা এলাকার মানচিত্র। থানা থেকে জোগাড় করেছেন। গাড়ির বনেটে সেই মানচিত্র পেতে পাঁচটি দলকে তিনি বুঝিয়ে দেন গুম্ফার অবস্থান। পাঁচটি দল পাঁচ দিক থেকে প্রবেশ করবে গুম্ফায়। তিরিশজনের স্মার্টফোনে সকালেই ফরোয়ার্ড করা হয়েছে ছোট্ট অর্হৎ, কবীর খান ও নিবেদিতার ছবি। দিয়ে দেওয়া হয়েছে টাইগার লামার ছবিও। চারটি ছবি দেখিয়ে রিয়াজ আবার বুঝিয়ে দেয় কী কর্তব্য। এসটিএফ কম্যান্ডোরা বসেন পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে। পুলিশকর্মীরা কোন পথে কীভাবে তাঁদের অনুসরণ করবেন, কী-করণীয় এবং কী-করণীয়-নয়, শেষমুহূর্তের বোঝাপড়া ও তালমিল ঝালিয়ে নেন ফের। ধূম্রসেবন করতে করতে ডিকে কেবল সকলকে মনে করিয়ে দেয় হিংস্র শ্বাপদের উপস্থিতির কথা। বরফচিতা কেতু।

মূল রাস্তা একটাই। ব্রিটিশ আমলের ডাকবাংলো পেরিয়ে একটি লেক-এর পাশ দিয়ে পথ মিশে গেছে সরলবর্গীয় গাছের ঘন জঙ্গলে। সেই পথে ট্রেক করে উঠতে হয় পাহাড়ের টং-এ। কিছুদূর গাড়িতে এসে পাঁচটি দল ছড়িয়ে যায় পাঁচ দিকে। পাহাড়ের পায়ের কাছে গাড়িতে এসে নামে রিয়াজ, তাশি ও ডিকে। তারপর শুরু করে যাত্রা উচাই বরাবর। কিছুদূর এগোতেই তাশির ফোন বাজে। ওসি সুভাষ রাই। তাঁর থানা এলাকায় যত গুম্ফা আছে, সর্বত্র অভিযান চালাতে হবে এবং মোতায়েন করতে হবে পর্যাপ্ত পুলিশ। এসপি সাহেবের হুকুম।

তাশির কাছে শুনে ডিকে চাপা গলায় রিয়াজকে বলে, ‘এই অভিযান গোটা হিমালয় জুড়ে সব গুম্ফায় শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে!’ বলতে বলতেই বাজে রিয়াজের ফোন। বিনোদ কুমার। পশ্চিম সিকিম জেলার এসপি। সড়ক ও হেলিকপ্টারে গেইজিং থেকে রওনা হয়ে গেছে পুলিশের একটি বিশেষ দল। অফিসার ইন-চার্জের নাম ও নম্বর দেন। রিয়াজের থেকে জেনে নেন অভিযানের খুঁটিনাটি। তাঁর জেলায় প্রতিটি গুম্ফায় শুরু হয়েছে পুলিশি অভিযান। গ্যাংটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হুকুমে সিকিমের প্রতিটি গুম্ফাতেই চলবে এই অভিযান।

কালুক থানা এলাকায় বৌদ্ধ গুম্ফার সংখ্যা পাঁচ। এই ঞিংমাপা গুম্ফাই সবথেকে বড়, বাকি চারটি অপেক্ষাকৃত ছোটো । রিনচেনপং ঞিংমাপা গুম্ফায় ইন্সপেক্টর রিয়াজ আলমের নেতৃত্বে বিশেষ দল অভিযান করছে, ফলত ওসি সুভাষ রাই-এর কাজ কিছুটা সহজতর, তাঁকে বাকি চারটি গুম্ফা দেখলেই চলবে।

ফোনপর্ব শেষ। চারদিকে জমকালো কিন্তু নীরব গাছ। মুহূর্তে স্তব্ধতা এসে বিছিয়ে দেয় চাদর। শুকনো পাতায় পদধ্বনি আর নাম-না-জানা পাখির ডাক যেন সেই স্তব্ধতারই অংশ। ঝিঁঝিঁর ডাকও। কথা বলে না কেউ। জলহীন খাঁ-খাঁ পোখরি। গভীর। মস্ত সেই শুকনো সরোবর বাঁয়ে রেখে সরলবর্গীয় গাছের জঙ্গল ঠেলে এগোয় তিন জন।

ঞিংমাপা গুম্ফা। রিনচেনপং। পশ্চিম সিকিম।

ছম নৃত্য চলছে চত্বরে। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নেচে চলেছে মুখোশ পরিহিত নর্তকের দল। নৃত্যাঙ্গন ঘিরে বহু দর্শক। বুড়ো-বুড়ি, ছেলেপুলে সকলেই বসে বা দাঁড়িয়ে দেখছেন মুখোশ নৃত্য। রঙিন লুংদার ও ধ্বজায় সেজেছে গুম্ফা চত্বর। সমস্ত আয়োজনের দিকে প্রায়-বিহ্বল তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। আজ সকালেই তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছে এই গুম্ফায়। পাহাড়ের ওপরে অপূর্ব অবস্থান। অক্টোবরের নির্মল আকাশে আশ মিটিয়ে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। গুম্ফার জানালা দিয়ে নিবেদিতা ছম যত দেখে, তার থেকেও বেশি দেখে পাহাড়। দূর-পাহাড় নীরব হাতছানি দেয় তাকে।

দ্রুত ডমরু বাজাচ্ছে বাজনদার, নিবেদিতা বোঝে এবার ছমের সাময়িক বিরতি। মহড়া দেখে আর মাঝেমাঝে পাসাং লামার ধারাবিবরণী শুনে ছম নৃত্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরি হয়েছে। তিব্বতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মিউজিক একটা বড় অংশ। তামার তৈরি লম্বা টেলেস্কোপিক ট্রাম্পেট সবচেয়ে দর্শনীয়। দু'জন সেই শিঙা ধরে আছে আর ফুঁ দিচ্ছে অন্য লোক। কেউ বাজাচ্ছে শাঁখ, কেউ ঘণ্টা, কারো হাতে কর্তাল।

অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এই গুম্ফা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন মোট ষোল জন স্বেচ্ছাসেবক। তিরিশ বছরের নীচে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। সন্ন্যাসিনী চারজন। নিবেদিতা তাঁদেরই একজন। ছম নাচের বিরতি হতেই চারজন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে যান আরও দু'জন সন্ন্যাসিনী।

ঘরে অপেক্ষায় আরও তিন জন। বিভিন্ন ভেষজ পাত্র তাদের হাতে। ঘরে ঢুকতেই সকলের পোশাক ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর সারা অঙ্গে লেপন করা হয় ভেষজ। কাঠপুতুলের মতো আচরণ নিবেদিতার। বাধাহীন। নির্বিকার। নগ্ন গায়ে এরা কী মাখাচ্ছে কে জানে, নাছোড় এক বাতাস এসে ঘুরঘুর করে চারপাশে, শিরশির করে শরীর।

শিঙা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ভেসে আসে। ফের শুরু হয়েছে ছম। ভেষজ মাখিয়ে আবার পরিয়ে দেওয়া হয় রক্তচীবর। তেজ কমে আসছে দিনের আলোর। গুম্ফায় সকলের মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা। থমথমে ভাব। এই আচরণ বোধগম্য হয় না নিবেদিতার। ঘরেই বসিয়ে রাখা হয় নির্বাচিত চার সন্ন্যাসিনীকে। বাকিরা চলে যায় ঘর ছেড়ে।

শিঙা ও ড্রামের আওয়াজ বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে বাইরে। বড় বড় মুখোশ পরে নর্তকরা কি নেমে গেল নাচতে? গবাক্ষের দিকে তাকায় নিবেদিতা। অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে। চোখ বুজে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন বাকি তিন সন্ন্যাসিনী। চোখ বোজে নিবেদিতাও। এখনও সে জানেই না, কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে তাকে! কী তার করণীয়? এই ভেষজ মাখাবার উদ্দেশ্যই বা কী?

হঠাৎ ছোট্ট একটা পাথরের নুড়ি এসে পড়ে গায়ে। চোখ খুলে চকিতে তাকায় দরজার দিকে। তেনজিং। চোখের ইশারায় বেরিয়ে আসতে বলে ঘর ছেড়ে। অন্যান্য তিন সন্ন্যাসিনীর দিকে তাকায় নিবেদিতা। চোখ বুজে তাঁরা একাগ্র চিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করেই চলেছেন নীচু গলায়। উঠে দাঁড়ায় নিবেদিতা। চারপাশ আবার দেখে সন্তর্পণে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। বেরোয় ঘরের বাইরে। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে তেনজিং। চোখের ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে নবীন সন্ন্যাসী। এগিয়ে যায় নিবেদিতা।

১৪৮

গুম্ফার সবথেকে পবিত্র ঘর গোন থাং-এ বৈদ্যুতিক আলো নেই। মাখন-প্রদীপ জ্বলে। ভয়ঙ্কর দর্শন ধর্মপালদের মূর্তি আজ আর ঢাকা নেই রঙিন কাপড়ে। চিত্রিত থাংকাগুলিও উন্মুক্ত। গোন থাং-এ পূজার আয়োজন হলেই সরান হয় আচ্ছাদন। আত্মপ্রকাশ করে মূর্তিগুলো। মহাকাল, যম, যমন্তক, হয়গ্রীব দেবতার পাশে আছেন পেলদেন লেহ্‌মো।

দেবতাদের মধ্য তিনিই একমাত্র দেবী। বহু মাথা, বহু পদ, বহু হস্ত বিশিষ্ট মূর্তিগুলো, ঘন অন্ধকারে মাখন-প্রদীপের আলোয় দৃশ্যত ভয়ঙ্কর। তবে আজ অতিরিক্ত আলো গোন থাং-এ। ব্যাটারি-চালিত এলইডি বাতি জ্বলছে ঘরে। চারটি বাচ্চা চুপচাপ বসে আছে আসনে। একজন সন্ন্যাসী এসে সব বাচ্চাদের হাতে ফ্রুট জুসের বোতল দিয়ে যান। অর্হৎ বোতলটা হাতে নিয়ে তাকায় চারপাশে। বাকি তিনজন তারই বয়সী, তবে তারা পাহাড়ের ছেলে। তিনজনই কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আসন থেকে উঠে দাঁড়ায় অর্হৎ। আস্তে এগোয় দরজার দিকে।

বাকি বাচ্চারা যেমন ভয়ে অস্থির, তেমন ভয় তার যদিও করছে না। ভয়-ভয় ভাব তার কেটে গেছে প্রথম দিনই। ঘুম ভেঙে যখন দেখল মা নেই পাশে, বাবা নেই, চারপাশে লাল কাপড়-পরা ন্যাড়ামাথা কয়েকটা লোক, 'নমো বুদ্ধায়' বলতে তার একটুও ইচ্ছে করল না। চারিদিকে তাকিয়ে বরং সে কেঁদে ফেলল ভ্যাঁ করে। কিন্তু পরে কেটেও গিয়েছিল সেই ভয়। ভালো ভালো খাবার দিয়েছিল গাড়িতে, অর্হতের যদিও খেতে ইচ্ছেই করেনি। মায়ের কথা বার বার মনে পড়ছিল। ভাবছিল কেবল একটাই কথা, সে কি কিডন্যাপড? তাহলে তো তাকে ফিরতেই হবে, মা-বাবার কাছে, ঠাম্মা-দাদুর কাছে। সেদিন থেকেই সে ভেবে গেছে কীভাবে পালানো যায় এদের হাত থেকে। কিন্তু সুযোগ পায়নি।

মাঝেমাঝে মায়ের কথা ভেবে মনখারাপ হয়েছে, কেঁদে উঠেছে ডুকরে। লাল-কাপড় পরা মেয়েরা তাকে আদর করেছে, খুব ভালোবেসেছে, খেতে দিয়েছে স্যুপ, নুডলস, মোমো। কতদিন মা-কে দেখেনি, আবার মনখারাপ ফিরে আসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে। সকলেই খুব ব্যস্ত, তার দিকে তাকাবার ফুরসত নেই কারো। হঠাৎ একটা পাখির ডাক শোনে, কিন্তু এই ঘরের মধ্যে পাখি কোত্থেকে এল? চারিদিকে তাকায় অর্হৎ। বাইরে কি ডাকছে পাখি? এই বাড়িটা কি জঙ্গলের মধ্যে?

না, পাখি তো কাছাকাছিই আছে, শিস দিয়ে যেন ডাকছে কারোকে। আবার তাকায় চারপাশে। সিঁড়ির কাছে লাল কাপড়-পরা একটা ন্যাড়ামাথা কমবয়সী সন্ন্যাসী হাত নেড়ে ডাকছে তাকে। অবাক হয় অর্হৎ। হাতছানি দিয়ে ডাকছে আবার। এগিয়ে যায় অর্হৎ। সে

চেনে এই বাচ্চা সন্ন্যাসীকে। এর আগেও দেখেছে দু'এক বার। সবসময় মিষ্টি করে হাসে। ওকে চকোলেটও দিয়েছিল একবার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে নবীন সন্ন্যাসী এগিয়ে যায় অনতি-প্রশস্ত অলিন্দ ধরে। পিছু পিছু অর্হৎ। অলিন্দ পেরিয়ে মস্ত চাতালের পাশে পরপর কয়েকটি ঘর। তৃতীয় ঘরের চৌকাঠে দাঁড়ায় সন্ন্যাসী। হাতের ইশারায় দ্রুত আসতে বলে অর্হতকে। অর্হৎ পা চালায় তাড়াতাড়ি। ঢুকে পড়ে ঘরে। বহু পুরনো আসবাব-ভর্তি ঘর। পরিত্যক্ত আসবাব, ভাঙা বাঁশ, নষ্ট থাংকা, ছেঁড়া লুংদার ও ধ্বজা ডাঁই হয়ে আছে ঘরে। বাইরের স্তিমিত আলো যেটুকু এখনও প্রবেশ করছে, নচেৎ আলাদা আলো নেই ঘরে। আধা-অন্ধকার ঘরের ভিতরের দিকে ভাঙা এক তক্তপোশ উল্লম্ব দাঁড়িয়ে, তারই পিছনে অর্হৎকে ঢুকিয়ে দেয় তেনজিং। তারপর দরজা ভেজিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

লাল কাপড়-পরা ন্যাড়া একটা মেয়ে টেনে নেয় ছোট্ট অর্হতকে। তীব্র আতঙ্কে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে-শিশু। নিবেদিতা আদর করে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসায়, 'কলকাতায় মা-বাবার কাছে যদি ফিরে যেতে চাও, একদম কাঁদবে না।' কান্না থামায় অর্হৎ।

দরজা বন্ধ করতেই ঘন হয়ে আসে অন্ধকার। অর্হতকে বুকে জড়িয়ে চৌকির পেছনে বসে থাকে নিবেদিতা। বাঁচার আশা তাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে স্থবিরতা থেকে। কিন্তু সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। তেনজিং-এর উদ্দেশ্য কী? সে কি সত্যিই তাদের বাঁচাতে চায়? কিন্তু কেন? ও কি গৌরাঙ্গকে মেল করেছে? গৌরাঙ্গ নিশ্চয়ই পুলিশ বা ডিকেবাবুকে ফোন করে জানাবে! তাহলে পুলিশ এখনও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন!

নীলকণ্ঠ আর টাইগার লামা—দুই বিপজ্জনক লোক একত্র হয়েছে। এদের হাত থেকে মুক্তি কি সহজে হবে? কবীরদা কোথায়? তিনিও কি এই গুম্ফায়? সকালে আসা ইস্তক কবীরদার দেখা পাওয়া যায়নি। কবীরদাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল! সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আরও বেড়ে যায় উৎকণ্ঠা। ছোট্ট অর্হৎ নিশ্চুপ বসে থাকে নিবেদিতার কোলে।

হঠাৎ অন্ধকারে জ্বলে ওঠে একজোড়া চোখ। ছ্যাঁত করে ওঠে বুক। হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে যাবে! এগিয়ে আসে দুটো জ্বলন্ত চোখ। বুনো বিশ্রী একটা গন্ধ।

কেতু। হিংস্র বরফচিতা তক্তাপোশের পেছনে এসে হাজির। জ্বলন্ত চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। অন্ধকারে ওর চোখ আর বুনো গন্ধ ছাড়া কিছুই ঠাহর হয় না। গন্ধটা চেনা বলেই নিবেদিতা বুঝতে পারে, জ্বলন্ত চোখের মালিক বরফচিতা কেতু। নীলকণ্ঠ বা টাইগার লামার হাত থেকে বাঁচলেও হিংস্র স্নো লেপার্ডের থেকে রক্ষা নেই! অসমবয়সী দুই মানুষ, মনুষ্যেতর এক প্রাণীর সামনে কার্যত কাঁপতে থাকে। আরও এগিয়ে আসে কেতু। বার করে জিভ। চেটে দেয় অর্হতের কপাল। নিবেদিতার মুখ। অন্ধকারের আলোয়, বিস্ময়ে নিবেদিতা দেখে, কোনও গর্জন ছাড়াই, হিংস্রতা ছাড়াই, তাদের পাশে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ে কেতু। টাইগার লামার প্রিয় পোষ্য।

১৪৯

‘না, আমি শুনব না! রিঞ্চেন স্টপ দ্য অডিও!’

দু’হাতে কান চেপে চিৎকার করেন টাইগার। নিজের ফোনে অডিও বন্ধ করেন রিঞ্চেন লামা। স্তব্ধ গর্ভগৃহ। ভাবী বুদ্ধ মৈত্রয়’র মূর্তির পাশে গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি। রিন-পো-ছে’র পদপ্রান্তে বসে মাথা ঠেকান টাইগার লামা।

‘হিজ হোলিনেস এই টেপড মেসেজ পাঠিয়েছেন সব গুম্ফায়! এটা হঠকারিতা! এই প্রোগ্রাম বন্ধ করতে বলেছেন! আশাকরি সকলেই মানবে হিজ হোলিনেসের কথা!’ বলেন রিঞ্চেন লামা।
‘আমি মানব না!’
‘‘হিজ হোলিনেসের বার্তা মানবে না!’

‘মুস্তাং-এ পাঠান টেপড মেসেজের কথা মনে নেই তোমার, রিঞ্চেন! কী হয়েছিল পরিণতি?’

‘আলাদা পরিস্থিতি! আলাদা মেসেজ! হিজ হোলিনেসের মূল উদ্দেশ্য রক্তপাত ঠেকান! মৃত্যু ঠেকান! সেদিনও ছিল, আজও তাই! সেদিন পিএলএ আর নেপালের কম্বাইন্ড ফোর্স বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল! আজ এই গণ আত্মাহুতির সিদ্ধান্ত তোমার হাতে, সিসিপি’র হাতে নয়!’

‘সত্তর বছরের ইতিহাস কোন বিশ্বাসের ইতিহাস রিঞ্চেন! পুরোটাই তো বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস!’

‘মেনে নাও টাইগার! হিজ হোলিনেসের কথা মান! সবাইকে বলে দাও প্রোগ্রাম ক্যানসেলড!’

‘না। মানব না! কেউ মানবে না! তাওয়াং থেকে লাদাখ জ্বলবে! লাসাও জ্বলবে!’

দুই বাহু তুলে হা-হা করে হাসতে থাকেন টাইগার। গর্ভগৃহের মৃদু আলোয় রক্তবর্ণ ত্রিচীবর বেষ্টিত লামাকে অলৌকিক এক মূর্তি বলে ভ্রম হয়। দূরে অসহায় বসে দুই লামার বাকযুদ্ধ দেখেন কবীর। উৎকণ্ঠা তুমুল। নিবেদিতাকে কি সত্যিই এই আগুনে বলিদান দেবেন টাইগার?

‘টাইগার, হোশ মে আও! ইউ হ্যাভ লস্ট ইয়োর ব্যালান্স!’ চিৎকার করেন লামা রিঞ্চেন।
‘স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়!’

মৃদু বিষণ্ন হাসি। শান্ত স্বরে কবিতা বলতে বলতে বৃদ্ধ লামা রিঞ্চেন লামার দিকে এগিয়ে যান। সহযোদ্ধার দুই কাঁধ ধরে নীচু করেন মাথা। তাঁর দু’চোখে অশ্রু।

হঠাৎ গর্ভগৃহে প্রবেশ এক সন্ন্যাসীর। সারা গায়ে তার ভেষজ লেপন। লাল চীবর পরিহিত সন্ন্যাসীর সারা দেহ ক্রোধে উত্তেজিত। ডান হাতে লোহার রড। বাঁ কব্জিতে মস্ত ব্যান্ডেজ। বৃদ্ধ লামাকে দেখতে পেয়েই রে-রে করে দৌড়ে যায় তাঁর দিকে।

‘এতবড় সাহস তোর লামা! তুই আমায় জ্বালিয়ে দিবি! নীলকণ্ঠ মুখার্জিকে তুই জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিবি!’

হাতের রডটি তুলে সপাট বসিয়ে দিতে চায় নীলকণ্ঠ টাইগার লামার মাথায়। এক ঝটকায় টাইগারকে সরিয়ে দেন লামা রিঞ্চেন। বৃদ্ধা লামা ছিটকে পড়েন মণ্ডলে, ছড়িয়ে যায় পূজার উপচার। টাইগার লামাকে সরিয়ে দিতে পারলেও নিজে সরতে পারেন না লামা রিঞ্চেন। রড এসে পড়ে সটান তার মাথায়। মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তিনি।

সম্বিতে ফিরে বৃদ্ধ লামা আড়চোখে একবার তাকান নীলকণ্ঠ’র ডিকে, তারপর চকিতে ছুঁড়ে মারেন তামার সরা। চক্রের মতো সেই ধাতব সরা তীব্র আঘাত করে নীলকণ্ঠ’র ডান বাহুতে। পড়ে যায় লোহার রড। লামা নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হন নীলকণ্ঠ’র। শুরু হয় ফের দুই মার্শাল আর্ট বিশেষজ্ঞের লড়াই। আঘাত ও পাল্টা আঘাতে গর্ভগৃহ উত্তাল।

অসহায় কবীর আসন থেকে উঠে থামাতে যান যুযুধান দুই পক্ষকে। ক্রোধে আত্মহারা নীলকণ্ঠ তীব্র আঘাত করে কবীরকে। প্রৌঢ় অশক্ত কবীর ছিটকে পড়েন, বেদির কোনায় লেগে ফেটে যায় মাথা। কবীরের মাথায় রক্ত দেখে ক্ষেপে যান টাইগার লামা। ডান পায়ের প্রচণ্ড পদাঘাত আছড়ে পড়ে নীলকণ্ঠ’র বুকে। জ্ঞান হারায় নীলকণ্ঠ।

লামা দৌড়ে গিয়ে নাড়ি পরীক্ষা করেন রিঞ্চেন লামার। উঠে দাঁড়িয়েছেন রক্তাক্ত কবীর। রিঞ্চেন লামার ক্ষতে প্রলেপ দেন ভেষজ ওষুধের। কবীরের ক্ষতেও লাগিয়ে দেন সেই প্রলেপ। তারপর অন্য এক পাত্র থেকে প্রলেপ নিয়ে নিজের সর্বাঙ্গে মাখতে শুরু করেন। সমস্ত প্রলেপ সারা গায়ে ও পোশাকে মেখে গর্ভগৃহ ত্যাগ করেন লামা।

পুলিশ ও কম্যান্ডোর পাঁচটি দল ঢুকে পড়েছে গুম্ফায়। তারা দখল নিয়ে নিয়েছেন প্রত্যেক সন্ন্যাসীর গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ। রিয়াজ, তাশি ও ডিকেও ছম নৃত্যানুষ্ঠানের চত্বর ডিঙিয়ে পৌঁছে গেছে গুম্ফার ভিতর। ফোনের পর্দায় জনে জনে ছবি দেখিয়ে তিনজন মানুষের খোঁজ পেতে চায়। প্রতিটি ঘরে ঢুকে ঢুকে দেখে। কিন্তু তিনজনেরই কোনও চিহ্ন নেই। অবশেষে গর্ভগৃহে তাশি আবিষ্কার করেন রক্তাক্ত কবীর, প্রায়-অচৈতন্য লামা রিঞ্চেন ও অজ্ঞান নীলকণ্ঠকে।

হুঁশ ফিরতেই যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে লামা রিঞ্চেন চিৎকার করেন, 'টাইগার কোথায়? ওকে বাঁচাতে হবে! বাঁচান ওকে!'

রিয়াজের ইশারায় তাশি দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন শায়িত নীলকণ্ঠ'র হাত ও পা।

লামা রিঞ্চেনের পিছু নেয় সকলে। লামা পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে দৌড়ে বাইরে যান। 'টাইগার, টাইগার!' কিন্তু কোথাও দেখা নেই টাইগার লামার।

টাইগার ততক্ষণে উঠে পড়েছেন দ্বিতল গুম্ফার ছাদে। 'তথাগত আমায় ক্ষমা করুন! গুরু পদ্মসম্ভব আমায় ক্ষমা করুন!' চোখ বুজে বলে শুরু করেন প্রার্থনা। নীরব সেই প্রার্থনার পর লামা নিজের শরীরে স্পর্শ করেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। মুহূর্তে জ্বলে ওঠে লামার সর্বাঙ্গ। জ্বলন্ত লামাকে উপরে দেখে সকলে চিৎকার করে ওঠে গুম্ফা চত্বর থেকে।

লামা রিঞ্চেন চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'টাইগার তুমি যেও না! তোমাকে তিব্বতের দরকার! তিব্বতিদের দরকার! তুমি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সবথেকে উজ্জ্বলতম দীপ! তুমি নিভে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে! তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না টাইগার!' আর পারেন না লামা রিঞ্চেন। মাথার ক্ষতস্থান থেকে আবার শুরু হয়েছে রক্তক্ষরণ। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান মাটিতে।

অনেকেই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে যায় ছাদের দিকে। কিন্তু পলকের মধ্যে ঘটে যায় এক অভাবনীয় দৃশ্য। লাফিয়ে পড়ে কেতু তার প্রভুর গায়ে। ঘাড় কামড়ে এক ঝটকায় তুলে নেয় শূন্যে। দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে নামে একতলার ছাদের চত্বরে। তারপর গুম্ফার দক্ষিণে দেয় মস্ত এক লাফ। ফুলগাছ ও ঝোপঝাড়ে-ভরা অংশে লাফিয়ে নেমে ছাড়ে প্রভুকে। ততক্ষণে বেশ দগ্ধ হয়েছেন বৃদ্ধ লামা। অন্যান্য লামারা এসে দ্রুত নেভান আগুন। দু'জন আমচি এসে শুরু করেন তিব্বতি প্রথার দাহ-চিকিৎসা। মাটিতে পড়ে আছে কেতুও। সে-ও দগ্ধ। পাসাং লামা জল ঢালে তার গায়ে। তার ক্ষতেও প্রলেপ পড়ে ভেষজ ওষুধের।

গেইজিং থেকেও বাহিনী ঢুকে পড়েছে গুম্ফায়। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ গুম্ফা চত্বর। ডিকেদের দোতলার ঘরে নিয়ে যায় তেনজিং। ভেজান দরজা ঠেলে খুলে দেয়। ডিকে চিৎকার করে, 'নিবেদিতা বাইরে আসুন! আর ভয় নেই!'

নিজের কানেই বিশ্বাস করে না নিবেদিতা। পরিচিত কণ্ঠস্বর অথচ যেন মনে হয় অপরিচিত। ঘরে ঢুকে তেনজিং টর্চের আলো ফেলে ভিতরে। অর্হৎকে নিয়ে চৌকির পিছন থেকে বেরিয়ে আসে নিবেদিতা। অর্হতকে কোলে তুলে নেয় রিয়াজ। ঘর থেকে বেরিয়েই নিবেদিতা মুখোমুখি ডিকের। নিবেদিতাকে দেখে বাকরুদ্ধ ডিকে। ইনিই কি নিবেদিতা? মুণ্ডিতমস্তক। পরনে সন্ন্যাসিনীর পোশাক। কে ইনি?

হাঁ করে চেয়ে থাকে ডিকে। নিশ্চল নিবেদিতা। আতঙ্কিত শরীর ও মন অর্গলমুক্তির অকস্মাৎ আনন্দে বিহ্বল। থরথর করে কাঁপে সারা শরীর। এগিয়ে যায় ডিকে। ডিকেকে জড়িয়ে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ে নিবেদিতা।

লামা রিঞ্চেনের জ্ঞান ফিরেছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে রিয়াজ। দগ্ধ টাইগার লামাকে প্রাণে বাঁচাতে হলে গ্যাংটকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা জরুরি। রাজি হন লামা রিঞ্চেন। পেলিং থেকে চলে আসে হেলিকপ্টার। গুম্ফা চত্বর ফাঁকা করা হয় দ্রুত হাতে। শূন্যে স্থির হেলিকপ্টারে দড়ির মই বেয়ে দগ্ধ লামাকে নিয়ে ওঠেন একজন এসটিএফ কম্যান্ডো। আরও একজন কম্যান্ডো, ওসি সুভাষ রাই ও তাশি নামডোল সঙ্গী হন লামার।

হেলিকপ্টারে ওঠার আগে হাতের ইশারায় ডাকেন কবীর খানকে। এগিয়ে যান কবীর। দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করেন লামা। ঠোঁট নড়ে। কিছু বলতে চান খানসাহেবকে। আরও সংলগ্ন হন কবীর।

রজতকে রিপোর্ট করে রিয়াজ। ভিডিও কল করে অর্হতের মা-বাবাকে কথা বলিয়ে দেয় ছেলের সঙ্গে। পকেট থেকে নীরবে-রাখা ফোন বার করে ডিকে। অসংখ্য মিসড কল। গৌরাঙ্গ। ফিরতি কল করে। পথ চিনতে না-পেরে সে-বেচারা বসে আছে কালুক থানায়। ফোন ধরিয়ে দেয় নিবেদিতাকে। আকুল গৌরাঙ্গ ফোনে শুনতে চায় স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। কান্নার দমকে প্রায় কিছুই বলতে পারে না নিবেদিতা।

কবীরকে জড়িয়ে ধরেন ডিকে। মাথায় ব্যান্ডেজ কবীরের। বিষণ্ণ দুই চোখ। মুখে মৃদু হাসি। নির্বাক। কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। কানে বাজে দগ্ধ টাইগার লামার সদ্য-শোনা কণ্ঠস্বর, 'আবার কর্মীজনগণের মধ্যে কাজের উন্মাদনা জাগাতে হবে! মদনকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে লেবার কলোনিতে। ডিটেনশন ক্যাম্পে। শ্রমিককে তার উৎপাদনের ভাগিদার করতে হবে! মদনকে না-বাঁচিয়ে আধুনিক বিশ্বের পরিত্রাণ নেই খানসাহেব!'

নীলকণ্ঠকে গ্রেফতার করে পুলিশ। লাল চীবর আবৃত অদ্ভুত-দর্শন নীলকণ্ঠ'র দিকে চেয়ে থাকে ডিকে। আহত রিঞ্চেন লামা ডিকের কানের কাছে মুখ এনে অস্ফুটে বলেন, 'আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মিস্টার কয়াল।' লামার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে কপালে ঠেকায় ডিকে।

গুম্ফা থেকে বেরোনোর সময় হাত নেড়ে বিদায় দেন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা। তেনজিং-এর কোলে কেতু, আহত সে শার্দুল সামনের দু'পা দিয়ে জড়িয়ে আছে তেনজিং-এর গলা। পাশে পাসাং লামা।

গাড়িতে যেতে যেতে ডিকে হেসে কেবল একটা কথাই বলে, 'কবীরদা, সবই হল, কিন্তু কামসূত্র উপন্যাস ঠিক কে লিখেছেন জানা গেল না!'

বহুক্ষণ পরে হাসেন কবীর। নিবেদিতার মুখেও হাসি। তার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে ছোট্ট অর্হৎ। ঝুঁকে অর্হতের কপালে চুমু খায় নিবেদিতা। হাত বুলিয়ে দেয় মাথায়। গাড়ি এগিয়ে চলে কালুক থানার দিকে।

নিবেদিতাদের বিদায় দিয়ে গোন থাং-এর দিকে এগোয় তেনজিং। কোলে কেতু। পেছনে পাসাং লামা। আগামিকাল গুরু চোংখাপা আলোর উৎসব। ভোর ভোর শুরু করেতে হবে দীক্ষাপর্ব।

জলে যেভাবে গুলে যায় কালো রঙ, চরাচরে অন্ধকার যেন ছড়িয়ে পড়ে সেইভাবে। ঠান্ডা পিছু নেয় অন্ধকারের। রিঞ্চেন লামা পাসাং-এর। হেলিকপ্টারের শব্দ মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নিশাচর পাখির পাখসাট টপকে লামা রিঞ্চেনের কানে আসে অন্য কোনও আওয়াজ। চাপা কান্না কি মিশে আছে বাতাসের শিসে?

==X==

অনুকথন

দু'হাজার পনের ও ষোল, দু'বছর ধরে যখন 'বিন্দুবিসর্গ' ছাপাতে শীতলতা দেখাচ্ছেন বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদক ও প্রকাশক, তখনই আমার মাথায় বিজবিজ করতে শুরু করেছে এই কাহিনির পরবর্তী পর্ব। কিন্তু নতুন লেখা শুরু করতে পারছি না, আগে প্রাথমিক পর্বের একটা হিল্লে হওয়া দরকার। ষোল'য় নিজস্ব ব্লগ-এ লেখাটি দিতেই পাঠকের অভাবনীয় সাড়া আর তাই দেখে রাজি হলেন প্রকাশক। সতের'র ফেব্রুয়ারিতে, কলকাতা বইমেলার শেষলগ্নে, সরস্বতী পুজোর দিন, অনাড়ম্বর প্রকাশ পেল 'বিন্দুবিসর্গ'। তারপর পাঠক, আমার প্রত্যাশা মতোই, বুকে তুলে নিলেন বইটি এবং আগলে রেখেছেন আজও।

লেখাটির হিল্লে হতেই শুরু করে দিলাম কলিম খান-এর সঙ্গে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্রয়োজনীয় রেকর্ডিং আর বই সংগ্রহ। স্যারের (রবি চক্রবর্তী) বয়সের কথা মাথায় রেখে তাঁকে খুব বিরক্ত করি না, প্রয়োজনে বাতচিত হয় ফোনে। গোটা সতের সাল জুড়ে কলিম খানের সঙ্গে চলল বাৎস্যায়নের কামসূত্র নিয়ে কথোপকথন, পাশাপাশি লেখাও। কখনও মুখোমুখি সাক্ষাৎ, কখনও ফোনে, কখনও প্রশ্নাবলী ই-মেল করছি, প্রত্যুত্তরও পাচ্ছি মেল মারফত। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর, একক ও যৌথ, সমস্ত বই পড়ে ফেলছি আবার। এবার কিঞ্চিৎ জোর দিলাম ওঁদের অভিধান, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ-এর দুই খণ্ডে। সরল শব্দার্থকোষও ছিল হাতের কাছে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র ইংরেজি অনুবাদে একাধিক পেলেও, বাংলা অনুবাদ সেই মুহূর্তে বাজারে অমিল, বন্ধু তাপস দাশ দিয়েছিলেন নবপত্র প্রকাশিত কামসূত্র-এর বাংলা অনুবাদ মূল সংস্কৃত শ্লোকসহ। তরুণ অধ্যাপক অভিষেক ঘোষাল বেশকিছু অপরিহার্য বই জুগিয়ে পাশে ছিলেন। অনুজ সহকর্মী দ্বৈপায়ন ঘোষও জরুরি বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। কেবল নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে নয়, ক্রিয়াভিত্তিক যে কোনও শব্দার্থ প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে ভরসা

দিয়েছেন অগ্রজ বন্ধু নারায়ণচন্দ্র দাস। ক্রিয়াভিত্তিক যে কোনও শব্দার্থ বুঝতে সাহায্য করেছে শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র-এর 'বর্ণসঙ্গীত' বইটিও। মহার্ঘ বইয়ের সন্ধান ও শব্দার্থ সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন বৌদ্ধ ও পালি সাহিত্য বিশেষজ্ঞ, লেখক নন্দিতা মিশ্র চক্রবর্তী।

তাপস দাশ সম্পাদনা করেছেন এই উপন্যাস। আমার তরফ থেকে লেখা সম্পূর্ণ করার পর, ওঁর মূল্যবান পরামর্শ মেনে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও কাটাছেঁড়া পর্ব পার করে তৈরি হয়েছে চূড়ান্ত খসড়া। তিন বছর আগে আঠের'র ১১ জুন কলিম খান প্রায় বিনা-নোটিশে ছেড়ে চলে গেলেন আমাদের। বাৎস্যায়নের কামসূত্র-এর বিনির্মাণ করেছেন তিনি, তাঁর সেই সূত্র ধরেই আমি ফাঁদব উপন্যাস, জানতেন কিন্তু দেখে যেতে পারলেন না। তাঁকে প্রণাম।

বাংলার বিশ্ববোধ—রেশমপথের প্রান্তে বাংলা—কূপমণ্ডুকতার সূত্রপাত শীর্ষক এক অসাধারণ নিবন্ধে প্রাচীন বাংলার সওদাগরি ইতিহাস লিখে নিজের ফেসবুক দেওয়ালে দিয়েছিলেন লেখক শেখর মুখোপাধ্যায়। তাঁর অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করেছি সেই লেখার অংশবিশেষ। ধ্বংসস্তূপ শব্দের অর্থসূত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন নাটককার অরূপশঙ্কর মৈত্র। দু'বছর আগে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির পত্রিকা চিরসবুজ লেখা'র শারদ সংখ্যার জন্য, ছোট উপন্যাস লিখতে বলেছিলেন লেখক দীপান্বিতা রায়। পাঁচ হাজার শব্দে টাইগার লামার কাহিনি পরীক্ষামূলকভাবে লিখে, দেখে নিতে চেয়েছিলাম পাঠকের প্রতিক্রিয়া। সফল হয়েছিল পরীক্ষা। এখন এক লক্ষ দশ হাজার শব্দের টাইগার লামার কাহিনি'র ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে, ইত্যবসরে, উল্লেখিত বন্ধুদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানান যাক।

কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর লেখা ব্যতীত, অন্যান্য যে বইগুলোর সাহায্য পেয়েছি লিখে ফেলা যাক এক-এক করে। প্রাচীন ভারতের জন্য সহায় হয়েছে সুকুমারী ভট্টাচার্য অনূদিত শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক; বাংলা অনুবাদে ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ; বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের সংস্কৃত নাটকে প্রাচীন ভারতের সমাজজচিত্র: শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক;

সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের দুই খণ্ড প্রাচীন ভারতের ইতিহাস; সুকুমার সিকদারের অনুবাদে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র; সুধাময় দাশের প্রাচীন উপমহাদেশ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাজা-রাজনীতি ও সমাজ; গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়; অক্ষয়কুমার দত্তের প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার; রজনীকান্ত গুহ'র মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ, সঞ্জীব সান্যালের দ্য ওশেন অফ চার্ন, হাও দ্য ইন্ডিয়ান ওশেন শেপড হিউম্যান হিস্ট্রি ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস কুমারসম্ভবের কবি।

বৌদ্ধধর্ম, তার বিভিন্ন পর্যায়-বিস্তার ও তন্ত্র বিষয়ে সাহায্য করেছে সাধনকমল চৌধুরী অনূদিত অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদ্ধধর্ম্ম; হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিষয়: বৌদ্ধধর্ম; বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের বৌদ্ধদের দেবদেবী; শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়ার প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ; দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়ার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস; মণিকুন্তলা হালদার (দে)র বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস; শরৎকুমার রায়ের বৌদ্ধ ভারত; সাধনকমল চৌধুরীর বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন; প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও গৌতম বুদ্ধ; উপনিষৎ ও বুদ্ধ; বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনায় নারীর অবদান; ভারতের নির্বাসিত বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ও অজ্ঞাত ইতিহাস; রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন; ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি; নলিনীকান্ত দাশগুপ্তের বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম; এডওয়ার্ড আইরনস-এর এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বুডঢিজম; আনন্দ কে কুমারস্বামীর এলিমেন্টস অফ বুডঢিস্ট আইকোনোগ্রাফি; গোপীনাথ কবিরাজের দুই খণ্ড তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার তন্ত্র; শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তির তন্ত্রই সাধনা—সাধনাই তন্ত্র ও শ্রীমৎ স্বামী সাধনানন্দ গিরি'র যোগ ও সাধন রহস্য। এই বইগুলি ছাড়াও সাহায্য করেছে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর নিবন্ধ শঙ্করাচার্য ও বৌদ্ধধর্ম; দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের লামা বিষয়ক নিবন্ধ; বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্র নিয়ে ঢাকার রণদীপম বসু ও অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্য্যের লেখা।

প্রাচীন ও বর্তমান তিব্বত ও কালিম্পং-এর পূর্বাপর ইতিহাস জানতে সাহায্য করেছে অস্টিন ওয়াডেলের দ্য বুডঢিজম অফ টিবেট অর লামাইজম; লামা থুবতেন ইয়েশি'র দ্য এসেন্স অফ টিবেটান বুডঢিজম; জন পাওয়ার্স-এর ইন্ট্রোডাকশন টু টিবেটান বুডঢিজম; ডেভিড জ্যাকসনের মিরর অফ দ্য বুডঢা: আর্লি পোর্ট্রেটস ফ্রম টিবেট; তানসেন সেনের

বুডঢিজম অ্যাক্রজ এশিয়া ভলিউম ওয়ান; রবার্ট বিয়ারের দ্য হ্যান্ডবুক অফ টিবেটান বুডঢিস্ট সিম্বলস; লি জিয়াংলিং-এর টিবেট ইন অ্যাগনি: লাসা নাইন্টি ফিফটি নাইন; গেলো থন্ডুপের দ্য নুডল মেকার অফ কালিম্পং ও অলকা চট্টোপাধ্যায়ের অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। সমন্থ সুব্রামনিয়ন, অনিরুদ্ধ সরকার, স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, প্রেম পোদ্দার ও লিজা লিঙ্কভিৎজ-এর বিভিন্ন নিবন্ধও এই বিষয়ে সহায়ক হয়েছে।

আমাদের বাংলার ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ে সহায়ক হয়েছে নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব; দীনেশ চন্দ্র সেনের বৃহৎ বঙ্গ; শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষের গৌড় কাহিনী; রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাস; ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গ বাঙ্গাল ও ভারত; অলকা চট্টোপাধ্যায়ের চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী; যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো)-এর বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস; ডঃ অতুল সুরের বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাস বেণের মেয়ে। সাহায্য পেয়েছি অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও বিশ্বেন্দু নন্দ সম্পাদিত পরম পত্রিকা প্রবন্ধ সংকলনের।

কামসূত্র ও পুরাণ নিয়ে ভরসা জুগিয়েছে ওয়েন্ডি ডনিগর ও সুধীর ককর অনূদিত(ইং) বাৎস্যায়নের কামসূত্র, গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগরের বাংলা অনুবাদে বাৎস্যায়নের কামসূত্র, ওয়েন্ডি ডনিগরের রিডিমিং দ্য কামসূত্র; দি হিন্দুজ, আ অলটারনেটিভ হিস্ট্রি ও সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত পৌরাণিক অভিধান।

অজস্র বই ছাড়াও বিস্তর নিবন্ধ, প্রতিবেদন, জার্নাল ও ম্যানুয়ল সহায় হয়েছে এই চার বছরে। ব্যবহার করেছি, দ্য হিন্দু, দ্য ফ্রন্টলাইন, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য প্রিন্ট, দ্য ওয়্যার, দ্য অর্গানাইজার, দ্য ডিপ্লোম্যাট, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, বঙ্গদর্শন.কম-সহ বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত চিন-তিব্বত-ভারত সংক্রান্ত দেদার প্রতিবেদন ও নিবন্ধের তথ্যাবলি।

উপন্যাসে উল্লেখিত পাণ্ডুলিপিসহ যাবতীয় শিল্পকর্ম, গুম্ফা, জাদুঘর, সংগঠন, হোটেল, প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সরকারি নিরাপত্তা সংস্থা/এজেন্সিসহ

অন্যান্য বিভাগের যোগসূত্র ও কার্যক্রম উপন্যাসের স্বার্থে কল্পনার আশ্রয়ে নির্মিত। চুসি গাংদ্রুক-এর বর্তমান অবস্থান ও কর্মসূচীও কাহিনির প্রয়োজনে সম্পূর্ণ মনগড়া। ঐতিহাসিক ও বাস্তব চরিত্র/ঘটনা ছাড়া এই উপন্যাসের সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে কোনও মিল নেই। কোনও ধর্ম ও সংস্থার সম্মানহানি বা বিশ্বাসে আঘাত, জ্ঞানত করা হয়নি।

খ্যাতনামা তিব্বতি চিত্রকর তাশি নরবু'র স্টাইল অনুসরণ করে প্রচ্ছদ করেছেন সৌজন্য চক্রবর্তী।

এর পরেও কোনও তথ্যসূত্র অনুল্লেখিত থাকলে তা ইচ্ছাকৃত নয়, নিতান্তই অনবধানতাবশত। অনিচ্ছাকৃত যেকোনও ত্রুটির জন্যই লেখক আগাম ক্ষমাপ্রার্থী। এই গ্রন্থ নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ।

আসন্ন উৎসবের শুভেচ্ছাসহ,
দেবতোষ দাশ।

১৬ সেপ্টেম্বর। ২০২১

https://boierpathshala.blogspot.com